

বাংলা
স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম
এম.এ
দ্বিতীয় সেমেস্টার

পঞ্চম পত্র
(সিবিসিএস)

পাঠ-সহায়ক উপাদান



মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ
ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যান্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫
পশ্চিমবঙ্গ

পাঠ-প্রণেতা

ড. রাজশেখর নন্দী — সহকারী অধ্যাপক (চুক্তিভিত্তিক) বাংলা বিভাগ, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. শ্রাবন্তী পান — সহকারী অধ্যাপক (চুক্তিভিত্তিক) বাংলা বিভাগ, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

জুন ২০১৯

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও

প্রিন্টটেক্, ১৫এ, অম্বিকা মুখার্জী রোড, কলকাতা-৭০০০৫৬ দ্বারা মুদ্রিত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ-সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোন অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইনানুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের লেখক/পাঠপ্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Message

Satisfying the varied needs of distance learners, overcoming the obstacle of distance and reaching the unreached students are the threefold functions catered by Open and Distance Learning (ODL) systems. The onus lies on writers, editors, production professionals and other personnel involved in the process to overcome the challenges inherent to curriculum design and production of relevant Self Learning Materials (SLMs). At the University of Kalyani a dedicated team under the able guidance of the Hon'ble Vice-Chancellor has invested its best efforts, professionally and in keeping with the demands of Post Graduate CBCS Programmes in Distance Mode to devise a self-sufficient curriculum for each course offered by the Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Development of printed SLMs for students admitted to the DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2017 had been our endeavour. We are happy to have achieved our goal.

Utmost care and precision have been ensured in the development of the SLMs, making them useful to the learners, besides avoiding errors as far as practicable. Further suggestions from the stakeholders in this would be welcome.

During the production-process of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) Sankar Kumar Ghosh, Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Sincere gratitude is due to the respective chairpersons as well as each and every member of PGBOS (DODL), University of Kalyani. Heartfelt thanks is also due to the Course Writers-faculty members at the DODL, subject-experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have enriched the SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would especially like to convey gratitude to all other University dignitaries and personnel involved either at the conceptual or operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their persistent and co-ordinated efforts have resulted in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any form without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Director
Directorate of Open and Distance Learning
University of Kalyani

পাঠক্রম
পঞ্চম পত্র
শিরোনাম : সি. বি. সি. এস বাংলা (ছাত্র নির্বাচিত)

পর্যায় গ্রন্থ : ১ কবিতা (সময় : ৪ ঘণ্টা)

- একক ১. রবীন্দ্রনাথের কবিতা — (সোনার তরী, জীবন দেবতা, অভিসার)
একক ২. জীবনানন্দ দাশ — বনলতা সেন (বনলতা সেন)
একক ৩. কাজী নজরুল ইসলাম — মানুষ (সাম্যবাদী/সংগীত)
একক ৪. সুভাষ মুখোপাধ্যায় — একটি কবিতার জন্য (সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা)

পর্যায় গ্রন্থ : ২ বাংলা উপন্যাস (সময় : ২ ঘণ্টা)

- একক ৫. শেষের কবিতা — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
একক ৬. কবি — তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

পর্যায় গ্রন্থ : ৩ প্রয়োগের বাংলা ভাষা (সময় : ৩ ঘণ্টা)

- একক ৭. ভাষার স্বরূপ
একক ৮. পত্র-পত্রিকার ভাষা
একক ৯. বিজ্ঞাপনের ভাষা

পর্যায় গ্রন্থ : ৪ নাটক ও নাট্যমঞ্চ (সময় : ৩ ঘণ্টা)

- একক ১০. মুক্তধারা
একক ১১. মেবার পতন
একক ১২. নাট্যমঞ্চ

পর্যায় গ্রন্থ : ৫ বাংলা ছোটগল্প (সময় : ৪ ঘণ্টা)

- একক ১৩. প্রাক-চল্লিশ বাংলা ছোটগল্প, উপএকক-১ (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—কাশীবাসিনী, বনফুল—ক্যানভাসার)
একক ১৪. প্রাক-চল্লিশ বাংলা ছোটগল্প, উপএকক-২ (প্রেমেন্দ্র মিত্র—সংসার সীমান্তে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—টোপ)
একক ১৫. চল্লিশোত্তর বাংলা ছোটগল্প, উপএকক-১ (বিমল কর—আঙ্গুরলতা, রমাপদ চৌধুরী—আমি ও আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া)
একক ১৬. চল্লিশোত্তর বাংলা ছোটগল্প, উপএকক-২ (অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়—কাফের, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়—স্বপ্নের ভিতর মৃত্যু)

সূচিপত্র

পঞ্চম পত্র

পঞ্চম পত্র	একক	শিরোনাম	পাঠ প্রণেতা	পৃষ্ঠা
পর্যায় গ্রন্থ ১	১.	রবীন্দ্রনাথের কবিতা—(সোনার তরী, জীবন দেবতা, অভিসার)	ড. শ্রাবন্তী পান	১-১১
	২.	জীবনানন্দ দাশ—বনলতা সেন (বনলতা সেন)	ড. শ্রাবন্তী পান	১২-১৮
	৩.	কাজী নজরুল ইসলাম—মানুষ (সাম্যবাদী/সম্মিতা)	ড. শ্রাবন্তী পান	১৯-২৬
	৪.	সুভাষ মুখোপাধ্যায়—একটি কবিতার জন্য (সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা)	ড. শ্রাবন্তী পান	২৭-৩০
পর্যায় গ্রন্থ ২	৫.	শেষের কবিতা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ড. রাজশেখর নন্দী	৩১-৪৭
	৬.	কবি—তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়	ড. রাজশেখর নন্দী	৪৮-৫৮
পর্যায় গ্রন্থ ৩	৭.	ভাষার স্বরূপ	ড. শ্রাবন্তী পান	৫৯-৬৫
	৮.	পত্র-পত্রিকার ভাষা	ড. শ্রাবন্তী পান	৬৬-৭৬
	৯.	বিজ্ঞাপনের ভাষা	ড. শ্রাবন্তী পান	৭৭-৮৮
পর্যায় গ্রন্থ ৪	১০.	মুক্তধারা	ড. শ্রাবন্তী পান	৮৯-৯৪
	১১.	মেবার পতন	ড. শ্রাবন্তী পান	৯৫-১০০
	১২.	নাট্যমঞ্চ	ড. শ্রাবন্তী পান	১০১-১১১
পর্যায় গ্রন্থ ৫	১৩.	প্রাক-চল্লিশ বাংলা ছোটগল্প, উপএকক-১ (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—কাশীবাসিনী, বনফুল—ক্যানভাসার)	ড. রাজশেখর নন্দী	১১২-১১৮
	১৪.	প্রাক-চল্লিশ বাংলা ছোটগল্প, উপএকক-২ (প্রেমেন্দ্র মিত্র— সংসার সীমান্তে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—টোপ)	ড. রাজশেখর নন্দী	১১৯-১২৬
	১৫.	চল্লিশোত্তর বাংলা ছোটগল্প, উপএকক-১ (বিমল কর— আঙ্গুরলতা, রমাপদ চৌধুরী—আমি ও আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া)	ড. রাজশেখর নন্দী	১২৭-১৩৫
	১৬.	চল্লিশোত্তর বাংলা ছোটগল্প, উপএকক-২ (অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় —কাফের, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়—স্বপ্নের ভিতর মৃত্যু)	ড. রাজশেখর নন্দী	১৩৬-১৪৬

পর্যায় গ্রন্থ - ১
কবিতা
একক ১
রবীন্দ্রনাথের কবিতা

বিন্যাসক্রম

- ৫.১.১.১ : রবীন্দ্র কাব্যপরিক্রমা
৫.১.১.২ : সোনার তরী
৫.১.১.৩ : জীবনদেবতা
৫.১.১.৪ : অভিসার
৫.১.১.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলি
৫.১.১.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৫.১.১.১ : রবীন্দ্র কাব্যপরিক্রমা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) কাব্যসাহিত্যের পথিকৃৎ। জীবনের প্রথম দিন থেকে শুরু করে শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সাহিত্যসাগরে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্র কবিমানসের রোমাণ্টিক কাব্যধারা ও রোমাণ্টিক জীবনে উপলব্ধি হলো মানসী থেকে ক্ষণিকা পর্যন্ত। এই সময়ে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে রবীন্দ্র কবিমানসের যে নিবিড় পরিচিতি ঘটেছিল, তারই রূপ ফুটে উঠেছে এই কাব্যধারায়।

মাত্র বারো বছর বয়েস থেকে শুরু করে আশি বছর বয়েস পর্যন্ত একের পর এক যিনি সৃষ্টি করেছেন কাব্যের পাহাড়। আর সেই কাব্যের পরিচয় যতোই সংক্ষেপে দেওয়া হোক না কেনো তার বলার শেষ নেই। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ কাব্যকার। তাঁর কাব্য ছোটো করে বলা চলে না। কবির প্রাণশক্তির এত প্রাচুর্য, আবেগের সুবিশাল গভীরতা, রোমান্সের কল্পস্বর্গপরিক্রমা যিনি নিজেই যেন এক গোটা বিশ্ব। এককভাবে রবীন্দ্রপ্রতিভার সাথে কোনো কবির তুলনা চলে না। বিশ্বের বিখ্যাত বিখ্যাত কাব্যকার, ব্যাস, বাস্কীকি, শেলী, কীটস সবার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ অনুপম। তাঁর কাব্যগুলি গুণে, স্বাতন্ত্র্যে অনন্য।

অতি শৈশব থেকে রবীন্দ্রনাথ কাব্যচর্চা শুরু করেন। ঠাকুরবাড়ি সাহিত্যিক পরিবেশ বেড়ে ওঠার দরফন ও পিতা দেবেন্দ্রনাথের শিল্পরচির সান্নিধ্যে এসে। সেই থেকেই আবেগপ্রবণ বালক কবি নিজেকে স্বতন্ত্রভাবে মেলে ধরতে সক্ষম হয়। কিন্তু শৈশবে বেশ কিছুদিন তাঁকে বিদ্যালয়ের চারদেওয়ালের মধ্যে জীবন কাটাতে হয়েছিল। যা তাঁর কাছে ছিলো খুবই দম আটকানো পরিবেশে থাকার মতন। বিদ্যালয় জীবন থেকে ছুটি পেয়ে বালক রবি

নিজগৃহেই পরিবেশ যোগ্য শিক্ষক দ্বারা নানান বিষয়ে অধ্যয়ন করতে লাগলেন। বাড়িতেই বাংলা, ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্য চর্চার যে ঢালাও পরিবেশ ছিলো তার থেকেই রবীন্দ্রনাথ একটু একটু শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। ফলে বয়েসের তুলনায় অধিক পড়েছিলেন এবং অল্প বয়েসে মনন, আবেগ প্রভৃতি অনেক পরিপক্বতা লাভ করেছিল সাহিত্য চর্চার ফলে। কৈশরে মা সরদা দেবী চলে যাওয়ায় বালক রবি কিছুটা হলেও একা হয়ে যান। কিন্তু সেই মাতৃহারা কিশোর আবার উৎসাহিত হয় নতুন বৌঠানের সান্নিধ্যে এসে। তাঁর শিল্পী মন বৌঠাকুরাণীর সান্নিধ্যে এসে মুকুলিত হতে থাকে।

কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে আরো উৎসাহিত করেছিল কাব্যগুরু বিহারীলালের গীতিরসসিক্ত ইন্দ্রিয়াতীত পিপাসা, তাঁর দাদাদের সাহচর্য্য এছাড়াও তখন কবি নেশায় ডুবে আছেন শেফালীর ম্যাকবেথ ও কালিদাসের কুমারসম্ভবের। এছাড়াও পড়ছেন সংস্কৃত সাহিত্য। জয়দেবের গীতগোবিন্দ প্রভৃতি। এছাড়াও কিছু রাধা কৃষ্ণ বিষয়ক বৈষ্ণব পদ। যা রবীন্দ্রনাথকে কাব্য লিখতে অনেকটা উৎসাহিত করেছিলো। রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা “হিন্দুমেলায় উপহার”। ১৮৭৫ সালে যে কবিতাটি তিনি হিন্দুমেলায় পাঠ করে শোনান। ১২৮১ বঙ্গাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের নাম না দিয়ে একখানি কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু বুঝতে পারা যায় যে কাব্যটি তাঁরই লেখা।

১৮৭৮ থেকে ১৮৮১ সালের মধ্যে তিনি লিখলেন কিছু নাট্যকাব্য। যেমন— “রুদ্রচণ্ড”, “শৈশবসঙ্গীত” ও “কালমৃগয়া”। কিন্তু কিশোর কবি প্রথম মুক্তির স্বাদ পেয়েছিলেন ১৮৭১ সালে। তিনি ব্রজবুলি ভাষায় আদবকায়দায় লিখলেন “ভনুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী”। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ ১৭ বছরের বালক মাত্র। কিন্তু তাঁর এই কাব্যে ভাবের গুণ, ভাষার চাটুর্য্য এতই প্রখর ছিল যে তখন যে সব বৈষ্ণব কবিরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা নিয়ে লিখছিলেন তাঁদেরকেও বালক রবীন্দ্রনাথ হার মানিয়ে ছিলেন। বৈষ্ণব পদাবলীর সাথে এই কাব্যের তেমন সাদৃশ্য না থাকলেও এতে বালক কবি যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন তা স্পষ্ট।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের উন্মেষ পর্বের মধ্যে দিয়ে কবির কাব্যধারার বিকাশ শুরু হয়। এই প্রথম তিনি রোমান্সের কল্পলোক ত্যাগ করে পৃথিবীর মাটিতে নেমে এলেন। লিখলেন— “সন্ধ্যাসঙ্গীত,” “প্রভাতসঙ্গীত,” “ছবি ও গান”, “কড়ি ও কোমল” প্রভৃতি কাব্য।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে যে সমস্ত কাব্য লিখেছিলেন সেগুলি রোমান্টিকতায় ভরপুর। এই অধ্যায়কে তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যায় বলা হয়। তাঁর বিখ্যাত বিখ্যাত কাব্যগুলি এই পর্যায়ে রচিত হয়। তার মধ্যে অন্যতম “চিত্রা”, “চৈতালি”, “সোনার তরী”, “মানসী” প্রভৃতি।

“মানসী” কাব্যগ্রন্থতে কবি মর্ত্যকেন্দ্রিক বাসনা ত্যাগ করে বাইরের জগতের সাথে অন্তরের জগতের মেলবন্ধন ঘটাতে না পেরে, রবীন্দ্রনাথ প্রথাগত জীবনের সাথে নিজেকে না মেলাতে পেরে এক অন্য বিচ্ছিন্ন জগতকে আশ্রয় করেছেন। কখনো প্রকৃতির মাঝে খুঁজে পেয়েছেন মানব জীবনের আশ্বাদ আবার কখনো মৃত্যুর বিভৎসতাকে উপলব্ধি করেছেন কিংবা আবার কখনো তীব্র ব্যঙ্গের সাথে বাঙালি জীবনকে কটাক্ষ করেছেন।

মানসীর কিছু পরেই প্রকাশিত হয়েছিলো রবীন্দ্রসাহিত্যের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ তথা কবির সেই সোনার ফসল যা তিনি সৃষ্টি করেছিলেন “সোনার তরী”। রবীন্দ্রকবিজীবনের এক বিশেষ প্রতীক। এই কাব্যে রবীন্দ্রনাথের সাথে পরিচয় হয় জীবনদেবতার। যার নৌকায় রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সোনার ফসল ঠাসা। কিন্তু কবির কোনো স্থান নেই। আবার নিরুদ্দেশ যাত্রাতে রবীন্দ্রনাথ দেখছেন কোনো এক নিরুদ্দেশের পথে কবি যাচ্ছেন কিন্তু তখনও সেই মানস

সুন্দরী কবি যাকে প্রশ্ন করছেন তার সাথে পুরোপুরিভাবে পরিচয় হয় নি। সে পুরুষ না নারী তাও কবি জানেন না।

“চিত্রা” কবির বিখ্যাত একটি কাব্যগ্রন্থ। ১৮৯৬ সালে এটি প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্য তথা বিশ্বসাহিত্যের বিখ্যাত একটি কাব্যগ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের কিছু উৎকৃষ্ট কবিতার সম্পদ। এই কাব্যে মানস সুন্দরী ও জীবনদেবতা তত্ত্ব পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। “চিত্রা” কাব্যসীমার সঙ্গে অসীমের, বাইরের জীবনের সঙ্গে অন্তরের যে বিচিত্র ভাব দেখা যায় তাতে “চিত্রা” কে রবীন্দ্রকাব্যের মধ্যে সবথেকে উৎকৃষ্ট বলা যেতে পারে। এর অন্তর্বর্তী পর্বে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন “কথা”, “কাহিনী”, “ক্ষণিকা”, “নৈবেদ্য”, “স্মরণ” প্রভৃতি উৎকৃষ্ট মানের কিছু কাব্যগ্রন্থ।

গীতাঞ্জলি পর্বে রবীন্দ্রনাথ জীবনের মায়া কাটিয়ে ভগবানকেই প্রিয় ও বন্ধু বলে ভাবলেন। রবীন্দ্রকাব্য জীবনের এটিকে আধ্যাত্মিক পর্বও বলা হয়। এছাড়াও এই গীতাঞ্জলির জন্য রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি হিসাবে সমাজ ও সাহিত্যে পরিচয় লাভ করেছিলেন। ১৯১৩ সালে গীতাঞ্জলি ইংরেজি অনুবাদ “song offerings”-এর জন্য তিনি প্রথম এশিয়ার কবি হিসাবে বিশ্বসাহিত্যের প্রাঙ্গণে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। দেশে বিদেশে এই বাঙালি কবি ও তাঁর বিশ্ববিখ্যাত কাব্যকে নিয়ে বহু প্রশংসা হয়। শুধু গীতাঞ্জলী নয় তার সাথে “গীতিমাল্য”, “গীতালি” এই দুটি কাব্য একত্রে “গীতাঞ্জলি” পর্ব নাম দেওয়া হয়। “গীতাঞ্জলি” তে রবীন্দ্রনাথ অন্তর দেবতাকে প্রিয়রূপে, সখারূপে ও প্রাণেশরূপে কল্পনা করেছেন। শূন্য জীবনে ভগবানকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছেন বারবার। তাই কবি ভয়াবহ ঝড়ের রাতে সেই প্রিয়ের সন্ধান করেন কিংবা আষাঢ়ের সন্ধ্যায় যখন কবি একলা তখন তিনি বলছেন “এই যে আসে, আসে, আসে”। “গীতাঞ্জলি” কে তাই রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে ধার হয়।

শেষ জীবনেও রবীন্দ্রনাথ বারোখানি কাব্য লিখেছিলেন। তখন রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধি। কিন্তু জীবনের সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে তিনি বারবার হাতে তুলে নিয়েছেন কলম। জীবন ও মৃত্যুর দোলায় দুলতে দুলতে সৃষ্টি করেছিলেন আরো কতোগুলি কাব্য। জীবনের শেষ দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেও কল্পনার জোয়ার কিন্তু সমানভাবে বয়ে চলেছিলো কবি হৃদয়ে। আবেগের উচ্ছাসও কম ছিলো না। প্রাণশক্তির প্রাচুর্য আরো বেড়ে গিয়েছিলো। এই সময়ে কবি লিখলেন—“পুনশ্চ”—১৯৩২, “বিচিত্রা”—১৯৩৩, “শেষ সপ্তক”—১৯৩৫, “বীথিকা”—১৯৩৫, “পত্রপুট”—১৯৩৬, “শ্যামলী”—১৯৩৬, প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ।

এজন্য ১৯৩৮ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত কবির শেষ জীবনে লেখা কাব্যগুলিকে রবীন্দ্রনাথ প্রেম, রোমান্স ছেড়ে এক আধ্যাত্মিকতার কবি হিসাবে পৃথিবীর কবি হয়ে উঠতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ বাঙালির বিস্ময়। বাংলা সাহিত্যের বিস্ময়। বাঙালির কাব্যধারার অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর কাব্য সোনার ফসল আপামর বাঙালির কাছে। তাই বলা যেতে পারে গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, সবধারার মতোই সাহিত্যের এই ধারাতেও তিনি সর্বসর্বা।

৫.১.১.২ : সোনার তরী

সোনার তরী (১৮৯৪) কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা ‘সোনার তরী’। এটি বহুল পঠিত ও আলোচিত কবিতার মধ্যে একটি। একটি গ্রামীণ দৃশ্যপটের নিটোল বর্ণনা এতে উপস্থাপিত হয়েছে। কবিতার দৃশ্যকল্প মানুষকে চিরচেনা প্রকৃতিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

■ কবিতার দৃশ্যকল্প :

- আকাশে মেঘ গর্জন করছে। চারিদিকে বরষার জল থৈথৈ করছে। সঙ্গে খরস্রোত বয়ে চলছে। জমির ধান কেটে একটি ছোট খেতে কৃষক একা বসে আছেন, পার হওয়ার কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না। ধান কাটতে কাটতে নদীর জল বেড়ে গেছে। খেতের চারিদিকে নদীর বাঁকা জল খেলা করছে।
- ওদিকে ওপারের দিকে তাকিয়ে কৃষক দেখলেন এই সকালেই মেঘ ছেয়ে আছে। ওপারের গাছগুলো ঢাকা পড়েছে মেঘের আড়ালে। এমনকি তার গ্রাম পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। এমন পরিস্থিতিতে কেউ একজন গান গেয়ে নৌকা বেয়ে এপারের দিকে আসছে। দেখে তাকে পরিচিত মনে হচ্ছে। কিন্তু সে তো কোনো দিকে না তাকিয়ে ভরা নৌকা নিয়ে চলে যাচ্ছে। কৃষক তাকে গলা ছেড়ে ডাকে —‘ওগো, তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে,/বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে।’
- কৃষকের ডাকে কেউ একজন নৌকা নিয়ে আসতে থাকে তীরের দিকে। জানতে চায়, কৃষক কোথায় যাবে? কৃষক বলেন, ‘যেয়ো যেথা যেতে চাও,/ যারে খুশি তারে দাও, /শুধু তুমি নিয়ে যাও,/ ক্ষণিক হেসে/ আমার সোনার ধান কূলেতে এসে।’
- মাঝি এসে নৌকায় সাধ্যমতো ধান তোলে। এতক্ষণ কৃষক যে ধান নিয়ে নদীর তীরে পারাপারের অপেক্ষা করছিলেন তা সব নৌকায় তুললেন। কিন্তু কৃষককে নেওয়ার মতো জায়গা হলো না। কৃষক রয়ে গেলেন ধানখেতে শূন্য নদীর তীরে। তার যা কিছু অর্জন ছিল তা নিয়ে গেলে সোনার তরী।

■ অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গনা :

এমন দৃশ্যপটের অন্তরালেও গভীর অর্থ নিহিত রয়েছে। তাই ‘সোনার তরী’ কবিতার ব্যাখ্যা একেকজন একেকভাবে উপস্থাপন করেছেন। এখানে কবির নিজের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হল :

“মহাকাল প্রবাহিত হইয়া চলিয়া যাইতেছে, মানুষ তাহার কাছে নিজের সমস্ত কৃত-কর্ম কীর্তি সমর্পণ করিতেছে এবং মহাকাল সেই সমস্তই গ্রহণ করিয়া এক কাল হইতে অন্য কালে, এক দেশ হইতে অন্য দেশে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, সেগুলিকে রক্ষা করিতেছে। কিন্তু যখন মানুষ মহাকালকে অনুরোধ করিল-যে ‘এখন আমারে লহ করুণা ক’রে’ তখন মানুষ নিজেই দেখিল যে—

‘ঠাই নাই, ঠাই নাই! ছোট সে তরী/আমারি সোনার ধানে গিয়াছে ভরি’!

মহাকাল মানুষের কর্ম কীর্তি বহন করিয়া লইয়া যায়, রক্ষা করে, কিন্তু স্বয়ং কীর্তিমান মানুষকে সে রক্ষা করিতে চায় না। হোমার বাল্মীকি ব্যাস কালিদাস শেক্সপীয়ার নেপোলিয়ান আলেকজান্ডার প্রতাপসিংহ প্রভৃতির কীর্তিকথা মহাকাল বহন করিয়া লইয়া চলিতেছে, কিন্তু সে সেই সব কীর্তিমানদের রক্ষা করে নাই। যিনি প্রথম অগ্নি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, বস্ত্রবয়নের তাঁত ইত্যাদি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ইতিহাস রক্ষা করে নাই, কিন্তু তাঁহাদের কীর্তি মানব-সভ্যতার ইতিহাস অমর হইয়া আছে।”

এই সম্ভার পরদিন প্রত্যুষেই কবি শান্তিনিকেতন-মন্দিরে উপাসনা করেন এবং ঐ সোনার তরীর কথা নিয়েই উপদেশ দেন। এটি অনুলিখিত হয়ে ‘শান্তিনিকেতন’ নামক পুস্তক-পর্যায়ের সপ্তম ভাগে ‘তরী বোঝাই’ শিরোনামে ছেপে প্রকাশ করা হয় :

সোনার তরী ব'লে একটা কবিতা লিখেছিলুম। এই উপলক্ষে তার একটা মানে বলা যেতে পারে।—মানুষ সমস্ত জীবন ধরে ফসল চাষ করছে। তার জীবনের ক্ষেতটুকু দ্বীপের মতো—চারিদিকেই অব্যক্তের দ্বারা সে বেষ্টিত—এ একটুখানিই তার কাছে ব্যক্ত হয়ে আছে—সেইজন্য গীতায় ভগবান বলেছেন—

‘অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। / অব্যক্তনিধান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।’

যখন কাল ঘনিয়ে আসছে, যখন চারিদিকের জল বেড়ে উঠছে, যখন আবার অব্যক্তের মধ্যে তার ঐ চরটুকু তলিয়ে যাবার সময় হলো— তখন তার সমস্ত জীবনের কর্মের যা কিছু নিত্য-ফল তা সে ঐ সংসারের তরণীতে বোঝাই ক’রে দিতে পারে। সংসার সমস্তই নেবে, একটি কণাও ফেলে দেবে না--কিন্তু যখন মানুষ বলে, ঐ সঙ্গে আমাকেও নাও আমাকে রাখ, তখন সংসার বলে-তোমার জন্য জায়গা কোথায়? তোমাকে নিয়ে আমার হবে কী? তোমার জীবনের ফসল যা-কিছু রাখবার সমস্তই রাখব, কিন্তু তুমি তো রাখবার যোগ্য নও!

প্রত্যেক মানুষ জীবনের কর্মের দ্বারা সংসারকে কিছু-না-কিছু দান করছে, সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করছে রক্ষা করছে, কিছুই নষ্ট হ’তে দিচ্ছে না,--কিন্তু মানুষ যখন সেই সঙ্গে অহংকেই চিরন্তন ক’রে রাখতে চাচ্ছে, তখন তার চেষ্টা বৃথা হচ্ছে। এই যে জীবনটি ভোগ করা গেল, অহংটিকেই তার খাজনাস্বরূপ মৃত্যুর হাতে দিয়ে হিসাবে চুকিয়ে যেতে হবে-ওটি কোনো মতেই জমাবার জিনিস নয়। —৪ঠা চৈত্র ১৩১৫

কবি যে মহাকালকেই সোনার তরীর নেয়ে বলেছেন তাহার সমর্থন তাঁহার অপর একটি রচনা হইতে পাওয়া যায় : গ্রীস ও রোম মহাকালের সোনার তরীতে নিজের পাকা ফসল সমস্তই বোঝাই করিয়া দিয়াছে, কিন্তু তাহার নিজেও সেই তরণীর স্থান আশ্রয় করিয়া আজ পর্যন্ত যে বসিয়া নাই তাহাতে কালের অনাবশ্যক ভার লাঘব হইয়াছে মাত্র, কোনো ক্ষতি করে নাই।—সঙ্কলন, পূর্ব ও পশ্চিম

■ কবিতার মর্মার্থ :

কবিকৃত ব্যাখ্যা থেকে সোনার তরী কবিতার মর্মার্থ যা দাঁড়ায়, সেটা অনেকটা এরকম : কবি দীর্ঘকাল কাব্যসাধনা করেছেন। মহাকালের সোনার তরীতে কবির কবিতা-নির্মাল্য অর্পণ করিবার সময় এসেছে। কবি তাঁর সাধনার সোনার ফসল মহাকালের হাতে সঁপে দিয়ে রিভ্র হস্তে মিনতি করেন,—“এখন আমরা লহ করুণা করে”। কালশ্রোত কবির সোনার ধান--কবিতার অর্ঘ্য-নৌকা বোঝাই করে নিয়ে চলে গেল। অথচ কবির স্থান সে নৌকায় হইল না। কারণ, কবির ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে সোনার তরীর নেয়ে (মহাকাল) কবির সৃষ্টিকে গ্রহণ করেলেন মাত্র। তিনি যেন কবিকে বলে গেলেন, —তোমার জীবনে যা কিছু তুমি সঞ্চয় করিয়াছ, তা তোমার চরম সঞ্চয় নয়। তোমার জীবনে আরও অনেক বর্ষা বসন্ত আসবে, এখনও বহুকাল এই শূন্য নদীর তীরে বসে তোমাকে সোনার ফসল ফলাতে হবে।

কাজেই শূন্য নদীর তীরে কবি পড়ে রইলেন—

‘শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি’

কবির বক্ষ ভেদ করে তখন কেবল একটি বেদনার রাগিণী ধ্বনিত হল—

‘যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী’

‘সোনার তরী’ কবিতার প্রাণই হল এই করুণরসে মথিত কবির হৃদয়োথিত গভীর বেদনাসম্ভার।

এই কবিতায় সঞ্চিত ধান তরীতে বোঝাই করবার ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে কবিজীবনের একটি সাময়িক বিষাদকরুণ মানচ্ছবি চিত্রিত হয়েছে। কবি যেখানে তাঁর কবিকর্মের ছেদ টানতে চান, কবির কাব্যপ্রেরণাদাত্রী সেইখানে তাঁকে দাঁড়ি টানতে দেন না, আরও বহুতর ও মহার্বতর ফসল ফলাবার জন্য কবিকে কর্মক্ষেত্রে প্রতীক্ষারত রেখে চলে যান। তাই বেদনার মধ্যেও আশ্বাসের একটি ব্যঞ্জনার আভাসও এই কবিতায় পাওয়া গেছে। কবিতাটির মধ্যে ভরা বর্ষার ছবি ও গতি সুস্পষ্ট হয়ে আছে—

গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা

এবং

শ্রাবণ-গগন ঘিরেঘন মেঘ ঘুরে-ফিরে,

ইত্যাদি বর্ণনা বর্ষাদৃশ্যকে আমাদের চোখের সম্মুখে স্পষ্ট করে তুলেছে। যেদিন ভরা বর্ষার অপরাহ্নে খরস্রোতা পদ্মার উপর দিয়ে কাঁচা ধানে বোঝাই নৌকার চাষীরা পারাপার করছিল, সেই দিনেই ‘সোনার তরী’ কবিতার সঞ্চয় হয়েছিল কবির মনে। কিন্তু কবিতাটির রচনাকাল ফাল্গুন ১২৯৮। ভরা বসন্তে, ভরা বর্ষার কথা-শ্রাবণ-গগনের মেঘরাজির কথা স্মরণ করে কবি যে কবিতা লিখেছেন-সোনার তরী কবিতাটি সেই জাতের কবিতা “যা মুক্তদ্বার অন্তরের সামগ্রী, বাইরের সমস্ত কিছুকে আপনার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে”। এই কবিতার সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে রচনাকালের সমস্ত কিছু। একবার পত্রদ্বারা কবির কাছে তাঁরই লেখা কয়েকটি অর্থ জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি সোনার তরীর প্রসঙ্গে লেখেন—

ছিলাম তখন পদ্মার বাটে। জলভারস্তু কালো মেঘ আকাশে, ওপারে ছায়াঘন তরু-শ্রেণীর গ্রামগুলি, বর্ষার পরিপূর্ণ পদ্মা খরবেগে ব’য়ে চলেছে, মাঝে মাঝে পাক খেয়ে ছুটেছে ফেনা। নদী অকালে কূল ছাপিয়ে চরের ধান দিনে দিনে ডুবিয়ে দিচ্ছে। কাঁচাধানে বোঝাই চাষীদের ডিঙি নৌকা হু-হু করে স্রোতের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে।... ভরা-পদ্মার উপরকার ঐ বাদল-দিনের ছবি ‘সোনার তরী’ কবিতার অন্তরে প্রচ্ছন্ন এবং তার ছন্দে প্রকাশিত।

৫.১.১.৩ : জীবনদেবতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত ‘জীবনদেবতা’ কবিতাটি ‘চিত্রা’ কাব্য গ্রন্থের অন্তর্গত। কবিতাটির রচনাকাল ১৩০২ বঙ্গাব্দে ২৯ মাঘ। জীবনদেবতা তত্ত্বের যে বীজ প্রোথিত হয়েছে ‘সোনার তরী’তে—এখানে যেন তাই হয়ে উঠেছে মহীরুহ।

★ জীবনদেবতা তত্ত্ব

কবি মাত্রেই বিশ্বাস তাঁর কবিতা রচনার পশ্চাতে রয়েছে কোনো এক অমোঘ শক্তির দিব্য প্রেরণা। যা জীবনের পরিচালন শক্তি, তাকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন অন্তর্যামী বা জীবনদেবতা। জীবনপ্রবাহ বয়ে চলেছে কবি জানেন না এর পরিণতি। কবি জীবনের প্রারম্ভে তিনি জীবনদেবতাকে তাঁর জীবনে আহ্বান করেছিলেন এই কাজে তাঁকে অনুপ্রাণিত করতে—তাঁকে দিয়ে কিছু করিয়ে নিতে কিন্তু ‘জীবনদেবতা’ কবিতায় কবি বুঝেছেন নিজের দীনতা-যে বিশাল কাজের ভার তাঁর উপর এসে পড়েছে তা সফল করায় নিজ অক্ষমতার কথা।

★ বিষয় বিশ্লেষণ

জীবন দেবতাকে সম্বোধন করে কবি জানতে চেয়েছেন তাঁর অন্তরে স্থান নিয়ে তাঁর সব আশা মিটেছে কি না! তিনি তাঁকে জানিয়েছেন জীবনদেবতাকে আশ্রয় দিতে গিয়ে কবিকেও কম ত্যাগ করতে হয়নি— তিনি দুঃখসুখের লক্ষ্যধারায় তাঁর পাত্র পূর্ণ করে দিয়েছেন জীবনদেবতাকে—এজন্য দ্রাক্ষাকে দলিত করার মতো নিজের হৃদয়কে নিষ্ঠুর পীড়নে পেষণ করতে হয়েছে তাঁকে। বর্ণের নানা বৈচিত্র্যের সম্ভারে গন্ধের নানা উপচারে, বিচিত্র রাগরাগিনী অভিনব ছন্দের সূত্রে গেঁথে রচনা করেছেন তাঁর সঙ্গে বাসর শয়নের লজ্জা। তিনি নিজের কামনা বাসনার সোনা গলিয়ে প্রতিদিন যেন নতুন নতুনরূপে নির্মাণ করেছেন জীবনদেবতাকে।

জীবন দেবতার সঙ্গে বিচিত্র লীলা : কবিকে এক সময় নিজেই বরণ করে নিয়েছিলেন জীবন দেবতা (স্মরণীয় ‘নিরুদ্দেশ যাত্রা’ কবিতা)। ‘জীবনদেবতা’ কবিতায় জীবন দেবতা হলেন কবির জীবনলীলার সাথী। তিনি কবির অনুপ্রাণিকা শক্তি। কবিতাটির চারটি স্তবকে কবি স্তরে ব্যক্ত করেছেন জীবনদেবতার সঙ্গে সম্পর্ক। প্রথম স্তবকে কী ভাবে নিজের মনের ভেতর গড়ে তুলেছেন জীবনদেবতার অবয়ব। সেই মনের মানুষ, সেই অন্তরতমের জন্য নিজের বক্ষ নিংড়ে সুখদুঃখের রসের ধারায় ভরে দিয়েছেন তাঁর পাত্র-তাঁরই জন্য তিনি আয়োজন করেছেন বিচিত্র বর্ণের গন্ধের-রাগরাগিনীর- নানান ছন্দে তাকে গেঁথে দেবার প্রয়াস করেছেন তিনি সাধ্যানুসারে। আর এরই মধ্যে তিনি চেয়েছেন জীবনদেবতার সঙ্গে তাঁর মিলন মুহূর্ত হয়ে উঠুক অক্ষয়।

কবির অনুযোগ— কবি চাননি জীবনদেবতাকে, জীবন দেবতাই বরণ করে নিয়েছিলেন কবিকে-কবি আপত্তি করেননি, সে আহ্বানে। জীবন দেবতার ইচ্ছে মতো তিনি চেষ্টা করেছেন নিজেকে তাঁর বাহকরূপে গড়ে তুলতে। কিন্তু কবি জানেন তাঁর সে প্রয়াস অনেকক্ষেত্রেই হয়ে গেছে অসফল। কবি নিজেও স্বীকার করে নিয়েছেন তাঁর অক্ষমতা।

বেদনাক্লান্ত চিন্তে কবি উপলব্ধি করেছেন জীবনদেবতার সঙ্গে তাঁর মিলনপর্ব বুঝি শেষ। কিন্তু যে সম্পর্ক বহুকালের-সে সম্পর্ক শেষ বললেই তো আর শেষ হয়ে যায় না। যে জীবন দেবতা কবির জীবন নিয়ন্ত্রক তিনিই তো পারেন কবির অপূর্ণতা দূর করে তাঁকে নতুন করে গড়ে, যোগ্য করে গড়ে নিতে! এই আকাঙ্ক্ষাতেই এ কবিতার সমাপ্তি। তাই জীবনদেবতার সঙ্গে যে লীলা চলেছে তাঁর তা এখানেই যায় নি থেমে-তা এগিয়েছে আরো আগামীর দিকে।

★ কবিতার ছন্দ

কলাবৃত্ত ছন্দের মধ্য লয় কবিতার আত্মনিবেদনের ব্যাকুলতাকে যেমন ফুটিয়েছে তেমনি বহু যুগ পূর্ব থেকে জীবনদেবতার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন লীলার ছন্দ ফুটেছে এ কবিতায়। কবিতার শুরুতেই দেখা যায়,—

“ওহে অন্তরতম

মিটেছে কি তব / সকল তিয়াষ / আসি অন্তরে মম?”

যেখানে রয়েছে লীলার গতি—সেখানে ছন্দের স্পন্দনে বদল না ঘটলেও ত্রিপদীর মতো যতিপাত দেখা গেছে,

‘কত যে চরণ / কত যে গন্ধ

কত যে রাগিনী / কত যে ছন্দ

গাঁথিয়া গাঁথিয়া / করেছি চয়ন / বাসন শয়ন তব—”

৫.১.১.৪ : অভিসার

■ উৎস

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘অভিসার’ কবিতাটি ‘কথা’ কাব্যের (১৩০৪-১৩০৬) অন্তর্গত। কবিতাটির রচনাকাল ১৯শে আশ্বিন ১৩০৬ বঙ্গাব্দ। কাশ্মীরি কবি ক্ষেমেন্দ্র ব্যাসদাস রচিত ‘বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা’ গ্রন্থের অংশীভূত দ্বিসপ্তম অধ্যায়ের নাম ‘উপগুপ্তাবদানাম’। এই অধ্যায়কে কেন্দ্র করেই রবীন্দ্রনাথের ‘অভিসার’ কবিতা।

■ মূল উপাখ্যান

মূল কাহিনিতে আছে উপগুপ্ত নামক এক গন্ধবণিক। দাসীর মুখে তার রূপের বর্ণনা শুনে তার প্রতি জাগে তীব্র আসক্তি এবং দাসীর মাধ্যমেই প্রস্তাব পাঠায়-বাসবদত্তা সঙ্গম প্রার্থনার। সংগমসুখের উপযুক্ত সময় আসেনি বলে দাসীকে ফিরিয়ে দেয় উপগুপ্ত। তবুও তাকে না পাওয়ার তৃষ্ণা তার থেকেই যায়। ইতোমধ্যে তার মায়ের পরামর্শে ধনের মোহে অন্য এক বণিককে সে হত্যা করে। রাজা পাপাসত্তা বাসবদত্তার ঘটনাটি শুনে তার হাত, পা, কান, নাক কর্তনের পর শ্মশানে ছড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর বাসবদত্তার বিকর্তিত শরীরের সঙ্গম কামনা তখন মৃত। তখনই উপগুপ্ত এলেন বুদ্ধবাণী শুনিতে তার হৃদয়শুদ্ধির জন্য। উপগুপ্তের সে বাণী হৃদয় ও প্রাণে ধারণ করে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হলো বাসবদত্তা।

■ কবিতার ভাবসৌন্দর্য

রবীন্দ্রনাথের ‘অভিসার’ মূল কাহিনিকে কেন্দ্র করে আঁকাবাঁকা পথে এগিয়েছে। কবি বাসবদত্তার প্রেমকেই মুখ্য উপজীব্য করে সামনে এগিয়েছেন। এ প্রেম শেষ পর্যায়ে শরীরকে অতিক্রম করে অপার্থিব হয়। কবির কবিতায় বাসবদত্তা গণিকা নয় নগরনটী এবং উপগুপ্ত বৌদ্ধ ভিক্ষু তথাগতের উপাসক।

শ্রাবণের নিশীথে আকাশ ঘনমেঘে ছাওয়া। তারারা মেঘের নিচে লুকিয়েছে। মথুরাপুরীতে নিদ্রিত সন্ন্যাসী উপগুপ্ত। এদিকে যৌবন উন্মাদনায় অভিসার চলেছে নগরনটী বাসবদত্তা। অভিসারিকার নূপুরশিথিলতায় স্তমিতপদ আঘাত করে সন্ন্যাসীর বক্ষ। আকস্মিকতায় বিস্মিত বাসবদত্তা থমকে দাঁড়ায়। প্রদীপের আলোতে দেখে শুভ্র, সৌম্য সহাস্য এক মুখমণ্ডল, চোখে তার করুণা ভাসে, ললাটে চাঁদের হাসির স্নিগ্ধতা, শরীরে তার স্নিগ্ধ কমলীয় লাবণ্যের অপার্থিব দিব্যজ্যোতির প্রতিভাস। এ সবই তো রবীন্দ্র কল্পনা। প্রেমের বেদী বিনির্মাণের জন্য কবির থাকে এক অতুলনীয় প্রয়াস।

কবির কবিতায় দেহপসারিণী বাসবদত্তা শরীরসর্বস্ব কাম অনুভূতি নিয়ে সঙ্গম প্রার্থনা করছে না গন্ধবণিকের কাছে। বাসবদত্তা নগরনটী এবং প্রেমিকা। প্রেমের দেউলে সে দীপ্তিময়ী। শ্রাবণের তারা ঢাকা রাতে বাতাসে নগরের আলোগুলো যখন নিভিয়ে দিয়েছে তখনই নায়িকার অভিসার।

কহিল রমণী ললিত কণ্ঠে,
নয়নে জড়িত লজ্জা,
ক্ষমা করো মোরে কুমার কিশোর,

দয়া করো যদি গৃহে চল মোর,
এ ধরণীতল কঠিন কঠোর
এ নহে মোর শয্যা।

আখ্যানমূলের কামবৃত্তি চারিণীর নির্লজ্জ ঘৃণ্য চরিত্র এখানে অনুপস্থিত। ভাষায় লালিত্য, সলাজ নয়নদৃষ্টি ও প্রেমের সংশয় জাগানিয়ার মধ দিয়েই প্রেমিকা তার আর্তিটুকু পৌঁছে দেয় উপগুপ্তের কাছে। এ প্রেম কামনার তীব্রতা বার্জিত, নির্মল নিষ্কলুষ ভালবাসা আশ্রিত।

সন্ন্যাসী প্রত্যাখ্যান করেন বাসবদত্তাকে। বারংবার প্রত্যাখ্যানে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন দুর্দিনেই তারই কুঞ্জে হবে তার দেখা। রূপের গরবে গরবিনী বাসবদত্তা। রূপই তার সম্পদ ও অবলম্বন। তাই এ অস্বীকারে প্রেমিকার যে হৃদয়যন্ত্রণা তা নারীর সর্বজনীনতায় গ্রাহ্যতায় স্বীকৃত।

অতঃপর ঋতুরাজ বসন্তের চৈত্রসন্ধ্যা। মুকুলিত বৃক্ষরাজি, বকুল, পারুল, রজনীগন্ধায় ভরে আছে রাজার কানন, বাতাসে ভাসে বাঁশির সুমিষ্ট সুর, মধুবনে ফুলউৎসবে পুরবাসী, মানবশূন্য নগরীতে জোৎস্নার আলোতে নির্জন পথে একাকী হেঁটে চলেন সন্ন্যাসী। কোকিলেরা কুহরিতুলে জানান দেয়, আমরা তোমারই সাথী। সন্ন্যাসী অভিসারে চলে। বসন্তের সন্ধ্যার প্রকৃতিকে কবিকল্পনা যেভাবে শল্যচিকিৎসকের মতো ব্যবচ্ছেদ করেছেন, সেটা রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই শুধু সম্ভব। বর্ষায় প্রেমের দেউলে প্রেমিকের প্রতি প্রেমিকার আহ্বানের উত্তরে প্রেমিকের প্রত্যাখ্যান। অবশেষে প্রেমিকার কুঞ্জে প্রেমিকের অভিসার।

অতঃপর নগর ছাড়িয়ে সম্মুখে অগ্রসরমান বিস্ময়ে স্তম্ভিত সন্ন্যাসী দেখেন—

দাঁড়ালেন আসি পরিখার পরে—
আম্রবনের ছায়ার আঁধারে
কে ওই রমনী প'ড়ে আছে ধারে
তাঁহার চরণপ্রান্তে।

বাসবদত্তা পরিত্যক্ত। মারীণ্ডিকায় তার সর্বাঙ্গ শরীর জীর্ণ ও সৌন্দর্য তিরহিত ও সকলের সঙ্গ পরিত্যাজ্য। করুণা, সেবা ও কল্যাণব্রতের আদর্শে সন্ন্যাসী নিজ শরীরে তাকে ধারণ করলেন। সেবা দিলেন। ইন্দ্রিয়ধর্মের অনুগত প্রেম দিলেন। এ প্রেম মৈত্রী-কুরণার আধারে গড়া। তার অভিসার দেহের দেউলে আবদ্ধ নয়, প্রেম মৈত্রী ও করুণার অমৃতপথে। শ্রাবণের অন্ধকার নিশিথে বাসবদত্তার ভরা যৌবনে ছিল তার প্রেম নিবেদন এবং বসন্তের পূর্ণজোৎস্নায় 'আজি দুঃখের রাতে তোমার অভিসার' এ পরিত্রাতা ধারণ করলেন তার নিজস্ব দেবরূপ। তার জ্যোতির্ময় প্রভায় পূণ্যালোকে উদ্ভাসিত ও আলোকিত হলো বাসবদত্তার অন্তরাত্মা। বাসবদত্তা কি প্রেমিকের পবিত্র এ অভিসারের প্রতীক্ষায় ছিল।

ঝরছে মুকুল কুজিছে কোকিল,
যামিনী জোছনামত্তা।
'কে এসেছো তুমি ওগো দয়াময়'
শুধাইল নারী, সন্ন্যাসী কয়—
'আজি রজনীতে হয়েছে সময়,
এসেছি বাসবদত্তা

■ স্বাতন্ত্র্য

আমরা জানি ‘অভিসার’ কবিতাটির কাহিনির মূল উৎস ‘বোধিস্বত্ভাবদান কল্পলতা’র ৭২তম অবদান ‘উপগুপ্ত অবদান’। ‘বোধিস্বত্ভাবদান’ গ্রন্থটি কাশ্মীরের কবি ক্ষেমেন্দ্ৰের রচনা। রবীন্দ্রনাথ মূল কাহিনির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন কিনা জানা যায় না। মনে হয় রাজেন্দ্রলালের অনুবাদ থেকেই তিনি গল্পাংশ গ্রহণ করেছেন, তবে তাকে নিজের মত করে সাজিয়ে নিয়ে ক্ষেত্র বিশেষ কাহিনি থেকে সরে এসে গল্পকবিতাটিকে রচনা করেছেন। ‘কথা’ (১৩০৪-১৩০৬) কাব্যটি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩০৬ সালের মাঘ মাসে। গ্রন্থাকারে বিজ্ঞাপনে ‘কথা’র ঐতিহাসিক কাহিনি সমূহের উৎস নির্দেশ করে কবি জানিয়েছেন—“এই গ্রন্থে যে সকল বৌদ্ধকথা বর্ণিত হইয়াছে তাহা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সংকলিত নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্য সম্বন্ধীয় ইংরাজি গ্রন্থ হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। ভক্তমাল হইতে বৈষ্ণব গল্পগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি। মূলের সহিত এই কবিতাগুলির কিছু কিছু প্রভেদ লক্ষিত হইবে আশা করি, সেই পরিবর্তনের জন্য সাহিত্য-বিধান মতে দণ্ডনীয় গণ্য হইব না।”

কবিতার প্রথমে উপগুপ্তকে বাসবদত্তার আমন্ত্রণ এবং শেষে বাসবদত্তার কাছে উপগুপ্তের আগমন, এই গল্পকাঠামোটি গ্রহণ করে কবি আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে কবিতাগল্পটি নির্মাণ করেছেন। সেখানে বাসবদত্তা কর্তৃক বিষপ্রয়োগে প্রেমিকের হত্যা, এবং তার শাস্তিস্বরূপ রাজাদেশে বাসবদত্তার নাক-কান কাটা ও বস্ত্রাদি খুলে নেওয়ার মতো বীভৎস ব্যাপার একেবারেই বর্জিত হয়েছে। বদলে কবিতায় তার দুর্গতির কারণ বসন্ত রোগ, ‘নিদারুণ রোগে মারীণ্ডিকায়’ তার সর্ব শরীর ভরে গিয়েছে, যা মূলে ছিল না। কবি উপগুপ্তের গন্ধবর্ণিক পরিচয় ভুলে তাকে আগাগোড়াই সন্ন্যাসীরূপে দেখিয়েছেন। বসন্ত রোগাক্রান্ত বাসবদত্তাকে সেবা করার মধ্য দিয়ে এই সন্ন্যাসী সেবাধর্ম, সর্বধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম পালন করেছেন। বাসবদত্তার তীব্র কামনার কথা না বলে কবিতায় সন্ন্যাসীর দেহে অজান্তে পদাঘাত করার অপরাধের প্রতিকার করতে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্যই বাসদত্তা উপগুপ্তকে আপন গৃহে আহ্বান জানিয়েছে একথা বলেছেন। সর্বোপরি যে পরিবর্তন কবিতাগল্পটিকে নবরূপ দিয়েছে, তা হল এটিকে তিনি একবার বাসদত্তার বসন্তাভিসার ও অন্যবার সন্ন্যাসীর বসন্তাভিসার রূপ দিয়েছেন। ফলে রচনাটি পাঠকের কাছে উপভোগ্য ও হৃদয়সংবেদ্য হয়ে উঠেছে। বাসবদত্তার সঙ্গে সন্ন্যাসী উপগুপ্তের প্রথম সাক্ষাৎকারের দৃশ্যটি যথার্থই শিল্পীর হাতে আঁকা ছবির রূপ নিয়েছে—

প্রদীপ ধরিয়া হেরিল তাঁহার
নবীন গৌরকান্তি
সৌম্য সহাস তরুণ বয়ান,
করুণকিরণে বিকচ নয়ান
শুভ্র ললাটে ইন্দুসমান
ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি।

মূল কাহিনির সঙ্গে কবিতায় বর্ণিত গল্পাংশের যোগে এত ক্ষীণ যে, কবিতাগল্পটি প্রায় তাঁর মৌলিক রচনা হয়ে উঠেছে।

৫.১.১.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরের কাব্যবিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচনা করো।
২. ‘সোনার তরী’ কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত?
৩. ‘সোনার তরী’ কবিতাটির রূপকার্থ বিশ্লেষণ করো।
৪. ‘সোনার তরী’ কবিতাটির কাব্যসৌন্দর্য বিশ্লেষণ করো।
৫. ‘জীবনদেবতা’ কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত?
৬. ‘জীবনদেবতা’ কবিতায় জীবনদেবতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করো।
৭. ‘অভিসার’ কবিতাটির উৎস নির্দেশ করো।
৮. ‘অভিসার’ কবিতাটির মূল উপাখ্যান বর্ণনা করো।
৯. ‘অভিসার’ কবিতাটি কাহিনিগত উৎস নির্দেশ করে কবির স্বাভাবিকতা নির্ণয় করো।

৫.১.১.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. সঞ্চয়িতা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
২. রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা—নীহাররঞ্জন রায়।
৩. রবিরশ্মি—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪. রবীন্দ্র কাব্যপরিক্রমা—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।
৫. রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ—প্রমথনাথ বসী।
৬. রবীজীবনী—প্রশান্তকুমার পাল।

একক ২

বনলতা সেন

বিন্যাসক্রম

- ৫.১.২.১ : কবি পরিচয়
- ৫.১.২.২ : কাব্যগ্রন্থ
- ৫.১.২.৩ : বনলতা সেন
- ৫.১.২.৪ : রচনা প্রকাশের ইতিহাস
- ৫.১.২.৫ : নামকরণ
- ৫.১.২.৬ : কাঠামো এবং রচনাকৌশল
- ৫.১.২.৭ : ভাববস্তু
- ৫.১.২.৮ : সাহিত্য সমালোচনা
- ৫.১.২.৯ : অনুবাদ
- ৫.১.২.১০ : আদর্শ প্রশ্নাবলি
- ৫.১.২.১১ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৫.১.২.১ : কবি পরিচয়

জীবনানন্দ দাশ (১৭ ফ্রেব্রুয়ারি, ১৮৯৯-২২ অক্টোবর, ১৯৫৪; ডফাল্লুন, ১৩০৫-৫ কার্তিক, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ) ছিলেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান আধুনিক বাঙালি কবি, লেখক ও প্রাবন্ধিক। তিনি বাংলা কাব্যে আধুনিকতার পথিকৃতদের মধ্যে অন্যতম। জীবনানন্দের প্রথম কাব্যে নজরুল ইসলামের প্রভাব থাকলেও দ্বিতীয় কাব্য থেকেই তিনি হয়ে ওঠেন মৌলিক ও ভিন্ন পথের অনুসন্ধানী। মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তিনি জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করেন এবং ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে যখন তার জন্মশতবার্ষিকী পালিত হচ্ছিল ততদিনে তিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় কবিতে পরিণত হয়েছেন।

গ্রামবাংলার ঐতিহ্যময় নিসর্গ ও রূপকথা-পুরাণের জগৎ জীবনানন্দের কাব্যে হয়ে উঠেছে চিত্ররূপময়, তাতে তিনি ‘রূপসী বাংলা কবি’ অভিধায় খ্যাত হয়েছেন। বুদ্ধদেব বসু তাঁকে নির্জনতম কবি বলে আখ্যায়িত করেছেন। আবদুল মান্নান সৈয়দ তাঁকে শুদ্ধতম কবি বলেছেন। সমালোচকদের অনেকে তাঁকে রবীন্দ্রনাথ ও

নজরুল-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের প্রধান কবি বলে মনে করেন। জীবনানন্দের *বনলতা সেন* কাব্যগ্রন্থ নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলনে পুরস্কৃত (১৯৫৩) হয়। ১৯৫৫ সালে শ্রেষ্ঠ কবিতাগ্রন্থটি ভারত সরকারের সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করে। জীবনানন্দ দাশের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলোর মাঝে রয়েছে রূপসী বাংলা, বনলতা সেন, মহাপৃথিবী, বেলা অবেলা কালবেলা, শ্রেষ্ঠ কবিতা ইত্যাদি।

জীবনানন্দ দাশ প্রধানত কবি হলেও বেশ কিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা ও প্রকাশ করেছেন। তবে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর পূর্বে তিনি ২১টি উপন্যাস এবং ১০৮টি ছোটগল্প রচনা করেছিলেন যার একটিও তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি। তাঁর জীবন কেটেছে চরম দারিদ্রের মধ্যে। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে অনপন্যেভাবে বাংলা কবিতায় তাঁর প্রভাব মুদ্রিত হয়েছে।

৫.১.২.২ : কাব্যগ্রন্থ

জীবনানন্দের কাব্যগ্রন্থসমূহের প্রকাশকাল সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রাধান্যযোগ্য যে, কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের একাধিক পরিবর্তিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। নিচে কেবল প্রথম প্রকাশনায় বৎসর উল্লিখিত। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *বরা পালক* প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে। এর দীর্ঘ কাল পর ১৯৩৬-এ প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *ধূসর পুণ্ডলিপি*। ইত্যবসরে কবির মনোজগতে যেমন পরিবর্তন হয়েছে তেমনি রচনাকৌশলও অর্জন করেছে সংহতি এবং পরিপক্বতা। তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ *বনলতা সেন* প্রকাশিত হয় ১৯৪২-এ। এটি “কবিতাভবন সংস্করণ” নামে অভিহিত। সিগনেট প্রেস বনলতা সেন প্রকাশ করে ১৯৫২-তে। *বনলতা সেন* কাব্যগ্রন্থের কবিতাসমূহ সহ পরবর্তী কবিতাগ্রন্থ *মহাপৃথিবী* ১৯৪৪-এ প্রকাশিত। জীবনানন্দের জীবদ্দশায় সর্বশেষ প্রকাশিত গ্রন্থ *সাতটি তারার তিমির* (১৯৪৮)। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর কিছু আগে প্রকাশিত হয় জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা।

কবির মৃত্যু-পরবর্তী প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ হলো ১৯৫৭-তে প্রকাশিত রূপসী বাংলা এবং ১৯৬১-তে প্রকাশিত বেলা অবেলা কালবেলা। জীবনানন্দ দাশ *রূপসী বাংলার* পাণ্ডুলিপি তৈরি করে থাকলেও জীবদ্দশায় এর প্রকাশের উদ্যোগ নেন নি। তিনি গ্রন্থটির প্রচ্ছদ নাম নির্ধারণ করেছিলেন বাংলার ত্রস্ত নীলিমা। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশকালে এর নামকরণ করা হয় “রূপসী বাংলা”। তাঁর অগ্রস্থিত কবিতাবলি নিয়ে প্রকাশিত কবিতা সংকলনগুলো হলো— *সুদর্শনা* (১৯৭৩), *আলো পৃথিবী* (১৯৮১), *মনোবিহঙ্গম, হে প্রেম তোমার কথা ভেবে* (১৯৯৮), *অপ্রকাশিত একাম* (১৯৯৯) এবং *আবছায়া* (২০০৪)।

কবির প্রকাশিত-অপ্রকাশিত গ্রন্থিত-অগ্রস্থিত সকল কবিতার আকর দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে। অব্যবহিত পরে গ্রন্থিত-অগ্রস্থিত সকল কবিতার পরিবর্তিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে আবদুল মান্নান সৈয়দের উদ্যোগে। পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত আরো কবিতা অন্তর্ভুক্ত করে ফেব্রু গুপ্ত ২০০১-এ প্রকাশ করেন জীবনানন্দ দাশে কাব্য সমগ্র। ২০১০ খ্রিস্টাব্দে ভূমেন্দ্র গুহ প্রকাশ করেন জীবনানন্দ দাশের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত-গ্রন্থিত-অগ্রস্থিত সকল কবিতার আকর গ্রন্থ পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ।

৫.১.২.৩ : বনলতা সেন

সমগ্র বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয়তম কবিতাগুলোর মধ্যে অন্যতম বনলতা সেন। কবিতাটির রচয়িতা বিংশ শতাব্দীর আধুনিক বাঙালি কবি জীবনানন্দ দাশ। বনলতা সেন প্রধানত রোমান্টিক গীতি কবিতা হিসেবে সমাদৃত।

৫.১.২.৪ : রচনা-প্রকাশের ইতিহাস

বনলতা সেন কবিতাটি প্রথম প্রকাশ করেছিলেন কবি বুদ্ধদেব বসু তাঁর ‘কবিতা’ পত্রিকায়। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে প্রকাশিত কবিতার পৌষ, ১৩৪২ সংখ্যার মাধ্যমে বনলতা সেন সর্বপ্রথম পাঠকের হাতে এসে পৌঁছায়। জীবনানন্দ দাশ বাংলা ১৩৪৯, ইংরেজি ডিসেম্বর ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর বনলতা সেন নামক তৃতীয় কাব্যগ্রন্থে কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত করেন। কবিতা-ভবন কর্তৃক প্রকাশিত “এক পয়সায় একটি” গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হিসেবে। প্রকাশক ছিলেন জীবনানন্দ দাশ নিজেই। ১৬ পৃষ্ঠার প্রথম সংস্করণে কবিতা ছিল মোট ১২টি। প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ করেছিলেন শম্ভু সাহা। পরবর্তীকালে জীবনানন্দ দাশ ১৯৪৪-এ প্রকাশিত তাঁর চতুর্থ কাব্য মহাপৃথিবীতে উক্ত বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থের সকল কবিতাই অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। অর্থাৎ “মহাপৃথিবী” কাব্যগ্রন্থেরও প্রথম কবিতা ছিল ‘বনলতা সেন’।

কবির জীবদ্দশায় বাংলা শ্রাবণ, ১৩৫৯, ইংরেজি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার সিগনেট প্রেস থেকে বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রকাশিত হয়। ৪৯ পৃষ্ঠার বর্ধিত কলেবর প্রকাশিত সংস্করণে আগের ১২টি কবিতার সাথে আরও ১৮টি কবিতা যোগ করে মোট ৩০টি কবিতা প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণের প্রচ্ছদ করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। মূল্য ছিল ২ টাকা। সিগনেট সংস্করণের প্রকাশক ছিলেন দিলীপকুমার গুপ্ত। পরবর্তীতে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে প্রকাশিত জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠকবিতা গ্রন্থটিতেও কবিতাটি সংকলিত হয়। এছাড়া আবু সায়ীদ আইয়ুব এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের যৌথ সম্পাদনায় ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত আধুনিক বাঙালি কবিতাশীর্ষক গ্রন্থেও কবিতাটি সংকলিত হয়েছিল। কোলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে সুরক্ষিত পুণ্ডুলিপিসমূহের ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ চিহ্নিত ৮নং খাতায় এ কবিতাটি আছে। তাই, পুণ্ডুলিপির হিসেবে, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে কবিতাটি লিখিত হয়েছিল বলে প্রতীয়মান হয়।

কবিতাটি প্রকাশের সময় সিটি কলেজে টিউটরের চাকুরি হারিয়ে বেকার জীবনানন্দ সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় কোলকাতায় দিনাতিপাত করছিলেন। এ ঘটনার মাত্র কয়েক বৎসর আগে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। স্ত্রীর সাথে বনিবনা হবে না কোনোদিন তা ইতিমধ্যে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল।

কবিতাটি সঠিক পাঠ নিয়ে প্রশ্ন আছে, কেননা ভিন্ন ভিন্ন সংকলনে ভিন্ন ভিন্ন পাঠ পাওয়া যায়। যদিও সেসবের পার্থক্য ব্যাপক কিছু নয়। তবে ভূমেন্দ্র গুহ সম্পাদিত পুণ্ডুলিপির কবিতা শীর্ষক গ্রন্থের পাঠটি নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়।

৫.১.২.৫ : নামকরণ

আপাতদৃষ্টিতে ‘বনলতা সেন’ একটি প্রেমের কবিতা যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বনলতা সেন নাম্নী কোনো এক রমণীর স্মৃতি রোমন্থন। শুরু থেকেই পাঠকের কৌতুহল বনলতা সেন কী বাস্তবের কোনো নারী নাকি সম্পূর্ণকল্পিত একটি কাব্যচরিত্র। এ কবিতার তিনটি স্তবকের প্রতিটির শেষ চরণে বনলতা সেন নামের এক নারীর উল্লেখ আছে।

প্রথম স্তবকের শেষ চরণ : “আমারে দুদণ্ড শাস্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন”

দ্বিতীয় স্তবকের শেষ চরণ : “পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন”, এবং

তৃতীয় স্তবকের শেষ চরণ : “থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন”।

বনলতা সেন ছাড়াও জীবনানন্দের কাব্যে বেশ কিছু নারী চরিত্রের উপস্থিতি আছে, যেমন শ্যামলী, সুরঞ্জনা, সুচেতনা, সরোজনী, শেফালিকা বোস, সুজাতা ও অমিতা সেন। তবে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে লিখিত এবং প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল অন্তরালবাসী ‘কারুণ্যবাসনা’ নামীয় উপন্যাসে প্রথম ‘বনলতা সেন’ নামটি পাওয়া যায়। অধিকন্তু ‘হাজার বছর ধরে খেলা করে’, ‘একটি পুরোনো কবিতা’ এবং ‘বাঙালি পাঞ্জাবী মারাঠি গুজরাটি’ শার্ক আরও তিনটি কবিতায় এ নামটি আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে কারুণ্যবাসনা উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে, কবির মৃত্যুর বহুকাল পর। এর ভাষা-ভঙ্গিতে অনবগুণ্ঠিত আত্মজৈবনিকতা সেকালের পাঠক মনে বিশেষ কৌতুহলের উদ্রেক করেছিল। বনলতা সেন রক্ত মাংসের কোনও মানবী না-কি নিছকই কল্পিত কোনও কবিতাশ্রিত নারী এ প্রশ্নটি অবসিত না-হলেও রহস্যের কিনারা হয়েছে কিছু। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে জীবনানন্দের পাণ্ডুলিপি উদ্ধারক ডা. ভূমেন্দ গুহ কবির ‘লিটেরেরি নোটস’ গবেষণা করে জানিয়েছেন যে কবির জীবনে প্রেম এসেছিল সন্দেহ নেই। দিনলিপি বা লিটেরেরি নোটস-এ ওয়াই (Y) হিসেবে উল্লিখিত মেয়েটিই কবির কাঙ্ক্ষিত নারী। বাস্তবে সে শোভনা-কবির এক কাকা অতুলান্ত দাশের মেয়ে-যার ঘরোয়া নাম বেবী। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে লাভণ্য দাশকে বিয়ের আগেই এই বালিকার প্রতি যুবক জীবনানন্দ গভীর অনুরাগ করেছিলেন। একটি উপন্যাসে শচী নামেও একে দেখতে পাওয়া যায়। শোভনাকে নিয়ে জীবনানন্দের অনুরাগ উন্নীত হয়েছে অনুক্ত প্রেমে, লাভণ্য দাশের সঙ্গে দাম্পত্যজীবন আদৌ সুখকর না-হওয়ায় এই প্রেম তীব্রতর হয়ে ক্রমশ এক প্রকার অভিভূতিতে পর্যবসিত হয়েছিল।

৫.১.২.৬ : কাঠামো এবং রচনা কৌশল

নাতিদীর্ঘ আঠারো পংক্তির নিরেট স্থাপত্যের এই গীতিকবিতায় রয়েছে ছয় পংক্তির তিনটি স্তবক। প্রথম স্তবকে কবি মূলত নিজের কথা বলেছেন, দ্বিতীয় স্তবকে বলেছেন এক বালক দেখা প্রিয় মুখের কথা এবং তৃতীয় স্তবকে বলেছেন একটি স্বপ্নের কথা। কবিতাটি জীবনানন্দ দাশের প্রিয় ছন্দ অক্ষরবৃত্ত বা পয়ারে রচিত। তবে পর্ব বিন্যাসে সমতা রক্ষা করা হয়নি।

প্রথম স্তবকের প্রতি পংক্তি তিন পর্বের, যার মাত্রা বিন্যাস $৮ + ৮ + ৬$ । ৮ মাত্রার একটি পর্ব মধ্যভাগে থাকার কারণে এ স্তবকের ছন্দবিন্যাসকে মহাপয়ার পর্যায়ী বলা যায়।

দ্বিতীয় স্তবকে বিভিন্ন পংক্তির পর্ব বিন্যাস বিভিন্ন, যেমন— $৮ + ৮ + ২$; $৪ + ৮ + ১০$; $৮ + ৬$, $৮ + ৮ + ১০$; $৮ + ৮ + ১০$; $৮ + ৪ + ৪ + ১০$ এবং $৮ + ৮ + ১০$ ।

তৃতীয় স্তবকের পর্ব ও মাত্রা বিন্যাস এরকম : $৮ + ১০$; $৪ + ৮ + ৬$; $৮ + ৪ + ১০$; $৮ + ১০$; $৮ + ৪ + ৮ + ৬$ এবং $৮ + ৮ + ৬$ পয়ারে বা অক্ষরবৃত্তের এরূপ সূত্রহীন ব্যবহার সত্ত্বেও কবিতাটির সঙ্গীতময়তা অতুলনীয়। এ কারণে অনুমতি হয় যে শব্দবিন্যাস এদিন-সেদিক করে কবিতাটির সঠিক পর্ববিন্যাস নির্ণয় করা আবশ্যিক।

৫.১.২.৭ : ভাববস্তু

কবিতাটির প্রথম স্তবকে হাজার বছর ব্যাপী ক্লাস্তিকর এক ভ্রমণের কথা বলেছেন কবি তিনি হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথে পথে ঘুরে ফিরেছেন—যার যাত্রাপথ সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগর অবধি পরিবাপ্ত। তার উপস্থিতি ছিল বিশ্বিসার অশোকের জগতে যার স্মৃতি আজ ধূসর। এমনকী আরো দূরবর্তী বিদর্ভ নগরেও স্বীয় উপস্থিতির কথা জানাচ্ছেন কবি। এই পরিব্যাপ্ত ভ্রমণ তাকে দিয়েছে অপরিসীম ক্লাস্তি। এই ক্লাস্তিময় অস্তিত্বের মধ্যে অল্প সময়ের জন্য শাস্তির বালক নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল বনলতা সেন নামের এক রমণী। কবি জানাচ্ছেন সে নাটোরের বনলতা সেন। কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকে বনলাত সেনের আশ্চর্য নান্দনিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন কবি। বনলতা সেনকে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন অন্ধকারে। তার কেশরাজি সম্পর্কে কবি লিখেছেন, “চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা”, মুখায়ব প্রতীয়মান হয়েছে শ্রীবস্তীর কারুকার্যের মতো। বনলতাকে দেখে গভীর সমুদ্রে হাল-ভাঙ্গা জাহাজের দিশেঙারা নাবিকের উদ্ধারলাভের অনুভূতি হয়েছে কবির, যেন একটি সবুজ ঘাসের দারুচিনি দ্বীপ সহসা ঐ নাবিকের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। বনলতা সেনও তার পাখির নীড়ের মতো আশ্রয়ময় চোখ দুটি তুলে জানতে চেয়েছে, “এতদিন কোথায় ছিলেন?”

তৃতীয় স্তবকটি স্তবতোক্তির মতো মৃদু উচ্চারণে একটি স্বপ্ন-উন্মোচনের কথা শোনা যায়। কবি জানাচ্ছেন (হেমন্তের) দিন শেষ হয়ে গেল সন্ধ্যা আসে, ধীরে, ধীরলয়ে শিশিরপাতের টুপটাপ শব্দের মতো। তখন (দিনভর আকাশচারী) চিলের ডানা থেকে রোদের গন্ধ মুছে যায়। এ সময় পাখিদের ঘরে ফিরে আসার তাড়া, এসময় (যেন) সব নদীরও ঘরে ফেরার ব্যাকুলতা। পৃথিবীর সব আলো মুছে যায়, অন্ধকারে কেবল কয়েকটি জোনাকি জ্বলে। সারাদিনের জাগতিক সব লেনদেন সমাপ্ত হয়েছে, গল্পের পাণ্ডুলিপি তৈরি, তখন (কেবল) অন্ধকার বনলতা সেনের মুখোমুখি বসে গল্প করার অবসর।

৫.১.২.৮ : সাহিত্য সমালোচনা

‘বনলতা সেন’ কবিতাটি সম্ভবত বিংশ শতাব্দীর সর্বাধিক পঠিত বাংলা কবিতাগুলোর একটি। জীবনানন্দের বিরুদ্ধে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ার বেশ আগেই কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল। অথচ শেষ দিককার

কবিতায় যে দুর্গম সাক্ষ্যভাষা পরিলক্ষিত হয় এ কবিতায়ও তা অনুপস্থিত নয়। কিন্তু এমনই এক দুর্মর রোমান্টিকতা কবিতাটির অবয়বে পরিব্যপ্ত যা পাঠককে সহজে আচ্ছন্ন করে, ফলে কবিতাটির আন্তর্ভাষ্য নিয়ে চিন্তায় প্রণোদনা পাঠকের হৃদয়ে সহজে প্রশ্রয় লাভ করে না। সাধারণ পাঠকের কাছে এটি নিছকই একটি প্রেমের কবিতা হিসেবে সমাদৃত হয়েছে, অথচ এর মর্মমূলে রয়েছে সুগভীর ঐতিহাসিকতা।

■ এলান পো'র টু হেলেন-এর সঙ্গে সাযুজ্য

এ কবিতাটির বিভিন্ন আলোচনায় বলা হয়েছে যে এডগার এলেন পো'র 'টু হেলেন' (বাংলা হেলেনের প্রতি) কবিতাটির সঙ্গে 'বনলতা সেন' কবিতাটির বিষয়গত সাদৃশ্য রয়েছে, যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে জীবনানন্দ দাশ এই কবিতাটি পড়ে 'বনলতা সেন' কবিতাটি রচনায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তবে 'বনলতা সেন' এবং 'টু হেলেন'-এর মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে তাও বিবেচনা করা হয়েছে।

৫.১.২.৯ : অনুবাদ

সেই পঞ্চাশের দশক থেকে শুরু করে আজ অবধি নানা হাতে 'বনলতা সেন' কবিতাটি বহুবার অনুদিত হয়েছে। প্রথম অনুবাদটি করেছিলেন মার্টিন কার্কম্যান, যা একটি কবিতা সংকলনে গৃহীত হয়েছিল। অব্যবহিত পরেই কবি নিজে করেছেন এর অনুবাদ। আরও যাদের হাতে কবিতাটি অনুদিত হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছেন সনৎ ভট্টাচার্য্য, পুরুষোত্তম লাল ও শ্যামশ্রী দেবী, ম্যারি ল্যাগো (তরুণ গুপ্তর সহযোগে), চিদানন্দ দাশগুপ্ত, হায়াৎ সাইফ, মুকুল শর্মা, ক্লিনটন সিলি, আনন্দ লাল, সুকান্ত চৌধুরী, ফয়জুল লতিফ চৌধুরী, অনুপম ব্যানার্জী, অঞ্জন বসু, ফখরুল আলম, জো উইন্টার, অরুণ সরকার, ডি কে ব্যানার্জী, অমিতাভ মুখার্জী এবং জয়দেব ভট্টাচার্য্য। অনুবাদগুলো পাঠ করলে অনুবাদকদের উপলব্ধির প্রভেদ এবং মর্মার্থ অনুধাবনে ভিন্নতা প্রতিভাসিত হয়। সুজিত মুখার্জী তাঁর *ট্রান্সলেশন এড ডিসকভারী* (১৯৯৪) শীর্ষক গ্রন্থে ৬টি অনুবাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। জীবনানন্দ দাশ মার্টিন কার্কম্যানকৃত অনুবাদে “পাখির নীড়ের মতো চোখ” কথাটির আক্ষরিক অনুবাদে আপত্তি জানিয়েছিলেন। অধিকাংশ অনুবাদক প্রথম ছত্রের (“হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে”) হাজার বছর ব্যাপী পথ চলাকে ঘটমান বর্তমান কাল হিসেবে অনুবাদ করেননি। তৃতীয় স্তবকের দুটি লাইন “পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন/ তখন গল্পের তবে জোনাকির রঙে ঝিলমিল”-এর মর্মার্থ রূপায়নে সক্ষম হয়নি অনেক অনুবাদক : “পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন” বা “গল্পের তবে” কথার অর্থ স্বতঃস্ফূট নয়।

৫.১.২.১০ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. বনলতা সেন কবিতাটির রচয়িতা কে? কোন কাব্যের অন্তর্গত?
২. বনলতা সেন কবিতাটির রচনা ও প্রকাশের ইতিহাস বর্ণনা করো।
৩. কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।
৪. বনলতা সেন কবিতাটির ভাবসৌন্দর্য আলোচনা করো।

৫. জীবনানন্দ দাশ বনলতা সেন কবিতাটির ভাববস্তু অবলম্বনে এর কাব্যসৌন্দর্য বিচার করো।
৬. বনলতা সেন কবিতাটির কয়েকজন অনুবাদকের নাম লেখো।

৫.১.২.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. বনলতা সেন— জীবনানন্দ দাশ।
২. কবিতার কথা— জীবনানন্দ দাশ।
৩. আধুনিক কবিতার দিগবলয়— অশ্রুকুমার সিকদার।
৪. আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়— দীপ্তি ত্রিপাঠি।
৫. আধুনিক বাংলা কাব্য— তারাপদ মুখোপাধ্যায়।
৬. আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা (১৯০১-৩০০৮)— অশোককুমার মিশ্র।
৭. কবিতার কী ও কেন— নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
৮. কবিতার ক্লাস— নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।
৯. জীবনানন্দ : সমাজ ও সমকাল— সুমিতা চক্রবর্তী।

একক ৩

কাজী নজরুল ইসলাম : মানুষ (সাম্যবাদী/সঞ্চিতা)

বিন্যাসক্রম

- ৫.১.৩.১ : কবিতাজীবন
- ৫.১.৩.২ : কাব্যপরিচয়
- ৫.১.৩.৩ : সাম্যবাদী
- ৫.১.৩.৪ : সঞ্চিতা
- ৫.১.৩.৫ : মানুষ
- ৫.১.৩.৬ : কবিতার বিশ্লেষণ
- ৫.১.৩.৭ : সমালোচনা
- ৫.১.৩.৮ : শিল্পসুখমা
- ৫.১.৩.৯ : আদর্শ প্রশ্নাবলি
- ৫.১.৩.১০ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৫.১.৩.১ : কবি পরিচয়

কাজী নজরুল ইসলাম (মে ২৫, ১৮৯৯-আগস্ট ২৯, ১৯৭৬), বাঙালি কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, দার্শনিক, যিনি বাংলা কাব্যে অগ্রগামী ভূমিকার জন্য সর্বাধিক পরিচিত। বাংলাভাষার অন্যতম সাহিত্যিক, দেশপ্রেমী এবং বাংলাদেশের জাতীয় কবি। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ-দুই বাংলাতেই তাঁর কবিতা ও গান সমানভাবে সমাদৃত। তাঁর কবিতায় বিদ্রোহী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তাঁকে বিদ্রোহী কবি বলা হয়। তার কবিতার মূল বিষয়বস্তু ছিল মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচার এবং দাসত্বের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ। বাংলা মননে কাজী নজরুল ইসলামের মর্যাদা ও গুরুত্ব অপরিসীম। একাধারে কবি, সাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ, রাজনীতিবিদ এবং সৈনিক হিসেবে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে নজরুল সর্বদাই ছিলেন সোচ্চার। তাঁর কবিতা ও গানে এই মনোভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে। অগ্নিবীণা হাতে তাঁর প্রবেশ, ধূমকেতুর মতো তাঁর প্রকাশ। যেমন লেখাতে বিদ্রোহী, তেমনই জীবনে—কাজেই ‘বিদ্রোহী কবি’।

নজরুল এক দরিদ্র মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রাথমিক শিক্ষা ছিল ধর্মের। স্থানীয় এক মসজিদে মুয়াজ্জিন হিসেবে কাজও করেছিলেন। বিভিন্ন থিয়েটার দলের সাথে কাজ করতে যেয়ে তিনি কবিতা, নাটক এবং সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কিছুদিন কাজ করার পর তিনি সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেন। এসময় তিনি কলকাতাতেই থাকতেন। এসময় তিনি ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ

সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। প্রকাশ করেন বিদ্রোহী এবং ভাঙার গানের মত কবিতা, ধূমকেতুর মত সাময়িকী। জেলে বন্দী হলে তারপর লেখেন রাজবন্দীর জবানবন্দী। এই সব সাহিত্যকর্মে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা ছিল সুস্পষ্ট। ধার্মিক মুসলিম সমাজ এবং অবহেলিত ভারতীয় জনগণের সাথে তার বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তার সাহিত্যকর্মে প্রাধান্য পেয়েছে ভালবাসা, মুক্তি এবং বিদ্রোহ। ধর্মীয় লিঙ্গভেদের বিরুদ্ধেও তিনি লিখেছেন। ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক লিখলেও তিনি মূলত কবি হিসেবেই বেশি পরিচিত। বাংলাকাব্যে তিনি এক নতুন ধারার জন্ম দেন। এটি হল ইসলামী সঙ্গীত তথা গজল। নজরুল প্রায় ৩০০০ গান রচনা এবং সুর করেছেন যেগুলো এখন নজরুল সঙ্গীত বা ‘নজরুলগীতি’ নামে পরিচিত এবং বিশেষ জনপ্রিয়। মধ্যবয়সে তিনি পিক্স রোগে আক্রান্ত হন। এর ফলে দীর্ঘদিন তাকে সাহিত্যকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হয়। একই সাথে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে ১৯৭২ সালে তিনি সপরিবারে ঢাকা আসেন। এসময় তাকে বাংলাদেশের জাতীয়তাপ্রদান করা হয়। এখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

৫.১.৩.২ : কাব্যপরিচয়

১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে কুমিল্লা থেকে কলকাতা ফেরার পথে নজরুল দুটি বৈপ্লবিক সাহিত্যকর্মের জন্ম দেন। এই দুটি হচ্ছে বিদ্রোহী কবিতা ও ভাঙার গান সঙ্গীত। এগুলো বাংলা কবিতা ও গানের ধারাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছেন। বিদ্রোহী কবিতার জন্য নজরুল সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। একই সময় রচিত আরেকটি বিখ্যাত কবিতা হচ্ছে কামাল পাশা-এতে ভারতীয় মুসলিমদের খিলাফত আন্দোলনের অসারতা সম্বন্ধে নজরুলে দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমকালীন আন্তর্জাতিক ইতিহাস-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯২২ সালে তাঁর বিখ্যাত কবিতা সংকলন অগ্নিবীণা প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থ বাংলা কবিতায় একটি নতুনত্ব সৃষ্টিতে সমর্থ হয়, এর মাধ্যমেই বাংলা কাব্যের জগতে পালাবদল ঘটে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এর প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে গিয়েছিল। পরপর এর কয়েকটি নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থের সবচেয়ে সাড়া জাগানো কবিতাগুলোর মধ্যে রয়েছে : “প্রলয়োল্লাস, আগমনী, খেয়াপারের তরণী, শাত-ইল-আরব, বিদ্রোহী, কামাল পাশা” ইত্যাদি। এগুলো বাংলা কবিতার মোড় ঘুড়িয়ে দিয়েছিল। তাঁর শিশুতোষ কবিতা বাংলা কবিতায় এনেছে নান্দনিকতা খুকী ও কাঠবিড়ালি, লিচু-চোড়, খাঁদু-দাদু ইত্যাদি তারই প্রমাণ। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি নিম্নরূপ :

- অগ্নিবীণা ১৯২২
- সঞ্চিতা ১৯২৫
- সাম্যবাদী ১৯২৫
- ফনী-মনসা ১৯২৭
- চক্রবাক ১৯২৯
- সাতভাই চম্পা ১৯৩৩
- নির্বীর ১৯৩৯
- নতুন চাঁদ ১৯৩৯

- মরুভাস্কর ১৯৫১
- সঞ্চয়ন ১৯৫৫
- নজরুল ইসলাম : ইসলামী কবিতা ১৯৮২
- আনন্দময়ীর আগমনে

৫.১.৩.৩ : সাম্যবাদী

সাম্যবাদী কাজী নজরুল ইসলাম রচিত ১৯২৫ সালের ডিসেম্বরে (পৌষ, ১৩৩২) প্রকাশিত একটি কাব্যগ্রন্থ। এই বইটির কবিতাগুলোতে নজরুল ইসলাম সাম্যের কথা বলেছেন। বিভিন্ন পিছিয়ে পড়া জাতি নিয়েও কবিতা এই বইতে রয়েছে। ধর্ম, জাত, লিঙ্গ সবকিছু পিছনে ফেলে মানুষের পরিচয়ই যে মহান তা তিনি এ কবিতাগুলোর মাধ্যমে বুঝিয়েছেন। তবে তার মানুষকবিতায় বলেছিলেন :

“পূজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল মূর্থরা সব শোন/মানুষ এনেছে গ্রন্থ, গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোন”

এই কাব্যগ্রন্থটিতে মোট ১১টি কবিতা রয়েছে। সবগুলিতেই মানুষের সমতা নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। কবিতাসমূহের তালিকা নিম্ন দেওয়া হল—

- সাম্যবাদী
- ইশ্বর
- মানুষ
- পাপ
- চোর-জাকাত
- বারাদ্দনা
- মিথ্যাবাদী
- নারী
- রাজা-প্রজা
- সাম্য
- কলিমজুর

৫.১.৩.৪ : সঞ্চিতা

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় এবং বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য-সংকলন হলো সঞ্চিতা। এই গ্রন্থে মোট ছিয়ানব্বইটি কবিতা আছে। এর মধ্যে—‘বিদ্রাহী’, ‘সর্বহারার’, ‘মানুষ’, ‘জীবন বন্দনা’, ‘খুকী ও কাঠবেলালী’, ‘চল চল চল’ প্রভৃতি প্রধান। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে।

গ্রন্থটির উৎসর্গ পত্রে লেখা আছে : “বিশ্বকবি সম্রাট শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু”।

৫.১.৩.৫ : মানুষ

মানুষ কবিতাটি নজরুল ইসলামের একটি অন্যতম কবিতা। এই কবিতাটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় The labour Swaraj party of the Indian Congress-এর মুখপত্র ‘লাঙল’ পত্রিকায়। পরে কবিতাটি “সাম্যবাদী” কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই কবিতাটিকে কবি নজরুলের মানুষের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা ও সমবেদনার এক উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে। এ উজ্জ্বলতা তাঁর মানবিকবোধের। শত ঝড়-ঝাপটা ও দারিদ্র্যপীড়িত জীবনযাপনের মধ্যেও যা তিনি কখনো হারাননি, মনের ভেতরে লালিত করেছিলেন সযত্নে। তাই তিনি অকপটে পরাধীন ভারতে শোষণ ও শাসনের নিপীড়ন সাধারণ মানুষের লাঞ্ছনা ও অপমান দেখেও, এমনকি নিজেও তার শরীক হয়েও বলতে পেরেছেন আমাদের অগ্নিবদনে এ কথা-‘গাহি সাম্যের গান’-মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।’

৫.১.৩.৬ : কবিতার বিশ্লেষণ

মানুষই যে ঈশ্বর, বা ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টির সুন্দর ও মঙ্গলময়ের প্রকাশের মূলেই যে মানুষ-এ বোধ নজরুলের ছিল বলেই তিনিই সাম্যের গানের মধ্য দিয়ে ঐক্যবদ্ধ সৃষ্টিশীল আনন্দময় মানবজাতির কামনা করেছেন। এ কামনা তিনি করেন সমস্ত ধর্ম-বর্ণ ও জাতিগত স্থূলতার উর্দে উঠে। এ কারণেই বলতে নেই তাঁর কাছে তাই ধর্ম ও জাতিগত বিভাজন মূল্যহীন বলে মনে হয়। কবিতার শুরুতেই মানুষের জয়গান করে, মানুষকে সবার বড় বলে এবং সর্বোপরি মানুষকে মহত্বের আসনে বসিয়ে বলতে দ্বিধা করেননি এ কথা বলতে—

নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি,

সব দেশ, সব কালে, ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।

‘পূজারী, দুয়ার খোলো,

ক্ষুধায় ঠাকুর দাঁড়ায়, পূজার সময় হল।

‘ক্ষুধায় ঠাকুর দাঁড়ায় দুয়ারে’—এ কথাগুলির মধ্যে কবি নজরুলের নিপীড়িত বুদ্ধিমত্তা দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষের প্রতি ভালোবাসার গভীরতার কথাই ব্যক্ত হয়েছে।

এই ‘মানুষ’ কবিতাটির প্রথমাংশেই কবি যেমন একদিকে পূজারীর অহংসর্বস্বতার রূপকে তুলে ধরেছেন, তেমনি পূজারীকে ব্যঙ্গ করতেও ছাড়েননি। মানবতাবাদী কবি ছিলেন বলেই কবি নজরুলের চোখে পূজারীর অহমিকা ও ধর্মীয় সংকীর্ণতা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। নজরুলের চোখে মানুষ ও দেবতায় কোনো প্রভেদ নেই বলেই ‘জীব প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর’— এই মন্ত্রে তিনি বিশ্বাসী। জীর্ণবস্ত্র, শীর্ণগাত্র, ক্ষুধায় কণ্ঠ ক্ষীণ’ এক ভিখারী মানুষের বা মুসাফির কাতর আহবানে মন্দিরের দরজা খুলেও পূজারীর দরজা বন্ধ করে দেবার মধ্যে কবি ধর্মের সংকীর্ণ মনোভাবের যে রূপটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, বলতে নেই তা শুধু অপমানকরই নয়— হত দরিদ্র মানুষের প্রতি এক শ্রেণি বিভাজনের অবজ্ঞা। এইজন্যেই কবি আমাদের হয়ে, মানুষের হয়ে বলেন—‘ঐ মন্দির পূজারীর, হায় দেবতা, তোমার নয়’।

প্রশ্ন জাগে মনে ঈশ্বর কি কেবল পূজারী ও মোল্লাতন্ত্রের? না হলে সামান্য নামাজের ছুতো তুলে অভুক্ত

ভিখারী-মানুষের মুখে খাবার তুলে দিতে যেমন তার বাধে না, তেমনি কোনো সংকোচ বোধ হয়না তার মুখের ওপর মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিতে। এমনকি কোনো দ্বিধা বোধ করেন না ‘মর গো-ভাগারে’ বলে অপমান বা তচ্ছিল্য করতে। কবি-ভাষাতেই যা স্পষ্ট চিত্রিত হয়েছে। যেমন—

এমন সময় এলো মুসাফির, গায়ে আজারির চিন্
বলে, “বাবা, আমি ভুখা ফাকা আছি নিয়ে সাত দিন!”
তেরিয়া হইয়া হাঁকিয়া মোল্লা—‘ভালা হ’ল দেখি লেঠা’,
ভুখা আছ, মর গো-ভাগাড়ে গিয়ে! নামাজ পড়িস্ বেটা?’

মোল্লা বা পূজারীর এ আচরণে রিক্ত-নিঃস্ব হতদ্রবির মানুষ বাস্তব অভিজ্ঞতায় পিষ্ট হয়ে উপলব্ধি করেন, মন্দির-মসজিদে মানুষের প্রকৃত কোনো দাবি নেই। মন্দির-মসজিদে কেবল একমাত্র মোল্লা ও পূজারীদের একচ্ছত্র অধিকার। এ কারণেই দৃপ্তকণ্ঠে জেহাদ ঘোষণা করতে বাধ্য হন দরজা ভেঙে ফেলার জন্য। যে বন্ধ দরজা কেবল সংকীর্ণতা ধর্মভাবের ও অবিশ্বাসের, যে দরজা এক শ্রেণিবৈষম্য সৃষ্টিকারীর, সেই দরজা—

কোথা চেঙ্গিস্, গজনী মামুদ, কোথায় কালাপাহাড়?
ভেঙে ফেল ঐ ভজনালয়ের যত তালা-দেওয়া দ্বার।
খোদার ঘরে কে কপাট লাগায় কে দেয় সেখানে তালা?
সব দ্বার এর খোলা রবে, চলো হাতুড়ি শাবল চালা।

ধর্ম ব্যাপারটার আসল সার্থকতা মানবিক সুউচ্চ বোধে প্রেম ও ভালোবাসায়, ধর্মের গোঁড়ামি অনুশাসনের নয়-এ সত্য কবি নজরুল তার হৃদয়ের মানবিকতার ভেতর দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি মোল্লা ও পুরোহিতদের ভণ্ডামির মুখোশটাকে ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছেন হাতুড়ি আর শাবলের ঘায়ে তালা লাগানো ভজনালয়ের দরজা ভেঙে ফেলতে।

মানুষকে ঘৃণা করেই যে কতিপয় মানুষ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভণ্ডধর্মিকের দলে নাম লিখিয়ে ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে ধর্মের অনুশাসনগুলি নিজেদের ইচ্ছেমতো সমাজবদ্ধ মানুষের চাপিয়ে দেয়-তা কবির দৃষ্টি এড়ায়নি। অথচ, ভণ্ডধর্মিকরা ধর্মের দোহাই দিয়েই কিন্তু প্রতিনিয়ত সাধারণ মানুষকে অবজ্ঞা করে বেদ-কোরান-বাইবেলের কথা বলে সমাজের বুকে যে জ্ঞান বিতরণ করেন—তা এরকম দ্বিচারিতা। কেননা, এসব গ্রন্থ এসেছে মানুষেরই হাতেই। কোনো অদৃশ্য দেবতার হাতে নয়। কবির খেদাক্তিতেই তা ব্যক্ত হয়েছে—

যাহারা আনিল গ্রন্থ-কেতাব সেই মানুষেরে মেরে
পূজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল! —মুখরা সব শোনো,
মানুষ এনেছে গ্রন্থ-গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো!

পুরোহিত ও মোল্লাতন্ত্র বেদ-কোরান ও বাইবেলের সারসত্যকে না বুঝে মানুষদের মধ্যে নিজেরাই তাদের মনগড়া কতকগুলো অনুশাসন জবরদস্তি চাপিয়ে দেয়। যার ফলে সমাজে তৈরি হয় অসম অবস্থার।

আমরা জানি কবি নজরুল মানবতাবাদী ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী কবি ছিলেন বলেই তিনি আজকের মানুষকে আদম দাউদ ঈসা মুসা ইব্রাহিম মোহাম্মদ কৃষ্ণ বুদ্ধ নানক কবিরের উত্তরাধিকার রূপে পরিগণিত করেন। কাজেই,

আজকের মানুষ কবির কাছে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জগদীশ্বরেরই সমতুল। ‘মানুষ মানুষের জন্যই’ এ সত্য কবি জানেন বলেই কবির কাছে পাপী-তাপী কোনো মানুষও অচ্যুত বা অস্পৃশ্য নয়। কবির কাছে তা তাই নিতান্ত নগণ্য ও তুচ্ছ হয়ে যায়—

তবু জগতের যত্র পবিত্র গ্রন্থ ভজনালায়

এ একখানি ক্ষুদ্র দেহের সম পবিত্র নয়!

বলতে নেই, এমন পবিত্র দেহমন্দিরেই জন্ম নেয় মহামানবেরা। কবি-কথাতেই যা ইঙ্গিতবাহীরূপে উদ্ভাসিত—

ও কে? চণ্ডাল? চমকাও কন? নহে ও ঘৃণ্যজীব!

ওই হ’তে পারে হরিশ্চন্দ্র, ওই শ্মশানের শিব।

চণ্ডালের মধ্যেই মিলেমিশে থাকেন রাজা হরিশ্চন্দ্র এবং স্বয়ং শিব। আজ যাকে আমরা অবহেলা করছি তুচ্ছাতিতুচ্ছ জ্ঞানে, কাল হয়তো তাকেই পূজা করতে হবে আমাদের।

কেননা, আমরা কেউই জানিনা রাখাল বা চাষার মধ্যে মূর্ত প্রকাশ ঘটতে পারে ব্রজের গোপাল, অর্থাৎ আমাদের আরাধ্য কৃষ্ণ ও বলরামের। বলতে কুণ্ঠা নেই, এখানে সাম্যবাদী কবি নজরুলের মনে যে আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া লেগেছে, তা কিন্তু এসেছে মানবতাবাদীর স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের জন্য।

৫.১.৩.৭ : সমালোচনা

অধ্যাপক-প্রাবন্ধিক তরুণ মুখোপাধ্যায় “নজরুল ও সঞ্চিতা” গ্রন্থে ‘মানুষ’ কবিতাটির আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন— ‘বঙ্কিমচন্দ্র-তাঁর ‘বিড়াল’ প্রবন্ধে কৃপণ ধনীকে চোরের চেয়েও ঘৃণ্য, শাস্তিযোগ্য মনে করেছিলেন। নজরুল আরো একধাপ এগিয়ে এসে ঘোষণা করেন, এই বঞ্চনা কোনোদিন ক্ষমা পাবে না—‘সে মোর রহিম জনা’ উক্তিতে প্রতিশোধ নেওয়ার ইঙ্গিত আছে।’ যারা মানুষের মধ্যে নিহিত আছে যে দেবতা ও প্রেম ভালোবাসা, যা নিজ স্বার্থসিদ্ধির কাজে ব্যবহৃত করে তাদেরকে ছিবড়ে করে দিয়ে পথের ভিখারী করে দেয়— তারা জানে না এই পাপের ফলভোগ তাদেরকে একদিন করতে হয়। প্রাবন্ধিক শ্রীকুমার দেব ‘কবি নজরুল ও সঞ্চিতা’ গ্রন্থে মানুষ কবিতা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন যে এখানে ‘নজরুল মানুষকে ঈশ্বর রূপে সবার ওপরে স্থান দিয়েছেন।’ আসলে সর্বদেশের সর্বকালের সমস্ত মানুষের সঙ্গে তিনি ঈশ্বরের সমান আত্মীয়তা অনুভব করেন। এই সমানুভূতি ‘মানুষ’ কবিতায় নজরুলীয় সাম্যবাদের শিকড় প্রোথিত করে দিয়েছে। তাই আজ আর আমাদের বলতে সংকোচ নেই যে, নজরুলই প্রথম আমাদের দেশের একজন প্রকৃত বিশ্বমুখীন সাম্যবাদী কবি। যা তাঁর ‘মানুষ’ কবিতায় গভীরতা পেয়েছে।

৫.১.৩.৮ : শিল্পসুখমা

‘মানুষ’ কবিতাটি ছয়মাত্রার মাত্রাবৃত্তে রচিত। যা নজরুলের প্রিয় ছন্দ। যদিও কবিতাটিতে কবির বক্তব্য বক্তৃতার আকারে আবেগঘন প্রকাশ ঘটেছে। তবু কিন্তু মধ্যে মধ্যে যে কবি-মনের অন্তরঙ্গতা ফুটে উঠেছে তা বেশ রসোত্তীর্ণ।

অন্যদিকে বক্তৃত্যধর্মী প্রবল হওয়ার জন্য এর অলঙ্করণ সেভাবে চোখে পড়ে না। নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো :

১. অনুপ্রাস :

- ক) জীর্ণবস্ত্র শীর্ণপাত্র, ক্ষুধায় কণ্ঠ ক্ষীণ
- খ) ও কারা কোরাণ, বেদ বাইবেল চুসিছে মরি মরি

২. উপমা :

- যত পবিত্র গ্রন্থ ভজনালয়
- ঐ একখানি ক্ষুদ্র দেহের সম পবিত্র নয়।

৩. রূপক :

- ক) তোমার মৃত্যুবাণ
- খ) তোমারি কামনা রাণী
- গ) দু'চোখে স্বার্থ ঠুলি।

৪. নিশ্চয় : মানুষ এনেছে গ্রন্থ : গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো।

৫. ব্যতিরেক : মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।

একটি সুন্দর চিত্রকল্পও নির্মাণ করেছেন কবি। যেমন—‘তিমির রাত্রি পথ জুড়ে তার ক্ষুধার মাণিক জ্বলে’।

এমনকি, শব্দচয়নের ক্ষেত্রেও নজরুল তাঁর কবি-স্বভাবের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। দেশি ও বিদেশি শব্দের প্রাচুর্য। যেমন—ক্ষুধা, পান্থ, ক্লোদাক্ত, ভুখারী, আজরিন চিন, শির্ণী, গোস্ত, ভালা, ল্যাঠা, তেরিয়া, ঠুলি, মথিত ইত্যাদি।

সবশেষে এভাবে সিদ্ধান্তে আসা যায়, যেহেতু নজরুল মানবতাবাদের পূজারী, তাই তিনি তাঁর সাম্যবাদের জয়গানকে ঘোষিত করার লক্ষ্য নিয়ে সাদামাটা কথায় ‘মানুষ’ কবিতাটি রচনা করেছেন বৃহৎ সমষ্টিগত সাধারণ মানুষের বোধগম্যের কথা ভেবে। কোনো মননখন্ড শিল্পসুষমার দিকে ঝাঁকেননি। সহজ-সরল গদ্যকেই তাঁর কবিতার বাহন করে নিয়েছেন ভাষা হিসাবে। যদিও আমরা জানি কবিত্ব অপেক্ষা বড় করে দেখা দিয়েছে কবি মনের আবেগ।

৫.১.৩.৯ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. ‘সঞ্চিতা’ সংকলনটি কোন কবির কবিতা সংকলন?
২. ‘মানুষ’ কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত?
৩. ‘মানুষ’ কবিতাটিতে কবি নজরুলের যে মানবতাবাদী ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে তার পরিচয় দাও।

৪. সাম্যবাদ, নজরুলের কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য—বক্তব্যটি কতদূর সমর্থনযোগ্য ‘মানুষ’ কবিতা অবলম্বনে আলোচনা করো।
৫. ‘মানুষ’ কবিতার ভাববস্তু আলোচনা করো।

৫.১.৩.১০ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. সঞ্চিতা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
২. নজরুল মানস—সনজিদা খাতুন।
৩. আধুনিক কবিতার দিগবলয়— অশ্রুকুমার সিকদার।
৪. আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়—দীপ্তি ত্রিপাঠি।
৫. আধুনিক বাংলা কাব্য— তারাপদ মুখোপাধ্যায়।
৬. আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা (১৯০১-২০০৮)—আশোককুমার মিশ্র।
৭. কবিতার কী ও কেন —নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।
৮. কবিতার ক্লাস— নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।
৯. আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা—বাসন্তী কুমার মুখোপাধ্যায়।

একক ৪

সুভাষ মুখোপাধ্যায়—একটি কবিতার জন্য

বিন্যাসক্রম

- ৫.১.৪.১ : ভূমিকা
- ৫.১.৪.২ : কবিজীবন
- ৫.১.৪.৩ : একটি কবিতার জন্যে
- ৫.১.৪.৪ : বাস্তব প্রেক্ষিত
- ৫.১.৪.৫ : ভাববস্তু বিশ্লেষণ
- ৫.১.৪.৬ : উপসংহার
- ৫.১.৪.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলি
- ৫.১.৪.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৫.১.৪.১ : ভূমিকা

সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩) বাংলা কাব্যজগতে চল্লিশের দশকের অন্যতম প্রধান কবি। মাত্র ২১ বছর বয়সে মধ্যবিত্ত বাঙালির অসহায়ত্ব আর অর্থনৈতিক দুর্দশার বিপরীতে এক সোচ্চার প্রতিবাদ সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তিরিশের দশকের কবিদের অনুভূতি ব্যক্তিচেতনাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে সমষ্টিচেতনায় জাগ্রত এ কবি। তাই তার কবিতা হয়ে ওঠে গণমানুষের কবিতা। ফলে চল্লিশের দশকের কবি হয়েও তিনি সর্বকালের গণমানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন।

৫.১.৪.২ : কবিজীবন

সুভাষ মুখোপাধ্যায় এর জন্ম ১৯১৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি বুধবার, নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে। পৈতৃক নিবাস ছিল কুষ্টিয়া জেলার দর্শনার লোকনাথপুরে। শৈশব কেটেছে রাজশাহী জেলার নওগাঁয়। তিনি কাব্যজীবন শুরু করেন ১৯৪০ সালে। তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘পদাতিক’ প্রকাশিত হয়। ৪০ দশকের আরেক শক্তিশালী কবি সমর সেন। সমর সেনের কবিতায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির অসহায়ত্বের চিহ্ন ছিল। ফুটে উঠেছিল অর্থনৈতির হতাশার ছবি। এই ব্যর্থতাকে শক্তিতে পরিণত করে কাব্য রচনা করলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর প্রতিটি কবিতায় প্রতিবাদের ভাষা, মুক্তির গান। মধ্যবিত্ত শ্রেণির দোলাচলবৃত্তির গোলকধাঁধা থেকে উত্তরণের আশায় উজ্জীবিত। প্রথম গ্রন্থই সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নেয়। এরপর ক্রমে প্রকাশিত হয় আরো ৫টি কাব্যগ্রন্থ। ১৯৪০ এ

পদাতিক, ১৯৪৮-এ অগ্নিকোণ, ১৯৫০-চিরকূট, ১৯৫৭-ফুল ফুটুক, ১৯৬২-যত দূরে যাই, ১৯৬৬-কাল মধু মাস, ১৯৯১-ধর্মের কল।

এছাড়াও তিনি বিভিন্ন পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন। ‘পরিচয়’ পত্রিকায় কাজ করতে গিয়ে আলাপ হয় সমর সেনের সাথে। সমর সেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে মার্কসবাদের বই পড়তে দেন। এই বই পড়ে সুভাষের মনে দৌল্যমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্য, তাঁদের অর্থনৈতিক ও মানসিক মুক্তির জন্য সচেতন হবার প্রেরণা জেগে ওঠে। প্রথমে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সার্বক্ষণিক কর্মী ছিলেন। পার্টির মুখপত্র দৈনিক জনযুদ্ধ পত্রিকার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। কিন্তু ১৯৪৮ এ পার্টি কর্তৃক নিষিদ্ধ হন এবং আড়াই বছর কারাবাসে থাকেন। কিন্তু আজীবনই তিনি এ মতবাদকে ধারণ করেছেন। তার কবিতায় তাই সৈনিকের শ্লোগানের সুর। মার্বে ১৯৪৬ এ দৈনিক স্বাধীনতায় কাজ করেন। পরিচয় পত্রিকার সাথে যুক্ত হন ১৯৫১ সালে।

৫.১.৪.৩ : একটি কবিতার জন্যে

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় রচিত ‘একটি কবিতার জন্যে’ কবিতাটি অগ্নিকোণ (১৯৪৮) কাব্যের অন্তর্গত একটি অন্যতম কবিতা। এ কাব্যের অপরাপর কবিতা হলো-অগ্নিকোণ, মিছিলের মুখ প্রভৃতি।

৫.১.৪.৪ : বাস্তব প্রেক্ষিত

১৯৩৯-১৯৪৫ এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটন কাল। মহাযুদ্ধের দক্ষিণা হিসাবে ৫০ (১৯৪৩) এর মঘন্তরে পঞ্চাশ লক্ষ নরবলি দিল বাংলাদেশ। সুভাষের দৃষ্টি তখন দশদিগন্তে বিপ্লবের ঝোড়ো হাওয়ায় সন্ধান করে ফিরছে। তারপর ভ্রাতৃত্বকে কলুষিত পথ বেয়ে এল ১৯৪৭ এর স্বাধীনতা। সে আজাদি ছিল বুটা। তাই স্বাধীনতার সুপ্রভাতে সুভাষের কণ্ঠ শুনতে পাওয়া গেল না। সাতচল্লিশে কবিকণ্ঠ নীরব। ১৯৪৮ এ আয়তনে ছোট কিন্তু বার্তা বড়ো, প্রকাশিত হয় কাব্য ‘অগ্নিকোণ’। কিন্তু এখানে দূরাগত বিপ্লবের পথচলা নিয়ে কিছু বললেন। টুকরো টুকরো ব্যঙ্গনা, আমাদের অতীতচারিতার সঙ্গে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্নের ইঙ্গিত দিয়ে যায়।

৫.১.৪.৫ : ভাববস্তু বিশ্লেষণ

কবিতাটি শুরু হয়েছে একটি ভবিষ্যৎ প্রত্নুতি নিয়ে— ‘একটি কবিতা লেখা হবে’। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি একেবারেই অনুকূল নয়, ‘রাগে গা রী-রী করে’। দুরন্ত ঝড়-ঝঞ্ঝা কবি মনকে বিধ্বস্ত করে গেছে। কিন্তু এ সব কিছু পরেও জড়তা কোনোমতেই কবিকে রোগগ্রস্ত করতে পারে না। কোনো শঙ্কাতেই পিছপা নয় আজ কবি মন। সমস্তরকম দুর্বলতা ঝেড়ে দুর্বীর গতিতে মহাবীরের এগিয়ে আসার সংকেত নিয়ে দিকে দিকে সাড়া পড়ে গেছে। বজ্রসম মুষ্টি যার বাহুবল, দীপ্ত ও উজ্জ্বল শিখা পূর্ণ হয় ‘রক্তের লাল দর্পণে মুখ দেখে’ সেই ভস্মলোচনসম ভয়ংকর প্রলয়নাশকারী পুরুষাকারের বন্দনা করেছেন কবি। সঙ্গে আশ্বাসের সুরে প্রতিজ্ঞা করেছেন দৃপ্ত ভঙ্গিতে সেই কালজয়ী পুরুষকে ‘একটি কবিতা লেখা হয় তার জন্যে’।

আসলে এসময় কবিতার আর কোনো নর-নারীর সুখীগৃহকোণের দাম্পত্যজীবন কিংবা মধুর রসের কাব্য করা সম্ভব নয়, এসময় কবিতা হয়ে যায় যুগের ছাড়পত্র। যুগবাণী বাহিত হয় যে কবিতায়, ঠিক তেমন কবিতা লিখতে চান কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। যেখানে থাকবে অনুর্বর যুগকে বলিষ্ঠ হাতে আবাদ করার ইতিহাস, থাকবে শতব্রন্দনরোলকে আনন্দের জোয়ারে জীবনমুখী করার গাথা। আমরা একারণেই পরবর্তীকালের পাঠক-কবিকুলের কাছে এসময়ের কবিতা হয়ে যায় ‘সংবাদপত্র’। যার পাতা ওল্টালেই আমাদের চোখে ভেসে ওঠে রক্তের লাল দাগে পূর্ণ ছিন্ন আঁচলে আবৃত মায়ের শোকাক্ত পাষণবৎ রক্তিম মুখমণ্ডল। যেখানে মিশে আছে বলিদানে কাতর মায়ের প্রতিবাদের সুর।

সমষ্টির প্রতিবাদে সুদিনের আসার আগাম সংকেত রূপে দেওয়ালে আটকে যায় ‘অনাগত এক দিনের ফতোয়া’। আগামী ভবিষ্যতকে সুরক্ষার্থে মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে ‘মিছিলে এগোয়’ জনতা। আকাশে বাতাসে মুখরিত যে জয়ধ্বনি তার গানে বিভোর জনসাধারণ। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে ‘নখদর্পণে আঁকা’ নতুন পৃথিবীর অভিমুখে—

নতুন পৃথিবী, অজস্র সুখ, সীমাহীন ভালোবাসা।

একটি কবিতা লেখা হয় তার জন্যে।

রোমাণ্টিকতার বিরোধী কবি ভবিষ্যতের কথা ভেবে আশাবাদী হন।

৫.১.৪.৬ : উপসংহার

কবির কাব্যের বিষয় কী হবে এ নিয়ে চর্চা বহুদিনের। রবীন্দ্রপরবর্তী কবিরা বিষয় হিসেবে বেছেছেন সমসাময়িক ঘটনাবলীকে। আলোচ্য কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রচনাতেই সমকাল জীবন্ত রূপ পেয়েছে। হয়ে উঠেছে প্রতিবাদের ভাষ্য। কবিতা কেমন হবে? যেসব কবিতা একটু স্পষ্টভাবে ঘটনাচিহ্নিত, বিশেষ দিনের বিষাদ বা প্রতিবাদ, অথবা উল্লাসিত বিজয়ের বার্তা যার শরীরে, ঘটনার অভিঘাত ও প্রাসঙ্গিকতা সময়ের ব্যবধানে মিলিয়ে গেলে সেখানে কবিতামূল্য অবশিষ্ট থাকে? এসব প্রশ্নের উত্তর সহজেই মেলে ‘পদাতিক কবি’র ব্যতিক্রমী পদ সঞ্চরণে।

কবি মনে করেন কবিতা লেখা হবে সমকালে শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য। কবিতার প্রতিবাদী ভাষায় আকাশ-বাতাস-সমুদ্র সমগ্র চরাচর কাঁপিয়ে তুলবে। ব্রজের আশ্রয়নে অরণ্যরূপী সমাজের নিষ্ক্রিয়তার ঘুম ভেঙে সাড়া ফেলে দেবে। শোষণের শিকড় পতনের ভয়ে মাথা খুঁড়বে। শেষে বিদ্যুতের আলোয় বিপ্লবের লাল আলো জ্বলে পীড়নের ভস্মের ওপর নতুন সমাজ গড়ে উঠবে। এর জন্যই কবিতা লেখা হবে। কবি এভাবেই বিপ্লবকে বিপ্লবের মুখকে স্বাগত জানিয়েছেন।

৫.১.৪.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. ‘একটি কবিতার জন্যে’ কবিতাটি কার লেখা? কোন কাব্যের অন্তর্গত?
২. কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

৩. পাঠ্য কবিতাটির ভাববস্তু বিশ্লেষণ করো।
৪. সমসাময়িক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে ‘একটি কবিতার জন্যে’ কবিতাটি কতদূর বাস্তবসম্মত হয়েছে বলে তুমি মনে করো।
৫. রবীন্দ্র-উত্তর কবিতারূপে ‘একটি কবিতার জন্যে’ কবিতাটির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যসহ আলোচনা করো।

৫.১.৪.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা : সুভাষ মুখোপাধ্যায়।
২. সুভাষ মুখোপাধ্যায় : পদাতিক কবি, রক্তিম কবিতা—বিজয় সিংহ।
৩. সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কথা ও কবিতা—শঙ্খ ঘোষ, সৌরীন ভট্টাচার্য, অমিয় দেব, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব বিশ্বাস (সম্পাদিত)
৪. আধুনিক কাব্যের সমস্যা—আবু সয়ীদ আইয়ুব
৫. আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়—দীপ্তি ত্রিপাঠী

পর্যায় গ্রন্থ - ২
বাংলা উপন্যাস
একক ৫
শেষের কবিতা

বিন্যাসক্রম

- ৫.২.৫.১ : প্রাক্ কথা
৫.২.৫.২ : শেষের কবিতার কাহিনী
৫.২.৫.৩ : শেষের কবিতা উপন্যাসের নামকরণ
৫.২.৫.৪ : চরিত্র বিচার :
 ৫.২.৫.৪.১ : অমিত রায়
 ৫.২.৫.৪.২ : শোভনলাল
 ৫.২.৫.৪.৩ : লাবণ্য
 ৫.২.৫.৪.৪ : কেতকী মিত্র
৫.২.৫.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী
৫.২.৫.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৫.২.৫.১ : প্রাক্ কথা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) উপন্যাসের জীবন ভাবনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) উপন্যাসের জীবনভাবনা কিন্তু আলাদা। কেননা সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে জীবনধারাও আগের থেকে পরিবর্তিত হয়েছে। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আগমন এক নতুন যুগের বার্তা নিয়ে এসেছে। তিনি আধুনিককালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মেয়েদের অধিকার বোধের কথা উপন্যাসে তুলে ধরলেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের উপন্যাস অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্স প্রধান ঐতিহাসিক উপন্যাস দ্বারা অনুপ্রাণিত। ষোল বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘করুণা’ নামে (১৮৭৭-৭৮) একটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। জীবনের স্বরূপ আলোচনায় ‘বউঠাকুরাণীর হাট’ (১৮৮৩) উপন্যাসে বঙ্কিমানুসারী রোমান্সের প্রভাবই বেশি। ইতিহাসের অংশটি হল রাজা প্রতাপাদিত্যের কাহিনী। ‘চোখের বালি’ (১৯০৩) উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ কাহিনী বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে মানুষের আঁতের কথাকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। নারী হৃদয়ের অতৃপ্ত ভালোবাসা, সমাজ সমস্যা হিসেবে ধরা পড়েছে।

উপন্যাসটিতে ত্রিভুজ প্রেমের আকর্ষণ প্রবল আকার ধারণ করেছে যা শেষ পর্যন্ত সাংসারিক বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে গেছে। “চোখের বালি উপন্যাসে—মহেন্দ্র চায় বিনোদিনীকে এবং বিনোদিনী চায় বিহারীকে, বিহারী বিনোদিনীকে প্রতিহত করতে চায়।” ‘নৌকাডুবি’তে (১৯০৬) রবীন্দ্র মানসের পশ্চাৎগামিতার চিহ্ন প্রকাশ পেলেও এখানে কাহিনী একটা বিশিষ্ট ‘সাইকোলজি’-র উপর প্রতিষ্ঠিত। ‘গোরা’ (১৯১০) উপন্যাসে স্বদেশ চেতনার সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটেছে। স্বদেশ প্রেম তথা ভারতবোধ, সব মিলিয়ে ভারত প্রেম তথা নারীর ভালোবাসা ফুটে উঠেছে।

‘চতুরঙ্গ’ (১৯১৬) উপন্যাসে শচীশের জীবনের চারটি স্তর দেখানোই উপন্যাসিকের লক্ষ্য। উপন্যাসটিতে লেখক আঙ্গিকের বদল ঘটালেন। তারফলে উপন্যাসটি হয়ে উঠল বক্তব্য প্রধান, ভাব নির্ভর। সমাজের রীতি-নীতি মেনেই জ্যাঠামশাই, শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাস বড় হয়ে উঠেছে। সর্বোপরি এই চারটি চরিত্র উপন্যাসে মুখ্য চরিত্র হিসেবেও দেখা দিয়েছে। আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশ জিজ্ঞাসার অন্যতম রূপ ফুটে উঠেছে ‘ঘরেবাইরে’ (১৯১৬) উপন্যাসে। ‘ঘরেবাইরে’ উপন্যাসে বিমলা চরিত্রের সংকট নৈতিকতার প্রশ্নে। নিখিলেশ ও সন্দীপকে কেবল দুটি বিপরীত ভাবাদর্শের প্রতিমূর্তি বলে মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘যোগাযোগ’ (১৯২৯) উপন্যাসে কুমুদিনী-মধুসূদনের মধ্যে ভালবাসার সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। দুটি নরনারীর মানস গঠনের ভিন্নতাই তাদের ভালবাসার সংকটকে ঘনিষ্ঠ তুলেছে। “মধুসূদন শিক্ষা-সংস্কৃতি বর্জিত উঠতি বড়লোক, ধনাগমে স্ফীতকায়, সে পড়তি বংশের মেয়ে কুমুদিনীকে বিয়ে করল নিজের ঐশ্বর্যের জোরে। কুমুদিনী কিন্তু তৈরি হয়েছে তার অগ্রজের মার্জিত রুচি ও সংযত ঐতিহ্যের মধ্যে। মধুসূদনের দাঙ্কিতা, ধনের ঔদ্ধত্য ও রুচিহীন আচার-ব্যবহার নববধূ কুমুদিনীকে সদাসর্বদা পীড়ন করত, হয়তো শীঘ্রই এ বিবাহে বিপর্যয় দেখা দিতে পারত, কিন্তু শেষ মুহুর্তে ঘটনা আকস্মিকভাবে সমাপ্ত হল, যখন জানা গেল কুমুদিনী সন্তান সম্ভবা”।

‘শেষের কবিতা’ (১৯২৯) উপন্যাসটি পাঠ করলে জানা যায় অমিত-কেতকী, লাভণ্য-শোভনলাল সম্পর্কে যা নতুন দিশার জন্ম দিয়েছে। রোমাণ্টিক প্রণয়ের এক অনাস্বাদিত পূর্ব জীবনচিত্র বাঙালির ভাবজগতে অভিনব বার্তা বহন করে এনেছে। লেখক এই উপন্যাসে বলতে চেয়েছেন “কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ায়-তোলা জল-প্রতিদিন তুলব, প্রতিদিন ব্যবহার করব। আর লাভণ্যর সঙ্গে আমার যে ভালোবাসা সে রইল দিঘি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে”। লেখক এই উপন্যাসটিতে গদ্যভাষার এক নতুন ঐশ্বর্য বাংলা সাহিত্যকে উপহার দিয়েছেন। সর্বোপরি ‘শেষের কবিতা’র আনন্দ সুন্দর ভাষা পাঠকের চিত্ত হরণ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘দুইবোন’ (১৯৩৩) উপন্যাসটিতে নারী দুইরূপে পুরুষের জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছে। কখনও সে প্রিয়রূপে আবার কখনও জননীরূপে। ‘দুইবোন’ উপন্যাসের শর্মিলা, উর্মিমালা ও শশাঙ্কের চরিত্রটি খুবই উল্লেখযোগ্য।

‘মালঞ্চ’ (১৯৩৪) উপন্যাসে নীরজা, সরলা ও আদিত্যের জীবন কাহিনী রূপায়িত হয়েছে। অসুস্থ রুগ্ন নারীর ক্ষুদ্র তাৎপর্যহীন মনোবিকারের এক চিত্র আমরা উপন্যাসটির মধ্যে লক্ষ্য করি।

শেষপর্বে ‘চারঅধ্যায়’ (১৯৩৪) উপন্যাসটিতে রাজনীতির সঙ্গে মানবতার প্রশ্নও মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পটভূমিকায় দুটি যুবক-যুবতীর প্রেমের উন্মেষ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অতীন্দ্র ও এলার ব্যর্থতার

কথা এ উপন্যাসের মাত্র চারটি অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। তবে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে, মানব জীবনের কামনা-বাসনার কুটিল আবর্ত উপন্যাসটিকে অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। যা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধতার সংকটকেই তুলে ধরেছে।

উপন্যাস হল চলমান জীবনের ছবি। তার মধ্যে কল্পনা থাকলেও বাস্তবকে অস্বীকার করে নয়। তাই উপন্যাস হল জীবনের শিল্প, সমগ্রতার শিল্প। সর্বোপরি জীবন ও উপন্যাসের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তা ভুলে গেলে চলবে না। তাই ‘সাধারণভাবে উপন্যাস হলো দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ বিমথিত মানবজীবনের শিল্পিত গদ্যরূপ।’ ‘রবীন্দ্র উপন্যাস সমীক্ষা’ গ্রন্থে, ডঃ সত্যব্রত দে—‘শেষের কবিতা’ উপন্যাস সম্পর্কে বলেছেন—“শেষের কবিতা শুধু রবীন্দ্র-উপন্যাস ধারায় নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন দিক দিয়ে অভিনব। এমন ভঙ্গিতে আর কোন উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে রচিত হয়নি। চতুরঙ্গ থেকে রবীন্দ্র-উপন্যাস-প্রবাহে নতুন ধারায় সূত্রপাত। তির্যক বুদ্ধিদীপ্ত বাকভঙ্গি আনুপূর্বিক রবীন্দ্র-উপন্যাসে কমবেশি লক্ষণীয় হলেও, এই স্তর থেকে তা যেন নতুন উদ্দীপনা লাভ করেছে। ভাষার কবিত্বও এই স্তর থেকে বেশ লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। শেষের কবিতায় এসে রচনাভঙ্গির এই রবীন্দ্রিক বৈশিষ্ট্য যেন একটি চরম পরিণতিতে পৌঁছেছে। এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলিত হয়েছে পরিহাস-তরল ব্যঙ্গ চটুলতার আমেজ। উপন্যাস পাঠ করতে গিয়ে রচনাভঙ্গির এই নানাবিধ বৈশিষ্ট্যই পাঠকের মনোহরণ করে নেয়।” (পৃ. ৪৩১)

৫.২.৫.৩ : শেষের কবিতা উপন্যাসের কাহিনী

সাহিত্য হল ‘সমাজের দর্পণ’। সেই দর্পণে আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি সমস্যাও সংকটের শিল্পরূপ ফুটে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প, উপন্যাস ইত্যাদির সঙ্গে মিলে মিশে আছে নিজের জীবন অভিজ্ঞতার কথা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যান্য উপন্যাসের মতো ‘শেষের কবিতা’ (১৯২৯) উপন্যাসের কাহিনী, চরিত্রের ব্যাপ্তি ও গভীর মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দেশের জল, মাটি, মানুষের সঙ্গে ছিল লেখকের আত্মিক বন্ধন। তাই মানবজীবন সম্পর্কে একটা বিশুদ্ধ দার্শনিক বোধ রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির নির্যাস। তাই মনে হয় ঔপন্যাসিক যত বেশি ছাঁচ ভেঙে বেরিয়ে আসবেন, তত বেশি তিনি স্বাধীন ও স্বনির্ভর থাকবেন। লেখক জীবনপথে চলতে চলতে যে সমস্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, তার ফসলই হল তাঁর উপন্যাসগুলি। আমরা জানি পরিবর্তন জীবনেরই ধর্ম। তাই জীবনচিত্র কথাসাহিত্যে যখন প্রতিফলিত হয় সেখানেও এই পরিবর্তন লক্ষণীয়। বাংলা উপন্যাসে এই বিবর্তন নিরীক্ষণ করলে তার রূপবৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আমাদের চিন্তা ও চেতনাকে সজীব করে রাখে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘চোখের বালি’ (১৯০৩) সংহত কাহিনীর উপন্যাস। আবার ‘গোরা’ (১৯১০) বিস্তারধর্মী উপন্যাস। ‘চতুরঙ্গ’ (১৯১৬) উপন্যাসটি আত্মকথন ভঙ্গিতে বিবৃত। ‘শেষের কবিতা’ (১৯২৯), ‘দুইবোন’ (১৯৩৩), ‘মালঞ্চ’ (১৯৩৪) তিনটি উপন্যাসেই দেখা যায়, ত্রিকোণ প্রেমের সমস্যাই কাহিনীর মূল আশ্রয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসে দেখাতে চেয়েছেন-প্রেম হল ধ্যানের বিষয়, যা দেবতার কাছে পূজা পাওয়ার মতো। আর এক প্রেম হল প্রতিদিনের ব্যবহারের জন্য। রবীন্দ্র-উপন্যাসে পালাবদল : বিষয় ও প্রকরণের আলোয়—গোপিকানাথ রায়চৌধুরী বলেছেন—

‘প্রেম এবং বিবাহ, প্রণয়িনী ও গৃহিণী-পুরুষের এ দুইয়ের প্রতি আকর্ষণই স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। সংসারে এই দুটি বস্তু বা দুই নারীর সাক্ষাৎ দুর্লভ কিছু নয়। কিন্তু যখন একই নারীর মধ্যে দিয়ে দুই ইচ্ছাকে চরিতার্থ করতে

চায় পুরুষ, দুই রূপকে প্রত্যক্ষ করতে চায়, তখনই দেখা দেয় জটিলতা ও অসংগতি।” (পৃ. ৯১৮) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অমিতের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, লাভণ্য হল দীঘির মতো, যেখানে অমিতের মন সাঁতার দিয়ে বেড়াবে, আর কেতকী মিত্র হল ঘড়ায় তোলা জলের মতো, প্রতিদিন তুলবে ও ব্যবহার করবে। তেমনি অমিত রায়ের নেশা ছিল স্টাইলে, ফ্যাশনে নয়। সে মনে করতো এটাই মানুষের প্রকৃত শ্রী হওয়া উচিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘শেষের কবিতা’(১৯২৯) উপন্যাসে সতেরটি পরিচ্ছেদে কাহিনীর বিস্তার ঘটিয়েছেন। এখন আমরা সেই অধ্যায়গুলির আলোচনায় অগ্রসর হবো—তিনি উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের নাম দিয়েছেন—‘অমিত-চরিত’। ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসের নায়ক হলো অমিত। সে কবি মানসিকতার অধিকারী ছিল। বিদেশে প্রায় সাত বছর কাটিয়েছে পড়াশোনার জন্যে। অমিত রায়ের দুই বোন ছিল, তারা হলো সিসি ও লিসি। অমিতের নেশা ছিল স্টাইলে, ফ্যাশানে নয়। অমিত রায় বালিগঞ্জের এক সাহিত্য সভায় রবি ঠাকুরের কবিতা নিয়ে বক্তৃতা দিয়েছে। লেখক বলেছেন—“সেই সভার সভাপতি ছিলেন অমিত রায়। তাঁর মতে কোন কবিরই পাঁচ বছরের অধিক কাব্যসৃষ্টি উচিত নয়। তাতে করে সেই কবির রচনা সস্তা বলে বিবেচিত হবে। অমিত তাই মনে করে প্রিমিটিভ ভাব ছেড়ে সাহিত্যে আনতে হবে তীক্ষ্ণ ভাষা অর্থাৎ তীরের মতন, বর্ষার ফলার মতন। ভাষা হবে ফুলের মতন নয়, বিদ্যুতের রেখার মতন। উদাহরণ হিসেবে অমিত আধুনিক কবি নিবারণ চক্রবর্তীর কবিতা আবৃত্তি করে শোনায়।”

‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি হল—‘সংঘাত’। শিলং পাহাড়ে হঠাৎ ঘটে যাওয়া গাড়ি দুর্ঘটনায় অমিতের সঙ্গে লাভণ্যের পরিচয় হয়েছে। পরিচয় হওয়ার পর অমিত বুঝতে পেরেছে লাভণ্য অন্য মেয়েদের থেকে আলাদা। তারপর ফিরে এসে অমিত ঐ দিনটির কথা ডায়েরিতে লিখে রেখেছে—“সেদিন ঘরে ফিরে এসে অমিত অনেকক্ষণ ভেবেছিল, এর গলার সুরে যে একটি স্বাদ আছে স্পর্শ আছে, তাকে বর্ণনা করা যায় কী করে। নোট বইখানা খুলে লিখলে, এ যেন অশ্রুরি তামাকের হালকা ধোঁওয়া, জলের ভিতর দিয়ে পাক খেয়ে আসছে নিকোটিনের ঝাঁজ নেই, আছে গোলাপ জলের স্নিগ্ধ গন্ধ।”

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তৃতীয় পরিচ্ছেদের নামকরণ করেছেন—‘পূর্ব-ভূমিকা’। এখানে যোগমায়া চরিত্রের পূর্ববৃত্তান্ত তুলে ধরা হয়েছে। যোগমায়ার শ্বশুর মশায় ছিলেন জ্ঞানদাশঙ্কর বাড়ুয়্যে, তার পিতা ছিলেন রামলোচন বাড়ুয়্যে। উপন্যাসে দেখা যায়—যোগমায়ার সঙ্গে বরদাশঙ্করের বিয়ে হয়েছিল। “স্বামীর মৃত্যুর পরেই তাঁর ছেলে যতিশংকর ও মেয়ে সুরমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। শীতের সময় থাকেন কলকাতায়, গরমের সময়ে কোনো একটা পাহাড়ে। যতিশংকর এখন পড়ছে কলেজে, কিন্তু সুরমাকে পড়াবার মতো কোনো মেয়ে-বিদ্যালয় তাঁর পছন্দ না হওয়াতে বহু সন্ধানে তার শিক্ষার জন্যে লাভণ্যলতাকে পেয়েছেন।”

“শেষের কবিতা’ উপন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদটি হল—‘লাভণ্য-পুরাবৃত্ত’। লাভণ্যর বাবা অবনীশ দত্ত ছিলেন এক পশ্চিমী কলেজের অধ্যক্ষ। অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও মাতৃহীন মেয়েকে সবদিক থেকে খেয়াল রাখতেন। “বাপের একমাত্র শখ ছিল বিদ্যায়, মেয়েটির মধ্যে তাঁর সেই শখটির সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয়েছিল। নিজের লাইব্রেরির চেয়েও তাকে ভালোবাসতেন।” অবনীশ দত্তের আর একটি স্নেহের পাত্র ছিল, তার নাম শোভনলাল। অল্প বয়স থেকেই শোভনলালের পড়ার প্রতি খুব মনোযোগ ছিল। সেইজন্য অবনীশের বাড়ির লাইব্রেরিতে এসে শোভনলাল পড়াশোনা করতো। সেই সূত্রেই লাভণ্যর সঙ্গেও শোভনলালের পরিচয় হয়। শোভনলালের বাবা ননীগোপাল

হঠাৎ একদিন অবনীশের বাড়িতে অভিযোগ জানাতে যায়—“নালিশ এই যে, অবনীশ নিজের ঘরে অধ্যাপনার ছুতোয় বিবাহের ছেলে ধরা ফাঁদ পেতেছেন, বৈদ্যের ছেলে শোভনলালের জাত মেরে সমাজ-সংস্কারের শখ মেটাতে চান”।

পঞ্চম পরিচ্ছেদের নামকরণ—“আলাপের আরম্ভ”। এই অধ্যায়ে অমিত ও লাভণ্যের পরিচয় হয়েছে। উপন্যাস পাঠে আমরা জানতে পারি অমিত, যোগমায়া দেবীর সঙ্গেও পরিচয় করেছে। “লাভণ্য পড়বার ঘরে অমিতকে বসিয়ে রেখে যোগমায়াকে খবর দিতে গেল। সে ঘরে অমিত বসল যেন পদ্মের মাঝখানটাতে ভ্রমরের মতো। চারিদিকে চায়, সকল জিনিস থেকেই কিসের ছোঁওয়া লাগে, ওর মনটাকে দেয় উদাস করে।” অমিত ও লাভণ্যের পরিচয় পর্বে দুজনের নাম ধরে ডাকার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। এত তাড়াতাড়ি না হলেও কিছুদিন পর নাম ধরে ডাকা যেতেই পারে বলে মনে করেন যোগমায়া দেবী। তারপর যোগমায়া দেবী মনে মনে ভাবতেন, লাভণ্যের সঙ্গে অমিতের বিয়ে হলে তিনি খুব খুশী হবেন। কিন্তু বাস্তবে তা হয়ে ওঠেনি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ‘নূতন পরিচয়’ নামে। অমিত যোগমায়া দেবীর বাড়িতে যতিশঙ্করকে পড়ানোর দায়িত্ব নিয়েছে তার উদ্দেশ্য একটাই যাতে করে লাভণ্যের সঙ্গে প্রতিদিনই দুবেলা দেখা হয়। তাদের মধ্যে আধুনিক কবিতা নিয়েও প্রায়ই আলাপ আলোচনা হতো। উপন্যাসে দেখা যায়—“অমিত বললে, দেখুন আমার কথা লোকে হঠাৎ বুঝতে পারে না বলেই হাসে, বুঝতে পারলে চুপ করে বসে ভাবত। আজ পাখিকে নতুন করে জানছি এ কথায় লোকে হাসছে। কিন্তু এর ভিতরের কথাটা হচ্ছে এই যে, আজ সমস্তই নতুন করে জানছি, নিজেকেও।”

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসের সপ্তম পরিচ্ছেদের নামকরণ করেছেন ‘ঘটকালি’। অমিত রায় নিজের ঘটকালি নিজেই করেছে। উপন্যাসে দেখা যায়—“অমিত যোগমায়ার কাছে এসে বললে, মাসিমা, ঘটকালি করতে এলেন। বিদায়ের বেলা কৃপণতা করবেন না।” এই অধ্যায়ে যোগমায়া দেবী ভালোবেসে অমিত ও লাভণ্যের নতুন নামকরণ করেছেন। তিনি অমিতের নাম রাখলেন মিতা আর লাভণ্যের নাম রাখলেন বন্যা।

অষ্টম পরিচ্ছেদে লক্ষ্য করা যায় ‘লাভণ্য তর্ক’। যোগমায়া দেবী লাভণ্যকে নানাভাবে বোঝাতে থাকেন। যেন তেন প্রকারে অমিতের সঙ্গে লাভণ্যের বিয়ে দিতে তিনি প্রস্তুত। অথচ লাভণ্যকে কোনভাবেই রাজী করানো যাচ্ছেনা। উপন্যাসে দেখা যায়, লাভণ্য বলেছে—“অমিতকে ভালোবাসা যায় কিন্তু বিয়ে করা যায় না।” কেননা অমিতকে বিয়ে করে দুঃখ দিতে চাই নে, তখন তার মনে হয়েছে বিয়ে সকলের জন্যে নয়। সেই পরিস্থিতিতে লাভণ্য ভাবে, সে শুধু—“কেবল বই পড়বে আর পাস করবে, এমনি করেই তার জীবন কেটে যাবে। কিন্তু অমিতের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর সে বুঝতে পেরেছে সেও ভালোবাসতে জানে অর্থাৎ নারী হিসেবে নিজেকে অনুভব করতে পেরেছে। লাভণ্যের মনে হয়েছে এইটুকুই আশীর্বাদ হয়ে থাক, বিয়ে করে সে তাকে নষ্ট করতে পারবে না।”

‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসের নবম পরিচ্ছেদের নাম ‘বাসা-বদল’। এই পরিচ্ছেদে দেখা যায়, অমিত রায় শিলং এর যে বাড়িতে থাকতো, সেখানে আর থাকা যাবে না। কারণ রংপুরের কোন জমিদার এসে সেখানে থাকবেন। তাই অমিতকে সেই বাসাবাড়ি বদল করতে হয়েছে। অনেক খোঁজার পর যোগমায়াদের বাড়ির কাছাকাছি একটা বাসা ভাড়া পাওয়া গেল। সেখানেই অমিত থাকবে বলে মনস্তির করেছে। সেই ঘরের অবস্থা যদিও খুবই খারাপ, তবুও অমিত সেই ঘরই বেছে নিল। যোগমায়া দেবীর সঙ্গে অমিতের কথোপকথনে জানা যায়—“অমিত উত্তর করলে, উমার ছিল নিরাহারের তপস্যা, শেষকালে পাতা পর্যন্ত খাওয়া ছেড়েছিলেন। আমার হল নিরাস্বাবের তপস্যা-খাট পালঙ টেবিল কেদারা ছাড়তে ছাড়তে প্রায় এসে ঠেকেছে শূন্য দেয়ালে। সেটা ঘটেছিল হিমালয়

পর্বতে, এটা ঘটল শিলঙ পাহাড়ে। সেটাতে কন্যা চেয়েছিলেন বর, এটাতে বর চাচ্ছেন কন্যা। সেখানে নারদ ছিলেন ঘটক, এখানে স্বয়ং আছেন মাসিমা-এখন শেষ পর্যন্ত যদি কোনো কারণে কালিদাস এসে না পৌঁছতে পারেন অগত্যা আমাকেই তাঁর কাজটাও যথাসম্ভব সারতে হবে।” সর্বোপরি বলা যায় অমিত রায় ঐ জীর্ণ, পোড়ো বাড়িতে থেকেও লাভণ্যের প্রতি ভালোবাসা ব্যক্ত করেছে।

দশম পরিচ্ছেদের নামকরণ করা হয়েছে ‘দ্বিতীয় সাধনা’। লেখক এই অধ্যায়ে অমিত রায়ের সাধনার কথা বলেছেন। অমিত মনে করে, ঐশ্বর্য দিয়েই ঐশ্বর্য দাবি করতে হয়, আর অভাব দিয়ে চাওয়া যায় আশীর্বাদ। সেই জন্য অমিতের মনে হয়েছে ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসের লাভণ্য দেবীর মতো মানবীরা ঐশ্বর্য জাগিয়ে রাখে। আর মাসিমা, যোগমায়া দেবীর মতো মানুষের কাছে আশীর্বাদ গ্রহণযোগ্য। অমিতের এই কুটিরে যোগমায়া দেবী লাভণ্যকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। তারপর দু’জনের মনের কথা জেনে নিয়ে গাঁটছড়া বেঁধে দিলেন। উপন্যাসে দেখা যায়— “এই বলে লাভণ্যকে অমিতের পাশে দাঁড় করিয়ে তার ডান হাত অমিতের ডান হাতের উপর রাখলেন। লাভণ্যের গলা থেকে সোনার হারগাছি খুলে তাই দিয়ে দু’জনের হাত বেঁধে বললেন, তোমাদের মিলন অক্ষয় হোক।”

‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসের এগারো পরিচ্ছেদ ‘মিলন-তত্ত্ব’ পর্ব। যোগমায়া শিলং থেকে কলকাতায় ফিরে গিয়ে বিয়ের সমস্ত আয়োজন করবে বলে মনস্থির করেছে। অষ্টাণ মাসে অমিত ও লাভণ্যের বিয়ে হবে বলে ঠিক হয়ে গেছে। সেই পরিস্থিতিতে লাভণ্য, অমিতকে বলেছে বিয়ের আগে আর আমাদের দেখা করা সম্ভব নয়। অমিত তার উত্তরে জানিয়েছে আমি না হয় শিলং থেকে চলে যাব কলকাতায়। তারপর কলকাতায় গিয়ে কী করবে, কী ভাবে নিজেদের সংসার সাজাবে সেই চিন্তাতেই ব্যস্ত থেকেছে। অমিত বলতে থাকে—“লোকে ভুলে যায়, দাম্পত্যটা একটা আর্ট, প্রতিদিন ওকে নতুন করে সৃষ্টি করা চাই।” অমিত বিয়ের পর দেখিয়ে দেবে কীভাবে সংসার করতে হয়, কীভাবে সংসারের জন্য কাজ করতে হয়। অমিত, তখন লাভণ্যের উদ্দেশ্যে বলেছে— “জীবিকার দরকারে নয়, জীবনের দরকারে। আমার মাঝখানটাতে থাকে আঁঠি, সেটা মিষ্টিও নয়, নরমও নয়, খাদ্যও নয়, কিন্তু ঐ শক্তটাই সমস্ত আমার আশ্রয়, এটেকেই সে আকার পায়।” আর আমরা জানি শেষ পর্যন্ত অমিত ও লাভণ্যের বিয়ে হয়নি ও সংসার পাতাও হয়ে ওঠেনি।

উপন্যাসটির দ্বাদশ পরিচ্ছেদ “শেষ সন্ধ্যা” নামকরণে দেখা যায়, অমিত ও লাভণ্য দু’জনে দেখা করতে গেছে। কারণ আগামী কালই অমিত কলকাতায় চলে যাবে। তাই মাসিমার অনুমতি নিয়ে অমিত ও লাভণ্য শিলং পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হয়েছে। “অমিত লাভণ্যর মাথা বুকে টেনে নিয়ে তার মুখটি উপরে তুলে ধরলে। লাভণ্যর চোখ অর্ধেক বোজা, কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।” সেই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য লাভণ্য মৃদুস্বরে অমিতকে বলেছে—‘চলো এবার’। তখনই লাভণ্যর মনে হয়েছে এই সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। তাই এইখানে শেষ করা ভালো। তখনই হয়েছে অমিতের মোহভঙ্গ। সেই পরিস্থিতিতে অমিতের মনে কোথায় যেন একটা আঘাত লেগেছে। যখন অমিত, লাভণ্যর মনের কথাটি একটি কবিতার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে বলেছে, তখন লাভণ্য জানিয়েছে—

“তোমারে দিই নি সুখ, মুক্তির নৈবেদ্য গেনু রাখি
রজনীর শুভ্র অবসানে। কিছু আর নাই বাকি,
নাইকো প্রার্থনা, নাই প্রতি মুহূর্তের দৈন্যরাশি,

নাই অভিমান, নাই দীন কান্না, নাই গর্ব-হাসি,
নাই পিছু ফিরে দেখা। শুধু সে মুক্তির ডালিখানি
ভরিয়া দিলাম আজি আমার মহৎ মৃত্যু আনি।”

সেই পরিস্থিতিতে লাবণ্য, অমিতকে আরো জানিয়েছে, আমাদের প্রেম আগুনে পোড়া, এ কোনদিনই মিলনের দাবি করে না। সুখে-সংসার করার বার্তাও বয়ে আনে না। এরপর শোভনলালের প্রসঙ্গ উঠে এল লাবণ্যের কথাতে। তখন অমিত নিজেকে হতভাগা চাঁদ মনে করতে লাগল। দুজনের কথাবার্তার মাঝখানে শোভনলালের প্রসঙ্গ এসে যাওয়ায় শেষ সন্ধেবেলার সুরও বিগড়ে গেল। আর পাঠকেরা জানতে পারে লাবণ্যের জীবনে শোভনলালের প্রবেশ ঘটেছে। অমিত তখন স্থির থাকতে না পেরে লাবণ্যকে জানিয়েছে—

“সুন্দরী তুমি শুকতারা
সুদূর শৈলশিখরান্তে,
শর্বরী যবে হবে সারা
দর্শন দিয়ো দিক্‌ভ্রান্তে।”

‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসের এয়োদশ পরিচ্ছেদের নাম ‘আশঙ্কা’। বিশেষ করে অমিতের মনের আশঙ্কা তুলে ধরা হয়েছে এই অধ্যায়ে। অপরদিকে লাবণ্যও কোন কাজে মন বসাতে পারেনি। অমিত, জিনিসপত্র সব কলকাতায় উদ্দেশ্যে রওনা করে দিয়েছে। ডাকঘরে কোন চিঠিপত্র আছে কি না, জানতে গেলে ডাকঘর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে তার নামে একটি টেলিগ্রাম আছে। টেলিগ্রামে লেখা আছে—আজই অমিতের খোঁজে শিলং-এ আসছে—“সিসি, আমার বোন, তার বন্ধু কেটি মিত্র আর তার দাদা নরেন।” অমিত তারপর কলকাতার উদ্দেশ্যে যাওয়া বাতিল করেছে। কলকাতা বাতিলের খবরটা যোগমায়া দেবীকে জানাতে গেলে, লাবণ্যের মন বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। লাবণ্য তখন অমিতকে জানিয়েছে— “ও বাড়ি থেকে আজ তুমি বেরিয়ে এসেছ মিতা। আবার একদিন যদি ঢুকতে চাও দেখবে, ওখানে তোমাকে কুলোবে না। পৃথিবীতে আজকের দিনের বাসায় কালকের দিনের জায়গা হয় না। সেদিন তুমি বলেছিলে, জীবনে মানুষের প্রথম সাধনা দারিদ্রের, দ্বিতীয় সাধনা ঐশ্বর্যের। তারপরে শেষ সাধনার কথা বলনি, সেটা হচ্ছে ত্যাগের।” এই পরিস্থিতিতে লাবণ্য বুঝতে পারে অমিতের সমাজ আর তার সমাজ একেবারে আলাদা। অমিত দু’ মাস ধরে শিলং-এ বসবাস করার পরেও লাবণ্য তাকে বুঝতে পারেনি। এমনকী অমিত, লাবণ্যকে বধু হিসেবে এই বাড়িতে নিয়ে আসবে বলে মনস্থির করলেও লাবণ্য গ্রহণ করল না। তখন হতাশায়, আক্ষেপে অমিতকে বলতে শোনা গেছে—“তুমি আজ বধূসজ্জা খসিয়ে ফেললে, বললে, এখানে জায়গা হবে না বন্ধু, চিরদিন ধরে আমাদের সপ্তপদী গমন হবে।”

‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসের চতুর্দশ পরিচ্ছেদের নামকরণ ‘ধূমকেতু’। ধূমকেতুর মতন শিলং-এ যারা এলো, তারা হলো অমিতের বোন সিসি। সিসির বান্ধবী কেটি মিত্র বা কেতকী মিত্র আর কেটি মিত্রের দাদা নরেন। নরেন তো দীর্ঘকাল ইউরোপে ছিল। সে জমিদারের সন্তান, তার যেমন আয়ের জন্য ভাবনা নেই, ব্যয়ের জন্যেও কোন চিন্তা নেই। নরেন মিত্র চিত্রকর হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু হয়েছেন চিত্র সমালোচক। “চিত্রকলা সে ফলাতে পারে না, কিন্তু দুইহাতে সেটাকে চটকাতে পারে।” আবার কেটি মিত্রের আসল নাম কেতকী মিত্র। “চালচলন ওর দাদারই কায়দা—কারখানার বকযন্ত্র পরম্পরায় শোধিত তৃতীয় ক্রমের চোলাই করা বিলিতি কৌলীন্যের ঝাঁঝালো এসেঙ্গ।” আসলে কেতকী মিত্র আধুনিক। তাই জীবনধারণ পদ্ধতিতে সে আধুনিক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে।

অমিতের বোন সিসির অবস্থান এখনো মাঝামাঝি জায়গায়। সে কোন পক্ষ অবলম্বন করবে তা বুঝে উঠতে পারছে না। “উচ্চ হাসিতে, অজস্র খুশিতে, অনর্গল আলাপে ওর মধ্যে সর্বদা একটা চলন-বলন টগবগ্ করছে।” কেতকী মিত্র, অমিতকে ভালোবাসে তাই সিসি ওর সঙ্গে উদ্বিগ্ন হয়ে শিলং এ ছুটে এসেছে। তারা এখন কিভাবে অমিতকে উদ্ধার করবে, সেই নিয়েই ব্যস্ত থেকেছে। “এটা নিশ্চিত, গোড়ায় অমিতকে কিছুই জানতে দেওয়া হবে না। তার আগেই শত্রুপক্ষকে আর রণক্ষেত্রটাকে দেখে আসা চাই। তারপর দেখা যাবে মায়াবিনীর কত শক্তি”। ওরা দুজনেই আশা করেছিল, অমিত, লাভণ্যর কথা নিজে থেকেই তুলবে। কিন্তু তা না হওয়ায় আন্দাজে বোঝা গেল—“অমিতের সাধের তরণী সম্প্রতি কিছু বেশিরকম ঢেউ খাচ্ছে।”

‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের নাম—‘ব্যাত’। দুই সখী সিসি ও কেতকী অমিতের মুখ থেকে লাভণ্যর কোন কথা শুনতে পায় না। তারফলে তাদের সম্পর্কের পরিণতি কোথায় তা তারা জানতে পারেনি। সেইজন্য তারা যোগমায়ার বাড়িতে উপস্থিত হয়েছে। “গাড়ি বারান্দায় এসে চোখে পড়ল, বাড়ির রোয়াকে একটি ছোটো টেবিল পেতে একজন শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীতে মিলে পড়া চলছে। বুঝতে বাকি রইল না, এরই মধ্যে বড়োটি লাভণ্য।” কেতকী, অমিতের নাম বিদেশী ধাঁচে— “মিস্টার অমিট্রায়ে এখানে এসেছেন কি না খবর নিতে এলুম।” তখন যোগমায়া, সিসিকে বলেছে— আমি যেহেতু অমিতের মাসি, তাই তোমারও মাসি। কিন্তু কেটি মিত্রের আসল উদ্দেশ্য হল যোগমায়া ও লাভণ্যকে অপমান করা। ঠিকসময়ে অমিত সেখানে এসে পড়ায় যোগমায়া দেবীরা তার থেকে রেহাই পেয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে অমিয় বলেছে—“ঠিক সময়টাতে আসাকেই বলে পাক্ষুয়ালিটি কিন্তু ঘড়ির সময় ঠিক সময় নয়, ঘড়ি সময়ের নম্বর জানে, তার মূল্য জানবে কী করে।” কেটি তখন অমিতের উপর অভিযোগ করতে লাগল। যখন তারা দুজনেই ইংলণ্ডে ছিল, তখন কেটির বয়স ছিল আঠের। সাত বৎসর আগেকার কথা হলেও কেটির মনে সব কিছু ঘটনা তেমনি জীবন্ত হয়ে আছে। উপন্যাসে দেখা যায়—“অক্সফোর্ডে একজন পাঞ্জাবী যুবক ছিল কেটির প্রণয়মুগ্ধ। সেদিন আপসে অমিত সেই পাঞ্জাবীর সঙ্গে নদীতে বাচ খেলেছিল। অমিতেরই হল জয়।” তখন অমিত কেটির হাতে আংটি পরিয়ে দিয়েছিল। আর এখন কেটির মনে হয়েছে, বাজিতে সে হেরে গেছে। তাই অমিতের উপর অভিমান করে আংটিটি খুলে টেবিলের উপর রেখে চলে যায়। সেই পরিস্থিতিতে কেটি বলেছে—“বাজিতে যদিই হারলুম তবে আমার এই চিরদিনের হারের চিহ্ন তোমার কাছেই থাক অমিট। আমার হাতে রেখে একে আমি মিথ্যে কথা বলতে দেব না।”

‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসের ষোল নম্বর পরিচ্ছেদে ‘মুক্তি’র কথা বলা হয়েছে। অমিতের অজান্তে, তার থেকে লাভণ্য মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু সেই সময় শিলং-এ উপস্থিত হয়েছে শোভনলাল। লাভণ্যের সঙ্গে শোভনলাল দেখা করতে চেয়েছে। শোভনলাল, লাভণ্যের উদ্দেশ্যে বলেছে—“তোমার কাছে শাস্তি পেয়েছি, কিন্তু কবে কী অপরাধ করেছি আজ পর্যন্ত স্পষ্ট করে বুঝতে পারিনি।” তখন লাভণ্যর চোখে জল ভরে এল। অতীতের কথা ভেবে তার মনে হল, জীবনকে অধিকার করে তাকে সফল করতে পারত কিন্তু নিজের জ্ঞানের গর্বের কারণে তা হয়ে ওঠেনি। শোভনলাল, যে তার পরম বন্ধু একথা, এতদিনে লাভণ্য অনুভব করতে পেরেছে। সেই পরিস্থিতিতে শোভনলালের উদ্দেশ্যে লাভণ্য চিঠিতে বলেছে—“তুমি আমার সকলের বড়ো বন্ধু। এ বন্ধুত্বের পুরো দাম দিতে পারি এমন ধন আজ আমার হাতে নেই। তুমি কোনোদিন দাম চাওনি, আজও তোমার যা দেবার জিনিস তাই দিতে এসেছ কিছুই দাবি না করে। চাই নে বলে ফিরিয়ে দিতে পারি এমন শক্তি নেই আমার, এমন অহংকারও নেই।” লাভণ্য চিঠিটা লিখে শোভনলালকে পাঠিয়ে দেবার পর অমিতের সঙ্গে কথোপকথন শুরু হয়েছে। তখন লাভণ্য,

অমিতকে বলেছে—“আমার সমস্ত ভালোবাসা দিয়েই বলছি, আমাকে তুমি আংটি দিয়ো না, কোনো চিহ্ন রাখবার কিছু দরকার নেই। আমার প্রেম থাক্ নিরঞ্জন, বাইরের রেখা, বাইরের ছায়া তাতে পড়বে না।” তারপর লাবণ্য নিজের আঙুল থেকে আংটিটি খুলে অমিতের আঙুলে পরিয়ে দিল। তখন অমিতের মনে হল সমস্ত শিলং পাহাড়ের শ্রী নিস্তেজ হয়ে গেছে। এমনকী অমিতের মনে সংকটের কারণে পরিবেশ-পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসটির সপ্তদশ পরিচ্ছেদের নাম ‘শেষের কবিতা’। এই অধ্যায়ে দেখা যায়, কলকাতার কলেজে পড়ে যতিশংকর। অমিত রায়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক বন্ধুত্বের। যতি শংকর একদিন জানতে পেয়েছে—“অমিতের এক বন্ধু ঠাট্টা করে বলেছে, সে আজকাল কেটি মিত্রের বাইরেরকার রঙটা ঘোচাতে উঠে-পড়ে লেগেছে। কাজ পেয়েছে মনের মতো, বর্ণান্তর করা। এতদিন অমিত মূর্তি গড়বার শখ মেটাত কথা দিয়ে, আজ পেয়েছে সজীব মানুষ।” যতিশংকর, অমিতকে একথা আগে জিজ্ঞাসা করতে পারেনি। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে অমিতকে জিজ্ঞাসা না করে উপায় ছিল না। “অমিত দা, শুনলুম মিস কেতকী মিত্রের সঙ্গে তোমার বিয়ে?” অমিত কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর, যতিশংকরকে জানিয়েছে—আসলে ভালোবাসা, বিবাহ সবই মানুষকে কেন্দ্র করে। তাই মানুষকে বাদ দিয়ে তার মানে বের করতে গেলে ধাঁধাঁ লাগে। তখন অমিত আরও বলেছে—“ভালোবাসা কথাটা বিবাহ কথার চেয়ে আরো বেশি জ্যাস্ত।” অমিত, সেই পরিস্থিতিতে যতি শংকরকে বলেছে, পৃথিবীতে যত কিছু মারামারি, খুনোখুনি হয় সবই ভালোবাসার জন্য। আর উপন্যাস পাঠে, আমরা জানতে পারি অমিতের সঙ্গে কেতকীর যে সম্পর্ক তা ভালোবাসারই। ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসের কাহিনীর শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অমিতের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত করেছেন—“দেখো ভাই, সব কথা সকলের নয়। আমি যা বলেছি, হয়তো সেটা আমারই কথা। সেটাকে তোমার কথা বলে বুঝতে গেলেই ভুল বুঝবে, আমাকে গাল দিয়ে বসবে। একের কথার উপর আরের মানে চাপিয়েই পৃথিবীতে মারামারি খুনোখুনি হয়। এবার আমার নিজের কথাটা স্পষ্ট করেই না হয় তোমাকে বলি। রূপক দিয়েই বলতে হবে, নইলে এ সব কথার রূপ চলে যায়—কথাগুলো লজ্জিত হয়ে ওঠে। কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ায়-তোলা জল—প্রতিদিন তুলব, প্রতিদিন ব্যবহার করব। আর লাবণ্যের সঙ্গে আমার যে ভালোবাসা সে হইল দিঘি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।”

এরপর অমিত পত্র লিখে লাবণ্যকে জানিয়েছে তার বিয়ের কথা। অপরদিকে লাবণ্যও যতিশংকরের হাতে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে শোভনলালের সঙ্গে লাবণ্যের বিয়ের খবর। “বিবাহ হবে ছ মাস পরে, জ্যৈষ্ঠমাসে, রামগড় পর্বতের শিখরে।” অমিতের উদ্দেশ্যে লাবণ্যের লেখা চিঠি দিয়েই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসটি শেষ করেছেন। লাবণ্য, চিঠির মধ্যে দিয়ে অমিতকে জানিয়েছে, সে যা দিয়েছে তা অমিতেরই দান। তার উত্তরে লাবণ্য (বন্যা) বলেছে—

“ সব-চেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়,
সে আমার প্রেম।
তারে আমি রাখিয়া এলেম
অপরিবর্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশ্যে।
পরিবর্তনের স্রোতে আমি যাই ভেসে
কালের যাত্রায়।
হে বন্ধু বিদায়।”

সবশেষে বলা যায় ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসের মূল বিষয় হল প্রেম। অমিত-লাবণ্য, অমিত-কেতকী, লাবণ্য-শোভনলাল এই ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনী হল ‘শেষের কবিতা’।

৫.২.৫.৩ : শেষের কবিতা উপন্যাসের নামকরণ

আমরা জানি নানান উপায়ে কাব্য, নাটক, উপন্যাস ও ছোটগল্পের নামকরণ করা হয়ে থাকে। কেননা এই নামকরণের তাৎপর্য সুদূর প্রসারী। কোথাও নায়ক-নায়িকার নামে, কোথাও আবার মূল বিষয় অনুসারে। এমনকী রূপক বা সাংকেতিক উপায়ে বিভিন্ন শিল্প মাধ্যমের নামকরণ হতে পারে। বাংলা কথাসাহিত্যে নায়ক বা নায়িকার নামে নামকরণ করার রীতি আমরা সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলি পাঠ করলেই জানতে পারি। সেগুলি হল ‘কপালকুণ্ডলা’ (১৮৬৬), ‘মৃণালিনী’ (১৮৭৩), ‘চন্দ্রশেখর’ (১৮৭৫), ‘রাজসিংহ’ (১৮৮২) ইত্যাদি। উপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাসগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সেখানেও তিনি চরিত্রভিত্তিক নামকরণ করেছেন। যেমন— ‘করুণা’ (১৮৭৭), ‘চোখের বালি’ (১৯০৩), ‘গোরা’ (১৯১০)। ‘চোখের বালি’ উপন্যাসের নামকরণে প্রথমে ‘বিনোদিনী’ রাখা হয়েছিল, তা আমরা প্রিয়নাথ সেনকে লেখা দুটি চিঠি থেকে জানতে পারি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘চতুরঙ্গ’ (১৯১৬), ‘ঘরেবাইরে’ (১৯১৬), ‘যোগাযোগ’ (১৯২৯) প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্যে বিষয়ভিত্তিক নামকরণ লক্ষ্য করা যায়। আবার রূপক-সাংকেতিক নামকরণের ক্ষেত্রে নাটকের কথা আমরা বলতে পারি। সেই ক্ষেত্রে দেখা যায়, আপাতদৃষ্টিতে যে দৃশ্য রূপায়িত তার অন্তরালে আর একটি অর্থের নিবিড় সমাবেশ। রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলি হল—‘শারদোৎসব’ (১৯০৮), ‘রাজা’ (১৯১০), ‘অচলায়তন’ (১৯১২), ‘ডাকঘর’ (১৯১২), ‘ফাল্গুনী’ (১৯১৬), ‘মুক্তধারা’ (১৯২২), ‘রক্তকরবী’ (১৯২৬), ‘কালের যাত্রা’ (১৯৩২) প্রভৃতি। তবে মনে রাখতে হবে এইসব নাটকের মধ্যে কোনোটিকেই বিশুদ্ধ রূপক বা সাংকেতিক নাটকরূপে অভিহিত করা যায় না। সেইজন্য মনে হয়, কোনো নাটকে রূপকের প্রাধান্য রয়েছে কোথাও আবার সাংকেতিকতার প্রাধান্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘শেষের কবিতা’ (১৯২৯) উপন্যাসের প্রথমে নাম রেখেছিলেন ‘মিতা’। তারপর নিজেই নাম পরিবর্তন করে রাখলেন ‘শেষের কবিতা’। ‘শেষের কবিতা’ রচনার সূত্রপাত ১৯২৮ খ্রিঃ মে মাস নাগাদ, কুন্সুরে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসটি শেষ করেছিলেন ১৯২৮ খ্রিঃ ২৫শে জুন। তারপর উপন্যাসটি ধারাবাহিক ভাবে প্রবাসী পত্রিকায় ১৯২৯ খ্রিঃ প্রকাশিত হয়েছিল। ৬৬ পৃষ্ঠার এই ছোট উপন্যাসে সরাসরি কবিতা স্থান পেয়েছে অনেকগুলি। ‘বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস’ গ্রন্থে (দ্বিতীয় খণ্ড)—ক্ষেত্র গুপ্ত বলেছেন—“সরাসরি রবীন্দ্র কাব্যাদর্শের বিরোধিতা করেছে এ বইয়ের নায়ক কবি। রবীন্দ্রপক্ষ এবং বিরোধীদের লড়াই শুধু গল্পের ভূমিকায় নেই, গল্পের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে। গোড়ায় অমিতের কথার তোড়ে এবং ব্যক্তিত্বের জোরে রবীন্দ্রপক্ষ বড় সিয়মান ছিল। কিন্তু লেখক লাবণ্যকে রবীন্দ্রপক্ষের মুখপাত্র করে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকেই জিতিয়ে দিয়েছেন।” (পৃ. ৩৯২) ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাস সম্পর্কে একথাও গুরুত্বপূর্ণ যে, সে যুগে রোমান্স নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টির আকর্ষণ ছিল লেখক সে কথা বলতে চেয়েছেন।

আমরা আগেই বলেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপন্যাসের সপ্তদশ পরিচ্ছেদটির নাম রেখেছিলেন ‘শেষের কবিতা’। উপন্যাসটির কাহিনী শুরু হয়েছিল কলকাতায়, আবার কাহিনীর শেষও কলকাতায়। তবে উপন্যাসের বেশিরভাগ সময়ের পরিচয় পাওয়া যায় শিলংয়ে। উপন্যাসটির মূল কাহিনী শুরু হয়েছিল শিলং পাহাড়ে দুটি গাড়ির সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে। তারপরেই অমিতের সঙ্গে লাবণ্যের পরিচয় হয়, তারপর সেই পরিচয়, প্রেমে পরিণত হয়েছে। শিলং

পাহাড়ে প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর পরিবেশে, অমিত ও লাবণ্যর কথাবার্তার মধ্যে অজস্র কবিতার ছত্রের প্রকাশ ঘটেছে। পরবর্তীকালে দেখা যায়, লাবণ্য, অমিতকে বলেছিল—“ভয় কিসের মিতা, এই আগুনে পোড়া প্রেম, এ সুখের দাবি করে না, এ নিজে মুক্ত বলেই মুক্তি দেয়।” তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রেমের বর্ণনা আর কবিতার আলোচনা উপন্যাসটির মাত্রাকে বাড়িয়ে তুলেছে। ‘বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’ গ্রন্থে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—“অমিত ও লাবণ্যের ক্ষেত্রে প্রেমের এই চিরচঞ্চলতা ও বিপুল গতিবেগ কোন নিয়মিত কক্ষাবর্তনের মধ্যে ধরা দেয় নাই, ইহার অপ্রতিরূদ্ধ অগ্রগতি কোন নিশ্চল পঙ্কিলতার শেষ শয়নে আপনাকে হারাইয়া ফেলে নাই। ইহার সুদূর প্রসার ও রহস্যময় ইঙ্গিত কোন অতি পরিচয়ের পুঞ্জীভূত চাপে পিষ্ট, দলিত হয় নাই।” (পৃ. ১৭৮)

উপন্যাসের পরিণতিতে লাবণ্যের সঙ্গে অমিতের বিয়ে হয়নি। অমিত বিয়ে করেছিল কেটি মিত্তিরকে। কেটিকেও বিয়ে করার সময় অমিত ঘষে মেজে লাবণ্যের স্তরে নিয়ে আসতে চেয়েছে। “কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ায়-তোলা জল—প্রতিদিন তুলব, প্রতিদিন ব্যবহার করব। আর লাবণ্যর সঙ্গে আমার যে ভালোবাসা সে রইল দিঘি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।” অমিতের ভালোবাসাকে লাবণ্য যেমন সম্মান দিয়েছে, তেমনি লাবণ্যের জীবনেও অমিতের প্রভাব পরিপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে।

আর একদিক দিয়া দেখিতে গেলেও লাবণ্যর চরিত্র আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়। তা হল লাবণ্যর বুদ্ধিদীপ্ত মনোভাবের কাছে প্রথমদিকে শোভনলাল কিছুই ছিল না। তাই সে শোভনলালকে উপেক্ষা করেছিল। উপন্যাসের শেষের দিকে অবশ্য তারা মনস্থির করেছিল বিয়ে করবে বলে। অমিতের পূর্বপরিচয় ছিল কেতকী মিত্রের সঙ্গে। সাত বছর আগে ইংলণ্ডে, অমিত কেতকীকে একটি আংটি পরিয়ে দিয়েছিল। উপন্যাসে দেখা যায়, অমিত বলেছে—

“একদিন আমার সমস্ত ডানা মেলে পেয়েছিলুম আমার ওড়ার আকাশ, আজ আমি পেয়েছি আমার ছোট বাসা, ডানা গুটিয়ে বসেছি। কিন্তু আমার আকাশও রইল।” ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসের উদ্ধৃত অংশটি পড়লে আমরা বুঝতে পারি তা ছিল—কবি কল্পনাত্মক ভাবনা। ‘শেষের কবিতার’ কবিতাগুলি উপন্যাসের প্রয়োজনে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি নায়ক-নায়িকার চরিত্রকে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করতে সাহায্য করেছে। সেইদিক থেকেও শেষ কবিতাটির গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী। সর্বোপরি উপন্যাসের নামকরণ সেইদিক দিয়েও সার্থক হয়েছে বলা যায়।

উপন্যাসের পরিণতির পক্ষে শেষ কবিতাটি যে অতি প্রয়োজনীয়, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসের কাহিনীর যদি কোথাও ফাঁক থেকে থাকে, লেখক শেষ কবিতাটির মাধ্যমে সমগ্র বৃত্তটিকে পূর্ণ করে তুলেছেন। উপন্যাসের শেষে কবিতা পাঠের মধ্যে দিয়ে অমিত নিজের হৃদয়ের কথা জানিয়েছে লাবণ্যকে। আর লাবণ্যও মন-প্রাণ খুলে তার মনের কথা জানিয়েছে অমিতকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসের শেষে লাবণ্যের কবিতার মধ্যে দিয়ে শোভন লালের সঙ্গে তার মিলনের কথাটি ব্যক্ত করেছেন। শেষের কবিতা দিয়ে লেখক শুধু লাবণ্যর সম্মানই বাঁচাননি, সেইসঙ্গে উপন্যাসের পরিণতিতে পাঠকেরও আর কোন জিজ্ঞাসা থাকল না। লাবণ্য অমিতকে জানিয়েছে—

“হে ঐশ্বর্যবান,

তোমারে যা দিয়েছি সে তোমারি দান—

গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।”

এই সমস্ত দিক দিয়ে বিচার করলে, উপন্যাসের নামকরণ ‘শেষের কবিতা’ সর্বতোভাবে সার্থক হয়ে উঠেছে।

৫.২.৫.৪ : চরিত্র বিচার

৫.২.৫.৪.১ : অমিত রায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসের নায়ক হলো অমিত রায়। তাকে আমরা কবি ও ব্যারিস্টার বলে জানি। অমিত রায়ের আবার পছন্দের কবি ছিলেন নিবারণ চক্রবর্তী। আমরা আগেই বলেছি ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের নাম ‘অমিত চরিত’। উপন্যাসে অমিত রায়ের পিতা-মাতার কোন নামের উল্লেখ নেই। তবে অমিত রায়ের দুই বোনের পরিচয় আমরা পেয়েছি। তারা হলো সিসি ও লিসি। অমিতের ছিল প্রখর মেধা ও প্রচুর বুদ্ধি। এমনকী সেই ছিল সাহিত্যের গুণমুগ্ধ পৃষ্ঠ পোষক। উপন্যাস পাঠে আমরা জানতে পারি অমিত রায় বুদ্ধিমান হওয়ার কারণে, বিশ্বাস করেছে—“ফ্যাশানটা হল মুখোশ, আর স্টাইলটা হল মুখশ্রী।”

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসে অমিতের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—“অমিতের নেশা হল স্টাইলে। কেবল সাহিত্য বাছাই কাজে নয়, বেশে ভূষায় ব্যবহারে। ওর চেহারাতেই একটা বিশেষ ছাঁদ আছে—পাঁচজনের মধ্যেও যে কোনো একজন মাত্র নয়, ও হল একেবারে পঞ্চম, অন্যকে বাদ দিয়ে চোখে পড়ে। দাড়ি গোঁফ কামানো চাঁচা মাজা চিকন শ্যামবর্ণ পরিপুষ্ট মুখ, স্মৃতিভরা ভাবটা, চোখ ঝল, হাসি চঞ্চল, নড়াচড়া চলাফেরা চঞ্চল, কথার জবাব দিতে একটু দেরী হয় না।”

অমিত রায় মহিলাদেরকে সম্মান করে এবং অল্পেতেই তাদের সঙ্গে ভাব জমাতে পারে। কিন্তু মেয়েদের প্রতি তার কোন আসক্তি নেই। বিদ্যা-বুদ্ধি সম্পর্কে অমিতের জ্ঞান খুবই প্রখর। লেখক, অমিতের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত করেছেন—“কমল হীরের পাথরটাকেই বলে বিদ্যে, আর ওর থেকে যে আলো ঠিকরে পড়ে তাকেই বলে কালচার। পাথরের ভার আছে, আলোর আছে দীপ্তি।”

সাধারণ মানুষ বেড়াতে গেলে যা করে, অমিত ঠিক তার উল্টোটি করে বসে। অমিত শিলং-এ বেড়াতে গিয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষাতত্ত্বের বই নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে। ‘বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস’ (দ্বিতীয়খণ্ড) গ্রন্থে—ক্ষেত্র গুপ্ত বলেছেন—“অমিত যতই প্রথাবিরোধী হোক, তাকে বোহেমিয়ান বলে সম্প্রদায়ের লোকেরা যতই মনে করুক, কল্লোলের বোহেমিয়ানগিরির জাতই আলাদা। বংশানুক্রমিক সঞ্চিত ধনের বাহুল্যে বিলিতি আভিজাত্যের উজ্জ্বলতা তাদের ছিল না। তাদের পশ্চিমী দীক্ষা ওদেশের নব্য সাহিত্যের প্রাপ্তনে। তাহলেও রবীন্দ্রনাথ ওদের কথা ভেবেই অমিতকে তৈরি করেছেন—প্রেমেন্দ্র-অচিন্ত্য-বুদ্ধদেবের অনুকরণেই যে গড়তে হবে এমন কথা নেই।” (পৃ. ৩৯২)

অমিতের কোনও কিছু পেয়েও না পাওয়া অথবা পেয়েও হারানো অমিতের স্বভাব ধর্ম। অমিত সামাজিক সংকটের ভারে পীড়িত নায়ক বলেই আমাদের মনে হয়। শিলং পাহাড়ে অমিতের খোঁজে কেতকী মিত্র যখন এসেছে, তখন লাভণ্যের সঙ্গে কেতকী মিত্রকে তুলনামূলকভাবে ব্যাখ্যা করেছে অমিত। অমিতের চরিত্রে সরলতা ও সহজতা থাকা সত্ত্বেও দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু চপল খেয়ালের দ্বারা যে জীবনের পথ ঠিকমতো বেছে নেওয়া যায় না। লাভণ্য, প্রথম থেকেই অমিতকে দেখে বুঝেছে তার সঙ্গে সংসার পাতা যায় না। লাভণ্য স্বীকার করেছে, অমিতের সমাজে গিয়ে সে থাকতে পারত না। তাই উপন্যাসে দেখা যায়—“প্রেমকে সেই সঙ্গে তার পূর্বতন অনুদারতা ও অহং এর ভ্রান্তিকে। তাই আজ যখন শোভনলালের কাছ থেকে আহ্বান এল তখন সে নির্দিধায় গ্রহণ করতে পারল শোভনলালকে। যেন সে বেঁচে গেল পথ ভ্রষ্টতার হাত থেকে।”

ভালোলাগাকে, ভালোবাসায় পরিণত করার মতো ধৈর্য, স্থির মানসিকতা অমিতের নেই। তা আমরা ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাস পাঠ করলেই জানতে পারি। সেই পরিস্থিতিতে অমিতও ভেবেছে এই বোধহয় ঠিক— ‘কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ায়-তোলা জল, প্রতিদিন তুলব, প্রতিদিন ব্যবহার করব। আর লাভ্যের সঙ্গে আমার যে ভালোবাসা সে রইল দিঘি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।’ অমিত রায়ের চরিত্রের মধ্যে দিয়ে আমরা দেখলাম প্রেম ও নিঃসঙ্গতার একটি রূপ।

‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসের সপ্তম অধ্যায়ের নাম ‘ঘটকালি’। যেখানে অমিত, নিজের ঘটকালি নিজেই করেছে। উপন্যাসে দেখা যায়—“কী আশ্চর্য করেই তুমি আমার চরিত্রের ব্যাখ্যা করেছ। তা নিয়ে কথা কাটাকাটি করব না।” আবার বিয়ে করা প্রসঙ্গে অমিতের মনোভাব ধরা পড়েছে—‘ভালোবাসা কথাটা বিবাহ কথার চেয়ে জ্যাস্ত’। অমিত বুঝেছে, ভালোবাসা আর বিবাহ এক নয়। তাই শেষ পর্যন্ত কেতকী মিত্রকে বিয়ে করে, অমিত রায় তার প্রেমকে রক্ষা করেছে। সব মিলিয়ে অমিত চরিত্রটি ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

৫.২.৫.৪.২ : শোভনলাল

‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসে শোভনলাল চরিত্রকে আমরা অমিত রায়ের বিপরীতে পেয়েছি। শোভনলাল এক স্বতন্ত্র প্রতিভার অধিকারী। তার পিতা ছিলেন ননীগোপাল। শোভনলালের শারীরিক বর্ণনায় পাওয়া যায় “প্রশস্ত কপালে, চোখের ভাবের স্বচ্ছতায়, ঠোঁটের ভাবের সৌজন্যে, হাসির ভাবের সরলতায়, মুখের ভাবের সৌকুমার্যে তার চেহারাটি দেখবামাত্র মনকে টানে। মানুষটি নেহাত মুখ চোরা, তার প্রতি একটু মনোযোগ দিলে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।” শোভনলালের পড়াশোনায় মনছিল, কিন্তু তারা খুব গরিব ছিল। তাই ছাত্রবৃত্তির টাকা তার একমাত্র ভরসা। উপন্যাস পাঠে আমরা জানতে পারি অধ্যাপক অবনীশ দত্ত, শোভনলালকে খুব স্নেহ করতেন। তাঁর বাড়িতে যে লাইব্রেরী ছিল, সেখানে শোভনলালকে পড়াশোনার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। সর্বোপরি শোভনলালের চরিত্রগঠনে অবনীশ দত্তের প্রভাব রয়েছে তা বলা যায়।

আবার শোভনলালের পক্ষে লাভ্যকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। উচ্চশিক্ষিত ছেলের জন্য শোভনলালের বাবার গর্ব হয়েছে। আবার দুস্তর মানসিক ব্যবধানের জন্য তার মনে একধরনের সঙ্কোচও তৈরি হয়েছে। অথচ তার এই সত্যটি জানা হয়ে গেছে, শোভনলাল, লাভ্যকে ভালোবেসে ফেলেছে। ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসের ষোল নম্বর পরিচ্ছেদে ‘মুক্তি’র প্রসঙ্গ এসেছে। ঐ পরিচ্ছেদে শোভনলাল, লাভ্যের উদ্দেশ্যে লিখেছে— “শিলঙে কাল রাতে এসেছি। যদি দেখা করতে অনুমতি দাও তবে দেখতে যাব। না যদি দাও কালই ফিরব। ...আজ এসেছি তোমার কাছে সেই কথাটি শোনবার জন্যে, নইলে মনে শান্তি পাই নে। ভয় কোনো না। আমার আর কোনো প্রার্থনা নেই।” অমিতের প্রেমের মহিমা দেখেও লাভ্য নতুন দিশা দেখতে পেয়েছে। তার সঙ্গে মেলামেশা করে জীবনকে সে নিজে উপলব্ধি করতে পেরেছে। কিন্তু লাভ্য যখন বুঝতে পেরেছে, অমিত তার সমগ্র জীবনকে চায় না, সে চায় জীবনের একটি দিককে। অপরদিকে শোভনলাল সমগ্র জীবন দিয়ে তাকে পেতে চেয়েছে। লাভ্য তাই শেষ পর্যন্ত ভালোবাসার ধন শোভনলালকেই, স্বামী হিসেবে গ্রহণ করবে বলে মনস্থির করেছে। সবশেষে বলা যায়, শোভনলাল চরিত্রটি শাস্ত প্রকৃতির। সেইজন্য শোভনলালকে লেখক শাস্ত করেই দেখাতে চেয়েছেন। আর লাভ্যের সঙ্গে শোভনলালের যে প্রেম-ভালোবাসা লেখক তা আড়ালেই রেখে দিয়েছেন। এভাবেই শোভনলাল চরিত্রটি “শেষের কবিতা” উপন্যাসে গুরুত্ব পেয়েছে।

৫.২.৫.৪.৩ : লাভণ্য

‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসের প্রধান নায়িকা চরিত্র লাভণ্য। পশ্চিমী কলেজের অধ্যক্ষ অবনীশ দত্তের মেয়ে লাভণ্য। ছোটবেলা থেকেই লাভণ্য ছিল মাতৃহীন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লাভণ্যর দেহের বর্ণনা দিয়েছেন—“তনু দীর্ঘ দেহটি, বর্ণ চিকন শ্যাম, টানা চোখ ঘন পক্ষছায়ায় নিবিড় স্নিগ্ধ, প্রশস্ত ললাট অব্যবহৃত করে পিছু হটিয়ে চুল আঁট করে বাঁধা, চিবুক ঘিরে সুকুমার মুখের ডৌলটি একটি অনতি পক্ষ ফলের মতো রমনীয়। জ্যাকেটের হাত কব্জি পর্যন্ত, দু-হাতে দুটি সরু প্লেন বালা।”

‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসে দৈনন্দিন জীবনের কাছাকাছি বর্ণনা পাওয়া যায় লাভণ্যর চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। ‘রবীন্দ্র উপন্যাসের নায়িকা’ গ্রন্থে, অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন— লাভণ্য যেন “সমুদ্র—মহু—উখিতা লক্ষী।” চারদিকের সব কিছু হতে স্বতন্ত্র। এই লাভণ্যময়ীকে বস্তু জগতের প্রবল চাঞ্চল্য ও প্রাণাবেগের মধ্যে ধরে রাখা যায় না। (পৃ. ৮০) সেইজন্য লাভণ্যকে, অমিত ধরে রাখতে পারেনি।

লাভণ্যর গলার কণ্ঠস্বর নিটোল। অল্প বয়সের বালকেরা যেমন কথা বলে, তেমনি লাভণ্যের গলা মসৃণ ও প্রশস্ত। অমিত ভেবেছিল, লাভণ্যের গলার সুরে একটি স্বাদ আছে, স্পর্শ আছে। লাভণ্য ছিল বুদ্ধিমতী মেয়ে। সেইজন্য পড়াশোনার বিষয়ে শোভনলালের সঙ্গে তার প্রতিযোগিতা বর্তমান। পিতা, অবনীশ দত্ত তাই মনে করতেন— “লাভণ্যের নাই বা হল বিয়ে, পাণ্ডিত্যের সঙ্গেই চিরদিন নয় গাঁটবাঁধা হয়ে থাকল।”

লাভণ্যকে দেখার পর অমিতের মনে হয়েছে—“লাভণ্যর সৌন্দর্য সকাল বেলায় মতো, তাতে অস্পষ্টতার মোহ নেই, তার সমস্তটা বুদ্ধিতে পরিব্যাপ্ত। তাকে মেয়ে করে গড়বার সময় বিধাতা তার মধ্যে পুরুষের একটা ভাগ মিশিয়ে দিয়েছেন, তাকে দেখলেই বোঝা যায় তার মধ্যে কেবল বেদনার শক্তি নয়, সেইসঙ্গে আছে মননের শক্তি।” সর্বোপরি লাভণ্য চরিত্রটি গোড়া থেকেই আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। কেবল যে তার রূপের গরিমা লেখক তুলে ধরেছেন তাই নয়, তার জীবন ধারণ পদ্ধতিতে বুদ্ধিমত্তারও পরিচয় দিয়েছেন।

লাভণ্য ও অমিতের প্রেম যে কোনদিনই মিলনে পূর্ণতা পাবে না তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানিয়েছেন। যোগমায়া যখন লাভণ্যকে বলেছে, অমিত—“তোমাকে ভালোবাসে। তার উত্তরে লাভণ্য বলেছে—“বিয়ে করে দুঃখ দিতে চাইনে। বিয়ে সকলের জন্য নয়।” কেন না বিয়ে করলে দুই জন নর-নারীকে সংসারের সব কিছু নিয়ম-কানন মেনে চলতে হবে। দু’জনের জীবন ধারণ পদ্ধতিতেও শুধু মানিয়ে নেওয়া ছাড়া আর কিছু নেই। তাই লাভণ্যর মনে হয়েছে নিয়মের যাতাকলে পারিবারিক জীবনে সংকট নেমে আসবে। অমিতের কাছে ধরা না দিয়ে ক্ষণকালের মায়া রূপেই লাভণ্য থেকে যেতে চেয়েছে। উপন্যাসে দেখা যায় লাভণ্য, অমিতের উদ্দেশ্যে পত্র লিখেছে—

“সব চেয়ে সত্য মোর সেই মৃত্যুঞ্জয়
সে আমার প্রেম’।

কিন্তু ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসে অমিতের সঙ্গে লাভণ্যের যে সম্বন্ধ, তা দেনা-পাওয়ার। সেইজন্য লাভণ্য, অমিতকে বলতে পেরেছিল—

হে ঐশ্বর্যবান,
তোমারে যা দিয়েছি সে তোমারি দান—
গ্রহণ করেছে যত ঋণী তত করেছে আমায়।”

শেষপর্যন্ত লাভণ্যের যুক্তি কাজ করল না, ফলে লাভণ্যকেও শোভনলালের সঙ্গে বাসা বাঁধতে হয়েছে। শোভনলালও লাভণ্যের ভালোবাসা পেয়ে তা গ্রহণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।

আমরা জানি, রবীন্দ্র উপন্যাসের নায়িকা মাত্রেই কল্যাণদাত্রী। ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসের লাভণ্য তার ব্যতিক্রম নয়। ‘বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’ গ্রন্থে, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—“লাভণ্য-অমিতের পরস্পর-লিখিত চিঠি দুইখানি তাহাদের মনোবৃত্তির শেষ পরিণতির সুন্দর বিশ্লেষণ।” (পৃ.১৮২) অমিতের মতো রোমাণ্টিক উদাসীন কবি লাভণ্যকে দূর থেকে ভালোবেসেছে। আবার লাভণ্যও শোভনলালকে জীবনে গ্রহণ করার পরিকল্পনা করেছে। সবশেষে একথা বলা যায়, রবীন্দ্র উপন্যাসের অন্যান্য নায়িকাদের মতো লাভণ্যকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মাধুর্যময়ী ও কল্যাণী নারী হিসেবে অঙ্কন করেছেন। এভাবে ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসে লাভণ্যকে একটি স্বতন্ত্র চরিত্র করে এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৫.২.৫.৪.৪ : কেতকী মিত্র

কেটি মিটারের আসল নাম কেতকী মিত্র। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসে আধুনিক অভিজাত সমাজের চিত্র তুলে ধরেছেন কেটি মিটারের চরিত্রের মধ্য দিয়ে। অবশ্য এই পরিবেশ-পরিস্থিতি থেকে লেখক কেটিকে বের করে আনতেও মনস্থির করেছেন। ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসে শোভনলাল ও কেটি মিটার চরিত্রগুলি ব্যক্তিত্ববান হিসেবে দাঁড়ায়নি। এরা নায়ক-নায়িকা তথা অমিত ও লাভণ্যের সঙ্গ দান করে গেছে মাত্র। পড়াশোনা করতে গিয়ে বিদেশে কেটিকেও অমিত প্রেম নিবেদন করেছিল। ভালোবাসার প্রমাণ স্বরূপ হাতে আংটিও পরিয়ে দিয়েছে। কেটি মিটারের চরিত্রে যে আধুনিকতার স্পর্শ পাওয়া যায়, বিদেশে পড়াশোনা করার সুবাদেই। আবার অমিতের অবহেলাতেও কেটি মিটার বিলেতিয়ানাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সব মিলিয়ে কেতকী মিত্র চরিত্রটি হয়ে উঠেছে আধুনিক সমাজের নতুন পথের দিশারী।

উপন্যাসে কেটি মিটার-এর পরিচয় প্রথম পাওয়া যায় ২৩নং পরিচ্ছেদে ‘আশঙ্কা’ পর্যায়ে। অমিত শিলং থেকে জিনিসপত্র সব রওনা করে দিয়েছে কলকাতার উদ্দেশ্যে। তারপর অমিত ডাকঘরে গেল চিঠিপত্র আছে কিনা জানার জন্য। তখনই জানতে পারল একটা টেলিগ্রাম আছে। টেলিগ্রামের বিষয় বস্তু হল—“আজই সন্ধ্যাবেলায় আসছে সিসি, আমার বোন, তার বন্ধু কেটি মিত্রের, আর তার দাদা নরেন।” ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসের চতুর্দশ পরিচ্ছেদে ‘ধূমকেতু’ পর্যায়ে আমরা কেটি মিটার সম্পর্কে কিছু তথ্য পেয়েছি। তার থেকে জানা যায় কেটি মিটারের চালচলন ওর দাদারই মতন। ভাবে-ভাষায়, জীবন ধারণ পদ্ধতিতে কেটি মিটার নিজেকে আধুনিক নারী হিসেবে পরিচয় দিয়েছে। “সাধারণ বাঙালি মেয়ের দীর্ঘ কেশ গৌরবের গর্বের প্রতি গর্ব সহকারেই কেটি দিয়েছে কাঁচি চালিয়ে, খোঁপাটা ব্যাঙাচির লেজের মতো বিলুপ্ত হয়ে অনুকরণের উল্লেখশীল পরিণত অবস্থা প্রতিপন্ন করেছে।” এরপর লেখক কেটি মিটারের পোষাক পরিচ্ছেদের বর্ণনা দিয়েছেন। জমিদারী আদব-কায়দায় মানুষ হয়েছে বলে তার জীবন-ধারণ পদ্ধতিতে কোন কৃপণতা ছিল না। কেটি মিটারের ঠোঁটদুটিতে সরল মাধুর্য ছিল তাও লেখক বর্ণনা করতে ভোলেননি। লেখক তার বেশভূষার বর্ণনা দিয়েছেন—“মোটের উপর চোখে পড়ে, উপরে একটা পাতলা সাপের খোলসের মতো ফুরফুরে আবরণ, অন্দের কাপড় থেকে অন্য একটা রঙের আভাস আসছে। বুকের অনেকখানিই অনাবৃত, আর অনাবৃত বাহুদুটিকে কখনো কখনো টেবিলের, কখনো চৌকির হাতায়, কখনো পরস্পরকে জড়িত করে যত্নের ভঙ্গিতে আলগোছে রাখবার সাধনা সুসম্পূর্ণ। আর, যখন সুমার্জিত নখররমণীর দুই আঙুলে চেপে সিগারেট খায় সেটা যতটা অলংকরণের অঙ্গরূপে ততটা ধূমপানের উদ্দেশ্যে নয়।”

পরবর্তীকালে আমরা উপন্যাস পাঠে জানতে পারি অমিতের সঙ্গে দেখা করার জন্য কেটি মিটার ও সিসি যোগমায়ার বাড়িতে হাজির হয়েছে। তারা জানতে পেরেছিল অমিত যোগমায়ার বাড়িতে যাতায়াত করে। যোগমায়ার বাড়িতে গিয়ে কেটি মিটার অমিতের খোঁজ করল। তারপর একটি সিগারেট ধরিয়ে খাওয়ার সময় ভাবতে থাকল—“লাবণ্যর ইতিহাসে একটা খুঁত আছে। যোগমায়াই মাসি সেজে অমিতের হাতে তাকে গছিয়ে দেবার কৌশল করছে। পুরুষ মানুষকে ঠকাতে অধিক বুদ্ধির দরকার করে না, বিধাতার স্বহস্তে তৈরি খুলি তাদের দুই চোখে পরানো।” চতুর প্রকৃতির কারণে অমিতকে জয় করা তার মূললক্ষ্য। তার জন্য যদি যোগমায়াকে ও লাবণ্যকে অপমান করতে হয়, তাও সে করতে রাজী।

কেটি মিটার রেগে গেছে। কেটির ব্যবহার অত্যন্ত কর্কশ, কেননা অধিকাংশ মানুষই তার দুর্ব্যবহারের কাছে হার মেনেছে। কেটি মিটার রুঢ়তাকে অকপটতা বলে বড়াই করেছে। অমিতের উদ্দেশ্যে কেটি মিটার বলেছে—“কমলালেবুর মধু নিয়ে তোমায় তো জিত হল, এবার আমারও যাতে হার না হয় সেটা করো।”

কেটি মিটারের চরিত্রে আরও পরিচয় পাওয়া যায় নরেনের সঙ্গে বাজি ধরায়। নরেনকে সে বলেছে, অমিতকে সঙ্গে নিয়ে রেসের মাঠে যাবে। বাজির শর্ত হিসেবে অমিতের দেওয়া আংটি তুলে ধরেছে। অমিতকে লক্ষ্য করে কেটি বলেছে—“অমিট তুমি জান, এই হীরের আংটি যদি হারি, জগতে আমার সান্ত্বনা থাকবে না। এই আংটি একদিন তুমিই দিয়েছিলে। এক মুহূর্ত হাত থেকে খুলিনি, এ আমার দেহের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। শেষকালে আজ এই শিলঙ পাহাড়ে কি একে বাজিতে খোয়াতে হবে।” কেটির বয়স যখন আঠের বৎসর, তখন অমিত ও কেটি মিটার দুজনেই ছিল ইংলণ্ডে। অক্সফোর্ডে একজন পাঞ্জাবী যুবক কেটিকে খুব পছন্দ করতো। সেদিন অমিত, সেই পাঞ্জাবী যুবকটির সঙ্গে নদীতে বাচ খেলেছিল ও অমিতই জয়ী হয়েছিল। সেদিন কেটির হাতে অমিত নিজের আঙুল থেকে আংটিটি খুলে পরিয়ে দিয়েছিল। কেটি তাই যোগমায়ার বাড়িতে লাবণ্যকে দেখার পর, অমিতকে জিজ্ঞাসা করেছে—“এমন অদ্ভুত করেই যদি হারাবে, সেদিন এত আদরে আংটি দিয়েছিলে কেন। সে দেওয়ার মধ্যে কি কোন বাঁধন ছিল না। এই দেওয়ার মধ্যে কি কথা ছিল না যে, আমার অপমান কোনোদিন তুমি ঘটতে দেবে না।”

এখন কেটি অনুভব করতে পেরেছে তার প্রতি অমিতের কোন আকর্ষণ নেই। তাই কেটির গলা ভার হয়ে এল, এবং অনেক কষ্টে চোখের জল সামলে হাতের আংটি খুলে টেবিলের উপর রেখে চলে গেল। সে যে অমিতকে ভালোবেসেছিল তা তার যন্ত্রনা কাতর মুখ দেখেই বোঝা যায়।

সতের নং পরিচ্ছেদে ‘শেষের কবিতা’ নামকরণে আমরা লক্ষ্য করি কেটিকে একেবারে স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। বন্ধুদের সে বলে দিয়েছে তাকে কেতকী বলে ডাকার জন্যে। যদিও অমিত তাকে আড়ালে ‘কেয়া’ বলেই ডাকে। কেটির প্রেমই এর জন্য দায়ী। তাই তার জন্মান্তর ঘটেছে। শহরে অনেকের মুখেই শোনা যাচ্ছে কেতকীর সঙ্গে অমিতের বিয়ে হওয়ার কথা। যতিশঙ্করের প্রশ্নের উত্তরে অমিত, কেতকীকে সম্মান করে বলেছে—“কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ায়-তোলা জল—প্রতিদিন তুলব, প্রতিদিন ব্যবহার করব। আর লাবণ্যর সঙ্গে আমার যে ভালোবাসা সে হইল দিঘি, সে ঘরে আনবার নয়। আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।” ‘বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’ গ্রন্থে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন— “কেটির তীব্র, উগ্র বিলাতী বাঁজ যে কিরূপে কেতকী-কুসুমের মৃদু, আদ্র সৌরভে পরিণত হইল। তাহার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা আমরা পাই না। যদি বলা যায় যে, এই অভাবনীয় পরিবর্তন প্রেমের অসাধ্য সাধনের, তাহার সোনার কাঠির ঐন্দ্রজালিক স্পর্শের

একটা নিদর্শন। তবে তাহা কবি কল্পনা বা অলৌকিক মাহাত্ম্যের বিষয় হইতে পারে।” তবে শেষপর্যন্ত অমিত, কেতকী মিত্রকে ভালোবেসে বিয়ে করেছে। এভাবেই কেতকী মিত্র অমিতের মন জয় করে পাঠকদের কাছে জীবন্ত হয়ে গেছে।

৫.২.৫.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

- ১। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
- ২। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
- ৩। রবীন্দ্র উপন্যাস সমীক্ষা—সত্যব্রত দে
- ৪। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)—ক্ষেত্র গুপ্ত
- ৫। রবীন্দ্র উপন্যাস পরিক্রমা—অর্চনা মজুমদার
- ৬। রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা : হৃদয়ে আঁকা ছবি—ববিতা কর

৫.২.৫.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

- ১। শেষের কবিতা উপন্যাস অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের পরিচয় দাও।
- ২। শেষের কবিতা উপন্যাসের নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।
- ৩। শেষের কবিতা উপন্যাসের অমিত চরিত্রের সার্থকতা বিচার করো।
- ৪। ‘অমিত বলে ফ্যাশানটা হলে মুখোশ, স্টাইলটা হলো মুখশ্রী’—উদ্ধৃত অংশটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।
- ৫। উপন্যাসের লাভণ্য চরিত্র সৃষ্টিতে লেখকের নৈপুণ্যের পরিচয় দাও।
- ৬। উপন্যাস হিসেবে ‘শেষের কবিতার’ গোত্রবিচার করো।

একক ৬

কবি—তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়

বিন্যাস ক্রম

- ৫.২.৬.১ : ভূমিকা
- ৫.২.৬.২ : কবি উপন্যাসের কাহিনী
- ৫.২.৬.৩ : নামকরণ
- ৫.২.৬.৪ : চরিত্র বিচার :
 - ৫.২.৬.৪.১ : নিতাইচরণ
 - ৫.২.৬.৪.২ : ঠাকুরবি
 - ৫.২.৬.৪.৩ : বসন্ত
- ৫.২.৬.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী
- ৫.২.৬.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৫.২.৬.১ : ভূমিকা

তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) ছিলেন বাংলা কথাসাহিত্যে স্বনামধন্য শিল্পী। রাঢ়বঙ্গের সুদক্ষ চিত্রকর তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাসের জগতে এক স্বতন্ত্র কারিগর। তাঁর উপন্যাসে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বাস্তব জীবনাশ্রয়ী প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর কথাসাহিত্যে মধ্যবিত্ত মানুষের বিবিধ সমস্যা, আর্থিক সংকট ও নিরাপত্তার অভাব লক্ষণীয় বিষয় ছিল। সেই পরিস্থিতিতে মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনে সর্বত্রই হাহাকার থাকা সত্ত্বেও তারা আশাহীন ছিলেন না। ‘বাংলা উপন্যাসের কালান্তর’ গ্রন্থে, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন— “শশী, অপু অথবা শিবনাথ কিংবা শঙ্কর, প্রত্যেকেই পরস্পরের থেকে দূরে হলেও এদের সমস্যার একটা সাধারণ উৎস বিদ্যমান ছিল। জীবন সম্পর্কিত আশা বা আদর্শকে রূপায়িত করতে পারা-না-পারা ব্যাপারটাই এদের জীবনের মুখ্য ব্যাপার। অপু শিশুচিন্তে সুদূরের আহ্বান, অথবা শশীর নগর-স্বপ্নের সঙ্গে গাওদিয়ার সংঘর্ষ কিংবা শিবনাথের ধরিত্রীকে চেনার বাসনা জীবন সম্পর্কিত আশা—আকাঙ্ক্ষারই প্রমাণ।” (পৃ.২৪২) তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় জানতেন, সময়ের অমোঘ নিয়মে সামন্ততন্ত্রের ভাঙন অনিবার্য। একদিকে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র অপরদিকে পশ্চিমী নগরতন্ত্র—এক ধনতান্ত্রিক সমাজ চেতনার বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বীরভূমের লাভপুর অঞ্চলের জমিদার পরিবারের সন্তান, কাহার, বাগদী, সাঁওতাল প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের জীবন কথাকে সাহিত্যে তুলে ধরেছেন।

আবার বীরভূম জেলাতে প্রবলভাবে প্রবাহিত বৈষ্ণবধর্মের ধারাও। একাল্পপীঠের একাধিক পীঠস্থান এই অঞ্চলে। বৈষ্ণবতীর্থ জয়দেব এর কেন্দ্র বিন্দু এই অঞ্চলের মানুষের রক্তে-মজ্জায়। আবার ঐ বীরভূমেরই নানুরে রয়েছেন স্বনামধন্য বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস। যিনি নিজে দাস হয়েও রচনাগুণে দাস করেছেন সকলকে। তাই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় সহাবস্থান ঘটেছে শ্যাম এবং শ্যামা দুইয়েরই।

বিশ শতকের তিনের দশকে বাংলা উপন্যাসে ব্যাপক হারে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। ঐ সময় মধ্যবিত্ত মানুষদের জীবন চেতনায় নানা দিক থেকে হতাশা প্রাধান্য পেয়েছে। ঐ সময় বাংলা সাহিত্যে তিনজন প্রধান ঔপন্যাসিকেও আমরা পেয়েছি। তাঁরা হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)। যাঁদেরকে একসঙ্গে ‘ত্রয়ী’ বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলা হয়। যখন আমরা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালী’ (১৯২৯) উপন্যাস, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হাঁসুলীবাঁকের উপকথা’ (১৯৪৭) উপন্যাস বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ (১৯৩৬) উপন্যাস পাঠ করি, তখন নতুন জগৎ ও জীবন সম্পর্কে পরিচিত হই। ‘বাংলা উপন্যাসের কালান্তর’ গ্রন্থে— সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন— “তিরিশের কাল বাঙালি মধ্যবিত্তের এই উপলব্ধির কাল যে, এই মধ্যবিত্তের ক্ষণস্থায়ী স্বর্ণযুগের অবসান ঘটেছে, গ্রামীণ মধ্যবিত্তের জীবন—রঙ্গমঞ্চে যবনিকা দুলছে, নতুন পালা নতুন করে বাঁধতে হবে। এইসময় এই তিনজন ঔপন্যাসিক তিন রকম ভাবে বাঙালি মধ্যবিত্তের কাছে অস্তিত্বের ভাষা ও বেঁচে থাকার মানে খুঁজে দেবার চেষ্টা করেছেন। অথচ তিনজনের মধ্যে একই সঙ্গে কাজ করেছে একটা বোধ, যার মূল কথা হল সঙ্কট। তারাশঙ্কর দেখিয়েছেন একটা শ্রেণীর সঙ্কট, বিভূতিভূষণ দেখিয়েছেন একটা অনুভূতির সঙ্কট, মানিক দেখিয়েছেন ব্যক্তির সঙ্কট অথবা জটিলতা। তারাশঙ্করের ইতিহাসবোধ, বিভূতিভূষণের প্রকৃতিবোধ ও মানিকের সমাজবোধ সেই জটিলতার ওপর আলো ফেলেছে”। (পৃ.২৪১)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলির মধ্যে যেমন লোকসংস্কৃতি ও লোকসংস্কার রয়েছে, তেমনি অকৃত্রিমতা ও ভাষার ঐশ্বর্যের পরিচয় হয়েছে প্রকাশিত। ঐ অঞ্চলে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের প্রাধান্য যেমন রয়েছে, তেমনি লোক ঐতিহ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। বীরভূমের মানুষদের সংস্কার, তাদের জীবনযাত্রা, সেখানকার রক্ষ-শুদ্ধ প্রকৃতি সবই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে উঠে এসেছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পগুলি হল— ‘রসকলি’, ‘জলসাঘর’, ‘তারিণী মাঝি’, ‘নারী ও নাগিনী’, ‘ডাইনী’, ‘পৌষলক্ষী’, ‘কালাপাহাড়’, ‘অগ্রদানী’, ‘বেদেনী’ প্রভৃতি। তিনি যেমন ছোটগল্প রচনা করেছেন, তেমনি উপন্যাস রচনা করে বাংলা সাহিত্যে সম্মানের শিরোপা পেয়েছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মধ্যে ‘নীলকণ্ঠ’ (১৯৩৩), ‘রাইকমল’ (১৯৩৪), ‘আগুন’ (১৯৩৭), ‘ধাত্রীদেবতা’ (১৯৩৯), ‘কালিন্দী’ (১৯৪০), ‘গণদেবতা’ (১৯৪২), ‘কবি’ (১৯৪৪), ‘পঞ্চগ্রাম’ (১৯৪৪), ‘মহন্তর’ (১৯৪৪), ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’ (১৯৪৭), ‘নাগিনী কন্যার কাহিনী’ (১৯৫১), ‘আরোগ্য নিকেতন’ (১৯৫২), ‘কালান্তর’ (১৯৫৬), ‘বিচারক’ (১৯৫৬), ‘সপ্তপদী’ (১৯৫৭), ‘রাধা’ (১৯৫৮), ‘উত্তরায়ণ’ (১৯৫৮), ‘মহাশ্বেতা’ (১৯৬০), ‘যোগভ্রষ্ট’ (১৯৬০), ‘ভুবনপুরের হাট’ (১৯৬৩), ‘মঞ্জুরী অপেরা’ (১৯৬৪), ‘গল্পা বেগম’ (১৯৬৪) প্রভৃতি।

৫.২.৬.২ : কবি উপন্যাসের কাহিনী

তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৪০ খ্রিঃ ‘কবি’ নাম দিয়ে একটি ছোটগল্প লিখেছিলেন। গল্পটি প্রথম ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে ‘কবি’কে গল্প থেকে উপন্যাসের রূপ দেন। ‘কবি’ উপন্যাসটি প্রথম ১৯৪৪ খ্রিঃ প্রকাশিত হয়েছিল।

তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় ‘কবি’ উপন্যাসের কাহিনী নির্বাচনে চোর-ডাকাত বংশের ছেলে নিতাইকে ‘কবি’ করে তুলেছেন। নিতাইকে অবশ্য কবি হয়ে ওঠার জন্য ব্যক্তিজীবন বিসর্জন দিতে হয়েছিল। বাপ-ঠাকুরদারা যে কাজ করতো, লোকের বাড়িতে চুরি করতো, নিতাই কিন্তু সে কাজ পছন্দ করেনি। তবে তার স্বভাব তার বাবা-কাকাদের মতো নয়। নিতাই সেই জীবন থেকে বেরিয়ে এসে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সমাজের মূল স্রোতে হাজির হতে চেয়েছে। অবশ্য সেই পথ অতিক্রম করতে নিতাইকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছিল। শেষপর্যন্ত নিতাই নিজের কৃতিত্বের জোরে বাবুদের দ্বারা প্রশংসাও পেয়েছে—‘তুই বেটা কবি—a Poet!’

তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় ডোম বলতে ‘কবি’ উপন্যাসে যাঁদের বুঝিয়েছেন, নিতাইচরণের পূর্বপুরুষ তা নয়। “ডোমেরা বাংলার বিখ্যাত লাঠিয়াল—প্রাচীনকাল হইতেই বাহুবলের জন্য ইহারা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। ইহাদের উপাধি হইল বীরবংশী।” বীরবংশীরা কোম্পানীর আমলে ডাকাতে পরিণত হয়েছে। আর এ অঞ্চলে বিখ্যাত ডাকাত হল গৌর ডোম। সে আবার সম্পর্কে নিতাইয়ের মাতামহ। গৌরের বাবা ছিলেন শম্ভু বীরবংশী। যিনি অনেকদিন আগে আন্দামানে দেহ রেখেছেন। আর নিতাইচরণের বাবা ছিল সিঁদেল চোর। উপন্যাসে দেখা যায়—“পিতামহ ছিল ঠ্যাঙাড়ে। নিজেই জামাইকেই নাকি সে রাঢ়ের অন্ধকারে পথিক হিসেবে হত্যা করিয়াছিল। জামাইমারীর মাঠ এখান হইতে ক্রোশখানেক দূরে।”

নিতাইচরণ যেখানে বসবাস করে, সেই গ্রামের প্রাচীন নাম অটুহাস। সেটি একান্ন মহাপীঠের অন্যতম মহাপীঠ। সেই মহাপীঠে এক অধিষ্ঠাত্রী দেবী থাকেন। তাঁর নাম মহাদেবী চামুণ্ডা। মাঘী পূর্ণিমার সময় সেখানে চামুণ্ডার পূজা হয়। সেই পূজা উপলক্ষ্যে মন্দির প্রাঙ্গণে মেলা বসে। মেলাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে জমজমাট কবিগানের পালাও গাওয়া হয়। এই অঞ্চলের দু’জন খ্যাতনামা কবিগান রচয়িতা হলেন, নোটনদাস ও মহাদেব পাল। তাঁরা এই আসরে কবিগান গাইবে বলে, মেলা কর্তৃপক্ষ আগাম জানিয়েছে। “কবিগানদের মধ্যে মহাদেবের দল আসিয়া আসরে বসিল, কিন্তু নোটনদাসের সন্ধান মিলিল না।” উপন্যাস পাঠে আমরা জানতে পারি নোটনদাস নগদ পনের টাকা প্রতি রাত্রে পাবে বলে অন্য কোথায় চলে গেছে, এখানে গান করতে আসেনি।

মহাদেব কবিগান একাই ক্ষিপ্ত জনগণকে কবিগান পাঠ করে শোনাতে বলে মনস্থির করেছে। কিন্তু তার সঙ্গে সহযোগিতার জন্য একজন ঢুলী ও দোয়ারের প্রয়োজন। ঠিক ঐ সময়েই নিতাইচরণের কথা মনে হল, ও আসরে নিতাইয়ের আবির্ভাব ঘটল। “নিতাইয়ের চেহারায় বংশের ছাপ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। দেহ কঠিন, পেশী দীর্ঘ সবল, রঙ কালো, রাত্রির অন্ধকারের মত। শুধু বড় বড় চোখের দৃষ্টি তাহার বড় বিনীত এবং সে দৃষ্টির মধ্যে একটি সঙ্কল্প বিনয় আছে। সেই নিতাই অকস্মাৎ কবিরূপে আত্মপ্রকাশ করিল।”

নিতাইচরণের গলাখানি বড় ভাল, তার উপর দোয়ারি করেও সুন্দর। তখন দর্শকসন থেকে অনেকেই হাততালি দিয়েছে, নিতাইয়ের প্রশংসা করেছে। গ্রাম্য অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কলকাতা প্রবাসী চাকুরে বাবুরা তখন গ্রামে এসেছেন, তারাও মেলা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠান দেখেছেন। নিতাইয়ের প্রশংসায় ওনারাও আশ্বস্ত। —“He is a

poet". সেই পরিস্থিতিতে মোহন্ত হেসে হেসে বলতে লাগলেন, নোটনকবি, কবিগান করতে এল না বলে, আমরা নিতাইয়ের গান শুনতে পেলাম। কেননা সবার মুখে তখন একই কথা—“ধুকুড়ির ভেতর খাসা চাল রে বাবা! রত্ন রে—একটা রত্ন—মানিকের বেটা মানিক!” কিন্তু নিতাইয়ের প্রশংসা শুনে মহাদেব কবিয়ালের ঈর্ষা হল। উনি তখন রঙ্গ-ব্যঙ্গ করে, গালি গালাজ করে নিতাইয়ের বিরুদ্ধে কবিগান গাইতে লাগলেন—

“সুবুদ্ধি ডোমের পোয়ের কুবুদ্ধি ধরিল।
ডোম কাটারি ফেলে দিয়ে কবি করতে আইল।।
ও-বেটার বাবা ছিল সিঁদেল চোর, কর্তা-বাবা ঠ্যাঙাড়ে।
মাতামহ ডাকাত বেটার-দীপান্তরে মরে।।
সেই বংশের ছেলে বেটা কবি করবি তুই।
ডোমের ছাওয়াল রত্নাকর, চিংড়ির পোনা রুই।।”

তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, মানুষের আবার জাতের অহংকার কিসের জন্য। ডোম পরিবারে জন্ম হয়েছে বলে নিতাই কবিগানের আসরে যেতে পারবে না বা কবিগান রচনা করতে পারবে না, তা তো নয়। লেখকের চোখে—“ডোম ও মানুষ বামনও মানুষ।”

উপন্যাস পাঠে আমরা জানতে পারি, নিতাইয়ের সখ-আহ্লাদ কিছু নেই। তার পূর্বপুরুষের ভিটে-মাটি ছেড়ে স্টেশনে রাজন পয়েন্টস্ম্যানের কাছে এসে বসবাস করতে শুরু করেছে। স্টেশনে কুলিগিরি করে যা অর্থ উপার্জন হয়, সেই দিয়েই কোনরকমে নিতাইয়ের জীবন চলে যায়। সত্যি-সত্যিই নিতাই একজন সাচ্চা ভালো মানুষ। উপন্যাসে দেখা যায়—“আজ্ঞে প্রভু, চুরি জীবনে আমি করি নাই। মিছে কথাও আমি বলিনা হুজুর, নেশা পর্যন্ত আমি করি না। জাত-জাত মা ভাইয়ের সঙ্গেও এইজন্যে বনে না আমার। ঘর তো ঘর, আমি পাড়া পর্যন্ত ত্যাগ করেছি একরকম।” কারণ নিতাই এর মামা গৌরচরণ এসব ভালোমানসিকতা একদম পছন্দ করতেন না। তিনি মনে করতেন নিতাইও তাদের মতো চুরি-ডাকাতি করবে। লেখাপড়া করে কি আর করবে। গৌরচরণ হঠাৎ একদিন নিতাই এর বই-খাতা পর্যন্ত ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। আর নিতাই তা সহ্য করতে না পেরে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। তারপর গৌঁসাইজীর বাড়িতে থাকবে বলে হাজির হয়। কিন্তু সেখানেও নানারকম অন্যায় দেখে সেই বাড়ি ত্যাগ করল। কেননা সে মুখ্য মানুষ, তার কথার কে গুরুত্ব দেবে। কিন্তু নিতাই যে মা চণ্ডীর সামনে দাঁড়িয়ে স্বীকার করেছে সে জীবনে কোনও অন্যায় কাজ করবে না। তাই গৌঁসাইদের বাড়ি ছেড়ে রাজেনের কাছে স্টেশনে এসে উপস্থিত হল।

বন্ধু রাজন এর সঙ্গে নিতাই স্টেশন চত্বরে থাকতে থাকতে তার বউয়ের বোন ঠাকুরঝির সঙ্গে পরিচয় হয়। রাজন যেমন শ্যালিকাটিকে ঠাকুরঝি বলে, তেমনি নিতাইও তাকে ডাকে ঠাকুরঝি। নিতাই প্রতিদিন ঠাকুরঝির কাছ থেকে এক পোয়া দুধ নেয়। ঠাকুরঝি দেখতে কালো হলে কি হবে, মেয়েটি বড় ভালো মনের। উপন্যাসে দেখা যায়—“কালো যদি মন্দ তবে বেশ পাকিলে কাঁদ কেনে?”

তখন নিতাইচরণ মনে করিয়ে দেয়, কৃষ্ণকে দেখতে কালো, কোকিলও কালো রঙের। এমনকী মানুষের মাথার চুলও কালো। তাই ওসব না ভেবে যার যেটা কর্ম, করে যাও তাহলে সংসারে সুখ মিলবে। কেননা ‘সংসারের সুখ ভালোবাসায়, মিষ্টি কথায়’। সেই পরিস্থিতিতে নিতাই, ঠাকুরঝির হাতে দুটি গাঢ় রাঙা কৃষ্ণচূড়ার

ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছে—“নাও। কবিরায়ের হাতে ফুল নিতে হয়।” নিতাই ও ঠাকুরঝির জীবন ধারণ পদ্ধতি থেকে স্পষ্ট প্রমানিত হয় তারা দু’জন—দু’জনকে ভালোবাসে। ঠাকুরঝি বিবাহিত নারী হলেও তাতে দোষের নয়। কেননা অবাধ্য মন কিছুতেই তা মেনে নিতে চায়না। তাই নিতাইয়ের কাছে ঠাকুরঝি চাঁদের মতো। তাকে না দেখলে নিতাইয়ের মন ছটফট করে। কিন্তু উপন্যাসের পরিণতিতে দেখা যায়, নিতাই ঠাকুরঝিকে শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারেনি। এমনকী যেদিন নিতাই কাশী চলে গেল, আর গ্রামে ফিরে আসবে না। সেই কথা শুনে ঠাকুরঝি মারা গেল। তখন ঠাকুরঝি আকাশের চাঁদ হয়েই নিতাইয়ের মণিকোঠায় থেকে গেছে।

আবার উপন্যাস পাঠে আমরা জানতে পারি, নিতাই যেখানে গেছে, সেখানেই দু’একখানা করে বই কিনেছে। কবিগান, পাঁচালী, তর্জার গান, রামায়ণ, মহাভারত, মনসার ভাসান ইত্যাদি বই নিতাই এর দপ্তরে পাওয়া যায়। এমনকী নিতাই যে গান রচনা করে, তাও সে খাতায় লিখে রাখে। নিতাই নীচু কুলে জন্ম নিলেও তার জীবন ধারণ পদ্ধতি উচ্চ মানের। তাই নিতাই এত সব ভেবে মনকে ভারাক্রান্ত করতে চায় না।—“মনের বিকারে এমন সুন্দর পৃথিবীর উপর রাগ করে মানুষ আত্মহত্যা করে মরে। আর বেশ্যা? বাবা, চিন্তামণি বেশ্যা—সাধক বিশ্বমঙ্গলের প্রেমের গুরু।”

‘কবি’ উপন্যাসে আরেকজন মহিলার কথা আমরা জানতে পারি, সে হল বসন্ত। সবাই তাকে বসন বলে ডাকে। বসন্ত নিম্নশ্রেণীর দেহ ব্যবসায়িনী। বুঝুর দলের মেয়ে হয়ে তাকে ঘুরতে হয়, সেইজন্য তার কোন লজ্জা নেই। বীরবংশীয় সন্তান নিতাই, বসনকে ভালোবেসে ফেলেছে। তবে নিতাই, বসন্তকে ভালোবাসলেও ঠাকুরঝি কে ভুলিল না। উপন্যাসে দেখা যায়—

“বঁধু তোমার গরবে গরবিনী হাম গরব টুটাবে কে।

তোজি’ জাতি-কুল বরণ কৈলাম তোমারে সঁপিয়া দে”।

নিতাইয়ের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকে বসন আর অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে না। তবে আসরে মন দিয়ে নৃত্য পরিবেশন করে। তার নৃত্য দেখে লোকেও মুগ্ধ হয়। আবার অর্থনৈতিক সংকটের কারণে, বসন কান্না-কাটি করলে, নিতাই খুব কষ্ট পায়। নিতাই পরিবেশ-পরিস্থিতি বিচার করে বসন্তকে কথা দিয়েছিল, তাকে ছেড়ে সে কোথাও যাবেনা। “বসন্তকে লইয়াই এ জীবনটা সে কাটাইয়া দিবে। এই তো কয়দিনের জীবন। কয়টা দিন। ইহার মধ্যে বসন্তকে ভালবাসিয়াই কি ভালবাসার শেষ করিতে পারিবে সে?”

এরপর নিতাই নতুন একটা গান বেঁধেছে, তারপর সেই গান বসন্তকে শোনানো হল। গান শুনে বসন্তের মন খারাপ।

“এই খেদ আমার মনে মনে।

ভালবেসে মিটল না আশ-কুলাল না এ জীবনে।

হায়, জীবন এত ছোট কেনে!

এ ভুবনে?”

বসন্ত, এ গান শোনার পর কষ্ট পেয়েছিল। সে তখন নিতাইকে বলেছে, আমি তো ভাল আছি। তবু কেন তোমার মনে হল জীবন এত ছোট কেন। “বাংলা উপন্যাসের কালান্তর’ গ্রন্থে— সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন— “কবি উপন্যাসে তারাশঙ্কর নিতাই, ঠাকুরঝি ও বসনের ত্রিভুজে জীবনের যে প্রাকৃত অপ্রাকৃত বেগ ও শ্রীকে বেঁধেছেন তা তাঁর অন্য উপন্যাসে দুর্লভ।” (পৃ.২৫৭)

বসন যেহেতু ঝুমুর গানের সঙ্গে যুক্ত ছিল, তাই তাদের দলকে এখানে-ওখানে যেতে হতো। তার উপর খাওয়া-দাওয়ার কোন নিয়ম ছিল না। বসন আবার খুব মদ্যপান করতো। নিতাইও পারেনি, বসনকে মদ খাওয়া থেকে বিরত থাকতে। তার ফলে বসনের মৃত্যু হয়েছে, তখন নিতাইয়ের গানটা বসনের জীবনে সত্যি হয়ে ধরা পড়েছে “হায়! হায়! বসন কি মরিয়া শান্তি পাইয়াছে? এ জগতের যত তাপ-যত অতৃপ্তি সব কি ও জগতে গিয়া জুড়াইল? জীবনে যা পাওয়া যায় না—মরণে কি তাই মেলে?” এর পর একরাশ হতাশা নিয়ে নিতাই ঝুমুরের দল ত্যাগ করে কাশী চলে গেল। সেখানে এক মা তাকে যা শেখালেন, তাতে তার চেতনা ফিরে এল। সেই মা নিতাইকে বললেন—“সুখ সংসারে মেলে না বাবা। যদি মেলে, যদি বিশ্বনাথ দেন তো তোমার আপন কাজের মধ্যেই পাবে।” নিতাই কবিরাল মানুষ। তাই কম বয়সে কাশীতে সময় নষ্ট করা উচিত হবে না। মায়ের পরামর্শে নিতাই কাশী থেকে বিদায় নিয়েছে, তারপর দেশের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে—“তুমি কবিরাল—গান গাইবে—লোককে আনন্দ দেবে, হাসাবে, কাঁদাবে, মেডেল পাবে, কত লোক প্রশংসা করবে—তবে তো তোমার আনন্দ হবে, সুখ হবে।”

সত্যিই তো নিতাই কবিরাল মানুষ। তাই কবিগান করে, কবির দল তৈরি করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া উচিত। সেইজন্য সে ভালোবাসার গানকেই বড় করে দেখবে এবং বাকি জীবনটা গানকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকবে। নিতাইয়ের লক্ষ্য বিভিন্ন ধর্মস্থানে, বিশেষতঃ তারকেশ্বরে-কালীঘাটে গিয়ে মানুষকে গান শুনিয়ে আনন্দ দেওয়া। এইভাবনা থেকে নিতাই বাড়ি ফিরে চণ্ডীতলায় মা চণ্ডীকে প্রণাম করতে গিয়ে মা কে জিজ্ঞাসা করে বসলেন—

“বসন্তকে হারাইয়া সে বুঝিতে পারিয়াছে সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া এই একই খেদ। জীবন এত ছোট কেনে?” তার কোন উত্তর নেই। আসলে লেখক তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনদর্শনের মধ্যে দিয়ে আমরাও সেই সত্যে উপনীত হতে পারি যে, এই সংকটের মুখোমুখি আমরা সকলে। মানুষ শুধু শুধু বগড়া করে, আমার-আমার করে মারা মারি করে। কিন্তু এই পার্থিব জগতে সবার সঙ্গে পরিচয়ে ভালো ব্যবহারই আসল লক্ষ্য। নিজের কর্মের মধ্যে দিয়ে সেই সুন্দর মানসিকতার পরিচয় প্রদানই প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হওয়া উচিত। কেননা এই ছোট জীবনে, কয়দিনের দেখাশোনায়ে হিংসাভুলে মানুষের মনের সবুজতা প্রকাশই গুরুত্বপূর্ণ। উপন্যাসের কাহিনীর অগ্রগতিতে তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় নিতাই চরিত্রের মধ্যে দিয়ে সেই জীবন আর্তিটি পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন।

৫.২.৬.৩ : উপন্যাসের নামকরণ

‘কবি’ (১৯৪২) তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অসংখ্য ছোটগল্প ও উপন্যাসে বীরভূমের নানা উপেক্ষিত সম্প্রদায়ের ছবি এঁকেছেন। গল্প ও উপন্যাসের প্রাপ্ত চরিত্রগুলি লেখকের চোখে দেখা ঐ বীরভূম জেলায় বসবাসকারী বৈষ্ণব, বেদে, কাহার, বাগদী, সাঁওতাল, লাঠিয়াল ও মাঝি প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত শ্রেণীর। তাদের কেউ সাপ খেলা দেখায়, কেউ মানুষকে ডিঙিতে করে নদী পার করে দেয়। কেউ বা কবিগান করে, কেউ আবার চাষ-বাস করে। এই সব বৃত্তিধারী সম্প্রদায়ের প্রতি লেখকের আন্তরিকতা ছিল। তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে ঐ সব জীবিকার মানুষেরা উপাদানের বৈচিত্র্য হিসেবে বারবার উঠে এসেছে।

আমরা জানি, বিভিন্ন শিল্প মাধ্যমের নামকরণ নানাভাবে হতে পারে। বিষয় ভিত্তিক, চরিত্র ভিত্তিক ও রূপক

সাংকেতিক উপায়ে নামকরণ হয়ে থাকে। আমাদের আলোচ্য তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কবি’ উপন্যাসের নায়ক নিতাইচরণের, নিতাই কবিরায়াল হয়ে ওঠার কাহিনী প্রাধান্য পেয়েছে। নিতাইচরণ, সিঁদেল চোরের পুত্র হয়েও কোনদিন চুরি করেনি। নেশা পর্যন্ত করে না, সে খুব ভালছেলে। বীরবংশী উপাধির পিছিয়ে পড়া মানুষ হয়েও নিতাই শিল্পী হতে চেয়েছে। তাদের সমাজের লোকজ প্রথা, লোক সংস্কার ত্যাগ করে নিতাই হয়ে উঠতে চেয়েছে কবিরায়াল। তারজন্য নিতাইচরণকে প্রচুর সংগ্রাম করতে হয়েছে। উপন্যাসে দেখা যায় —“রোজ সন্ধ্যায় নিতাইচরণ বইয়ের দপ্তর বগলে করিয়া কালি পড়া লণ্ঠন হাতে নাইট ইঙ্কুলে চলিয়াছে।” তখনকার দিনে সমাজের যারা নিরক্ষর মানুষ, তাদের জন্য সরকার থেকে অনুদান দেওয়া হতো নাইট স্কুল পরিচালনার জন্য। এখন যেমন সরকার স্কুলের সব শ্রেণীর মানুষের জন্য মিড ডে মিল চালু করেছে। ‘কবি’ উপন্যাসে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে অতীতকে বাদ দিয়ে বর্তমানের আনন্দ বেদনার রোম্যান্টিক আলেখ্য রচনা করা হয়েছে। নিতাই কবিরায়ালের পথ চলার কাহিনীতে ‘প্রেম ও বিরহ-বেদনার সম্মিলন ঘটেছে।

নিতাইচরণের শুধু কবিগান নয়, যাত্রাগান, মেলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ ভাললাগার বিষয় ছিল। তার যেমন ভালোলাগে নানা রকমের বই সংগ্রহ করতে, তেমনি রাস্তায় হাঁটার সময় ছেঁড়া কাগজ ও বইয়ের পাতাও সংগ্রহ করে রাখতো। নিতাই, জীবনকে এইভাবেই পরিচালনা করতে পছন্দ করে। তাই তার যা ভালো লাগে না, সে কাজ জোর করেও করে না। উপন্যাসে দেখা যায়—“যাহা ভাল লাগে তাহাই সে সযত্নে রাখিয়া দেয়। বইয়ের সংগ্রহ তাহার কম নয়, কুন্ডিবাসী রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কৃষ্ণের শত নাম, শনির পাঁচালী, মনসার ভাসান, গঙ্গামাহাত্ম্য।” নিতাইচরণের অপ্রাপ্যকে পাওয়ার জন্য যে আকৃতি, অচেনার জন্য যে বিস্ময়-বিমুগ্ধ ভালোবাসা-তা তার রোম্যান্টিক স্বপ্ন ঠিকই। আবার চণ্ডীমণ্ডপ কেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থার বাইরে যে জগৎ রয়েছে। তার সঙ্গে পরিচিত হওয়া নিতাইকে অন্য জীবনের সন্ধান দিয়েছে। তবে সেই পথ অতিক্রম করতে নিতাইকে অনেক সাধনা করতে হয়েছে।

নিতাইচরণ থেকে নিতাই কবিরায়াল হয়ে ওঠার জন্য সে পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি যেমন ত্যাগ করেছিল, তেমনি কুলিগিরি করা ছেড়ে দিয়েছিল। কেননা কুলিগিরি করে অর্থ উপার্জন করলে লোকে ভাল বলবে না। তখন কেউ বলবে ঐ দেখ—“কবি মোট বহন করছে”। সেই পরিস্থিতিতে নিতাই দু’বেলা খাওয়ার পরিবর্তে একবেলা খেয়ে থাকবে, তাও ভাল। “ভগবান যখন আমাকে কবি করেছেন, তখন—! নিতাই বারবার অস্বীকারের ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়িল, অর্থাৎ না-না-না! তখন সে মাথায় করিয়া মোট আর বহিবে না।” সেই দিক থেকেও উপন্যাসের নাম ‘কবি’ হওয়া সার্থক।

উপন্যাসিক তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ‘কবি’ উপন্যাসে বীরভূমের কবিরায়াল সম্প্রদায়ের এক অতি মনোজ্ঞ ও পূর্ণাঙ্গ ছবি এঁকেছেন। নিতাইচরণ তাদের অঞ্চলের প্রসিদ্ধ কবিরায়াল তারণ মণ্ডলের মতো কবি হতে চায়। কেননা তারণ মণ্ডল যদি বেঁচে থাকতেন, তাহলে নিতাইচরণ তাকেই গুরু বলে স্বীকার করতো। এমনকী নিতাইচরণ প্রায়ই স্বপ্ন দেখতো, কত লোক তারণ মণ্ডলকে প্রশংসা করছে; হাততালি দিচ্ছে। নিতাইয়ের সেই স্বপ্ন এখন সার্থক হয়েছে। অনেক জীবন সংগ্রাম ও সাধনার মধ্যে দিয়ে নিতাই ঐ অঞ্চলের মানুষের মন জয় করে নিতে চেয়েছে। শহরের চাকুরে বাবুটি পর্যন্ত প্রশংসা করে নিতাইকে বলেছেন— "You are a poet" তুই তো একজন কবি রে। সেই দিক থেকেও উপন্যাসের নাম ‘কবি’ হওয়া যুক্তিযুক্ত।

আবার নিতাইচরণের শিল্পী হয়ে ওঠার পেছনে দুটি নারীর কথা অবশ্যই বলতে হবে। তারা হলো ঠাকুরঝি

ও বসন্ত। দু'জনকেই নিতাই ভালোবেসেছিল। নিতাইয়ের চলমান জীবনে মৃত্যু এসে সবকিছু লগুভগু করে দিয়েছে। জীবনছন্দে বিশ্বাসী হয়েও নিতাইকে সংকটে আবদ্ধ হতে হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে নিতাইচরণ বলেছে—

“এই খেদ আমার মনে—

ভালবেসে মিটল না সাধ, কুলাল না এ জীবনে

হায়-জীবন এত ছোট কেনে?

এ ভুবনে?”

উপন্যাস পাঠে আমরা জানতে পারি বসন্তের মৃত্যুর পর জীবন সম্পর্কে নিতাইয়ের অনীহা প্রকাশ পেয়েছে। শেষ পর্যন্ত সে কাশীতে চলে গেছে। কাশীতে যাওয়ার পর সেখানের জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেনি। তখন সে আবার নিজের গ্রামেই ফিরে এসেছে। নিতাইয়ের জীবনাভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছে সুখ সংসারের কোথাও নেই, সর্বত্রই সংকট ও হাহাকার। এ জগতের যত অতৃপ্তি, বিরহ-বেদনা সবই পূর্ণতায় ভরে উঠে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে। তাই এই জগতে যেটুকু আনন্দ ও শান্তি রয়েছে, তা নিজের আপন কাজের মধ্যে। “নিতাইয়ের কবিরায়ের খ্যাতি দেশে সকলেই শুনিয়েছে, তাহার জন্য সকলে তাকে শ্রদ্ধা না হোক প্রশংসাও করে মনে মনে।” শিল্পী নিতাই কবিরায় সেই জীবনের মানে ঠিকই বুঝতে পেরেছে। এখানে ব্যক্তি নিতাইচরণের পরিবর্তে শিল্পী নিতাইকে লোকে মনে রেখেছে। ‘বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’ গ্রন্থে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—“কবি উপন্যাসে একটি নিম্নশ্রেণীর প্রতিনিধির মধ্যে কবিত্ব শক্তি স্ফুরণের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। নিতাই কবি, সমস্ত সত্যিকার কবির মত, স্বাভাবিক সুরটি ও সুকুমার অনুভূতির অধিকারী” (পৃ.৫৪৮)। সেই অর্থে উপন্যাসের নামকরণ ‘কবি’ যথোপযুক্ত হয়েছে।

৫.২.৬.৪ : চরিত্র বিচার

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন তপশিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষদের জীবনচিত্র বর্ণনা করেছেন তাঁর কথাসাহিত্যে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মানব জীবনের প্রবৃত্তির লীলা দেখেছেন। এ প্রবৃত্তি যেমন জৈবিক, তেমনি আদিম, সভ্যদৃষ্টিতে যা অশোভনীয় ও কদাকার। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূমের মাটি, প্রকৃতি— মানুষকে বাস্তবানুগ করে তুলেছেন। এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই তাঁর মূল ধন। চরিত্র নির্মাণে মানব প্রকৃতির অসংবৃত রূপকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেননি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ‘কবি’ উপন্যাসে প্রধান তিনটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে কাহিনীর বিস্তার ঘটিয়েছেন। উপন্যাসটিতে নিতাইচরণ, ঠাকুরবি, বসন্ত চরিত্র অঙ্কনে কোনও দার্শনিক চিন্তা ভাবনা লেখকের মনকে প্রভাবিত করেনি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সহজ-সরল ভাবে অন্যান্য উপন্যাসের মতো ‘কবি’ উপন্যাসেও জীবনের প্রবাহকে তুলে ধরেছেন। রাঢ়ের ভৌগোলিক সীমার মাঝখানে যে জীবন ছবি তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাকেই আমদানি করেছেন তাঁর গল্প ও উপন্যাসে।

৫.২.৬.৪.১ : নিতাই

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কবি’ (১৯৪২) উপন্যাসের নায়ক নিতাই। সে নিম্নবিত্ত সমাজের সন্তান। ‘যে বংশে নিতাইচরণের জন্ম, সে বংশটি হিন্দু সমাজের প্রায় পতিততম স্তরের অন্তর্গত ডোমবংশ।’ নিতাইয়ের বাবা

ছিল সিঁদেল চোর। আর পিতামহ ছিল ঠাণ্ডাড়ে। নিতাইয়ের জামাইবাবু— “এ অঞ্চলের বিখ্যাত দাঙ্গাবাজ লাঠিয়াল। রাত্রে ডাকাতি করে, গোপনে মদ চোলাই করিয়া বিক্রম করে, ভাঙ্গা ঘরে বসিয়া পাকী মদ খায় ও সের দরুণে মাছ কেনে। নিতাইয়ের মা শুধু ভাতের জন্য নয়—এই পাকী মদ ও মাছের প্রলোভনেই সেখানে এখন বাস করিতেছে।” নিতাইচরণ গ্রাম্য, ডোম সমাজ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। তারপর শিক্ষা-দীক্ষায় ও জীবন-ধারণ পদ্ধতিতে নিজের মতো করে বাঁচতে শিখেছে। ‘বাংলা উপন্যাসের কালান্তর’ গ্রন্থে, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন— “নিতাইয়ের জীবন বৃত্তের দুই অংশ-ঠাকুরঝি ও বসন নিজেরাই যেন নিতাইয়ের পটভূমি। ঠাকুরঝি ও বসন নিতাইয়ের কাছে জীবনের দুই রূপের সম্মান দিয়েছে। (পৃ.২৫৬)

নিতাই বিভিন্ন ধরনের বই পড়তে ভালোবাসে। তেমনি তার বইয়ের সংগ্রহও প্রচুর। তবে নিতাইয়ের আসক্তি অন্যরূপ লক্ষ্য করা যায়। সে বিভিন্ন পুরাণ কাহিনী ও কবিতার ছন্দ মিল লক্ষ্য করে পড়াশোনা করে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালী’ (১৯২৯) উপন্যাসে একটি শিশুর (অপুর) বড় হয়ে ওঠার কাহিনী প্রাধান্য লাভ করেছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘অপু’ এবং তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিতাইচরণের মধ্যে পার্থক্য আছে। সেই জীবন জিজ্ঞাসার উত্তর ‘কবি’ উপন্যাসের নিতাইয়ের মধ্যে পাওয়া যায় না। নিতাই কাশীতে গেলেও উপন্যাসের শেষেরদিকে আবার নিজের গ্রাম, চণ্ডীতলাতে ফিরে এসেছে। উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়— “তুমি কবিয়াল—তুমি দেশে ফিরে যাও বাবা। চমৎকার তোমার গলা। গানও তোমার ভাল। দেশে তোমার কদর হবে।”

উপন্যাসের শেষে নিতাইচরণ গ্রামে ফিরে এসেছে। তবে আগের নিতাইচরণ নয়, শিল্পী নিতাই কবিয়াল। এখন আর ডোম বংশের পূর্বপরিচিতি নিয়ে সে বাঁচবে না, সে মাথা উঁচু করে শিল্পী হয়ে বেঁচে থাকবে। ‘বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’ গ্রন্থে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন— ‘নিতাই-এর চরিত্রে তাহার হীনজাতি ও বিনয় কুণ্ঠিত আচরণের মধ্য দিয়া চরিত্র গৌরব এবং কবির মানস আভিজাত্য ও অতৃপ্তি চমৎকার ফুটিয়াছে।’ (পৃ. ৫৪৯) সাহিত্যিক তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার মধ্যে এমন কিছু কাহিনী, চরিত্র আছে যা ঐ নির্দিষ্ট অঞ্চল থেকে উঠে এসেছে। লেখকের উপন্যাস ও ছোটগল্পের চরিত্রগুলি লেখকের নিজস্ব রচনাগুণে নূতন বৈশিষ্ট্যে উদ্ভীর্ণ হয়েছে। ‘কবি’ উপন্যাসের নিতাইচরণ চরিত্রটির মধ্যে আমরা শিল্পীসত্ত্বার মানুষকে দেখতে পেয়েছি। যদিও চরিত্রটি বিবর্তিত হলেও উপন্যাসের কাহিনীর প্রয়োজনে আবার নিজের গ্রামেই ফিরে এসেছে। শেষ পর্যন্ত রাড়ের পরিবেশে এক জীবন্ত সত্য হিসেবে নিতাই কবিয়াল আত্মপ্রকাশ করেছে।

৫.২.৬.৪.২ : ঠাকুরঝি

নিতাইয়ের পরম বন্ধু ছিল, স্টেশনের পয়েন্টস্ম্যান রাজেন। রাজেনের বউয়ের বোন হল ঠাকুরঝি। তার বয়স প্রায় ষোল-সতের বছর। ঠাকুরঝির দেহখানি শুধু লতার মত নয়, তার মনও দীঘল দেহের অনুরূপ। “ঠাকুরঝির সর্বাস্থে কচিপাতার মত যে একটি কোমল ঘনশ্যাম শ্রী আছে।” তা তাকে দেখলে বোঝা যায়।

ঠাকুরঝি পাশের গ্রামের বউ। তার স্বশুর বাড়িতে অনেকগুলি গাই-গরু আছে। তাদের রোজ দেখাশোনা করাই তার কাজ। তারপর গাইয়ের দোয়া দুধ নিয়ে বিক্রি করতে যায় পাশের গ্রামে রেলস্টেশনে। সেই সূত্রেই ঠাকুরঝির সঙ্গে নিতাই এর পরিচয়। “নিতাই নিজেও তাহার কাছে একপোয়া করিয়া দুধের ‘রোজ’ লইয়া থাকে।”

ঠাকুরঝি মেয়েটি বড় ভালো। কেননা সে অল্পেতেই রেগে যায়না, দুঃখ প্রকাশও করে না। ঠাকুরঝির নমনীয়তা তার স্বভাবজাত গুণ। কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে?” নিতাই কবিরালের এই গান শুনে ঠাকুরঝি নিতাইয়ের দিকে বিস্ময়ে তাকিয়েছিল। ঠাকুরঝির গায়ের রঙ কালো বলে তার মনে কোন হীনমন্যতা ছিল না। শেষপর্যন্ত নিতাই কবিরাল ঠাকুরঝিকে ভালোবেসে ছিল। উপন্যাস পাঠে আমরা জানতে পারি, নিতাই ঠাকুরঝির জন্য একটি হার নিয়ে এসেছিল—“হারখানির ছোঁয়ায় বুকের ভিতরটা তাহার থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, বসন্ত দিনে দুপুরের বাতাসে অশ্বখগাছের নূতন কচিপাতার মত”। নিতাই যে কত বড় কবিরাল, তা ঠাকুরঝি জানে, কেননা নিতাই এর গান সে শুনেছে। নিতাইয়ের প্রেমে ঠাকুরঝিও ভরসা করেছে। নিতাই কাশী চলে গেলে, আর গ্রামে ফিরে আসবে না শুনে পরবর্তীকালে ঠাকুরঝি মারা গেছে। তখন নিতাই কবিরাল আপন মনেই বলতে পেরেছে—“আকাশের চাঁদ তুমি আমার ঠাকুরঝি, তুমি আকাশেই থাক।” সর্বোপরি বলা যায় ঠাকুরঝি চরিত্রটি আমাদের আকর্ষণ করেছে। ‘কবি’ উপন্যাসের কাহিনীর শোভা বর্ধনকারী হিসেবে ঠাকুরঝি চরিত্রটির গুরুত্বও আছে।

৫.২.৬.৪.৩ : বসন্ত

তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কবি’ উপন্যাসের একটি অন্যতম নারী চরিত্র ‘বসন্ত’। লোকে তাকে বসন বলেও ডাকে। ঝুমুর দলের মেয়েটির নাম বসন্ত। সে ‘নিম্নশ্রেণীর দেহ ব্যবসায়িনী’। ঝুমুর দলের মেয়ে হয়েও তাকে এ কাজ করতে হয়েছে। অর্থনৈতিক সংকটের কারণে বসন এ পথে অর্থ উপার্জন করতে বাধ্য হয়েছে। ঝুমুরের দলকে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতে হয়, গাছ তলায় আস্তানা পাতে হয়। “কেহ বায়না না করিলেও সন্ধ্যার পর পথের ধারে নিজেরাই আসর পাড়িয়া গান-বাজনা আরম্ভ করিয়া দেয়। মেয়েরা নাচে, গায়-অল্লীল গান। ভনভনে মাছির মত এ রসের রসিকরা আসিয়া জমিয়া যায়”। মেয়ে-পুরুষের ঝুমুরের দলটিতে বসন গায়িকা হিসেবে কাজ করে। প্রজাপতি বৃত্তিই বসনের মূল প্রবৃত্তি। এই বহুভোগ্যা নারীর বাসনা সর্বস্ব ভালোলাগা, ভালোবাসার বিবরণই ধরা পড়েছে ‘কবি’ উপন্যাসটিতে।

বসনের দেহের বর্ণনা দিয়েছেন লেখক এইভাবে—“দীর্ঘ কৃশতনু গৌরাঙ্গী মেয়ে। অদ্ভুত দুইটি চোখ। বড় বড় চোখ দুইটার সাদা ক্ষেতে যেন ছুরির ধার-সেই শানিত-দীপ্তির মধ্যে কালো তারা দুইটা কৌতুকে অহরহ চঞ্চল।” বসন খিলখিল করে হাসে। সে শুধু মুখ ভরিয়া হাসে না, সর্বাঙ্গ ভরে হাসে। আলেপুরের রাসপূর্ণিমায় মেলায় নিতাই কবিরালের সঙ্গে বসনের পরিচয় হয়। সেই আসরে বসন নাচবে ও নিতাই কবিরাল গান গাইবে। ধীরে ধীরে নিতাইয়ের সঙ্গে বসনের পরিচয় মধুর হয়। তখন নিতাইকে, বসন কালোমানিক বলে ডাকতে শুরু করেছে। নিতাই কবিরালের সংস্পর্শে এসে ও তার গান শুনে বসন তাকে ভালোবেসে ফেলেছে।

বসনকে নিয়েই নিতাই কবিরাল এ জীবনটা কাটিয়ে দিতে চেয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা সার্থক হয়নি। প্রেমের এই বিচিত্র অনুভূতি নিতাইয়ের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত করেছে বসন। উপন্যাসে দেখা যায়, নিতাই বলেছে—“তুমিই তো আমার প্রেমের গুরু-তুমিই তো আমাকে রাধাকে চিনাইয়াছ—তুমিই তো রচনা করিয়াছ-পূর্ণিমায়, পূর্ণিমায়-কুঞ্জশয্যা, আমাদের সম্মুখে রাখিয়া-তুমিই তো গাহিয়াছ—যুগল রূপের মাধুরী।” নিতাই কবিরাল বসন্তকে কথা দিয়েছেন, সে যতদিন বেঁচে থাকবে, বসনকে ছেড়ে কোথাও যাবে না। কিন্তু বসন্তই তাকে চেড়ে চলে গেল। বসন্ত প্রচুর মদ খেয়েই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনল। ‘এত মদ খেলে কি শরীর থাকে’! তাই জটিল রোগে বসন্ত

আক্রান্ত হয়ে পড়ল। কিছুদিন পরই বসন্ত মারা গেল। বসন্তকে সে ভালোবেসেছিল, তাই তাকে হারিয়ে নিতাইয়ের মনে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে লেখকের জীবনজিজ্ঞাসা নিতাইয়ের মধ্যে ব্যক্ত করা হয়েছে এইভাবে—

“এই খেদ আমার মনে মনে।

ভালবেসে মিটল না আশা-কুলাল না এ জীবনে।

হায়, জীবন এত ছোট কেনে?

এ ভুবনে?”

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু নর-নারীর প্রেম ভালোবাসার চিত্র অঙ্কন করেননি, সেই সঙ্গে সমাজের বহুবিধ সংকটের মধ্যে চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে সাহিত্যে তুলে ধরেছেন। ‘কবি’ উপন্যাসের বসনের মধ্যেও রাগ, হিংসা নেই। নিতাইয়ের প্রতি তার ভালোবাসার অন্ত নেই। সে শুধু অতিরিক্ত মদ্য পান করে নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। ‘বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’ গ্রন্থে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—“বসন্তের চরিত্রে তীক্ষ্ণ, হিংস্র আঘাত করিবার প্রবৃত্তি ও উদ্দাম, বেপরোয়া জীবন উপভোগ স্পৃহার সঙ্গে আত্মগ্লানি ও একনিষ্ঠ প্রেমের মর্যাদা উপলব্ধির চমৎকার সমন্বয় হইয়াছে। (পৃ. ৫৪৯)

সবশেষে একথা বলা যায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘কবি’ উপন্যাসে বসন চরিত্রটিকে নিপুণভাবে অঙ্কন করেছেন। নিতাইচরণ থেকে নিতাই কবিরালে উত্তীর্ণ হওয়ার পেছনে বসন চরিত্রের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। তাই উপন্যাসের ঘটনা-গতির অগ্রগতিতে বসন চরিত্রটি আমাদের আকর্ষণ করেছে।

৫.২.৬.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

- ১। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
- ২। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
- ৩। কালের প্রতিমা বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর (১৯২৩-১৯৯৭)—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
- ৪। বাংলা কথাসাহিত্য প্রকরণ ও প্রবণতা—গোপিকানাথ রায়চৌধুরী
- ৫। বাস্তবের গভীরে : তারাশঙ্কর ও তিন নক্ষত্র—গোপিকানাথ রায়চৌধুরী

৫.২.৬.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

- ১। কবি উপন্যাসটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।
- ২। কবি উপন্যাস অবলম্বনে তারাশঙ্করের জীবনদর্শনের পরিচয় দাও।
- ৩। কবি উপন্যাসে নিতাইচরণ চরিত্রসৃষ্টির সার্থকতা বিচার করো।
- ৪। কবি উপন্যাসে নারী চরিত্রসৃষ্টিতে লেখকের নৈপুণ্যের পরিচয় দাও।

পর্যায় গ্রন্থ - ৩

প্রয়োগের বাংলা ভাষা

একক ৭

ভাষার স্বরূপ

বিন্যাসক্রম

- ৫.৩.৭.১ : ভূমিকা
- ৫.৩.৭.২ : বাংলা ভাষার উৎস ও ইতিহাস
- ৫.৩.৭.৩ : বাংলা ভাষার যুগবিভাগ ও তার বৈশিষ্ট্য
- ৫.৩.৭.৪ : বাংলা ভাষা চর্চার ইতিহাস
- ৫.৩.৭.৫ : সরকারি ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার ব্যবহার
- ৫.৩.৭.৬ : বাংলা ভাষার প্রয়োগের বিবিধতা
- ৫.৩.৭.৭ : বাংলা বর্ণমালা
- ৫.৩.৭.৮ : বাংলা ধ্বনি ও উচ্চারণগত অবস্থান
- ৫.৩.৭.৯ : নমুনা পাঠ্য
- ৫.৩.৭.১০ : সম্পর্কিত ভাষাসমূহ
- ৫.৩.৭.১১ : আদর্শ প্রশ্নাবলি
- ৫.৩.৭.১২ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৫.৩.৭.১ : ভূমিকা

বাংলা ভাষা একটি ইন্দো-আর্য ভাষা, যা দক্ষিণ এশিয়ার বাঙালি জাতির প্রধান কথ্য ও লেখ্য ভাষা। মাতৃভাষীর সংখ্যায় ইন্দো-আর্য ভাষা পরিবারের দ্বিতীয়, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের চতুর্থ ও বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম ভাষা। বাংলা সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশের জাতীয় ভাষা ও একমাত্র রাষ্ট্রভাষা এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসামের বরাক উপত্যকার সরকারি ভাষা। বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসামের বরাক উপত্যকার সরকারি ভাষা। বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের প্রধান কথ্য ভাষা বাংলা। এছাড়া ভারতের ঝাড়খণ্ড, বিহার, মেঘালয়, মিজোরাম, উড়িষ্যা রাজ্যগুলোতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাংলাভাষী জনগণ রয়েছে। ভারতে হিন্দির পরেই সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা বাংলা। সারা বিশ্বে সব মিলিয়ে ২৬ কোটির অধিক লোক

দৈনন্দিন জীবনে বাংলা ব্যবহার করে। বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত এবং ভারতের জাতীয় সঙ্গীত ও স্তোত্র বাংলাতে রচিত।

বাংলা ভাষা বিকাশের ইতিহাস প্রায় ১২০০ বছরের অধিক পুরানো। চর্যাপদ এ ভাষার আদি নিদর্শন। অষ্টম শতক থেকে বাংলায় রচিত সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডারের মধ্য দিয়ে অষ্টাদশ শতকের শেষে এসে বাংলা ভাষা তার বর্তমান রূপ পরিগ্রহণ করে। বাংলা ভাষার লিপি হল বাংলা লিপি। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত বাংলা ভাষার মধ্যে শব্দগত ও উচ্চারণগত সামান্য পার্থক্য রয়েছে। বাংলার নবজাগরণে ও বাংলার সংস্কৃতির বিবিধতাকে এক সূত্রে গ্রন্থনে এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদ তথা বাংলাদেশ গঠনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব বাংলায় সংগঠিত বাংলা ভাষা আন্দোলন এই ভাষার সাথে বাঙালি অস্তিত্বের যোগসূত্র স্থাপন করেছে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদী ছাত্র ও আন্দোলনকারীরা সংখ্যাগরিষ্ঠের মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষাকরণের দাবিতে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন। ১৯৮৭ সালের বাংলা ভাষা প্রচলন আইন বাংলাদেশের সকল রাষ্ট্রীয় কাজে বাংলার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছে। ১৯৫২'র ভাষা শহিদদের সংগ্রামের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।

৫.৩.৭.২ : বাংলা ভাষার উৎস ও ইতিহাস

খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়কালে মাগধী প্রাকৃত ও পালির মতো পূর্ব মধ্য ইন্দো-আর্য ভাষাসমূহ থেকে বাংলা ও অন্যান্য পূর্ব ইন্দো-আর্য ভাষাগুলির উদ্ভব ঘটে। এই অঞ্চলে কথ্য ভাষা প্রথম সহস্রাব্দে মাগধীপ্রাকৃত বা অর্ধমাগধী ভাষায় বিবর্তিত হয়। খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর শুরুতে উত্তর ভারতের অন্যান্য প্রাকৃত ভাষার মতোই মাগধী প্রাকৃত থেকে অপভ্রংশ ভাষাগুলি উদ্ভব ঘটে। পূর্বী অপভ্রংশ বা অবহট্ট নামক পূর্ব উপমহাদেশের স্থানীয় অপভ্রংশ ভাষা ধীরে ধীরে আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় বিবর্তিত হয়, যা মূলত ওড়িয়া ভাষা, বাংলা-অসমীয়া ও বিহারী ভাষাগুলি ধীরে ধীরে আঞ্চলিক কথ্য ভাষার বিবর্তিত হয়, যা মূলত ওড়িয়া ভাষা, বাংলা-অসমীয়া ও বিহারী ভাষাসমূহের জন্ম দেয়। কোনো কোনো ভাষাবিদ ৫০০ খ্রিস্টাব্দে এই তিন ভাষার জন্ম বলে মনে করলেও এই ভাষাটি তখন পর্যন্ত কোনো সুস্থির রূপ ধারণ করেনি, সে সময় এর বিভিন্ন লিখিত ও ঔপভাষিক রূপ পাশাপাশি বিদ্যমান ছিল। যেমন, ধারণা করা হয়, আনুমানিক ষষ্ঠ শতাব্দীতে মাগধী অপভ্রংশ থেকে অবহট্টের উদ্ভব ঘটে, যা প্রাক-বাংলা ভাষাগুলির সঙ্গে কিছু সময় ধরে সহাবস্থান করছিল।

চৈতন্য মহাপ্রভুর যুগে ও বাংলার নবজাগরণের সময় বাংলা সাহিত্য সংস্কৃত ভাষা দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিল। সংস্কৃত থেকে যে সমস্ত শব্দ বাংলা ভাষায় যোগ করা হয়, তাঁদের উচ্চারণ অন্যান্য বাংলা রীতি মেনে পরিবর্তিত হলেও সংস্কৃত বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়। বাংলা ভাষার ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা করেন বাংলার মুসলিম শাসকগোষ্ঠী। ফার্সি পাশাপাশি বাংলাও বাংলার সালতানাতের দাফতরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃত ছিল এবং ব্যাপক হারে ব্যবহার হতো। এছাড়াও প্রোটো বাংলা ছিল পাল এবং সেন সাম্রাজ্যের প্রধান ভাষা।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে নদিয়া অঞ্চলে প্রচলিত পশ্চিম-মধ্য বাংলা কথ্য ভাষার ও পর ভিত্তি করে

আধুনিক বাংলা সাহিত্য গড়ে ওঠে। বিভিন্ন আঞ্চলিক কথ্য বাংলা ভাষা ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে অনেকখানি পার্থক্য রয়েছে। আধুনিক বাংলা শব্দভাণ্ডারে মাগধী প্রাকৃত, পালি, সংস্কৃত, ফার্সি, আরবি ভাষা এবং অস্ট্রোএশিয়াটিক ভাষাসমূহ সব অন্যান্য ভাষা পরিবারের শব্দ স্থান পেয়েছে।

৫.৩.৭.৩ : বাংলা ভাষার যুগবিভাগ ও তার বৈশিষ্ট্য

বাংলা ভাষার ইতিহাসকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হয় :

- ১। প্রাচীন বাংলা (৯০০/১০০০-১৪০০ খ্রিস্টাব্দে)—চর্যাপদ, ভক্তিমূলক গান এই সময়কার লিখিত নিদর্শন। এই সময় আমি, তুমি ইত্যাদি সর্বনাম এবং -ইলা -ইবা, ইত্যাদি ক্রিয়াবিভক্তির আবির্ভাব ঘটে।
- ২। মধ্য বাংলা (১৪০০-১৮০০ খ্রিস্টাব্দ)—এ সময়কার গুরুত্বপূর্ণ লিখিত নিদর্শন চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ইত্যাদি। শব্দের শেষে ‘অ’ ধ্বনির বিলোপ, যৌগিক ক্রিয়ার প্রচলন, ফার্সি ভাষার প্রভাব এই সময়ের সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়। কোনো কোনো ভাষাবিদ এই যুগকে আদিও অন্ত্য এই দুই ভাগে ভাগ করেন।
- ৩। আধুনিক বাংলা (১৮০০ খ্রিস্টাব্দ-বর্তমান কাল)—উপন্যাস, ছোট গল্প, নাটক, আধুনিক কাব্য-কবিতা ইত্যাদি হল আধুনিক বাংলার অন্যতম সাহিত্যিক নিদর্শন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ এই পর্বের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক। এই সময় ক্রিয়া ও সর্বনামের সংক্ষেপণ ঘটে, যেমন তাহার—তার, করিয়াছিল—করেছিল।

৫.৩.৭.৪ : বাংলা ভাষা চর্চার ইতিহাস

অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে, বাংলা ব্যাকরণ রচনার কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ১৭৩৪ থেকে ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভাওয়াল জমিদারিতে কর্মরত অবস্থায় পর্তুগিজ খ্রিস্টান পুরোহিত ও ধর্মপ্রচারক ম্যানুয়েল দ্য আসম্পসোও সর্বপ্রথম ভোকাবোলারিও এম ইডিওমা বেঙ্গালা, এ পোর্তুগুয়েজ ডিভিডিডো এম দুয়াস পার্তেস (পর্তুগিজ : VocabolarioemidiomaBengalla, e Portuguezdivididoemduaspartes) নামক বাংলা ভাষার অভিধান ও ব্যাকরণ রচনা করেন। ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড নামক এক ইংরেজ ব্যাকরণবিদ আ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ (ইংরেজি : A Grammer of the Bengal Language) নামক গ্রন্থে একটি আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন, যেখানে ছাপাখানার বাংলা হরফ প্রথম ব্যবহৃত হয়। বাঙালি সমাজসংস্কারক রাজা রামমোহন রায় ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে গ্রামার অফ দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ (ইংরেজি : Grammar of the Bengali Language) নামক একটি ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন।

১৯৫১-৫২ সালে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি জনগণের প্রবল ভাষা সচেতনতার ফলস্বরূপ বাংলা ভাষা আন্দোলন নামক একটি ভাষা আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনে পাকিস্তান সরকারের নিকট বাংলা ভাষার সরকারি স্বীকৃতি দাবি করা হয়। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়চত্বরে বহু ছাত্র ও রাজনৈতিক কর্মী নিহত হন। বাংলাদেশে প্রতি বছর ২১ শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন দিবস পালিত হয়। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা প্রদান করে।

বাংলাদেশ ছাড়াও ১৯৫০-এর দশকে ভারতের বিহার রাজ্যের মানভূম জেলায় বাংলা ভাষা আন্দোলন ঘটে। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের ভারতের অসম রাজ্যের বরাক উপত্যকায় একই রকমভাবে বাংলা ভাষা আন্দোলন সংঘ ভাষা বঙ্গ অঞ্চলের বাঙালি অধিবাসীর মাতৃভাষা। স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ এবং ভারতের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত। এছাড়া ভারতের অসম রাজ্যের দক্ষিণাংশেও এই ভাষা বহুল প্রচলিত। ভারতের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী বাংলা ভাষার কথা বলে থাকেন।

৫.৩.৭.৫ : সরকারি ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার ব্যবহার

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা ও সরকারি ভাষা হলো বাংলা। এছাড়াও ভারতীয় সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত ২৩টি সরকারি ভাষার মধ্যে বাংলা অন্যতম। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, অসম এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারি ভাষা হল বাংলা। এছাড়াও বাংলা ভারতের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অন্যতম প্রধান ভাষা। ২০১১ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস হতে বাংলা ভাষা ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দ্বিতীয় সরকারি ভাষা রূপে বাংলাকে গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সিয়েরা লিওনের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আহমাদ তেজন কাব্বাহওই রাষ্ট্রে উপস্থিত জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীর ৫,৩০০ বাংলাদেশি সৈনিকের সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাষার মর্যাদা প্রদান করেন।

নোবেলজয়ী বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুইটি বাংলা কবিতা ভারত ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হয়। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জাতিসংঘের সরকারি ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে মর্যাদা দেওয়ার দাবি জানান।

৫.৩.৭.৬ : বাংলা ভাষার প্রয়োগের বিবিধতা

বাংলার কথ্য ও লেখ্য রূপের মধ্যে বিবিধতা বর্তমান। বিভিন্ন শব্দভাণ্ডার দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে বাংলায় দুই ধরনের লিখনপদ্ধতি তৈরি হয়েছে :

- ১। সাধু ভাষা বাংলার এক ধরনের লেখ্য রূপ, যেখানে সংস্কৃত ও পালি ভাষাসূহ থেকে উদ্ধৃত তৎসম শব্দভাণ্ডার দ্বারা প্রভাবিত অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ক্রিয়াবিভক্তি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই ধরনের ভাষা বাংলা সাহিত্যে বহুল ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে সাহিত্যে এই ভাষারূপের ব্যবহার নেই বললেই চলে।
- ২। চলিতভাষা, যা ভাষাবিদদের নিকট মান্য চলিত বাংলা নামে পরিচিত, বাংলার এক ধরনের লেখ্য রূপ, যেখানে মানুষের কথ্য বাগধারা স্থান পায়। এই লিখনশৈলীতে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের ক্রিয়াবিভক্তি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বর্তমান বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের শৈলী অনুসরণ করা হয়ে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরে দুলাল প্রভৃতি রচনাগুলিতে এই ধরনের শৈলী সাহিত্যে জায়গা করে নেয়। এই শৈলী নদিয়া জেলার শান্তিপুর অঞ্চলে প্রচলিত কথ্য উপভাষা থেকে গঠিত হয়েছে, ফলে একে অনেক সময় শান্তিপুর বাংলা বা নদিয়া উপভাষা বলা হয়ে থাকে।

মান্য চলিত বাংলায় অধিকাংশ বাংলা সাহিত্যে রচিত হলেও, কথা বাংলা উপভাষাগুলির মধ্যে যথেষ্ট বিবিধতা রয়েছে। কলকাতাসহ দক্ষিণ-পশ্চিম পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা মান্য চলিত বাংলায় কথা বলে থাকেন। কিন্তু বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলগুলির কথ্য ভাষা মান্য চলিত বাংলার থেকে অনেকটাই ভিন্ন। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলের কথ্য ভাষার সঙ্গে মান্য চলিত বাংলার খুব সামান্যই মিল রয়েছে। তবে অধিকাংশ বাঙালি নিজেদের মধ্যে ভাব আদানপ্রদানের সময় মান্য চলিত বাংলা সহ একাধিক উপভাষার কথা বলতে সক্ষম বলে মনে করা হলেও অনেক ভাষাবিদ তা স্বীকার করেন না।

৫.৩.৭.৭ : বাংলা বর্ণমালা

বাংলার প্রধান স্বরধ্বনি হল সাতটি— অ, আ, ই, উ, এ, অ্যা, ও।

বাংলা বর্ণমালায় স্বরধ্বনি আছে দশটি— অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ।

বাংলা স্বরধ্বনির চিহ্ন আছে দশটি— া, ি, িী, ୃ, ୄ, େ, ୈ, ୉, ୊, ୋ।

বাংলা বর্ণমালায় ব্যঞ্জনবর্ণ আছে চল্লিশটি—

ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, শ, ষ, স, হ, ড়, ঢ়, য়, ঞ্, ণ্, ঃ, ঁ।

দুহরফ, তিনহরফ, চারহরফ-এর যুক্তাক্ষরের ব্যবহার ব্যঞ্জনবর্ণের যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। যেমন দু'হরফের যুক্তাক্ষর—ক্ত, স্থ, শ্চ ইত্যাদি।

তিন হরফের যুক্তাক্ষর— ক্ষ্য, শ্ব, শ্র ইত্যাদি।

চার হরফের যুক্তাক্ষর— ক্ষ্য্য, স্থ্য ইত্যাদি।

বর্তমানে বিভিন্ন হরফের আকৃতির পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে এবং সেইমতো বানান সংস্কার করা হয়েছে।

৫.৩.৭.৮ : বাংলা ধ্বনি ও উচ্চারণগত অবস্থান

বাংলা স্বরধ্বনি

বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি

	সম্মুখ	কেন্দ্রীয়	পশ্চাৎ
সংবৃত	ই~ঈ i i		উ~ঊ u u
সংবৃত-মধ্য	এ e e		ও o~o u/o
বিবৃত-মধ্য	এ্যা/অ্যা æ ê		অ a ô
বিবৃত		আ a a	

	উভয়মৌল্য	দন্ত্য	দন্তমূলীয়	মূর্ধন্য জিহ্বাগ্র্য-পশ্চাৎ- দন্তমূলীয়	জিহ্ব্য-পশ্চাৎ- দন্তমূলীয়	কণ্ঠনালীয়
নাসিক্য	ম ma mô	ঞ ~ ন ~ ণ na nô			ঙ ŋa ngô	
স্পর্শ	অঘোষ	প pa pô	ত ṭa tô	ট ṭa ṭô	চ tʃa~sa chô/sô	ক ka kô
	অঘোষ	ফ ḫa fô	থ ṭʰa thô	ঠ ṭʰa ṭhô	ছ tʃʰa~ssa chhô/ssô	খ kʰa khô
	ঘোষ	ব ba bô	দ ḍa ḍô	ড ḍa ḍô	জ ~ য dʒa~dʒa jô ~ zô	গ ga gô
	ঘোষ	ভ bʱa bhô	ধ ḍʱa dhô	ঢ ḍʱa ḍhô	ঝ dʒʱa jhô	ষ gʱa ghô
উষ্ম		স sa sô		শ ~ ষ ʃa shô		হ ha hô
তরল		ল la lô				
তরল		র ra rô	ড় ~ ঢ ṛa~ṛʱa rô / rhô			

৫.৩.৭.৯ : নমুনা পাঠ্য

নিম্নলিখিত ভাষাতে মানবাধিকার সনদের প্রথম ধারার নমুনা পাঠ্য

বাংলা লিপিতে বাংলা ভাষা

ধারা-১ : সমস্ত মানুষ স্বাধীনভাবে সমান মর্যাদা এবং অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাদের বিবেক এবং বুদ্ধি আছে; সুতরাং সকলেরই একে অপরের প্রতি ভ্রাতৃত্বসুলভ মনোভাব নিয়ে আচরণ করা উচিত।

বাংলার রোমানীকরণ

Dhara êk : Sômôstô manush sbadhin bhabê sôman môrzada ebông ôdhikar niye jônômôgrôhôn kôre. Tăder bibek ebông buddhi achhe; sutôrang sôkôleri êke ôpôrer prôti bhratritbôsulôbh mônobhab niye achôrôn kôra uchit.

আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালাতে বাংলা ভাষার উচ্চারণ

d^haraæk ʃomost̪ ɔmanuʃ ʃad̪ʱinb^habe ʃoman mɔrdʒada ebɔŋ ɔd̪ʱikar niee dʒonmɔgrɔhɔn kɔre. ʈăder bibek ebɔŋ budd̪ʱiːi at̪ʰe; sut̪ɔrang sɔkɔleri æke ɔpɔrer prɔt̪ʃ b^hrat̪rit̪b̪ɔsulɔb^h mɔnob^hab niee at̪ʃɔrɔn kɔra ut̪ʃit̪.

৫.৩.৭.১০ : সম্পর্কিত ভাষাসমূহ

অধিকাংশ ভাষাবিজ্ঞানীর মতে বাংলা ভাষার সাথে নেপালি ভাষার প্রায় ৪০ শতাংশ সাদৃশ্য রয়েছে। এই সূত্রেই বলা যায় আমরা জানি বাংলা ভাষার অন্যতম প্রাচীন সাহিত্যিক নিদর্শন চর্যাপদের অক্ষরের অনেকেই নেপালি হরফ বা নেওয়ারি অক্ষরের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। এছাড়া অসমীয়া ভাষা, সাদরি ভাষা প্রায় বাংলার অনুরূপ। অনেকেই অসমীয়াকে বাংলার উপভাষা বা আঞ্চলিক রীতি হিসেবে বিবেচনা করেন। সাঁওতালি, মণিপুরী ভাষার সাথেও বেশ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

৫.৩.৭.১১ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বংশে বাংলা ভাষার স্থান নির্ণয় করো।
২. বাংলা ভাষার উৎস ও ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করো।
৩. বাংলা ভাষা চর্চার ইতিহাসের ধারাবাহিক দিকটি বর্ণনা করো।
৪. সরকারি ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষা কতটা গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে বলে তুমি মনে করো।
৫. প্রয়োগ রূপে বাংলা ভাষার কার্যকারিতার বিবরণ দাও।
৬. বাংলা ধ্বনির সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা করো।
৭. বাংলা ধ্বনির উচ্চারণগত স্থান নির্ণয় করো।
৮. বাংলা ভাষার যুগ বিভাগ করে তার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

৫.৩.৭.১২ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. ভাষা-প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ— সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
২. ভাষার ইতিবৃত্ত— সুকুমার সেন।
৩. বাংলা ভাষা পরিভ্রম (প্রথম খণ্ড)— পরেশ চন্দ্র মজুমদার।
৪. সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা— রামেশ্বর শ।
৫. বাংলা ভাষাবিজ্ঞান অভিধান— অলিভা দাক্ষী।
৬. ভাষা : প্রয়োগে ব্যবহারে— সুখেন বিশ্বাস (সম্পাদিত)।

একক ৮

পত্র-পত্রিকার ভাষা

বিন্যাসক্রম

- ৫.৩.৮.১ : ভূমিকা
৫.৩.৮.২ : সংবাদপত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহারের ইতিহাস
৫.৩.৮.৩ : পত্র-পত্রিকায় বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশ ও পরিণতি
৫.৩.৮.৪ : সংবাদপত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহারের নিয়মাবলি
৫.৩.৮.৫ : মূল্যায়ন
৫.৩.৮.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলি
৫.৩.৮.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৫.৩.৮.১ : ভূমিকা

ভাষা হলো আমাদের আত্ম প্রকাশের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। ভাষার প্রধান কাজ ভাবনাকে একজনের নিকট হতে অন্যের নিকট পৌঁছে দেওয়া। তবে ভাষা দুই ধরনের : (ক) মুখের ভাষা (খ) লেখার ভাষা। কথা বলার সময় অসম্পূর্ণ ভাষার ব্যবহার করেও অন্যকে অর্থ বোঝানো সম্ভব। কিন্তু ভাষা লিখিত আকারে প্রকাশ করতে হলে তার সাথে যোগ হয় সম্পূর্ণ ও শুদ্ধ বাক্য, আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগ না করা, বানান ও ব্যাকরণের শুদ্ধতা, যতিচিহ্নের সঠিক ব্যবহারের তাগিদ। কিন্তু তা সত্ত্বেও লিখিত ভাষার একটা অসাধারণ সুবিধা আছে, এর মাধ্যমে যেহেতু লিখিত তাই এর ভিত্তিতে ক্ষমতা প্রকাশ পায়। আমাদের এই চলিষ্ণু জীবনের প্রতিদিনের ইতিহাস হলো সংবাদপত্র। এটি সামাজিক যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম। এখানে আমরা সামাজিক যোগের জন্য আনুষ্ঠানিক ভাষার প্রয়োগ করে থাকি। সংবাদপত্র হলো খবরের বাহন, আর এই খবরের বাহন হলো ভাষা ও ছবি। সংবাদপত্রের ভাষা লেখ্যভাষার জগৎ থেকে আগত ভাষা। এই লেখ্য ভাষার মাধ্যমে সংবাদপত্রে বিভিন্ন ঘটনার খবর বাণীবদ্ধ থাকে। তবে সংবাদপত্রের ভাষার কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। যেমন, সংবাদপত্রের ভাষা হবে সহজ, সরল, স্বচ্ছ, যেন পাঠক ও শ্রোতা তা সহজেই বুঝতে পারেন। যেহেতু পাঠক সুপণ্ডিত আছে, তেমনি রয়েছেন নামমাত্র সাক্ষর ব্যক্তি তাই এতে ব্যবহৃত ভাষা হবে সহজ যেন সকলেই তা বুঝতে পারেন। তবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে—

সহজ কথা বলতে আমায় কহয়ে,

সহজ কথা যায় না বলা সহজে।

তবে কাজটি যতই কঠিন হোক না কেন সাংবাদিকের লেখাতে স্বচ্ছতা ও সরলতা থাকা প্রয়োজন।

৫.৩.৮.২ : সংবাদপত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহারের ইতিহাস

সংবাদপত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার শুরু হয় বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হবার সময় থেকে, তবে বাংলা সংবাদপত্রের আবির্ভাবকালে বাংলা গদ্যের অবস্থা ছিল অনেকখানি বিশৃঙ্খল। তারপরও বাংলা সংবাদপত্র এই বিশৃঙ্খলার দ্বারা আক্রান্ত হয়নি। বরং বিশৃঙ্খলা দূর করতে সমর্থ হয়েছিল। এ সম্পর্কে সুকুমার সেনের মন্তব্যটি তাৎপর্যপূর্ণ— “সাধারণ পাঠকের অপযোগী সংবাদ ও সরস কাহিনী পরিবেশের দ্বারা সাময়িকপত্রে বাঙ্গালা গদ্যের পঙ্গুত্ব ঘুচাইয়া ইহাকে প্রতিদিনের কাজ কর্মের উপযোগী এবং সর্বসাধারণের উপযোগ্য রস সৃষ্টির বাহন করিয়া তোলে।” (বাঙ্গালী সাহিত্যে গদ্য তৃতীয় সংখ্যা, কলিকাতা ১৩৫৬ পৃ: ৪৭) ১৮০১-১৮১৭-খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে প্রকাশিত বাংলা বই যা করতে পারেনি ১৮১৮-১৮৩৫ সালের মধ্যে বাংলা সাময়িকপত্রের বৃদ্ধি ও দৈনিক সংবাদপত্র-পত্রিকার আবির্ভাবে তা সম্ভব হয়েছিল। কাজের ধারায় যুক্ত হয় দ্রুততা। এছাড়া আন্তর্জাতিক সংবাদ বিনিময়ের ব্যবস্থায় ও বিশ্বায়কের অগ্রগতি আছে। এতসব চাহিদা মেটাতে সংবাদপত্রের ভাষায় আসে অসমূহ বৈচিত্র্য। তবে সংবাদপত্রের ভাষা সম্পর্কে একটি অভিযোগও পাওয়া যায়, তা হলো সংবাদপত্রে বাংলা ভাষার প্রকৃতি ও ব্যাকরণ অগ্রাহ্য করে তা ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রথমত, বাংলা গদ্যের আবির্ভাবের পর ১৮১৭-১৮১৮ সালে যাত্রা শুরু হয় সংবাদপত্রের— “দিকদর্শন” ও “সমাচার দর্পণ” এর মাধ্যমে। পরবর্তীতে ‘সংবাদ কৈমুদী’ ‘জ্ঞান অন্বেষণ’-এর আবির্ভাব হয়। ১৮৩৩ সালে সাপ্তাহিক হিসেবে যাত্রা শুরু করে “সম্বাদ প্রভাকর”। ১৯৩৯ সালে বাংলা ‘দৈনিক সম্বাদপ্রভাকর’ এর অভিযাত্রা শুরু। ব্রিটিশ শাসনের সময়ে বাংলা সংবাদপত্রগুলো বিট্রিশ শোষকদের অত্যাচার অবিচার এবং সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ে সংবাদ প্রচার করলে পরবর্তীতে এর সাথে যুক্ত হলো সমাজ সংস্কার ও ধর্ম সংস্কারের ভাষা। তারই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে সংবাদপত্রে স্থান পেতে শুরু করল সাহিত্যের ভাষা।

৫.৩.৮.৩ : পত্র-পত্রিকায় বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশ ও পরিণতি

বাংলায় সংবাদ ও সাময়িকপত্র প্রকাশের প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করে ইংরেজরা। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় প্রথম সংবাদপত্র বেঙ্গল গেজেট, রূপান্তরে ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভার্টাইজার। প্রথম দিকে পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে মুদ্রণযন্ত্র, বর্ণের অভাব ইত্যাদি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলেও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ছিল প্রধান প্রতিবন্ধক। কারণ ওই সময় যাঁরা পত্রপত্রিকা প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন তাঁরা কেউ কোম্পানির চাকুরে ছিলেন না। কোম্পানির সঙ্গে ছিল তাঁদের স্বার্থগত এবং নীতিগত বিরোধ। এ কারণেই লর্ড ওয়েলেসলি প্রবর্তন করেন কঠোর সেন্সর ব্যবস্থার এবং হেস্টিংসের আমলেও এ নিয়মের পরিবর্তন হয়নি। এ পরিপ্রেক্ষিতেই ১৭৬৮ সালে ওলন্দাজ বংশোদ্ভূত ইউলিয়াম বোল্টস কলকাতায় একটি মুদ্রণযন্ত্র স্থাপনের প্রস্তাব করলে ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলের সিলেক্ট কমিটি তাঁকে ভারত ত্যাগের নির্দেশ দেয়। শুধু তাই নয়, উল্লিখিত বেঙ্গল গেজেট -এর মালিক ও সম্পাদক জেমস অগাস্টস হিকিকেও বারবার কোম্পানির রোষনলে পড়তে হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে কলকাতা থেকে বহিষ্কার করা হয়।

বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশের প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিস্ট মিশনারিরা। ১৮১৮ সালে মিশনের পক্ষে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় প্রথম বাংলা সাময়িক পত্র দিক্‌দর্শন। এর ২৬টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটিতে ইংরেজি প্রবন্ধও প্রকাশিত হতো। ১৮২১ সালের পরে এটি বন্ধ হয়ে যায়।

দিক্‌দর্শন প্রকাশিত হওয়ার একমাস পর (২৩ মে, ১৮১৮) মার্শম্যান প্রকাশ করেন সমাচার দর্পণ। এর সম্পাদনা কাজে সহায়তা করেন জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, তারিণীচরণ শিরোমণি প্রমুখ। পত্রিকাটির ফারসি এবং ইংরেজি বাংলা সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৩২-৩৪ পর্যন্ত পত্রিকাটি ছিল দ্বি-সাপ্তাহিক এবং ১৮৪১ সাল পর্যন্ত এর প্রকাশনা অব্যাহত ছিল।

বাঙালি সম্পাদিত প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক বাঙালি গেজেটিং প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮১৮ সালে(মে/জুন)। সম্পাদক ও মালিক ছিলেন হরচন্দ্র রায়। বছর খানেক পত্রিকাটি চলেছিল। এর কোনো কপি পাওয়া যায়নি। এ ধরনের পত্রিকা/সাময়িকপত্র প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত সংবাদ পরিবেশন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা করা, তবে এর মাধ্যমে বাংলা গদ্যের অনেক উন্নতি হয়।

১৮১৮ থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত প্রধানত কলকাতাকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়, যদিও সেগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। বলা যেতে পারে, বাঙালির কাছে সংবাদপত্র উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে ১৮৩১ সালে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত সাপ্তাহিক সংবাদ প্রভাকর প্রকাশের ফলে। এটি বাংলা সাময়িকপত্রে এক নতুন ধারায় সৃষ্টি করে, কারণ তখন থেকে সাময়িকপত্রগুলিকে অবলম্বন করে সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস দেখা দেয়। এছাড়া তখন বাংলা গদ্যরীতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে এবং নতুন নতুন লেখকেরও আবির্ভাব ঘটে। ওই একই বছর প্রকাশিত হয় মুসলমান সম্পাদিত প্রথম সাপ্তাহিক সমাচার সভারাজেন্দ্র (৭মার্চ, ১৮৩১)। পরে শুরু হয় কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে থেকে বিভিন্ন বিষয়ে মাসিক, পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রকাশ। বাংলার পাশাপাশি তখন যথেষ্ট ইংরেজি সংবাদপত্রও প্রকাশিত হয়, তবে ইংরেজি ও বাংলা পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল স্বতন্ত্র। প্রথমটির উদ্দেশ্য ছিল পাঠকের মনোরঞ্জন ও মুনাফা অর্জন এবং দ্বিতীয়টির সমাজ-সংস্কার ও জ্ঞানের প্রসার। ওই সময় বেশ কয়েকটি উর্দু ও ফারসি সংবাদপত্র ও প্রকাশিত হয়েছিল।

১৮৫৭ সালের আগে প্রকাশিত দুটি সংবাদপত্র ব্যতীত ১৮৫৭ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ববঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল ৭৬টি সংবাদপত্র ও ১৬২টি সাময়িকপত্র (মোট ২৩৮টি, বিজ্ঞাপিত সংবাদ-সাময়িকপত্র এবং ১৮৫৭ সালের আগে প্রকাশিত দুটি সংবাদপত্র ধরলে মোট সংখ্যা হয় ২৫২)। একই সময়ে অথগু বাংলায় প্রকাশিত হয়েছিল মোট ৯০৫টি বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র। এ পরিসংখ্যান পূর্ববঙ্গের সাহিত্য-সংস্কৃতির অবস্থা তুলে ধরে। তবে নানা দিক থেকে পশ্চাৎপদ তৎকালীন পূর্ববঙ্গের ক্ষেত্রে এ সংখ্যা একেবারেই অকিঞ্চিৎকর নয়।

বাংলাদেশে প্রকাশিত ২৫২টি সংবাদ-সাময়িকপত্রের অনেকগুলিই ছিল সাপ্তাহিক ও নিয়মিত, যেমন ঢাকা প্রকাশ, বেঙ্গল টাইমস, বান্ধব ইত্যাদি। প্রথম দুটি টিকে ছিল দীর্ঘদিন। ঢাকা প্রকাশের অয়ুষ্কাল ছিল প্রায় একশ বছর। কালীপ্রসন্ন ঘোষ সম্পাদিত সাহিত্য মাসিক বান্ধবকে তখন দ্বিতীয় বঙ্গদর্শন বলে আখ্যায়িত করা হতো।

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের পরবর্তীকালে শুধু রাজনৈতিক বা সামাজিক ইতিহাসের জন্যই নয়, বাংলা সাময়িকপত্রের জন্যও উল্লেখযোগ্য। এ সময় কলকাতা থেকে সোমপ্রকাশ হতে থাকে (১৫নভেম্বর, ১৮৫৮), যার প্রভাব পড়ে তৎকালীন প্রায় সকল পত্রিকার ওপর। সোমপ্রকাশের প্রকাশ গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, এর আগে বাংলা সাময়িক সংবাদপত্রে রাজনীতি বা সমাজ নিয়ে তেমন আলোচনা হতো না, সোমপ্রকাশেই ব্যাপকভাবে এ ধরনের আলোচনার সূত্রপাত হয়। কারণ ১৮৫৭ সালের পরে বাঙালি মধ্যবিত্তের মনে দ্রুত রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারিত হয় এবং এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়।

পূর্ববঙ্গের সংবাদ-সাময়িকপত্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার পূর্বে উনিশ শতকের বাংলাদেশে মুদ্রণ শিল্প সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন। পূর্ববঙ্গে প্রথম বাংলা মুদ্রণযন্ত্রটি কোথায় এবং স্থাপিত হয় তা সঠিক জানা যায় না, তবে অনুমান করা হয়, ১৮৪৭ সালে পঙ্গপুর বার্তাবহ প্রকাশের জন্য রংপুর স্থাপিত মুদ্রণযন্ত্রটিই পূর্ববঙ্গের প্রাচীনতম বাংলা মুদ্রণযন্ত্র। এর এক বছর পর ১৮৪৮ সালে ঢাকায় স্থাপিত হয় একটি ইংরেজি মুদ্রণযন্ত্র এবং ১৮৫৬ সালে স্থাপিত হয় ঢাকা নিউজ প্রেস, যেখান থেকে ঢাকা নিউজ প্রকাশিত হয়।

১৮৬০ সালে ঢাকার বাবু বাজারে স্থাপিত ‘বাঙ্গালা যন্ত্র’ শুধু ঢাকাতেই নয়, পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলেও মুদ্রণযন্ত্র স্থাপনের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। এছাড়া বাঙ্গালা যন্ত্র ঢাকার সমাজজীবনে যতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা আর কোনো মুদ্রণযন্ত্র করতে পারেনি। এই যন্ত্র থেকেই মুদ্রিত হয়েছিল দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটক। ষাটের দশক থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত হতে থাকে।

বাংলাদেশে সংবাদ-সাময়িকপত্র বিকাশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল ব্রাহ্ম আন্দোলনের। ব্রাহ্ম আন্দোলন যদিও এখানে শুরু হয়েছিল চল্লিশের দশকে, কিন্তু ষাটের দশকের আগে তা পূর্ববঙ্গে তেমন গুরুত্ব পায়নি। ব্রাহ্ম আন্দোলনের সহায়ক হিসেবে উনিশ শতকে বাংলাদেশে গঠিত হয় বেশ কিছু সভা-সমিতি, যেগুলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সমাজ-সংস্কার। সভা-সমিতিগুলির কর্ণধাররা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। উনিশ শতকের প্রভাবশালী সংবাদপত্র ঢাকা প্রকাশ ব্রাহ্মরাই প্রকাশ করেন। শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মবিরোধীরাও নিজেদের কথা জনসাধারণের নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার আশ্রয় নিয়েছিল। তখন ব্রাহ্ম, রক্ষণশীল হিন্দু, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক, উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণি সকলের বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠেছিল সংবাদ-সাময়িকপত্র, সারণি ১,২ ও ৩-এ উল্লিখিত ১৮৪৭-১৯০৫ সালের সংবাদ-সাময়িকপত্রের উপাত্তই এর প্রমাণ।

সারণি তিনটি থেকে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের সমাজ ও সংবাদ-সাময়িকপত্র সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ের ধারণা নেওয়া যায়। ১৮৬১-৭০ এর উপাত্ত থেকে অনুমান করা যায় যে, পূর্ববঙ্গে তখন একটি উচ্চ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণির উদ্ভব হয়েছিল এবং তাঁরা সাহিত্য ও সমাজ সংস্কারে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন, তবে সবকিছু আবর্তিত হয়েছিল ঢাকাতে কেন্দ্র করেই।

১৮৭১-৯০ এ বিশ বছরে দেখা যাচ্ছে সংবাদ-সাময়িকপত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তা শুধু ঢাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল মফস্বলে, এমননি কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রাম এলাকায়ও। ওই সময় প্রকাশিত সাময়িকপত্রগুলি ছিল বৈচিত্র্যময়, সেগুলিতে বিভিন্ন বিষয় প্রকাশিত হতো। ঢাকা থেকে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল কাব্যবিষয়ক সাময়িকী কবিতাকুসুমাবলী। নারীমুক্তি বিষয়ক সাপ্তাহিক বালারঞ্জিকা প্রকাশিত হয়েছিল আবদুর রহিমের সম্পাদনায় বরিশাল থেকে। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়েছিল অয়ুর্বেদ ও তন্ত্রমন্ত্র সম্পর্কিত মাসিক ঋষিতত্ত্ব। ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল সঙ্গীত বিষয়ক মাসিক কৌমুদী। শিল্প ও কৃষি বিষয়ক পত্রিকা বৈষয়িকতত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছিল রাজশাহী থেকে। কিশোরদের জন্য সুখীপাখী প্রকাশিত হয়েছিল যশোর থেকে। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে বেরিয়েছিল মহাপাপ বাল্যবিবাহ। ঢাকার শিল্প ও বিজ্ঞান সাপ্তাহিক রামধনু ও ছিল বেশ জনপ্রিয়। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, ষাটের দশকে বাংলাদেশে যে বাঙালি বুদ্ধিজীবী শ্রেণির উদ্ভব ঘটেছিল তা বিকশিত হয়েছিল সত্তর থেকে নব্বই দশকের মধ্যে এবং পত্রিকার পাঠক যেহেতু ছিলেন পেশাজীবী/শিক্ষিত বা অধিশিক্ষিত শ্রেণি, সেহেতু অনুমান করা যায় যে, পেশাজীবী/মধ্যশ্রেণি

ও ওই সময় বিকশিত হয়েছিল। নব্বই দশকের পরে অবশ্য পত্র-পত্রিকা প্রকাশের হার হ্রাস পায়। এর কারণ সম্ভবত ব্রাহ্ম আন্দোলনের গুরুত্ব হ্রাস পাওয়া এবং এর সময় এই আন্দোলনের ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি তথা সমাজজীবনে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, তা স্তিমিত হয়ে পড়া।

বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্র রঙ্গপুর বার্তাবহ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৪৭ সালে রংপুর থেকে। প্রথম ইংরেজি সংবাদপত্র ঢাকা নিউজ প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে ১৮৫৬ সালে। প্রথম সাময়িকপত্র কবিতাকুসুমাবলী প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬০ সালে ঢাকা থেকে। তবে যে দুটি পত্রিকা দীর্ঘকাল টিকেছিল এবং পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত সমাজে প্রভাব বিস্তার করেছিল সে দুটি হলো ঢাকা প্রকাশ ও বেঙ্গল টাইমস।

আলোচ্য সময়ে পূর্ববঙ্গে সাপ্তাহিক পত্রিকার সংখ্যা ছিল খুবই কম। এর কারণ হয়তো এই যে, একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের জন্য যে অবকাঠামো, যেমন প্রেস, দক্ষ কম্পোজিটর, সংবাদ সংগ্রহের সুবিধা ইত্যাদির প্রয়োজন, তার অভাব ছিল। ফলে সংবাদভিত্তিক পত্রিকার চাহিদা থাকলেও তার সংখ্যা যেমন বাড়েনি এবং যেসব পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, সেসবের অধিকাংশই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

এসময় মুসলমান সম্পাদিত পত্রিকার সংখ্যা ছিল খুবই কম। এই দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরে মুসলমান সম্পাদিত পত্রিকার সংখ্যা ছিল মাত্র পনেরোটি এবং এর অধিকাংশই ছিল মাসিক। এর কারণ সম্ভবত অর্থনৈতিক ও সামাজিক সর্বক্ষেত্র মুসলমানদের পশ্চাৎপদতা।

উনিশ শতকে বাংলা সংবাদপত্রের প্রচার ছিল সীমিত, এর কারণ বাঙালিদের আর্থিক অস্বচ্ছলতা। ধনীরা সংবাদপত্রকে সাহায্য করেছেন ঠিকই, কিন্তু এক্ষেত্রে পুঁজিগত লগ্নী করেননি, কারণ ঔপনিবেশিক শাসনে অধস্তন শ্রেণি হিসেবে বাঙালি ধনীরা শিল্প বা ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করার চেয়ে জমিতে খাটানো অনেক নিরাপদ মনে করতেন। ১৮৭০-৮০ সাল পর্যন্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত একুশটি পত্রিকার মধ্যে সতেরোটি ছিল একক উদ্যোগে প্রকাশিত এবং চারটি যৌথ উদ্যোগে।

পশ্চিমবঙ্গে ধনী ব্যবসায়ী ও সম্পন্ন মধ্যবিত্তশ্রেণি অনেক সংবাদপত্রের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, কিন্তু এ অঞ্চলের সংবাদপত্র গুলি ওভাবে পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি। এর একটি কারণ হয়ত এই যে, পূর্ববঙ্গের জমিদাররা প্রায়শই অনুপস্থিত থাকতেন, নব্য ধনীরা ও সময় কাটাতে ভালোবাসতেন রাজধানী কলকাতায়। ফলে উনিশ শতকে বাংলাদেশে অনেক পত্রিকা বেরিয়েছিল যৌথ উদ্যোগে বা বিভিন্ন গোষ্ঠী বা দলের মুখপত্র হিসেবে। জমিদারদের অর্থানুকূল্যেও কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা তা করেছিলেন নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। বাংলাদেশে অধিকাংশ পত্র-পত্রিকা যাঁরা প্রকাশ করেছিলেন তাঁরা ছিলেন স্বল্প আয়ের উকিল, সমাজসেবী, ব্রাহ্ম প্রচার বা শিক্ষক। একই ব্যক্তি একাধারে ছিলেন সম্পাদক, লেখক, সাংবাদিক সবকিছু। তাই দেখা যায়, যতদিন প্রতিষ্ঠান, সমিতি বা উদ্যম টিকে ছিল, পত্রিকাও ততদিন প্রকাশিত হয়েছিল।

ঢাকা বা মফস্বল থেকে প্রকাশিত প্রায় সব পত্রিকারই প্রচার সংখ্যা ছিল অস্বাভাবিক রকম কম। ১৮৬৩ সালের সরকারি হিসাব অনুযায়ী ঢাকা নিউজ, ঢাকা প্রকাশ, ঢাকা দর্পণ এবং হিন্দু হিতৈষিণীর প্রচার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩০০, ২৫০, ৩৫০ এবং ৩০০ কপি। ১৮৬৭ সালের এক হিসাবে জানা যায়, ঢাকা প্রকাশের প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল মাত্র ১৯ কপি এবং হিন্দু হিতৈষিণীর ১০০ কপি। ১৮৮০ সালে পূর্ববঙ্গের দশটি পত্রিকার সম্মিলিত প্রচার সংখ্যা ছিল ৩২৭৭ কপি। এর মধ্যে সবচেয়ে কম ছিল রাজশাহী সমাচারের, মাত্র ৩১ কপি। ১৮৯০-এর

অপর এক হিসাবে জানা যায়, ছয়টি পত্রিকার সম্মিলিত প্রচার সংখ্যা ছিল ২২৪০ কপি। এর মধ্যে ঢাকা প্রকাশেরই ১২০০ কপি। পত্রিকা প্রকাশের এই অন্তরায়ের প্রধান কারণ ছিল জনগণের নিরক্ষরতা। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙ্গালীর নবজাগরণ (১৯৭৭) গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, ওই সময়ে বাংলায় অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন লোকের সংখ্যা ছিল মাত্র শতকরা তিনভাগ। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, কোনো গ্রামে হয়ত একটি মাত্র খবরের কাগজ যেত এবং সেটি একজন পড়তেন, অন্যরা শুনত।

পত্রিকার প্রকাশ সংখ্যার স্পষ্টতার আরেকটি কারণ ছিল ব্যয়বাহুল্য। ওই আমলে অন্যান্য খরচের তুলনায় মুদ্রণ ও কাগজ বাবদ খরচ খুব একটা কম ছিল না। এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় তো ছিলই। ঢাকা প্রকাশে ১৮৬৩ সালের এক বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়, পাইকা টাইপে প্রতি ফর্মার মুদ্রণ খরচ ছিল ছয় টাকা। পল্লী বিজ্ঞান পত্রিকার মুদ্রণ ও কাগজ বাবদ খরচ ছিল যথাক্রমে ৩৯টাকা ও ২২টাকা ৬আনা। অন্য দিকে ডাকমাণ্ডলের ব্যয় ছিল ৪০ টাকা।

সাধারণত একটি পত্রিকার আয়ের প্রধান উৎস তার প্রচার ও বিজ্ঞাপন। প্রচারের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। উনিশ শতকের বাংলাদেশের বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রে বিজ্ঞাপন প্রায় থাকত না বললেই চলে (ব্যতিক্রম বেঙ্গল টাইমস)। এ থেকে বাংলাদেশের শহর ও শহরকেন্দ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে ধারণা করা যায় যে, এর কোনোটিরই তখন বিকাশ ঘটেনি। তবে অনেক ক্ষেত্রে পত্রিকার দাম কম হলে কাটতি বাড়ত। যেমন ঢাকার এক পয়সার দুটি কাগজ শুভসাধিনী ও কর্তৃপক্ষের পক্ষে সবসময় কাগজের দাম কমিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না।

সংবাদপত্রের নিরপেক্ষ নীতি বলে কিছু নেই। সংবাদ-সাময়িকপত্র সবসময় জনগণের একটি অংশের মত প্রকাশ করে মাত্র। উনিশ শতকের বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলিও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রায় প্রতিটা সংবাদ-সাময়িকপত্রই বিশেষ একটি দল, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে সমর্থন করত। যেমন ঢাকা নিউজ সমর্থন করত নীলকরদের, ঢাকা প্রকাশ প্রথমে ব্রাহ্ম এবং পরে গোঁড়া হিন্দুদের মুখপত্র ছিল, বঙ্গবন্ধু ছিল ব্রাহ্মদের মুখপত্র, গ্রামবার্তা প্রকাশিকা বিরোধিতা করেছিল জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচারের, আবার বেঙ্গল টাইমস সমর্থন করত ইংরেজদের।

উনিশ শতকের সংবাদপত্রগুলি ছিল প্রধানত রচনাভিত্তিক। অর্থাৎ ছোটখাট সংবাদ ছাড়া প্রায় ক্ষেত্রেই যেকোনো একটি সংবাদ বা বিষয়কে কেন্দ্র করে বিস্তারিত আলোচনা ও মতামত ছাপা হতো। খবরের মধ্যে বেশির ভাগ থাকত স্থানীয় খবর, আর কিছু থাকত বিদেশী কাগজ থেকে সংগৃহীত খবর। মাঝে মাঝে ছাপা হতো মফস্বল থেকে প্রেরিত পত্রিকা পাঠকদের সংবাদ, চিঠিপত্রের কলামও ছিল। সম্পাদকরা বিষয়ভিত্তিক রচনা বা কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁদের নিজস্ব মতামত তুলে ধরতেন।

প্রায় ক্ষেত্রেই সম্পাদকদের নিজস্ব মতামত থাকত। তবে তাঁদের প্রধান সম্পাদকীয় বিষয় ছিল জমিদার-রায়ত, সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক ও সমাজ-সংস্কার, ইংরেজ শাসন নিয়েও প্রায়শই মন্তব্য করা হতো। সম্প্রদায়, দল বা গোষ্ঠী সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হতো, কারণ তখন সমাজ বা রাজনীতি সম্পর্কে ব্রাহ্ম, হিন্দু বা মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন ভিন্ন।

আলোচ্য সময়ে প্রকাশিত ইংরেজি ও বাংলা পত্রিকাগুলির মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ছিল। ইংরেজি পত্রিকাগুলি ছিল সংস্কারমূলক, কিন্তু অধিকাংশ বাংলা পত্রিকাই ছিল রক্ষণশীল, যা সেই সময়কার সামাজিক প্রবণতাকে তুলে ধরে। রক্ষণশীল ও সংস্কারবাদীদের এই দ্বন্দ্ব শেখোক্তরা জয়লাভ করে, যদিও রক্ষণশীলদের পক্ষও কম শক্তিশালী

ছিল না। এই পটভূমিকায়ই পূর্ববঙ্গের পত্রিকাগুলিও প্রকাশিত হয়েছিল। এখানকার পত্রপত্রিকাসমূহের প্রধান বিষয় ছিল আঞ্চলিকতা, কৃষক, জমিদার, নীলকর, চা-কর, সিভিল সার্ভিস, শিক্ষা, সমাজ-সংস্কার, মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক।

৫.৩.৮.৪ : সংবাদপত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহারের নিয়মাবলি

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, দেশে বাংলা ভাষার প্রকাশিত দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক পত্রিকার সংখ্যা অগণিত, এগুলো প্রকাশে আমাদের মাতৃভাষা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু সংবাদপত্রের ভাষায় নানাবিধ পরিবর্তন আসলেও সংবাদপত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহারে কিছু নিয়ম রয়েছে, যার কারণে বাংলা ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগের জন্য ‘বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট’ প্রায় প্রতি বছরেই সাংবাদিকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে।

ক) শব্দের সঠিক ব্যবহার :

সংবাদপত্রে খবর প্রকাশের জন্য সঠিক স্থানে সঠিক শব্দটি বসানো প্রয়োজনীয়। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বলেন— “ঠিক জায়গায় ঠিক কথাটি বসানোতেই লেখকের বিশেষত্ব” (লেখার ইঙ্কুল) সঠিক স্থানে সঠিক শব্দ ব্যবহৃত হলে ব্যবহৃত ভাষায় প্রাঞ্জলতা আসে।

খ) বাহুল্যশব্দ প্রয়োগ :

প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার হলো বাহুল্য দোষ। সংবাদপত্রে যথাসম্ভব এই দোষ পরিহার করা উচিত, তা না হলে সংবাদটি অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। যেমন—“উচ্ছেদ অভিযান টিমের উপস্থিতিতে দোকানীদের অবৈধ দোকান সরানোর চেষ্টা করবে দেখা গেলেও টিম চলে যাবার পরক্ষণেই পূর্বাবস্থা দেখা গেছে।” দৈনিক ব্রাহ্মনবাড়িয়া, (১৩.৪৯) পরবর্তীতে যদি লেখা হতো, “উচ্ছেদ টিমের উপস্থিতিকালে অবৈধ দোকান সরানোতে দোকানীদের ব্যস্তভাবে দেখা গেলেও টিম চলে যাওয়া মাত্রই পূর্বাবস্থা দেখা গেছে। তবে ভাবটি আরো প্রাঞ্জল হতো।

‘যে কথা বললেন পাঠকরা নিজেরাই’ প্রথম আলো ২০০৪, এটি লেখা যেত N যে কথা বললেন পাঠক নিজেরাই বা যে কথা বললেন পাঠকরা নিজে।

গ) শব্দ ও বাক্যের শুদ্ধতা :

সংবাদপত্র অনেকের জন্য ভাষা শিক্ষার প্রধান বাহন। তাই সাংবাদিকের শুদ্ধ শব্দ ও বাক্য ব্যবহারে সচেতন থাকা প্রয়োজন। তাই বাংলা একাডেমীর প্রণীত বানানের নিয়ম, প্রয়োজন। যেমন করা অনুসরণ (১৯৯২) “এই প্রেক্ষিতে আমাদের আবেদন”...কিন্তু শব্দটি হবে পরিপ্রেক্ষিতে বা প্রেক্ষাপটে। সংবাদপত্রের পাতার এমন ভুল বানানের অনুপ্রবেশ পাঠকে পীড়া দেয়। “প্রথম আলো”-তে ২০০৭ সালের ২৫মার্চ প্রথম পৃষ্ঠায় তিনজন পরিচ্ছন্নতা কর্মীর ছবি ছেপেছে। চিত্র পরিচিতিতে লিখেছে, পরিচ্ছন্ন কর্মী। যা একটি ভুল শব্দ। এছাড়াও বাংলা সংবাদপত্রে যে সকল শব্দের বানান সমূহ প্রায়ই ভুল ছাপানো হয়। তা হলো, মোহামান, পঙক্তি, আকাক্ষা, গণ্ডার, অবিস্কার, রুগ্ন, উধ্ব, বুদ্ধিজীবী, গজ্জলিকা, দুর্বিস্থ, নিয়ন্ত্রণ পুরস্কার, পোশাক, বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যবসা, ব্যয়, ব্যর্থ বিদ্যুৎ, অত্যধিক।

ঘ) সরল বাক্যের প্রয়োগ :

জটিল ও যৌগিক বাক্য ব্যবহার না করে ছোট ও সরল বাক্যের ব্যবহার অর্থকে সহজবোধ্য করে, ভাষাতে আসে গতিশীলতা। গবেষণায় দেখা গেছে, একেকটি বাক্যে পনেরটির বেশি শব্দ ব্যবহৃত হলে তা আর সহজবোধ্য থাকে না, এতে পাঠকের অসুবিধা হয়। উদাহরণ—“আম বাংলাদেশের এমন জনপ্রিয় ফল যা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের কাছেও পছন্দসই খাবার হিসেবে বিবেচিত।”

বাক্যটি হতে পারতো এমন—“বাংলাদেশের জনপ্রিয় ফল আম যা বিশ্বেও পছন্দসই খাবার হিসেবে বিবেচিত।”

ঙ) বাক্যের পদ বিন্যাস :

বাংলা বাক্যের প্রথম কতৃপদও সর্বশেষ ক্রিয়াপদ বলে যা অনেক সময় সংবাদপত্রে অনুসৃত হয় না। যেমন প্রথম—জুন ২৮ পত্রিকায় আলো, ২০০৯ এ ছাপানো হয় “আকালে ঝরে গেল মেধাবী ছাত্রী নিতা” নিয়ম অনুসরণে বাক্যটি হওয়া প্রয়োজন ছিলো ‘মেধাবী ছাত্রী নিতা অকালে ঝরে গেল’।

চ) বহুবচনের সঠিক প্রয়োগ :

বাংলায় আমরা এক সাথে একাধিক বহুবচন চিহ্নের ব্যবহার করি না। তাই সংবাদপত্র কখনো এমন শব্দ লেখা উচিত নয় যে, “পাঁচজন লোকেরা”

ছ) বিভক্তির প্রয়োগ :

বচনের পাশাপাশি বিভক্তির ব্যবহারেও সাংবাদিকের সচেতনতার প্রয়োজন। উদাহরণ : “১০ জন ছাত্র বহিষ্কার সিদ্ধান্ত নিয়েছে” (দৈনিক খবর, ১৯ বিভক্তির যেখানে-(৮৭-০৯-ব্যবহারে ভুল হয়েছে যার কারণে বাক্যের অর্থ দ্ব্যর্থবোধক মনে হয়। পুরো খবর পড়ে বোঝা যায় এখানে একটি অনুচ্যারিত কর্তা আছে অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১০ জন ছাত্রকে বহিষ্কার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

জ) অর্থ দ্বৈততা :

সংবাদপত্রের সংবাদ প্রকাশের অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো অর্থ দ্বৈততা। “অসাংবিধানিক পত্রিকায় নির্বাচিত সরকারকে সরানো যাবে না : প্রধানমন্ত্রী” (ইত্তোফাক, ১১ এপ্রিল, ২০০৮) এই শিরোনামে ভাবের ও অর্থের অসম্পূর্ণ বিদ্যমান। সংবাদটি হওয়া প্রয়োজন ছিলো : “নির্বাচিত সরকারকে অসাংবিধানিক প্রক্রিয়ার সরানো যাবে না।” যথাযথ শব্দ প্রয়োগ না করলেও বাক্যের অর্থ বিপর্যক ঘটে। যেমন: ‘যৌতুকের টাকা না পেয়ে পাষণ্ড স্বামীর স্ত্রীকে পুড়িয়ে হত্যা।’ (ইত্তোফাক ১১, এপ্রিল, ২০০৮) এই শিরোনামে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে হত্যার বিষয়টি প্রথমেই স্পষ্ট নয়।

ঝ) শব্দ : প্রত্যয় ব্যবহারের পৌনঃপুনিকতা :

সুন্দর ও গতিশীল গদ্য সংবাদপত্রের প্রাণ। আর এই সৌন্দর্য ও গতিশীলতা নিকতা বর্ণনা করা বাঞ্ছনীয়। যেমন : “কিন্তু তার আগেই দেশজুড়ে চলছে একুশে কেন্দ্রিক নানা অনুষ্ঠান। দিন দিনই বাড়ছে এই অনুষ্ঠান। সোমবার হরতালের দিনও অনুষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন অনুষ্ঠান। শহীদ মিনার, বাংলা একাডেমী সব জায়গাতেই হয়েছে অনুষ্ঠান। শহীদ মিনারকে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। জনকণ্ঠ, (১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০০৫)।

এই সংবাদে অনুষ্ঠান শব্দটি সাত স্থানে ধ্বনিজাত হয়েছে যা অত্যন্ত ঞ্জতিকটু ও পঠন কষ্টসাধ্য।

ঞ) একাধিক বিশেষণ :

যথেষ্ট বিশেষণ ব্যবহার প্রতিবেদনের বিশ্বাসযোগ্যত কমায়। “সাবেক স্বৈরশাসক”, “দুর্নীতিবাজ”, “সাম্প্রদায়িক মনোভাব সম্পন্ন” ইত্যাদি আরো অনেক বিশেষণ এক সাথে পাঠকের সাথে গ্রহণযোগ্য হয় না। তাই বিশেষণ ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

ট) পরিভাষায় ব্যবহার :

বিদেশী সংবাদসমূহ আমরা বিদেশী ভাষার মাধ্যমে পাই। এই সংবাদ অনুবাদ করে লেখার সময় বিদেশী বা অপরিচিত শব্দ ব্যবহারের প্রতি দুর্বলতা সংবাদপত্রের লেখকদের রচনায় লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে ঐ বিদেশী শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করে তা ব্যবহার করা উচিত। যেমন, সিডার শব্দটি ব্যবহারের আগে যেমন তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তেমনি সুনামি, আইলা এ সব শব্দ ব্যবহারের শুরুতে তার ব্যাখ্যা প্রদত্ত করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিদিন সংবাদপত্রে প্রেসিডেন্ট, আইটেম, কমাণ্ডো, গার্মেন্টস, টিন, ডায়রিয়া, প্রাইভেটকার, ফ্যাক্টরী, ভিসি, ব্রিজ, মার্কেট, রিলিফ, শোকজ-নোটিশ, সাবলেট এসব ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করা। এসব শব্দ বাংলা শব্দ ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে। তবে অপ্রচলিত বিদেশী শব্দ ব্যবহারের আগে তার ব্যাখ্যা দেয়া আবশ্যিক।

ঠ) যতি ও বিরামচিহ্ন :

লেখার সময় আরেকটি বিষয়ে বাংলা সংবাদপত্রে বিশেষ নজর দেওয়া উচিত তা হলো যতি চিহ্ন সোজা বিরামচিহ্ন। বাংলায় “থামবার সংকেত” যেখানে থামার দরকার সেখানে যদি তা না হয় তাহলে যেমন শ্রতিমধুর হয় না, তেমনি যেখানে বিরামচিহ্নের প্রয়োজন সেখানে তা না দেয়া হলে বা ভুল দেওয়া হলে পাঠক অসুবিধায় পড়েন। তাই সাংবাদিকদের বিরাম চিহ্নের সঠিক ব্যবহার করা প্রয়োজন। উদাহরণ “মেয়েরা স্বাধীন : তবে সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়” (বাংলা ২১-৮-৮৯ এখানে ভুল বিরামচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে, এখানে হবে মেয়েরা স্বাধীন হলেও সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়।

ড) জার্নালিজ শব্দ :

সংবাদপত্রে কিছু শব্দ ব্যবহার করতে করতে জীর্ণ হয়ে পড়েছে। এগুলোকে জার্নালিজ শব্দ বলে। এরকমই লিখতে লিখতে কিছু বানান আমরা চালু করে ফেলি এবং বলি, “যা চালু তাই শুদ্ধ”, যেমন: ফলশ্রুতি, পদক্ষেপ, সহসা, ইতিমধ্যে, পৃথকীকরণ, বক্তব্য রাখেন, উদ্বেগ প্রকাশ, তৎপরতা, আশাবাদ ব্যক্ত করেন, আইনের চোখকে ফাঁকি দেওয়া ইত্যাদি। এসব শব্দের ব্যবহার পরিহার করলে সংবাদপত্রের ভাষা আরো শ্রুতিমধুর হয়।

ঢ) ব্যক্তি/বইয়ের নাম :

কোন বিখ্যাত মানুষের নাম, বইয়ের নাম লেখার সময় সচেতনতা ও সতর্কতা জরুরি, যেমন রুশ লেখক টলস্টয় / তলস্তুয়, গ্রীক নাটক ইডিপাস অদিউ পাস/এ্যাডিও পাস ইত্যাদি ভিন্ন বানান দেওয়া যায় কারণ এগুলো বিদেশী ভাষার শব্দ। আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘ঘরে বাইরে’, নজরুল ইসলামের ‘অগ্নিবীণা’ ইত্যাদি গ্রন্থনামে হাইফেন ব্যবহার আবশ্যিক। দৈনিক প্রথম আলো (২০০৬ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি) ছাপায় : “১৯৫২ সালের ২০

ফেব্রুয়ারি রাতে ছাত্রদের মনোভাব বুঝতে পেরে কমিনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি হিসেবে শহীদুল্লাহ কায়সার এসেছিলেন মেডিকেল হোস্টেল।” কিন্তু এখানে শহীদুল্লা নামটির ব্যবহার ভুল হয়েছে।

গ) সাহিত্যের ভাষা ও সংবাদপত্রের ভাষার মধ্যে পার্থক্য :

সংবাদপত্রের ভাষা আলোচনায় যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হলো, সংবাদপত্রের ভাষা ও সাহিত্যের ভাষা এক নয়। প্রথম চৌধুরীর মতে, “ভাষা মানুষের মুখ থেকে কলমের মুখে আসে, কলমের মুখ থেকে মানুষের মুখে নয়” (নিরীক্ষা ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ২৯) : বর্তমানে কিছু সংবাদপত্রে গদ্য স্টাইলে নতুন ধারা এসেছে কিন্তু গুরু সংবাদের ক্ষেত্রে তা খুব একটা দেখা যাচ্ছে না। সাহিত্যের ভাষা কাব্যিক, তথ্য ভিত্তিক বর্ণনাত্মক, বিশ্লেষণাত্মক হতে পারে। কিন্তু সংবাদের ভাষা অবশ্যই তথ্য ভিত্তিক হবে। তবে বর্তমানে ফিচারধর্মী সংবাদগুলো বিশ্লেষণাত্মক।

ত) শিরোনাম কৌশল :

শিরোনাম হলো সম্পূর্ণ ঘটনার সারসংক্ষেপ। তাই শিরোনাম নির্ধারণে সাংবাদিকের সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। বেশ বড় বড় অক্ষরে শিরোনাম ছাপানো হলে : ‘ইটালী মেয়েরা চ্যাম্পিয়ান।’ (দৈনিক বাংলা, ২-৯-৮৭) যা একটি ভুল শিরোনাম, হওয়া প্রয়োজন ছিল: ইটালীয় মেয়েরা চ্যাম্পিয়ান। আবার অনেক সময় থাকে যে : ‘পরিস্থিতি মোকাবেলায় পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ’—শিরোনাম হিসেবে এটি চমৎকার হলেও ব্যাকরণবিদগণ মনে করেন, ‘খাদ্য পরিস্থিতি মোকাবেলা করার মতো পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ আছে’—এই শিরোনামই সঠিক। তবে শিরোনামে কম শব্দে মূল ভাবটি প্রকাশ পেলে এবং তা পাঠককে আকৃষ্ট করলে তা হবে যথার্থ শিরোনাম।

থ) অনুবাদ প্রসঙ্গ :

বিশ্বায়নের এই যুগে আমরা অনেক আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম হতে সংবাদ সংগ্রহ করি, যা আমাদের সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এই প্রাপ্ত সংবাদগুলি বেশির ভাগই ইংরেজি ভাষায় রচিত। ইংরেজি ভাষা হতে বাংলায় অনুবাদের সময় সতর্কতার প্রয়োজন। কখনো কখনো সাংবাদিকরা ইংরেজির ধাঁচে বাংলা লেখে যার কারণে বিভ্রান্তি বেড়ে যায়। যেমন— “রোববার এখানে ফাইনেলে ইটালি ৯৭-৮৯ পয়েন্টে চীনকে হারিয়ে ফরাসি উন্মুক্ত মহিলা বাল্কেক বলে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে।”

যা অতি বিভ্রান্তিকর সংবাদ, এটা অনুবাদের সমস্যা। ইংরেজি বাক্যের গঠনরীতি ও অর্থ অক্ষুণ্ণ রেখে বাংলায় অনুবাদ হয়েছে বলে সংবাদটি অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর। তাই অনুবাদের সময় লেখা পড়ে বুঝে নিয়ে তা কিভাবে বাংলায় প্রকাশ সম্ভব তা ঠিক করে প্রকাশ করা প্রয়োজন।

৫.৩.৮.৫ : মূল্যায়ন

লেখার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় সংবাদপত্রে, তাই ভাষার গতি সংবাদপত্র নির্ধারণে প্রকৃতি ‘সন্দর্ভ, প্রবন্ধ, রচনা, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, সংবাদ সব ধরনের লেখাতেই বেশকিছু ভাষাগত সমস্যা আছে যা সকল লেখককেই মোকাবিলা করতে হয়। এতে লেখকদের অনেক চিন্তাশক্তি ও শ্রম ব্যয় হয়। বাংলা ভাষায় মূল উপাদানগুলোকে কেন্দ্র করে আসে এ সমস্যা। সমস্যাকে কেন্দ্র করে আসে ভাষাগত জটিলতা ও ত্রুটিবিচ্যুতি। সমস্যার ও ত্রুটি-বিচ্যুতির রূপ সবচেয়ে প্রকট সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাতে।’

কিন্তু বাংলা ভাষায় স্বার্থ রক্ষায় সংবাদপত্রের ভাষাকে হওয়া উচিত নির্ভুল ও নির্ভেজাল। সংবাদপত্রের ভাষা নিয়ে গুণীজনের বক্তব্যকে প্রাধান্য দেওয়া যেতে পারে। “সংবাদপত্রে বাংলা ভাষা’ শীর্ষক প্রবন্ধের প্রকাশনা উৎসব হয়েছিল ১৯৮৯ সালে, যেখানে তৎকালীন সংবাদপত্র “দৈনিক বাংলা”-র সম্পাদক সাংবাদিক আহমেদ হুমায়ুন বলেছিলেন।

“সংবাদ পৌছানোর পদ্ধতি খুব সরাসরি, খুব প্রাঞ্জল ও মানুষকে চট করে ধরবে এরকম হওয়া প্রয়োজন এবং সেরকম একটা নিরাভরণ গদ্য যদি আমরা এখানে তৈরি করতে পারি তাহলে মানুষের সাথে সংবাদপত্রের সম্পর্ক নিবিড়ভাবে হবে বলে আমি মনে করি এবং এ গদ্য তৈরী করার প্রয়োজন আছে।” (নিরীক্ষা আগস্ট, ১৯৮৯।)

ঐ অনুষ্ঠানে এ সাংবাদিক আখতার বলেন আলম-উল-ন “সংবাদপত্রের ভাষা ব্যবহারের সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে ভাষাগত ও ব্যাকরণগত সমস্যাটি ঠিক থাকে, সচেতন থাকতে হবে যেন মারাত্মক কোন ভুল না হয়ে যায়। সাথে সাথে কথাও মনে রাখতে হবে সংবাদপত্রের ভাষা আলাদা।” (নিরীক্ষা আগস্ট, ১৯৮৯।) তবে সাম্প্রতিক সময়ে সংবাদপত্রে বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও অপব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে সংবাদপত্রগুলো যেমন সমালোচনার শিকার হচ্ছে, তেমনি ভাষাকে যারা ভালভাবে রূপ দেওয়া করতে আগ্রহী তারা বিভ্রান্ত ও হতাশ হবে। তাই সংবাদপত্র বাংলা ভাষা ব্যবহারের আগে তার উপযুক্তশিক্ষা, সচেতনতা এবং ব্যবহার বা প্রয়োগ অভিজ্ঞতা ভুলভ্রান্তি ও বিচ্যুতি দূর করতে পারে।

৫.৩.৮.৬ : আদর্শ প্রস্তাবলি

১. সংবাদপত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত রচনা করো।
২. পত্র-পত্রিকায় বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশ ও পরিণতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করো।
৩. সংবাদপত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহারের নিয়মাবলি উদাহরণ সব আলোচনা করো।
৪. বাংলা ভাষার অগ্রগতিতে পত্র-পত্রিকার গুরুত্ব সম্পর্কে তোমার অভিমত প্রকাশকরো।

৫.৩.৮.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (খণ্ড ৫)—বিনয় ঘোষ।
২. মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র—আনিসুজ্জামান।
৩. বাংলা সাময়িকপত্র (খণ্ড ২)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪. বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙ্গালীর নবজাগরণ—পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

একক ৯

বিজ্ঞাপনের ভাষা

বিন্যাসক্রম

- ৫.৩.৯.১ : ভূমিকা
- ৫.৩.৯.২ : বিজ্ঞাপনের মাধ্যম
- ৫.৩.৯.৩ : বিজ্ঞাপনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
- ৫.৩.৯.৪ : বাংলা বিজ্ঞাপনের ইতিহাস
- ৫.৩.৯.৫ : বাংলা ভাষা ও বিজ্ঞাপন
- ৫.৩.৯.৬ : বাংলা বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- ৫.৩.৯.৭ : আদর্শ প্রশ্রাবলি
- ৫.৩.৯.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৫.৩.৯.১ : ভূমিকা

ইংরেজি শব্দ Advertising-এর অর্থ বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন একটি Marketing বা বিপণন কৌশল যা যেকোনো পণ্য বা সেবা সম্ভাব্য গ্রাহকের নিকট করার মাধ্যম। প্রচারমূলক বার্তাকে বিজ্ঞাপন বলা হয়। বিজ্ঞাপনের লক্ষ্য হল এমন ব্যক্তিদের কাছে পণ্য বা সেবা সম্পর্কে তথ্য পৌঁছানো, যার ফলে সম্ভাব্য গ্রাহকশ্রেণি তৈরী হয়। বিজ্ঞাপনের অন্যতম উদ্দেশ্য পণ্য বা সেবা সম্পর্কে জানান দেওয়া ও গ্রাহকের চাহিদাকে বৃদ্ধি করা। তাই বলা যায় যে, বিজ্ঞাপন একটি পণ্য বা সেবার সাথে ব্যবহারকারীদের যোগাযোগ মাধ্যম। রোজকার সংবাদপত্র খুললেই আমাদের চোখে নানা রঙের বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। প্রচারেই প্রসার এই কথাকে সামনে রেখে ব্যাপক বিজ্ঞাপন দেখা যায় মিডিয়ায়। বিভিন্ন প্রোডাক্ট এবং ব্র্যান্ডের প্রতিযোগিতা চলছে, কার আগে কে টিকে থাকবে। তাই কোম্পানিগুলো বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে। হোক সে বিজ্ঞাপনটি সুশ্রী বা কুশ্রী, পছন্দনীয় বা অপছন্দনীয়, ভাল বা মন্দ, শিক্ষণীয় বা বর্জনীয়, প্রাসঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্গিক।

সরিষার তেল, সয়াবিন তেল, কোল্ড ড্রিংক্স, শাড়ি-কাপড়, জমি-জমা, কাগজ-কলম, হোটেল-রেস্টুরেন্ট, টয়লেট ক্লিনার-বডি ক্লিনার, আলতা-স্নো, প্লাস্টিক-রড; এমন কোনো জিনিস নেই, যেটার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না। এমনকি পত্রিকার বিশেষ কিছু পাতা খুললে বর-কনের বিজ্ঞাপনও চোখে পড়ে। পাত্র চাই/পাত্রী চাই শিরোনামে নানা বিশেষণে বিশেষায়িক করে দেয়া হয় পাত্র-পাত্রীর চারিত্রিক ও শারীরিক গঠনের বিবরণ।

৫.৩.৯.২ : বিজ্ঞাপনের মাধ্যম

বিজ্ঞাপনের সব থেকে বড় ও প্রচালিতক মাধ্যম টেলিভিশন। সাধারণত বড় বড় কোম্পানি টেলিভিশনকে প্রধান মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়ে থাকে। ব্যয় বহুল মাধ্যম হিসাবে বিভিন্ন বড় অনুষ্ঠানে আয়োজন, স্পোর্টস টিম স্পন্সরশীপ পরিচিত। তাছাড়া যেসব মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তা নিম্নরূপ :

অনলাইন বিজ্ঞাপন মাধ্যম : ফেসবুক, গুগল, টুইটার, সহ সোশ্যাল মিডিয়া, ওয়েবসাইট ব্যানার এড ইত্যাদি বেশ পরিচিত। তাছাড়াও আরো যেসব মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেওয়া যায় তা হলো, মিডিয়া ডট কম, টেবুলা ডট কম, এমজিউড ডট কম ইত্যাদি। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে গুগল এড ওয়াড ও ফেসবুক বেশ কার্যকরী।

অফলাইন বিজ্ঞাপন মাধ্যম : নিউজপেপার, বিলবোর্ড, দেওয়াল পোস্টার, লিফলেট, মাইকিং ইত্যাদি প্রচলিত। উদাহরণ কোরবানির পশুর হাটের মাইকিং এক ধরনের অফলাইন।

বিজ্ঞাপন কখন কোথায় কিভাবে দেওয়া হবে তা নির্ভর করে গ্রাহক ও পণ্যের চাহিদার উপর। যেমন বি টিভিতে সাধারণত টিনের বিজ্ঞাপন দেখা গেলেও অন্য মাধ্যমে টিনের বিজ্ঞাপন খুব কমই চোখে পড়ে। আবার চালডাল ডট কম বা দারাজের বিজ্ঞাপন ফেসবুক ও গুগলে বেশি দেখা যায় বা বি টিভিতে দেখা যায় না। মূলকথা গ্রাহক শ্রেণি যে মাধ্যম ব্যবহার করে তার সাথে পণ্যের মিল রেখে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।

৫.৩.৯.৩ : বিজ্ঞাপনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে, মিশরীয়রা প্রথম দেওয়ালে পোস্টার লাগিয়ে বিজ্ঞাপনের যাত্রা শুরু করে। ইংল্যান্ডের থমাস জেবারটাকে “আধুনিক বিজ্ঞাপনের পিতা” বলা হয়ে থাকে। Pears Soap নামে একটি কোম্পানি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তখন তিনি বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন।

বিজ্ঞাপনের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, প্রাচীন মিশরীয়রা পণ্য বিক্রয়ের জন্য পণ্যের বিস্তারিত তথ্য ও গুণাগুণ জানাতে প্যাপিরাস ব্যবহার করত। প্রাচীন আরব ও ধ্বংসপ্রাপ্ত রোমান নগর পম্পেইতেও বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের নমুনা পাওয়া যায়। ইনান (Tsinan) বর্তমান পূর্ব চীনের এক পরিচিত শহর ভ্রমণপিপাসুদের কাছে। এই ইনান শহর সভ্যতা ও ব্যবসা বাণিজ্যের জন্যও বিখ্যাত। এই শহর ইতিহাসে বিশেষ স্থান দখল করে আছে তাদের সভ্যতা, পণ্যের ব্যবহার ও ব্যবসা-বাণিজ্যে জন্য। এই ইনান শহর থেকেই খ্রিস্টপূর্ব ৭০০ বছর আগে গঠনমূলক বিজ্ঞাপনের যাত্রা শুরু। সেখানকার ‘নিও ফ্যামিলি নিডল শপ’ তাদের তৈরিকৃত সুই বিক্রয়ের জন্য ব্রোঞ্জের প্লেটে খোদাই করে সর্বপ্রথম বিজ্ঞাপন দেয়। এমনকি সেই বিজ্ঞাপনের ভাষা বর্তমান বিজ্ঞাপনের ভাষার অনেক মিলও রয়েছে। বিজ্ঞাপনে লেখা ছিলো,

“We buy high quality steel rods and make fine quality needles, to be ready for use at home in no time”

২০১৭ সালের একটি জরিপে দেখা যায় যে, সারা বিশ্বে যত টাকা বিজ্ঞাপনের পিছনে ব্যয় করা হয় তার মধ্যে ৩৪.৮% ব্যয় হয় টেলিভিশন বিজ্ঞাপনে। মোবাইল ও কম্পিউটার বিজ্ঞাপনে প্রায় ৩৪%, সংবাদপত্রে ১০%, ম্যাগাজিনে প্রায় ৫%, বিলবোর্ড বিজ্ঞাপনে ৬%, রেডিওতে প্রায় ৫% ও সিনেমায় ১% টাকা খরচ হয়।

৫.৩.৯.৪ : বাংলা বিজ্ঞাপনের ইতিহাস

প্রথম বাংলা হরফে বিজ্ঞাপন ছাপা হয় ১৭৭৮ সালে ‘Calcutta Chronicle’ ইংরেজি পত্রিকায়। পঞ্চাশনন কর্মকার প্রকাশ করেন এই বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনটি ছিলো বাংলা ব্যাকরণ বিষয়ক এক বইয়ের। এরপর ধীরে ধীরে বাংলায় প্রকাশিত হতে থাকে নানা পণ্যের বিজ্ঞাপন। কেমন ছিলো সেসময়কার সাদা-কালো যুগের বাংলা বিজ্ঞাপন?



সে সময়কার পুরনো সাদা কালো বাংলা বিজ্ঞাপন; image source : Ananda Bazar

এখানকার মতো সে সময়কার বিভিন্ন বিজ্ঞাপনও ছিল অনেক ক্ষেত্রে সত্য বর্জিত। এখন যেমন বিভিন্ন পণ্যের বিজ্ঞাপনে অনেক সময় অপ্রাসঙ্গিক মিথ্যে নানা গুণের কথা বলা হয়, সে সময়ও এমনই ছিল। যেমন নীচে শ্রীমতিলাল বসু এ্যাণ্ড কোম্পানির এই বিজ্ঞাপনে ‘লক্ষ্মীবিলাস তেল’—যাবতীয় শীরঃপীড়া, হাত-পা জ্বালা বন্ধ হওয়া, সুগন্ধী ‘গোলাপ সার’-এর সুগন্ধে মাথা ঠাণ্ডা হওয়া, গাছগাছড়ায় প্রস্তুত কুইনাইন বর্জিত ‘সুধাসিন্ধু রসে’ প্লীহা ও যকৃত সংক্রান্ত জ্বর, ম্যালেরিয়া ও পুরাতন জ্বর থেকে আরোগ্য লাভ করা ইত্যাদি দাবি করা হয়েছে। অবশ্য গ্যারান্টি দেওয়া হয়নি।

লক্ষ্মীবিলাস তৈল ।

হৃৎক, শিথলকারিতার, বাবতীর শিরঃপীড়া দূরীকরণে, হাত পা জ্বালা ও চর্মরোগ নিবারণে এবং মস্তিষ্কের শীতলতা সম্পাদনে ইহার মত সর্বগুণসম্পন্ন তৈল আর নাই। মানসিক পরিশ্রমকারীদের পক্ষে নিত্য ব্যবহার্য। লক্ষ্মীবিলাস কেশ বৃদ্ধি করিতে এক মাত্র তৈল। মূল্য প্রতি শিশি ৬০, বোতল ২২; প্যাকিং ও ডাক মাওল স্বতন্ত্র।

গোলাপ সার ।

বিলাতী সেন্ট বা পুশপার হইতে কোন অংশে নিকট নহে, বরং শত গুণে শ্রেষ্ঠ; ইতরাং বদেশজাত দেশীয় গোলাপফুলের মধুর সৌগন্ধ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশী ফুলের কঠোর গন্ধের নিকট কোন প্রাধান্য হইবে না, আমাদের গোলাপ সার ব্যবহার করুন। সৌরভে বিষম হইবেন। মস্তিষ্ক শীতল হইবে, তাসল ও নকলের প্রভেদ সহজে বুঝিতে পারিবেন। মূল্য প্রতি শিশি ১০ আনা, ডাক মা: স্বতন্ত্র।

সুধাসিন্ধু রস ।

ইহা নিয়মিত রূপে সেবনে জ্বালা, পাত্ত, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, ম্যালেরিয়া ও পুরাতন জ্বর, পালি, দিকালীম ও বিষমজ্বর প্রভৃতি সর্বপ্রকার জ্বর আরোগ্য হয়। কুইনাইন বর্জিত ও গাছ গাছড়ায় প্রস্তুত। মূল্য প্রতি শিশি ১০ আনা, প্যাকিং ও ডাক মাওল স্বতন্ত্র।

বাতরাজ তৈল ।

এই তৈল ব্যবহারে গেষ্টে বাত, কোমরের বাত, চলিত বাত, কিন্ন দিনে বাত, চৌরঙ্গি বাত প্রভৃতি সকল প্রকার বাত-রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ১২; ছোট শিশি ১০ আনা। ডজন—বড় শিশি ১০০ টাকা, ছোট শিশি ৫০ টাকা; প্যাকিং ও ডাক মাওল স্বতন্ত্র।

শ্রীমতিলাল বসু এণ্ড কোং

ভুগির্হন এণ্ড জেনারেল মার্চেন্টস্,

১২২ নং পুরাতন চিনাবাজার, কলিকাতা।

এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়েছিল বাংলা ১৩১৫ সনে। অর্থাৎ আজ থেকে ১১০ বছর আগে।



এই দারুণ পরমেন্স দিনে—

আরামে থাকি যাই, যদি প্রতিদিন স্নানে ও প্রসাধনে

ক্যালকেমিকোর

সুগন্ধি নিম্ন টয়লেট সাবান

মার্গোসোপ

ব্যবহার করা হই, এক স্নানান্তে দুইবেলা মাপা ও

ক্যালকেমিকোর সুগন্ধি নিম্নের টয়লেট পাউডার

রেণুকা

ব্যবহারে ছুটি, মেচেতা, ঘামাচি, তুলকাচি প্রভৃতি

এবং বর্ণের ঐচ্ছল্য বৃদ্ধি করে।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল—বালিগঞ্জ, কলিকাতা

ক্যালকাটা মেকিল্যাল-এর মার্গোসোপ-এর বিজ্ঞাপন; Image Source : দীপক সেনগুপ্ত

উপরের বিজ্ঞাপনটি ক্যালকাটা কেমিক্যালের মার্গোসোপ-এর বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়েছিল আনুমানিক বাংলা ১৩৪৪ সনে। অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ৮১ বছর আগে। শুরু থেকেই নিম্ন গাছের উপকারিতা উপলব্ধি করে এই কোম্পানি অনেক সমগ্রীতেই (মার্গোসোপ, নিম্ন টুথপেস্ট, রেণুকা টয়লেট পাউডার) নিম্নকে উপাদান হিসেবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বিলেতি সাবান ও টুথপেস্টের সঙ্গে পাশ্চাত্য দিয়ে এগুলোর বিক্রিও মন্দ হতো না। মার্গোসোপ ও নিম্ন টুথপেস্ট পরে একসময়ে হেক্সেল ইন্ডিয়া লিমিটেড কিনে নেয়। সেই হেক্সেল ইন্ডিয়া জ্যোতি ল্যাবোরেটরিজ লিমিটেড কোম্পানি নামে পরিচিত।



ছেলেমেয়েদের ছেলেবেলা থেকেই
ক্যালকেমিকোর

নিম টুথ পেস্ট

ব্যবহার করতে শেবালে তারা জীবনে কখনো দাঁতের
অহুবে কষ্ট পাবে না।

শৈশবেই অবহেলাই আমাদের পরবর্তী জীবনে
সকল যোগের মূল।

অস্বাস্থ্য যে কোন দাঁতের মাজন অপেক্ষা ‘নিম-টুথ-পেস্ট’-এর
শেট্‌সের কারণ এতে দাঁতের উপকারী সমস্ত উপাদান ত
আছেই, তা ছাড়া এতে আছে নিম দাঁতনের সমস্ত বিষহারক
এক বীজাণুনাশক তন।

নিম টুথ পেস্টের বিজ্ঞাপন : Image Source : Ananda Bazar

এটিও ক্যালটাকা কেমিকোর আরেকটি বিজ্ঞাপন। এই বিজ্ঞাপনে তাদের ‘নিম টুথপেস্ট’-এর গুণাগুণ উল্লেখ করেছে। বিজ্ঞাপনে সন্তানদের ছোটবেলা থেকেই দাঁতের সুরক্ষার জন্য নিম টুথপেস্ট ব্যবহার যেখাতে বলছে। এখনকার টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনের ভাষার সাথে তেমন কোনো পার্থক্যই নেই।

৫.৩.৯.৫ : বাংলা ভাষা ও বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞাপন যোগাযোগের একটি বিশেষ ধরন। বিজ্ঞাপন প্রস্তুতকারক ও ক্রেতার মধ্যে সংযোগ তৈরী করে। অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থার মত এটারও দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। রাজনীতিবিদেও ও রেস্টোরাঁর মালিকেরা বহু প্রাচীনকালেও বিজ্ঞাপন দিত। বিজ্ঞাপনে আকর্ষণীয় শব্দ মালা ব্যবহার করা হয়। কেননা বিজ্ঞাপনের মূল উদ্দেশ্য হল একটি পরিকল্পিত যোগাযোগ। যেখানে আমরা যারা ক্রেতা তাদেরকে সচেতন করা হয় এবং আমাদের চাহিদার উদ্রেক করা হয়। যেন আমরা পণ্যটির চাহিদা অনুভব করি এবং কিনি। এই জন্যই বিজ্ঞাপনের ভাষা খুব সহজ ও বোধগম্য হয়। অল্প কিছু শব্দ আর শ্লোগান দিয়ে বিজ্ঞাপন সাজানো হয়। এরকম বিষয় আমাদের মস্তিষ্ক ভালোভাবে মনে রাখে। কিছু কিছু শব্দ যেমন অব্যয়, পণ্যটিকে উপকারী হিসেবে বর্ণনা করে। তাই, বিজ্ঞাপনের ভাষা সবসময় ইতিবাচক হয়।

মজার ব্যাপার হল, বিজ্ঞাপনের ভাষা সবসময় সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। বলা যায়, বিজ্ঞাপনের ভাষা আমাদের সমাজের প্রতিফলন। বর্তমানে “সৌন্দর্য্য” ও “তারুণ্য” শব্দ দুটি অনেক দেশে খুবই জনপ্রিয়। “ভবিষ্যৎ”

ও “নিরাপত্তা” শব্দ দুটোও সমান জনপ্রিয়। পশ্চিমা সমাজে ইংরেজি জনপ্রিয় ভাষা। ইংরেজিকে গণ্য করা হয় আধুনিক ও সার্বজনীন ভাষা হিসেবে। তাই প্রযুক্তিগত পণ্যে ইংরেজি নাম সবচেয়ে মানানসই। রোমান ভাষা গোষ্ঠীর অন্যতম উপাদান হল ইচ্ছাপূরণ ও আবেগ। এটা ব্যবহার করা হয় সাধারণত খাদ্যদ্রব্য ও প্রসাধনী সামগ্রীতে। যারা উপভাষায় কথা বলেন তারা নিজ স্থান ও ঐতিহ্যকে গুরুত্ব দেয়। পণ্যের নাম প্রায়শই নতুন শব্দের হয়। অনেক সময় এসব শব্দের কোন অর্থ থাকে না কিন্তু শুনতে ভাল লাগে। কিন্তু কিছু নাম শব্দভাণ্ডারে নিজের নাম যুক্ত করে নেয়। যেমন : ভ্যাকুয়াম ইংরেজি শব্দটি একটি ক্রিয়া হয়ে গেছে—যার অর্থ পরিস্কার করা।

৫.৩.৯.৬ : বাংলা বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বর্তমানে যেমন বিভিন্ন চিত্রনায়ক, অভিনেতা-অভিনেত্রী, খেলোয়াড় ও ও তারকারা বিজ্ঞাপন করেন, সেসময়ও তেমনি বিভিন্ন খ্যাতিমান লেখক, অভিনেতা, তারকাদের দিয়ে বিজ্ঞাপন করানো হতো।



**“নারীর
রূপলাবণ্য”**
কবি বলেন যে, “নারীর রূপ-
লাবণ্যে স্বর্গের ছবি ফুটিয়া
উঠে।” প্রত্যহ্নে আপনাপন
রূপ ও শাবল্য ফুটাইয়া তুলিতে
সকলেই আগ্রহ হয়। কিন্তু কেশের অভাবে নবনারীর
রূপ কখনই সম্পূর্ণভাবে পরিফুল্ল হয় না। কেশের
প্রাচুর্যে মহিলাগণের সৌন্দর্য সজ্জাওণে বর্ধিত হয়।
কেশের মোড়ার পুরুষকে রূপকথ দেবার। বহি কেশ
হস্ত ও তাহার উন্নতিসাধন করিতে চান, তবে আপনি
হস্তের সহিত ভিটামিন ও হরমোনযুক্ত কেশতৈল “কুস্তলীন”
ব্যবহার করুন।
কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :- “কুস্তলীন ব্যবহার
করিয়া এক মাসের মধ্যে নতুন কেশ হইয়াছে।”
“কুস্তলীনে”র ভণে হুত হইয়াই কবি সাহিত্যছিলেন—
“কেশে মাঝে “কুস্তলীন”।
রূপসেতে “বেলবোল”।
পানে বাও “কুস্তলীন”।
বস্ত্র হোক এইচ-বোল”।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুস্তলীন কেশ তেলের বিজ্ঞাপন : Image Source : দীপক সেনগুপ্ত

উপরের বিজ্ঞাপনটি ‘কুস্তলীন’ নামক কেশ-তেলের। স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিজ্ঞাপনটি লিখেছিলেন। বিজ্ঞাপনে লেখা আছে, “কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :- কুস্তলীন ব্যবহার করিয়া এক মাসের মধ্যে নতুন কেশ হইয়াছে” এমনকি সেই কুস্তলীন কেশ তেল নিয়ে কবির লেখা একটি গানের অংশ বিশেষও উল্লেখ করা হয়েছে বিজ্ঞাপনে।

কুস্তলীনের এই বিজ্ঞাপনটি আজ থেকে প্রায় ৭৬ বছর আগে প্রকাশিত হয়। ‘কুস্তলীন’ তেলের জনক হেমেন্দ্র মোহন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। তাই বলে বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুস্তলীনের গুণগান নিছক বন্ধুপ্রীতির জন্য মনে করা হলে ভুল করা হবে। বিজ্ঞাপনজগতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নাম অকাতরে ব্যবহার করতে দিয়েছেন।



রেডিয়াম ল্যাবরেটরীর বিজ্ঞাপন : Image Source : Getty image

উপরের বিজ্ঞাপনটি কলকাতার রেডিয়াম ল্যাবটরী কর্তৃক প্রকাশিত তাদের স্নো, ক্রিম, কেশ তেল, লাইম জুস, তিল তেল ও গ্লিসারিনের বিজ্ঞাপন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রেডিয়াম ল্যাবটরীর বিজ্ঞাপনও করেছেন। রেডিয়াম ক্রিম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, “রূপচর্চার জন্য স্নো ও ক্রিমজাতীয় প্রসাধন যারা ব্যবহার করেন, তারা রেডিয়াম ফ্যাক্টরির তৈরি ক্রিম ব্যবহার করে দেখুন, বিদেশি পণ্যের সঙ্গে এর কোনো পার্থক্য খুঁজে পাবেন না।”

যি থেকে শুরু করে স্নো-পাউডার, এমনকি হারমোনিয়াম পর্যন্ত প্রায় শতাধিক বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথের লিখিত বাণী দেখা যায়। সেই সময় লেখার জন্য বাজারে পাওয়া যেত সুলেখা কালি। ডট পেন, জেল পেন ইত্যাদি তখনও বাজারে আসেনি। বর্ণা কলম বা ফাউন্টেন পেনে এই কালি ভরে লোকে লিখতো। সুলেখা কালির বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, “সুলেখা কারি। এই কালি কলঙ্কের চেয়েও কালো।”

অল্প কথায়, এরকম আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন এখন আর চোখে পড়ে না। বিদেশি কোম্পানি পার্কারের Quink এবং শেফার্সের Skrip-এর সঙ্গে পাল্লা দিতে হয়েছিল সুলেখাকে। ফাউন্টেন পেনের ভালো কালি বানানো সহজসাধ্য ছিল না। কালি যেন শুকিয়ে গিয়ে নিব কালি ঝরা বন্ধ না করে—কালির উৎপাদন নির্বাচনে সেটি ছিল মস্ত বড় বিষয়। তাছাড়া লেখা যেন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিকে না হয়, সহজে উৎপাদন করা যায়—সবই ছিল বিবেচ্য বিষয়। রবীন্দ্রনাথের এই ঢালাও সুখ্যাতি সুলেখা কালিকে বাজারে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছিল—সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই।

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥



বোর্ভিটাস
বোর্ভিটাস
বোর্ভিটাস

REWRANATH TAGORE
THE GREAT POET AND DRAMATIST



Cadbury's
BOURN-VITA
THE IDEAL
FOOD DRINK
MADE AT BOURNVITA
SPECIALISTS IN FOOD
DRINKS FOR ICEYATERS
HEINZ

বোর্ভিটাস সেবনে উপকার পেয়েছে হাজার হাজার
সেই। তাই ধূলা বিশ্ববিশ্ব এই বোর্ভিটাস—বোর্ভিটাস
বোর্ভিটাস শক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ কভার সে শক্তির ভিত্তি হ'ল
পুষ্টি।

সৈবিক ও মামসিক দুটোই বাবা শাকের একমাত্র উপকার
উপকার দুটোই বাবাশাকের। সেই ও মামের মামের
পুষ্টিই বিনা শারীরিক বা মামসিক পুষ্টিতে কভার শক্ত
মহ। অন্যতম বাবাশাকের মামসিকতার কারণে এই বাবাশাক
দুটোই মামের মামের মামের মামের।

বোর্ভিটাস সব বিনা বোর্ভিটাস দুটোই শক্ত। বাবাশাক
বিনা ভিত্তি মামের মামের মামের। বোর্ভিটাস তাই
উপকারিতা প্রদান পরিচালনা। তাই বোর্ভিটাস মামের
সেবনে শক্ত হার মামের মামের মামের।

Cadbury's
BOURN-VITA

সামগ্রিক নিম্নোক্ত কাপড়শক্তির কাপড়
কভার মামের মামের মামের মামের মামের মামের
কভার মামের মামের মামের মামের মামের মামের

বোর্ভিটাস এ কাপড়শক্তির কাপড়

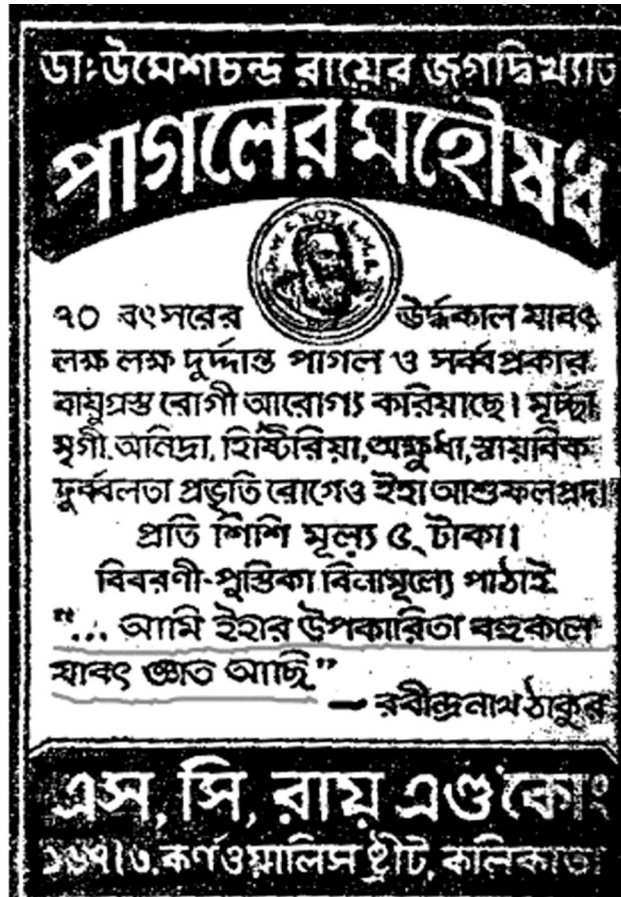
বোর্ন ভিটার বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : Image Source : Pinterest

উপরের বিজ্ঞাপনটি বোর্ন-ভিটার। এ বিজ্ঞাপনেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম ব্যবহার করা হয়েছে। বিজ্ঞাপনে কবির স্বহস্তে লেখা চিঠিতে দেখা যাচ্ছে তিনি লিখেছেন, “বোর্ন-ভিটা সেবনে উপকার পাইয়াছি।”

রবীন্দ্রনাথের আরেকটি জনপ্রিয় বিজ্ঞাপন ছিল ‘জলযোগ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার’-এর জন্য। ঐ বিজ্ঞাপনে তিনি লিখেছিলেন,

“জলযোগের বানানো মিষ্টান্ন আমি চেখে দেখেছি। এটা আমাকে তৃপ্তি দিয়েছে। এর আলাদা স্বাদ আছে।” জলযোগ সে যুগে কেকের জন্য বিখ্যাত হলেও রবীন্দ্রনাথের সার্টিফিকেটের সুবাদে মিষ্টান্ন জগতেও প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পেয়েছিল।

সেসময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক বিজ্ঞাপন লিখেছিলেন। তাঁকে লিখতে হয়েছিলো, তাঁর নিজের জন্য ও তাঁর শান্তিনিকেতনের জন্য এমনকি এস সি রায় এন্ড কোং-এর ড. উমেশচন্দ্র রায়ের কথিত পাগলের মহৌষধের বিজ্ঞাপনও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর করেছিলেন।



পাগলের মহৌষধ কথিত এক ওষুধের বিজ্ঞাপন : Image Source : printerset



পূর্ব রেলওয়ের বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা; Image Source : আনন্দবাজার

উপরে বিজ্ঞাপনে দেখা যাচ্ছে, ভারতবর্ষের পূর্ব রেলওয়ের বিজ্ঞাপনেও রবীন্দ্রনাথের কবিতা ব্যবহার করা হয়েছে। পূর্ব রেলওয়ের বিজ্ঞাপনে কবির ‘হঠাৎ দেখা’ কবিতার দু’লাইন তুলে দেওয়া হয়েছে। এয়ারলাইন্সের বিজ্ঞাপনেও রবীন্দ্রনাথের লেখা পাওয়া যায়। কবি ‘কে এল এম রয়াল ডাচ’ এয়ারলাইন্সের জন্য বিজ্ঞাপন লিখেছিলেন। রয়াল ডাচ এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ সেই বিজ্ঞাপন ‘গুরুদেবের বিমান যাত্রা’ শিরোনামে বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশ করেছিল।

১৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা : বিজ্ঞাপনী জ্যৈষ্ঠ-মাঘ ১৩৪১

গুরুদেবের
বিমান যাত্রা

কলিকাতা হইতে ভারত দেশে আশ্বাদের বিমান যাত্রা
মঙ্গলক্ষেপে দক্ষিণ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইহার জন্য গুরুদেব
বিমান কোম্পানী আশ্বার অতিশয় প্রসঙ্গা পাও করিয়াছে।
বিশেষ পাঠ্যার্থের মধ্যে আশ্বার যাত্রা বেশ হইবে। তাঁহাদের
যত ও শ্রীতির জন্য আশ্বি এই চক্ৰাঙ্গীকে ধন্যবাদ তাগন
করিলাম। আশ্বার এই কক্ষে এই প্রকার সুদীর্ঘ যাত্রা অতিশয়
করা কেবল কে-এল-এমএই মতব হইবে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অভিজ্ঞ বিমান যাত্রীর প্রিয়

KLM
ROYAL DUTCH
AIRLINES

৫.৩.৯.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. বাংলা ভাষা ও বিজ্ঞাপনের সম্পর্কটি নিজের ভাষায় লেখো।
২. বিজ্ঞাপনে বাংলা ভাষার প্রয়োগ বিষয়ে একটি নিবন্ধ রচনা করো।
৩. বিজ্ঞাপন কী? বিজ্ঞাপনের ইতিবৃত্ত লেখো।
৪. বাংলা বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান আলোচনা করো।

৫.৩.৯.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
২. ভাষার ইতিবৃত্ত—সুকুমার সেন।
৩. বাংলা ভাষা পরিক্রমা (প্রথম খণ্ড)—পরেশচন্দ্র মজুমদার।
৪. সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা—রামেশ্বর শ।
৫. বাংলা ভাষাবিজ্ঞান অভিধান—অলিভা দাক্ষী।
৬. ভাষা : প্রয়োগে ব্যবহারে—সুখেন বিশ্বাস (সম্পাদিত)।

পর্যায় গ্রন্থ - ৪
নাটক ও নাট্যমঞ্চ
একক ১০
মুক্তধারা

বিন্যাসক্রম

- ৫.৪.১০.১ : রচনাকাল
৫.৪.১০.২ : প্রেক্ষাপট
৫.৪.১০.৩ : নাট্যবস্তু
৫.৪.১০.৪ : জনচরিত্র
৫.৪.১০.৫ : রূপক-সাংকেতিক নাটক
৫.৪.১০.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলি
৫.৪.১০.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৫.৪.১০.১ : রচনাকাল

১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি পৌষসংক্রান্তির দিন মুক্তধারা রচনা শেষ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এক সপ্তাহ ধরে নাটকটি লেখেন এবং শেষ করার পরদিনই আশ্রমবাসীদের পড়ে শোনান; একবার নয়, দু'বার। এরপর প্রকাশিত হয় মুক্তধারা।

৫.৪.১০.২ : প্রেক্ষাপট

১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১২ মে থেকে ১৯২১ এর ১৬ জুলাই প্রায় চৌদ্দ মাস যাবৎ রবীন্দ্রনাথ ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন বিশ্বের নানা প্রান্তে — ইংল্যান্ডে, প্যারিসে, নেদারল্যান্ডসে, বেলজিয়ামে, আমেরিকায়। এর আগে তিনি দেখে এসেছেন জাপান। এই পর্বে তিনি বিশেষভাবে চিন্তাযুক্ত নিজের দেশের অসহযোগ নিয়ে, চিন্তামগ্ন বিশ্বভারতী বিষয়ে।

১৯২১ এর ডিসেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ বিশ্রামের জন্য যান শিলাইদহতে এবং সেখানে দিন সাতেক থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথ লেখেন মুক্তধারা; জানান রাণু অধিকারীকে, ‘আমি ছোট

একটি নাটক লিখতে আরম্ভ করেছি’। স্বদেশে এই নাটকটি সমাদৃত হবে কিনা, এ বিষয়ে কুণ্ঠা ছিল রবীন্দ্রনাথের। তিনি প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশকে লিখেছিলেন একটি চিঠিতে, ডাকঘর নাটকে ‘চিরকাল এর যে বেদনাটি আছে দেশে তা কারোর কানে পৌঁছায়নি, কিন্তু বিদেশের সর্বত্র তার সমাদর হয়েছে। এই পথ-মুক্তি নাটকটাও সেখানে সকলে গ্রহণ করবে।’

আসলে যন্ত্রসভ্যতাকে নিয়ে উদ্ভিগ্ন রবীন্দ্রনাথ, যন্ত্র এবং মানবতার মধ্যে যে সংঘাত লক্ষ্য করেছিলেন তিনি, যে যন্ত্রের নিষ্ঠুর পেষণে মানুষ দানবতা-আক্রান্ত, তার বিরোধিতা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন মুক্তধারা, রক্তকরবী। এ-কথা ঠিকই, মুক্তধারার ভারকেন্দ্র এই একটি বিষয় নয়, এটিকে কাহিনিসূত্র করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাবনাকে ছড়িয়ে ফেলেছেন নানা দিকে; তবুও এই যন্ত্র অর্থাৎ বাঁধ নির্মাণ এবং বাঁধ-ভাঙা — এই ঘটনার ওপরেই তো মূল গল্পের কাঠামো নির্মিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও জোনিয়েছেন ‘machine এই নাটকের একটা অংশ। এই যন্ত্র প্রাণকে আঘাত করছে, অতএব প্রাণ দিয়েই সেই যন্ত্রকে অভিজিৎ ভেঙেছে, যন্ত্র দিয়ে নয়।’ এরপরে রবীন্দ্রনাথ ওই চিঠিতে যন্ত্রের প্রতীকী তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন।

বিদেশ পরিভ্রমণপর্বে যন্ত্রের এই গ্রাস পীড়িত করেছিল তাঁকে। এ-কথাও ভাবা যেতে পারে যে এই সময়ে তিনি দেখেছিলেন বড়ো বড়ো বাঁধ নির্মাণ করে কীভাবে সহজ জলস্রোত রোধ করা হচ্ছিল। প্রকৃতির সহজ চলার ছন্দপতন ঘটছিল। হয়তো বা তাঁর সহজাত দার্শনিক এবং কাব্যময় চেতনায় এই বাঁধই প্রতীকরূপে প্রতীয়মান হয়েছিল। শিল্পবিপ্লবের পর থেকে ইংল্যান্ডে ও ইটালিতে, অনেক বড়ো বাঁধ তৈরি হয়েছিল। ১৯০০ সাল নাগাদ শিল্পাঞ্চলকে কেন্দ্র করে ইংল্যান্ডে তৈরি হয় প্রায় ২০০টি বাঁধ। ১৯১১ সালে আমেরিকায় অস্টিন নামে এক পার্বত্য শহরে বাঁধ ভেঙে বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। সেই বাঁধে ছিল ফাটল, তার ফলেই সেই বিপর্যয় হতে পেরেছিল। এ-ঘটনার সঙ্গে ‘মুক্তধারা’র কাহিনীর দূর-সম্পর্ক কল্পনা বোধহয় খুব অযৌক্তিক হবে না।

৫.৪.১০.৩ : নাট্যবস্তু

পার্বত্য প্রদেশ উত্তরকুটের রাজা রণজিতের সভার যন্ত্ররাজ বিভূতি পঁচিশ বছরের চেষ্টায় বাঁধ নির্মাণ করে, মুক্তধারার ঝরণাকে বেঁধে, এনেছেন আপন আয়ত্তে। বিদ্রোহী শিবতরাই জনপদের প্রজাদের আয়ত্তে আনতে না পেরে সেই রাজ্যের জল সরবরাহের পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। নাটকের পট-উন্মোচন সেই অভ্রভেদী অসুরোপম দানবরূপী বাঁধের লৌহযন্ত্র দিয়ে। মন্দিরের প্রতিস্পর্শী এই যন্ত্র। ভৈরবমন্ড্রে দীক্ষিত সন্ন্যাসীরা যন্ত্রের কাছে নতজানু।

প্রকৃতির অকৃপণ উজাড় করা দান হঠাৎ রুদ্ধ হয়েছে এই বাঁধ নির্মাণে। মানবশক্তি গ্রাস করেছে মানবকল্যাণ। নাগরিক—পথিকের কথোপকথনে যন্ত্রের স্বরূপ ক্রমশ উন্মোচিত হয়—‘মাংস নেই, চোয়াল ঝোলা’। বিধ্বস্ত অস্রা, সে ছেলে সুমুনের খোঁজে। মুক্তধারার বাঁধ বাঁধতে গিয়েছিল তার ছেলে সুমন, আর সে ফেরেনি।

এদিকে উত্তরকুটের যুবরাজ অভিজিৎকে নিয়ে রাজা বিভ্রান্ত। সে রাজার নিজের পুত্র নয়, মুক্তধারা ঝরণাতলায় কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল তাকে। তার কথায় পাই বাঁধনছেঁড়া সুর—‘আমার জীবনের স্রোত রাজবাড়ির পাথর ডিঙিয়ে চলে যাবে এই কথাটা কানে নিয়েই পৃথিবীতে এসেছি।’

একসময় অভিজিৎ সংঘাত-বিরোধ-আপোষের প্রেক্ষিতে ‘বন্দী’ হয়ে রাজার বন্দিশালায়। মোহনগড়ের রাজ খুড়ো মহারাজ বিশ্বজিতের কৌশলে অভিজিৎ মক্তি পান। এমন সময় কুমার সঞ্জয় সংবাদ আনে—‘অভিজিৎ মুক্তধারার বাঁধ ভেঙেছেন। মুক্ত ধারার স্রোতে তাঁকে নিয়ে গেল, আমরা তাঁকে পেলুম না।’ এখানেই নাটকের সমাপ্তি।

৫.৪.১০.৪ : জনচরিত্র

পথের ওপর নাটকটি জমাট বাঁধতে থাকে। উত্তরকূট ও শিবতরাই এর সাধারণ মানুষের বাকবিতণ্ডায় নাটক জমে ওঠে। পথিক এবং নাগরিকের সংলাপে গল্প শুরু হয়। উত্তরকূটের নাগরিকেরা পুজোর সমারোহে মুখর। অন্যপক্ষে শিবতরাই-এর প্রজাদের মনে ক্রমশ বিরোধ ঘনায়। উত্তরকূট ও শিবতরাই-এর সংঘাত স্পষ্ট হয় এদের হাসিঠাট্টায়। শিবতরাই প্রশ্ন করে, ‘পিপাসার জল বিভূতির হাতে? হঠাৎ সে দেবতা হয়ে উঠল নাকি?’ উত্তরকূট উত্তর দেয়, ‘দেবতাক ছুটি দিয়ে দেবতার কাজ নিজেই চালিয়ে নেবে।’ গণেশ বিভূতির দেবতাকে ব্যঙ্গ করে, শিবতরাই বিদ্রোপবাক্যে বলে ওঠে, উত্তরকূট ওদের মরণ কামনা করে।

➤ অম্মা ও বটুক (বটু)

জনচরিত্রের মধ্যে বিশেষ জনাই গাঁয়ের অম্মা, বটুক বুড়ো যার গায়ে ছেঁড়া কম্বল, হাতে বাঁকা ডালের লাঠি, চুল উসকোখুসকো। অম্মা তার সন্তান সুমনকে হারিয়েছে, বটুক হারিয়েছে তার দুই ‘জোয়ান’ নাতিকে। সহজ সরল অম্মা নিজের উপলব্ধিতে কিছু সহজ কথা বলে; বটুক বুড়ো অনেক বেশি সচেতন। সকলকে সে সাবধান করে বলে, ‘সাবধান, বাবা, সাবধান, যেয়ো না ও পথে।’ উত্তরের ভৈরবের মন্দির তৃষ্ণাদানবীর দখলে —এ-কথা চিৎকার করে বটুক জানিয়ে দেয় সকলকে। তার নাতিদের কেন বলি দেওয়া হয়েছে — সেটাও তার কাছে স্পষ্ট — ‘প্রাণের বদলে প্রাণ যদি না মেলে, মৃত্যু দিয়ে যদি মৃত্যুকেই ডাকা হয়, তবে ভৈরব এত বড়ো ক্ষতি সইবেন কেন?’ অর্থাৎ মৃত্যু যদি জীবনের ইঙ্গিত না হয়, তাহলে তো পৃথিবী ক্রমশ শূন্যতার দিকে এগিয়ে যাবে। এজন্যই বটুকের জোয়ান নাতির মৃত্যু ভয়াবহ এবং মর্মান্তিক। বটুক যেন অনেকটা ‘বিবেক’।

➤ ছাত্র এবং গুরুমশায়

উত্তরকূটের গুরুমশায় রাজভক্ত; কখনও অমান্য করেন না রাজা রণজিৎকে। জ্ঞাতসারে-অজ্ঞাতসারে, চেতনে-অচেতনে গুরুমশায় রাজার ‘দাস’। ছাত্ররা গুরুর প্রতিধ্বনি, প্রতিচ্ছায়া। গুরুর অসমাপ্ত কথা ছাত্ররা সম্পূর্ণ করে। গুরুমশায়ের ‘দাসত্ব’, প্রশ্নহীন রাজ-আনুগত্য এবং যান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রকট করে এই কথোপকথন। গুরু চান, ‘উত্তরকূটের গৌরবে’ ছাত্ররা যেন ‘শিশুকাল হতেই গৌরব করতে শেখে’। তাই তিনি যম্বরাজ বিভূতির শিরোপা পাওয়ার অনুষ্ঠানে ছাত্রদের নিয়ে চলেছেন।

অল্প সময়ের জন্য গুরু-ছাত্রদের প্রবেশ, কিন্তু গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ ছাত্ররা উত্তরকূটের ভবিষ্যৎ নাগরিক এবং তাদের যথার্থ নাগরিক তৈরি করার দায়দায়িত্ব গুরুমশাইয়ের। সেই গুরু এবং ছাত্রদের দল যখন অন্ধ অনুকরণে চোখবাঁধা হয়ে গড্ডালিকা প্রবাহে এগিয় চলে, যখন তারা প্রশ্নহীন হয়ে যায়।

➤ ধনঞ্জয় বৈরাগী

মুক্তধারা নাটকে শিবতরাই এর প্রজাদের পুরোধা হলেন ধনঞ্জয় বৈরাগী। ‘আমি মারের সাগর পাড়ি দেব’ গান গাইতে গাইতে বৈরাগী প্রবেশ করেন মঞ্চে। ধনঞ্জয় বৈরাগী রবীন্দ্রনাথের অহিংসনীতির প্রতীক। কবি বহুদিন ধরেই চাইছিলেন যে ভারতের যিনি নায়ক হবেন, তিনি হবেন সর্বত্যাগী, ফকির। সেই আদর্শায়িত নেতার মূর্তি হল ধনঞ্জয় বৈরাগী।

করবন্ধ, শাস্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে রাজশক্তির অন্যায়ের বিরোধিতা ও তার জন্য কষ্ট বরণের যে চিত্র ধনঞ্জয় বৈরাগী চরিত্রে ফুটে উঠেছে, তার সঙ্গে গন্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সাদৃশ্য খোঁজা অস্বাভাবিক নয়।

➤ অভিজিৎ ও অন্যান্য

অভিজিৎ রাজার পালিত পুত্র। রাজচক্রবর্তী লক্ষণ দেখে মুক্তধারার ঝরণাতলা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু তার রাজবিরোধী কার্যকলাপে রাজা যারপরনাই অনুশোচনাগ্রস্ত। নিজের আত্মহুতি দিয়ে রাজদণ্ডের প্রতীক ‘মুক্তধার বাঁধ’ ভেঙে সে শিবতরাইকে রাজ ‘দণ্ড’ থেকে মুক্ত করে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ‘প্রাণের দ্বারা যন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে, মুক্তি দিতে হবে।’ অভিজিৎ হল লেখকের ভাষায় ‘মানুষ’।

রণজিৎ বিরক্ত মোহনগড়ের রাজা খুড়ো বিশ্বজিতের উপর। কারণ ‘অভিজিৎকে নষ্ট করার দলে উনি অগ্রগণ্য।’ বিশ্বজিৎ যেন শুভ্রতার প্রতীক — শুভ্র কেশ, শুভ্র বস্ত্র, শুভ্র উষ্ণীষ তাঁর। রাজাকে ভৎসনা করেন খুড়ো, বাঁধ নির্মাণের বিরোধিতা করেন। উত্তরভৈরবের পূজো গ্রহণ করবেন না দেবতা এমন কথা বলেন বিশ্বজিৎ। অভিজিতের মধ্যে তিনি দেখতে পেতেন — ‘ভাবীকালের পথ’, ‘দূরকে নিকট করবার পথ’।

সঞ্জয় অভিজিতের অনুগামী। অভিজিৎ অনুগমনকে প্রশ্রয় দিতে চায় না, তবুও সঞ্জয় থাকেন তাঁর সঙ্গে। অভিজিৎ এর মৃত্যু সংবাদ বয়ে আনেন সঞ্জয়।

➤ বিভূতি

বিভূতি যন্ত্ররাজ, উত্তরকূটের রাজসভার অন্যতম ক্ষমতাকেন্দ্র; পঁচিশ বছরের চেষ্ঠায় অসাধ্য সাধন করেছেন এই যন্ত্রী; মুক্তধারা ঝরণায় বাঁধ তৈরি করেছেন। বিভূতি এবং যন্ত্র এখানে একাকার, যেন বিভীষিকা। বিকটদর্শন অসুরোপমযন্ত্র আসলে বিভূতির নির্মমতাকেই প্রকট করেছে। বিভূতি সৃষ্টির আনন্দে মত্ত। কত মানুষের প্রাণ গেল, তাতে বিচলিত নন তিনি। বাঁধ সম্পূর্ণ করার জন্য এ প্রাণদান তো সঙ্গত এবং স্বাভাবিক — মনটাই তাঁর মত। বড়ো কাজের জন্য এমন নরবলি তো অনায়াস নয়! স্লাম্বা বোধ করেছেন তিনি এই ভেবে যে ‘কত মায়ের অভিশাপের উপর আমার যন্ত্র জয়ী হয়েছে। দৈবশক্তির সঙ্গে যার লড়াই, মানুষের অভিশাপকে সে গ্রাহ্য করে?’

৫.৪.১০.৫ : রূপক-সাংকেতিক নাটক

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন বিখ্যাত নাট্যকার। নাট্যসাহিত্যেও তিনি একজন কালজয়ী পুরুষ। অনেক বিখ্যাত নাটক বাংলা সাহিত্যকে উপহার দিয়েছেন তিনি। তার মধ্যে অন্যতম হলো তাঁর বিখ্যাত সাংকেতিক নাটক ‘মুক্তধারা’।

এই নাটকের নামকরণ করেন রবীন্দ্রনাথ বহুবাব — পথ, পথমোচন, মুক্তধারা। দ্বিতীয় বারের পর নাটকটির নাম দেন ‘মুক্তধারা’। সারাজীবন তাঁর মুক্তমনা স্বাবের পরিচয় আমরা পাই। কোনোরকম বন্ধনে বেঁধে থাকার মানুষ রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না। তাঁর মুক্ত স্বভাবের একটি বিখ্যাত নিদর্শন হলো বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। মুক্তধারা নাটকটি বিখ্যাত একটি সাংকেতিক নাটক। মুক্তধারা আসলে একটি ঝরণা। যার জলে উত্তরকূট ও শিবতরাইয়ের মানুষ পুষ্ট। যার জলে শিবতরাইয়ের মানুষ খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকত। আর সেই মুক্তধারার পায়ে লোহার শিকল পড়িয়ে দিয়েছে যন্ত্ররাজ বিভূতি। শিবতরাইয়ের মানুষকে শাস্তি দেবে বলে। হিংসার এক রাজনৈতিক প্রসঙ্গও রবীন্দ্রনাথ এনেছেন। কিছু মানুষের কষ্ট ও হাহাকার এই নাটকটিতে ফুটে উঠেছে। প্রকৃতির পায়ে শিকল পরিয়ে বিভূতি সকল শিবতরাইবাসীকে চরম কষ্টের মুখে ফেলেছিল। তাদের মুখের অন্ন, জল বিভূতি কেড়ে নিতে চায়। কিন্তু উত্তরকূটের যুবরাজ রাজা রঞ্জিতের পুত্র অভিজিৎ তা হতে দেয় না।

অভিজিৎ মুক্তমনা। পথের থেকে যে ডাক এসেছে সেই ডাক সে অগ্রাহ্য করতে পারে না। বেরিয়ে পরে পথে। স্বর্গ থেকে ঝরে পড়ছে যে অমৃত সুখ তাকে মুক্ত করতে। শিবতরাইবাসীর মধ্যে সেই জল পৌঁছে দিতে। শেষ পর্যন্ত নিজের জীবন দিয়ে তা প্রমাণ করেন অভিজিৎ। মুক্তধারাকে মুক্ত করে সে। বিভূতির বসানো শিকলের আঘাতেমারা যায় অভিজিৎ। ভেসে যায় ঝর্ণার জলের স্রোতে। নিজের জীবনের বদলে হাজারো মানুষের প্রাণ বাঁচান তিনি।

আসলে অভিজিৎ কোনো কিছুতে ভয় পেত না। ও পথে বেরোবার ডাক পেয়েছিল। বহু বছরের সাধনায় বিভূতি যে বাঁধটা তৈরি করেছিলেন তাতে লেগেছিল হাজার যৌবনের ক্লান্ত নিশ্বাস। এই বাঁধ তৈরি করতে উত্তরকূটের প্রতিটি ঘরের ১৮ বছরের উর্ধ্ব ছেলেরে কাজে লাগানো হয়েছিল। তাদের বেশিরভাগ কেউই আর ঘরে ফেরেনি। যৌবনের তাজা রক্ত জলে ভাসিয়ে দিয়ে বিভূতি সেদিন গড়ে তুলেছিল এই বাঁধ। বহু মায়ের কোল খালি হয়েগিয়েছিল সেদিন। তারমধ্যে অন্যতম অস্বাভাবিক ছিল সুমন। যাকে অস্বাভাবিক আজও খুঁজছে। নাটকটিতে রবীন্দ্রনাথ একটি মুক্তির বার্তা এনেছেন। তাইতো তাঁর নাটকের নাম ‘মুক্তধারা’। প্রকৃতির কোনোকিছুকেই বেঁধে রাখা যায় না। প্রকৃতি মুক্ত। তাই বিভূতির বহু বছরের প্রচেষ্টা এক লহমায় ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে যুবরাজ অভিজিৎ।

এই পথের শেষ কোথায় তা কেউ জানে না। শুধু পথ হাঁটা তার স্বভাব। কখনই কোনো বাধা অভিজিতকে বাঁধতে পারেনি। কারণ অভিজিৎ মুক্তধারারই কোলার সন্তান। কোনো মা তাকে জন্ম দিয়ে ওই ঝরণাতলায় ফেলে রেখে গিয়েছিলো। রাজা রঞ্জিৎ তাকে পালন করেছেন মাত্র। এই কথাটি কোনো কারণে অভিজিৎ জেনে যায় এবং তারপরই সে মুক্তধারার পায়ের শিকল খুলতে পথে বেরিয়ে পরে। এ যেন কোনো সন্তানের নিজের মায়ের প্রাণ রক্ষা করার আশ্রয় চেষ্টা এবং সেই চেষ্টায় সফল হয়ে শিবতরাইয়ের মানুষের জীবন বাঁচানো।

লোহার বাঁধ ভাঙতে গিয়ে অভিজিৎ আহত হলেন এবং মুক্তধারা মা তাঁর আহত দেহটাকে কোলে তুলে নিয়ে গেল। ঘুচে গেল সব বন্ধন। আপন প্রাণে খিলখিল করে হাসতে হাসতে ছুটে গেল মুক্তধারা। বাংলা সাহিত্যের একটি বিখ্যাত নাটক রবীন্দ্রনাথের ‘মুক্তধারা’। শুধু বাংলা ভাষাতেই নয় রবীন্দ্রনাথ নাটকটির ইংরাজি অনুবাদও করেন। নাম দেন ‘The waterfall’. ‘সাংকেতিক নাটক’ বা ‘symbolic drama’ হিসাবে এটি একটি বিখ্যাত নাটক।

৫.৪.১০.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

- ১) ‘মুক্তধারা’ নাটকটি নাট্যকার কখন রচনা করেন?
- ২) নাটকটির নাম ‘মুক্তধারা’ হলো কেন নাট্যবস্তুর আলোকে তা বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দাও।
- ৩) নাটকের প্রেক্ষাপট হিসাবে ‘মুক্তধারা’ নাটকের প্রেক্ষাপটের গুরুত্ব নির্ণয় করো।
- ৪) মুক্তধারা নাটকটি নাট্যকারের কোন অভিপ্রায় সিদ্ধ করেছে বলে তোমার মনে হয়।
- ৫) ‘রূপক-সাংকেতিক’ নাটক হিসাবে ‘মুক্তধারা’ কতদূর সার্থক হয়েছে বলে তুমি মনে করো।
- ৬) ‘মুক্তধারা’ নাটকের চরিত্রগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

৫.৪.১০.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

- ১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত ‘মুক্তধারা’ (১৯২২)—বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।
- ২) রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা — নীহাররঞ্জন রায়।
- ৩) রবীন্দ্রজীবনী — প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।
- ৪) রবীন্দ্রজীবনী — প্রশান্তকুমার পাল।
- ৫) রবীন্দ্র নাট্য-পরিক্রমা — উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।
- ৬) রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ — প্রমথনাথ বিশী।
- ৭) রবি প্রদক্ষিণ — মোহিতলাল মজুমদার।
- ৮) কাব্য পরিক্রমা — অজিতকুমার চক্রবর্তী।
- ৯) রবীন্দ্র সৃষ্টি সমীক্ষা — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

একক ১১

মেবার পতন

বিন্যাসক্রম

- ৫.৪.১১.১ : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
- ৫.৪.১১.২ : মেবার পতন
- ৫.৪.১১.৩ : নাট্যবস্তু
- ৫.৪.১১.৩ : ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
- ৫.৪.১১.৪ : প্লট
- ৫.৪.১১.৫ : চরিত্র
- ৫.৪.১১.৬ : স্বদেশচেতনা
- ৫.৪.১১.৭ : উপসংহার
- ৫.৪.১১.৮ : আদর্শ প্রশ্নাবলি
- ৫.৪.১১.৯ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৫.৪.১১.১ : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩–১৯১৩) কবি, নাট্যকার, গীতিকার। ১৯৬৩ সালের ১৯ জুলাই পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে তাঁর জন্ম। পিতা সুকণ্ঠ গায়ক কার্তিকেয়চন্দ্র রায় ছিলেন কৃষ্ণনগরের দেওয়ান এবং মাতা প্রসন্নময়ী দেবী ছিলেন অদ্বৈত প্রভুর বংশধর। তাঁর দুই অগ্রজ রাজেন্দ্রলাল ও হরেন্দ্রলাল এবং এক ভ্রাতৃজায়াও সাহিত্যিক হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল হুগলি কলেজ থেকে বিএ এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ (১৮৮৪) পাস করেন। এরপরে কিছুদিন চাকরি করে তিনি সরকারি বৃত্তি নিয়ে কৃষিবিদ্যা শেখার জন্য লণ্ডন যান এবং সেখানে ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত অবস্থান করেন। লণ্ডনের সিসিটার কলেজ থেকে তিনি কৃষিবিদ্যায় এফ.আর.এ.এস. ডিগ্রি এবং রয়েল এগ্রিকালচারাল কলেজ ও এগ্রিকালচারাল সোসাইটির এম.আর.এ.সি ও এম.আর.এস.এ উপাধি লাভ করেন। বিলেত থেকে ফিরে তিনি মধ্যপ্রদেশে জরিপ ও রাজস্ব নিরূপণ ট্রেনিং নেন এবং সরকারি ডেপুটির চাকরি পান; পরি তিনি দিনাজপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন।

দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন একজন স্বাধীনচেতা মানুষ; এজন্য কর্মক্ষেত্রে তিনি অনেক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। ১৮৯০ সালে বর্ধমান এস্টেটের সুজামুটা পরগণায় সেটেলমেন্ট অফিসারের দায়িত্ব পালনকালে তিনি

প্রজাদের স্বার্থে ছোটলাটের বিরোধিতা করতে কুণ্ঠিত হননি। বিলেত থেকে ফেরার পর প্রায়শ্চিত্ত করার প্রশ্ন উঠলে তিনি তা অস্বীকার করেন এবং এজন্য তাঁকে অনেক বিড়ম্বনা সহিতে হয়। সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনা আছে তাঁর একঘরে (১৮৮৯) নামক পুস্তিকায়।

দ্বিজেন্দ্রলাল ১৯০৫ সালে কলকাতায় ‘পূর্ণিমা মিলন’ নামে একটি সাহিত্যিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এটি তখনকার শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসেবী বাঙালিদের তীর্থস্থানে পরিণত হয়। এ সময় তিনি ‘ইভনিং ক্লাব’ নামে অপর একটি সংগঠনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন এবং এর মাধ্যমে তিনি প্রথম অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। বিলেতে থাকা অবস্থায় তিনি সেখানকার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয়-কৌশল ও রঙ্গালয়-ব্যবস্থা নিকট থেকে পর্যবেক্ষণ করেন, যা পরবর্তীকালে নাটক রচনা ও অভিনয়ে তাঁকে গভীরভাবে সহায়তা করে।

দ্বিজেন্দ্রলাল কৈশোরেই কাব্যচর্চা শুরু করেন। ছাত্র জীবনে তাঁর আর্য্যগাথা (১ম ভাগ, ১৮৮২) এবং বিলেতে থাকাকালে Lyrics of Ind (১৮৮৬) কাব্য প্রকাশিত হয়। ১৯০৩ সাল পর্যন্ত তিনি মূলতঃ কাব্যই রচনা করেন এবং এ সময় পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ বারোটি।

এর মধ্যে প্রহসন, কাব্যনাট্য, ব্যঙ্গ ও রহস্যরসাত্মক কবিতাও রয়েছে। জীবনের শেষ দশ বছর তিনি প্রধানত নাটক রচনা করেন। পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক সব ধরনের নাটক রচনায়ই তিনি অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে তাঁর মধ্যে যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়েছিল, ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে তার প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি ষোলোটি নাটক রচনা করেন। তাঁর প্রবন্ধমূলক রচনাগুলিও অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে। দ্বিজেন্দ্রলালের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হলো : কাব্য আর্য্যগাথা (২য় ভাগ, ১৮৯৩), মদ্র (১৯০২), আলেখ্য (১৯০৭), ত্রিবেণী (১৯১২); নকশা-প্রহসন একঘরে (১৮৮৯), সমাজ-বিদ্রাট ও কঙ্কি অবতার (১৮৯৫), ত্র্যহস্পর্শ (১৯০০), প্রায়শ্চিত্ত (১৯০২), পুনর্জন্ম (১৯১১), পৌরাণিক নাটক পাষাণী (১৯০০), সীতা (১৯০৮), ভীষ্ম (১৯১৪); সামাজিক নাটক পরপারে (১৯১২), বঙ্গনারী (১৯১৬); ঐতিহাসিক নাটক তারাবাদী (১৯০৩), রাণা প্রতাপসিংহ (১৯০৫), মেবার-পতন (১৯০৮), নূরজাহান (১৯০৮), সাজাহান (১৯০৯), চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১); প্রবন্ধগ্রন্থ কালিদাস ও ভবভূতি (১৯১০-১১) প্রভৃতি। ঐতিহাসিক নাটক রচনার জন্য তিনি যশস্বী হয়ে আছেন। তাঁর অধিকাংশ নাটক কলকাতা ও তার বাইরে সফলভাবে মঞ্চস্থ হয়। সাহিত্যকর্ম হিসেবে তাঁর অনেক নাটক উচ্চশিক্ষার পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়েছে।

৫.৪.১১.২ : মেবার পতন

‘নূরজাহান’ এর পরের ঐতিহাসিক নাটক ‘মেবার পতন’ (২৭ ডিসেম্বর, ১৯০৮)। ‘প্রতাপসিংহ’ নাটকে যার সূত্রপাত ‘মেবার পতন’ নাটকে তারই পরিসমাপ্তি ঘটেছে। ঘটনার দিক থেকে ‘মেবার পতন’কে ‘প্রতাপসিংহ’ নাটকের পরিশিষ্ট বলা যায়। যদিও দুটি নাটকের আঙ্গান স্বতন্ত্র। ‘প্রতাপসিংহ’ নাটকে চরিত্রগুলির মাধ্যমে নাট্যকারের আদর্শবাদ ধ্বনিত হয়েছে, কিন্তু ইতিহাসকে অতিক্রম করে নাট্যকারের উদ্দেশ্য প্রাধান্য লাভ করেনি। অপরপক্ষে ‘মেবার পতন’ নাটকে নাট্যকারের উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রচারধর্মিতাই মুখ্যস্থান অধিকার করেছে। নাট্যকার গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন মইকেল মধুসূদন দত্তকে।

নাটকের ভূমিকায় শিল্পী স্বয়ং বলেছিলেন, “এই নাটকে আমি এক মহানীতি লইয়া বসিয়াছি; সে নীতি বিশ্বপ্রেম। কল্যাণী, সত্যবতী ও মানসী—এই তিনটি চরিত্র যথাক্রমে দাম্পত্যপ্রেম, জাতীয় প্রেম এবং বিশ্বপ্রেমের মূর্তিরূপে কল্পিত হইয়াছে। এই নাটকে ইহাই কীর্তিত হইয়াছে যে বিশ্বপ্রীতিই সর্বাপেক্ষা গরীয়সী।”

৫.৪.১১.৩ : নাট্যবস্তু

এই নাটকের পটভূমিকা এক সূর্যকরোজ্জ্বল গৌরবদীপ্ত জীবনের অপরাহ্নিক বেদনার ছায়ায় ভরে উঠেছে। মেবারপতনের দুর্যোগঘন পটভূমিকা, অসুগমনোন্মুখ স্বাধীনতাসূর্যের শেষ রশ্মি নট্যকার নিজের ভাবসত্যের দ্বারা মণ্ডিত করেছেন। প্রতাপসিংহের কীর্তিভাস্বর জীবনের সংগ্রামশীল অধ্যায়ের মধ্যে জাতীয় জীবনে যে দুর্বীর প্রাণাবেগ সঞ্চারিত হয়েছিল, অমর সিংহের সময় তা ভাটায় পরিণত হয়েছে। রণক্লান্ত জাতি দীর্ঘ সতেরো বছরের যুদ্ধবিমুখ জীবন অতিবাহিত করার পর নিশ্চিত আলস্যে তার সেই দুর্জয় প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। মোগল আক্রমণে রাজস্থানের ভাগ্যকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন, স্বয়ং রানা যুদ্ধবিমুখ। গোবিন্দ সিংহের উৎসাহব্যঞ্জক বাণী, চারণীব্রতধারী সত্যবতীর অতীত মহিমার গান, অজয়সিংহের আত্মোৎসর্গ প্রভৃতি ঘটনা সেই ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুৎ দীপ্তিতে বিকশিত করেছে।

৫.৪.১১.৩ : ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

এই নাটকের রচনার কাল ব্রিটিশ বাংলায় মুক্তিরাজের উষ্মাধ্ব-বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের (১৯০৫-১৯১১) মধ্যভূমিতে। এসময় রামমোহন-বিদ্যাসাগর-মধুসূদনের সাধনায় ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নাগরিক বাঙালির জীবনলোকে রেনেসাঁসের যে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল, আলোচ্য স্বদেশী আন্দোলনেই তার সফল উদ্‌ঘাপন।

এর পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮), ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দ এবং তারও পরবর্তীকালের পৌনঃপুনিক অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দ এবং তার পরবর্তীকালে বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দা, সবকিছু মিলে ভারতের বৈপ্লবিক প্রয়াস ক্রমশ নাগরিক মধ্যবিত্ত আভিজাত্যের কেন্দ্রচ্যুত হয়ে নতুন পথে মোড় ফিরছিল। অর্থের এবং মানসিক সামর্থ্যের নবজাগরণিক মধ্যবিত্ত মূল্যচেতনার বিনাশ তাঁর এক প্রধান লক্ষণ। স্বদেশী আন্দোলনের কাল ছিল বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নাগরিক আদর্শবাদের মহত্তম পরিণতির যুগ। সেকালের কবি কল্পনা ঐ পরিণতির প্রত্যাশায় বর্ণাঢ্য রোমান্টিক স্বপ্নস্বর্গ রচনায় তন্ময় হয়েছিল।

আলোচ্য আন্দোলনকালে বাঙালির কল্পনা জাতি-প্রেমকে আশ্রয় করে বিশ্বপ্রেমে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছিল। রামমোহনের প্রাথমিক স্বদেশ-চিন্তাতেই বিশ্বনীতি কল্পনার স্পষ্ট অঙ্কুর আভাস প্রত্যক্ষ করেছি। স্বদেশীযুগে পরিবার-প্রেম, জাতি-প্রেম ও বিশ্বপ্রেমের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্ভাবনা আদর্শবাদী বাঙালি শিল্পীর স্বপ্ন কল্পনাকে আন্দোলিত করেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের আবেগতীর ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় করে সেই স্বপ্নরূপই কাব্য-মূর্তি ধরেছে ‘মেবার পতন’ এর নাটকীয় অবয়বে।

৫.৪.১১.৪ : প্লট

প্রথম থেকেই নাটকের গল্প পৌরুষ-দীপ্ত রাজপুত-স্বভাব হারিয়ে নারীকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবার প্রেমভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছে। গোটা প্লটের মধ্যে পর পর তিনটি দুর্ধর্ষ যুদ্ধের উল্লেখ রয়েছে। প্রথম দুটিতে যথাক্রমে হেদায়েৎ আলি ও আব্দুল্লাহর নেতৃত্বাধীন মুঘল সেনা সমুদ্রকে জয় করেছিল রাজপুত সেনাদল। তৃতীয়টিতে মহাবৎ খাঁর পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের মুখে মেবারের ভয়াবহ পতন। কিন্তু নাট্যঘটনার মধ্যে প্রথম দুটির প্রাসঙ্গিক সংবাদ ছাড়া কোনো প্রত্যক্ষ সংঘাতের প্রভাব পরিচয় নেই। বরং প্রথম যুদ্ধ উপলক্ষ্যে মানসী ও অজয়সিংহের রোমান্টিক প্রণয়কথা ঘনতর হয়েছে মানসীর সেবারতকে কেন্দ্র করে। বলাবাহুল্য সেবারতিনী মানসীর চরিত্রে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল সম্পর্কে সেকালের বাঙালি মনের স্বপ্নলি গরিমাবোধ আরোপিত হয়েছে। অপরপক্ষে যুদ্ধদৃশ্যে হেদায়েৎ আলি প্রসঙ্গ রাজপুত জীবন সংগ্রামের উদাত্ততার বদলে যুদ্ধ-প্রহসনের কৌতুককর ছবিই যেন এঁকেছে। দ্বিতীয় যুদ্ধ-চিত্রের যে সংকেত আভাসিত হয়েছে, দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে সায়েদ আব্দুল্লাহর শিবির চিত্রণে, তাতেও যুদ্ধঘটনার গুরুত্ব নেই একেবারেই। বরং সেই যুদ্ধ চিত্রকে পাশ কাটিয়ে সত্যবতী-সগরসিংহ-অরুণসিংহ সংবাদে এর একটি দেশপ্রেমস্বিচ্ছ পারিবারিক মিলনরসই উৎসারিত হতে পেরেছে।

তৃতীয় এবং শেষ যুদ্ধেও যুদ্ধের উদাত্ততা নেই, আছে হত্যার বিভীষিকা। সেই বীভৎস ধ্বংসচিত্রে রোমান্টিক করুণাঘন স্নিগ্ধতার প্রলেপ দিয়েছে অজয় সিংহের মৃত্যু, মহাবৎ-কল্যাণীর সাক্ষাৎকার, সবশেষে মৃত অজয়সিংহের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য প্রেমনিবেদনান্তে মানসীর বিশ্বপ্রেমিকা মূর্তি ধারণ : “যেমন স্বার্থ চাইতে জাতীয়ত্ব বড়, তেমনি জাতীয়ত্বের চেয়ে মনুষ্যত্ব বড়। জাতীয়ত্ব যদি মনুষ্যত্বের বিরোধী হয় ত মনুষ্যত্বের মহাসমুদ্রে জাতীয়ত্ব বিলীন হয়ে যাক্”। এ কেবল মানসীর উক্তি নয়, স্বদেশী আন্দোলনযুগের বাঙালি জীবনের চারণ দ্বিজেন্দ্রলাল মহামানবিক বিশ্বাসেরই প্রতিধ্বনি।

এছাড়া রাজপুত জাতীয়তার ঐতিহাসিক পরাভবের কারণ হিসাবে হিন্দুত্বের ‘অহংকার’কেই বড় করে তুলেছেন— “তুমি হিন্দু আমি মুসলমান, যে তুমি প্রপীড়িত আমি অত্যাচারী। শুদ্ধ মনে কর, যে তুমি মানুষ, আমি মানুষ, তুমি ভগ্নী—আমি ভাই।” মহাবৎ খাঁর এই উক্তি আসলে দ্বিজেন্দ্রলালের উদার জীবনবাদের কাব্যরূপ!

৫.৪.১১.৫ : চরিত্র

পুরুষ চরিত্র : রাণা অমরসিংহ (মেবারের রাণা)। সগরসিংহ (অমরসিংহের জ্যেষ্ঠতাত)। মহাবৎ খাঁ (মোগল-সেনাপতি, সগরসিংহের পুত্র)। অরুণসিংহ (সত্যবতীর পুত্র, মহাবৎ খাঁর ভাগিনেয়)। গোবিন্দসিংহ (রাণা অমরসিংহের সেনাপতি)। অজয়সিংহ (গোবিন্দসিংহের পুত্র)। হেদায়েৎ আলি খাঁ, আব্দুল্লাহ (মোগল সৈন্যাধ্যক্ষদ্বয়)। মহারাজ গজসিংহ (মাড়বারের অধিপতি)। ছসেন (হেদায়েৎ আলির অধীন কর্মচারী)।

স্ত্রী-চরিত্র : রাণী রুক্মিণী (রাণা অমরসিংহের স্ত্রী)। মানসী (অমরসিংহের কন্যা)। সত্যবতী (সগরসিংহের কন্যা)। কল্যাণী (মহাবৎ খাঁর স্ত্রী ও গোবিন্দসিংহের কন্যা)।

৫.৪.১১.৬ : স্বদেশচেতনা

মেবার পতন নাটকের প্লটের মধ্যে আমরা দেখলাম রাজপুত জীবনের ঐতিহাসিক প্রত্যয় পরিচয়কে ছাপিয়ে রেনেসাঁস — উত্তর বাংলার জীবন-প্রশ্নের ছবিই আগাগোড়া রূপ পেয়েছে।

চরিত্রায়ণের মধ্যেও রসেই বৈশিষ্ট্যই স্ব-প্রকাশ। কল্যাণীর অন্তর্ধর্মীয় প্রেম, মানসীর চির অপূর্ণ পূর্বরাগ, সত্যবতীর দেশগৌরবদীপ্ত মাতৃহৃৎ, সবকিছুর মধ্যেই দ্বিজেন্দ্রলালের যুগের স্বপ্নকল্যাণমাধুর্যময়ী নারীকেই প্রত্যক্ষ করি। কেবল চরিত্র-স্বভাবে নয়, বাচনভঙ্গিতেও।

পুরুষ চরিত্রগুলিতেও শিল্পীর যুগচেতনার ছাপই প্রধান। অমরসিংহের মধ্যে একটি উদার, পূর্বাপর বিচারশীল, সৌন্দর্য-প্রেমিক শিল্পী স্বভাবকেই প্রত্যক্ষ করি। পিতারূপে, শাসকরূপে, দ্বিজেন্দ্রলালের অপ্রমেয় অনুকম্পাপ্রবণ কবি-ব্যক্তিত্বেরই প্রতিভাস বলে মনে হয় চরিত্রটিকে। অজয় সিংহের মধ্যে প্রেমিক ও দেশপ্রেমিক-এর রোমান্টিক কল্পমূর্তি একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে। রাজপুত শৌর্য, আত্মত্যাগ ও উদাত্ততার মহিমা একটিমাত্র পুরুষ চরিত্রে প্রস্ফুট হতে দেখি, — শালস্বাপতি গোবিন্দসিংহ। আজীবন প্রতাপসিংহের দক্ষিণহস্ত ছিলেন, — বার্ষক্যে প্রতাপ-পুত্রের সাহায্য করতে কম্পিত হস্তে মৃত্যুবর্যী তরবারি ধারণ করেছেন বার বার। আদ্যন্ত স্বভাবে জাতিগৌরব, রাজপুত ঐতিহ্যবোধের পরস্পরবিরোধী সংকীর্ণতা, অন্তঃকোমল বহিঃকঠিন করুণাঘন দৃপ্ততা, সবকিছুই আদর্শ ‘মেবারী’ সমুচিত হয়েছে।

সবশেষে কবি নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশ বন্দনা দিয়ে শেষ করা যেতে পারে—“স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা”। এই স্বদেশ প্রেমিকের নাট্যকারের নাটকে চরিত্রায়ণের মধ্য দিয়ে স্বদেশচেতনা ধরা পড়েছে।

৫.৪.১১.৭ : উপসংহার

ইতিহাসের গল্পের পাশ্বে স্বদেশী আন্দোলন-যুগের বাঙালিকে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল নবজীবন-রস পান করিয়েছেন। সে যেমন স্বপ্নমন্দির, তেমনি আবশ্যন জাতীয় উদ্দীপনায় ভরা। দ্বিজেন্দ্রলালের যুগের ঐতিহাসিক জাতীয় প্রেরণায় রসরূপ হিসাবে ‘মেবার পতন’ সুডোল; ‘নূরজাহানে’র মতো এর কাব্যকাহিনি বহুধা-ব্যপ্ত শৈথিল্যে এলিয়ে পড়তে পারেনি। দেশ-কাল-ঘটনার ঐক্য কবি-কল্পনাকে সংহতি দিয়েছে। অন্যদিকে বহিঃসংঘাতের বদলে আন্তর আবিষ্তার ব্যঞ্জনা-প্রভাবে এক ভাবময় কাব্য-সুখমার সৃষ্টি হয়েছে। সবকিছু মিলে ‘মেবার পতন’ পূর্ণাঙ্গ নাটক না হলেও, লোভনীয় একটি নাট্য-কাব্য হয়ে উঠেছে।

৫.৪.১১.৮ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

- ১) মেবার পতন নাটকটির রচয়িতা কে?
- ২) মেবার পতন নাটকটি কোন ধরনের নাটক?
- ৩) মেবার পতন নাটকের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিচার করো।

- ৪) বাস্তব ইতিহাসের প্রেক্ষিতে মেবার পতন নাটকটির প্লট বিশ্লেষণ করো।
- ৫) মেবার পতন নাটকের স্বদেশচেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করো।

৫.৪.১১.৯ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

- ১) দ্বিজেন্দ্রলাল কবি ও নাট্যকার—রথীন্দ্রনাথ রায়।
- ২) দ্বিজেন্দ্রলাল রায় জীবন ও সাহিত্য — দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়।
- ৩) নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল — সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত।
- ৪) বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস — আশুতোষ ভট্টাচার্য।
- ৫) বাংলা নাটকের ইতিহাস — অজিত কুমার ঘোষ।
- ৬) বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা — বৈদ্যনাথ শীল।
- ৭) বাংলা নাটকের বিবর্তন — সুরেশ চন্দ্র মৈত্র।

একক ১২

নাট্যমঞ্চ

বিন্যাসক্রম

৫.৪.১২.১ : ভূমিকা

৫.৪.১২.২ : নাট্যমঞ্চের কালানুক্রমিক ইতিহাস

৫.৪.১২.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৫.৪.১২.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৫.৪.১২.১ : ভূমিকা

প্রথম বাংলা নাট্যমঞ্চ নির্মাণ করেন রুশ মনীষী লেবেদেফ। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার ডোমতলায় (বর্তমান এজরা স্ট্রিট) তিনি ‘বেঙ্গলী থিয়েটার’ স্থাপন করে ২৭ নভেম্বর কাল্পনিক সংবাদল নামক একটি বাংলা অনুবাদ-নাটক মঞ্চস্থ করেন। এর আগে কলকাতায় ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত দুটি নাট্যমঞ্চ ছিল, যেখানে কেবল ইংরেজি নাটকই অভিনীত হতো।

লেবেদেফের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে উনিশ শতকে বাঙালিরা কলকাতায় বেশ কয়েকটি নাট্যমঞ্চ নির্মাণ করেন, যেমন : হিন্দু থিয়েটার (১৮৩১), ওরিয়েন্টাল থিয়েটার (১৮৫৩), জোড়াসাঁকো নাট্যশালা (১৮৫৪), বিদ্যোৎসাহিনী মঞ্চ (১৮৫৭) ইত্যাদি। উনিশ শতকের শেষভাগে ঢাকায়ও কয়েকটি নাট্যমঞ্চ নির্মিত হয়, যেমন : পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি (১৮৬৫), ক্রাউন থিয়েটার মঞ্চ (১৮৯০-৯২ এর মধ্যে), ডায়মণ্ড জুবিলি থিয়েটার (১৮৯৭) ইত্যাদি। এ সময় মুন্সিগঞ্জ শহরে ‘জগদ্ধাত্রী নাট্যমঞ্চ’ নামে একটি মঞ্চ নির্মিত হয়, যা এখনও বর্তমান। বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে ঢাকার বাইরে বেশ কয়েকটি মঞ্চ নির্মিত হয়, যেমন : খুলনা থিয়েটার (১৯০৫), করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব (টাঙ্গাইল, ১৯১১) ইত্যাদি। এ সময় টাঙ্গাইলের সন্তোষ, এলোংগা, শিবপুর, আলোয়া ও করটিয়ার জমিদাররা বেশ কয়েকটি মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন।

৫.৪.১২.২ : নাট্যমঞ্চের কালানুক্রমিক ইতিহাস

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর ঢাকায় নির্মিত হয় মাহবুব আলী ইনস্টিটিউট (১৯৫০)। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দীর্ঘকাল যাবৎ ঢাকায় স্বতন্ত্র কোন নাট্যমঞ্চ নির্মিত না হলেও বেশ কয়েকটি সাধারণ মঞ্চ বিশেষভাবে নাট্যাভিনয়ের জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে, যেমন : মহিলা সমিতি মিলনায়তন, গাইড হাউস মিলনায়তন ইত্যাদি। সম্প্রতি ঢাকার গুলিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ৬০০ আসনবিশিষ্ট ‘ঢাকা মহানগর নাট্যমঞ্চ’। এখানে প্রধানত নাট্যাভিনয় হয়। এগুলি ছাড়া ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি সাধারণ মঞ্চে নাটকের

অভিনয় হয়, যেমন : ব্রিটিশ কাউন্সিল মিলনায়তন, গণগ্রন্থাগার মিলনায়তন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তন, কচিকাঁচা মিলনায়তন ওয়াপদা মিলনায়তন, অশ্বিনীকুমার টাউন হল (বরিশাল, ১৯৩০), জে. এম. সেন হল (চট্টগ্রাম), মুসলিম হল (চট্টগ্রাম), ইত্যাদি। উভয় বঙ্গের কয়েকটি প্রধান নাট্যমঞ্চের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো :—

এমারেন্ড থিয়েটার — ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কলুটোলা নিবাসী গোপাললাল শীল-এর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বহু অর্থ ব্যয় করে থিয়েটারের জন্য জাঁকজমকপূর্ণ দৃশ্যপট ও পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরি করান এবং গ্যাসের আলোর পরিবর্তে ডায়নামোর সাহায্যে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করেন। প্রতিষ্ঠা বছরেই ৮ অক্টোবর থিয়েটারের উদ্বোধন দিবসে কেদারলাল চৌধুরীর একখানি পৌরাণিক নাটক মঞ্চস্থ হয়; কিন্তু দক্ষ পরিচালনার অভাবে থিয়েটারের দর্শকসংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। এমতাবস্থায় গোপাল শীলের আমন্ত্রণে গিরিশচন্দ্র ঘোষ-এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং কয়েকখানি পুরাতন ও নতুন নাটক মঞ্চস্থ করেন। সেগুলির মধ্যে পূর্ণচন্দ্র ও বিষাদ খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

কিছুদিন পরে প্রখ্যাত মঞ্চাধ্যক্ষ ধর্মদাস সুর এর মঞ্চসজ্জায় নিযুক্ত হন। কিন্তু খেয়ালি মানুষ গোপাল শীল দু'বছরের মাথায় থিয়েটার বিক্রি করে দেন। তার পরেও বিভিন্ন মালিকানায় ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি পর্যন্ত এর কার্যক্রম অব্যাহত ছিল। কেদারলাল রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দীনবন্ধু মিত্র, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রায় ৪০ খানা নাটক এমারেন্ড থিয়েটারে অভিনীত হয়। এর প্রধান শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি, মহেন্দ্র বসু, রাধামাধব কর, মতিলাল সুর, বনবিহারিণী, ক্ষেত্রমণি, সুকুমারী, কুসুম, গুন্ডফন হরি প্রমুখ।

ওরিয়েন্টাল থিয়েটার — ১৮৫৩ সালে কলকাতার ২৬৮ নং গরানহাটা, চিৎপুরে গৌরমোহন আড়ির ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুল বাড়ির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধানত স্কুলের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্ররাই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতেন। শেক্সপীয়রের ওথেলো নাটকের অভিনয়ের জন্য মি. ক্রিঞ্জার ও মিসেস এলিস ছাত্রদের শিক্ষা দেন। প্রতিষ্ঠা বছরের ২৬ সেপ্টেম্বর নাটকটির প্রথম অভিনয় হয় এবং এর দ্বিতীয় অভিনয় হয় ৫ অক্টোবর।

১৮৫৪ সালের ২ ও ১৭ মার্চ ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয় মার্চেন্ট অফ ভেনিস। মিসেস গ্রেইগ নামে জনৈকা মহিলা 'পোর্সিয়া'র ভূমিকায় অভিনয় করেন। পরের বছর ১৫ ফেব্রুয়ারি শেক্সপীয়রের হেনরি ফোর্থ ও হেনরি পার্কার মেরিডিথের এ্যামেচার নাটক দুটি অভিনীত হয়। ১৮৫৭ সালের মে মাসে শেক্সপীয়রের আর একখানি নাটক অভিনয়ের বিবরণ প্রকাশিত হয় সংবাদ প্রভাকরে।

ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের ব্যয় নির্বাহ হতো টিকিট বিক্রয়ের অর্থ দিয়ে, যেহেতু এটি কোন বিত্তবানের প্রাসাদের থিয়েটার ছিল না। এর নাট্যভিনয়ের বিজ্ঞাপন এবং বিবরণসমূহ সংবাদ প্রভাকর, বেঙ্গল হরকরা, হিন্দু প্যাট্রিয়ট, দি মর্নিং ক্রনিকল, দি সিটিজেন ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হতো।

ক্রাউন থিয়েটার মঞ্চ — ১৮৯০ থেকে ১৮৯২ সালের মধ্যে কোনও এক সময় পুরান ঢাকার নবাব বাড়ির সন্নিকটে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে প্রথমে ছিল 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' নাট্যগোষ্ঠীর মঞ্চ; কিন্তু এই গোষ্ঠীর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেলে ক্রাউন থিয়েটার সেটি ভেঙে নতুন করে মঞ্চ নির্মাণ করে। স্থানীয় বাসিন্দাদের আপত্তির কারণে মঞ্চটি এক সময় ইসলামপুরে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৯৭ সালে 'ডায়মণ্ড জুবিলি থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হলে ক্রাউন থিয়েটারের

কতিপয় অভিনেতা-অভিনেত্রী সেখানে যোগ দেন এবং এর ফলে ক্রাউনের কর্মকাণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিছুকাল পরে ক্রাউন থিয়েটার চলচ্চিত্র প্রদর্শন শুরু করলে নাট্যমঞ্চ হিসেবে এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়।

গাইড হাউস মিলনায়তন — ঢাকার নিউ বেইলী রোডে বাংলাদেশ গার্লস গাইড অ্যাসোসিয়েশনের কার্যালয় প্রাঙ্গণে অবস্থিত। আশির দশক থেকে এই মঞ্চটি নিয়মিত নাট্য প্রদর্শনীর অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। নাট্য প্রদর্শনীর সংখ্যা বৃদ্ধি, নতুন নতুন নাট্যদলের উদ্ভব, নাটকের দর্শক সৃষ্টি ইত্যাদি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গাইড হাউস মিলনায়তনের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। দ্বিতীয় ধাপে ঢাকা শহরে এখানেই প্রথম দর্শনীয় বিনিময়ে নাট্য প্রদর্শনী শুরু হয়।

গাইড হাউস মিলনায়তনে বিভিন্ন নাট্যদল কর্তৃক মঞ্চস্থ কয়েকটি প্রধান নাটক হলো : বহুবচনের প্রজাপতির লীলালাস্য (১৯৭২), ইডিপাস (১৯৮২); থিয়েটারের পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় (১৯৭৮); ঘরে-বাইরে (১৯৮৫); কোকিলারা (১৯৮৯); আন্তিগোনে (১৯৯২); ঢাকা থিয়েটারের শকুন্তলা (১৯৭৮); নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের দেওয়ান গাজীর কিসসা, বিসর্জন (১৮৯৫); সুবচন নাট্য সংসদের জীবন ঘষে আগুন (১৯৮৬); লোক নাট্যদলের পদ্মা নদীর মাঝি (১৯৯১), মহাপ্রাণ (১৯৯৪), একাত্তরের দিঙলো (১৯৯৫); সময় সাংস্কৃতিক নাট্যকেন্দ্রের বিছু (১৯৯১), লালসালু (১৯৯১), তুষলোক (১৯৯২); সড়কের হ্যালুসিনেশন (১৯৯২); ঢাকা লিটল থিয়েটারের মার্চেন্ট অব ভেনিস (১৯৯৩); থিয়েটার আর্টের কোর্ট মার্শাল (১৯৯৩), কালান্তর (১৯৯৪), গোলাপজান (১৯৯৫); কণ্ঠশীলনের পুতুল খেলা (১৯৯৩), ভূত রাজকতন্ত্র (১৯৯৫); ঢাকা সুবচন নাট্যদলের বিবিসাব (১৯৯৪); ঢাকা পদাতিকের ফেরা (১৯৯৪); জাহাঙ্গীরনগর থিয়েটারের পাবলিক (১৯৯৫) ইত্যাদি।

বাংলাদেশে দলীয় মূকাভিনয়ের পথিকৃৎ ঢাকা প্যান্টোমাইম (১৯৮৯) গাইড হাউস মঞ্চের দর্শনীয় বিনিময়ে ১৯৯১-৯৩ সালের মধ্যে মঞ্চস্থ করে মানব ও প্রকৃতি, সভ্যতার ক্রমবিকাশ, ভাষা আন্দোলন, নদী পাড়ের জীবন, মাদকশক্তি এবং স্বাধীনতা শীর্ষক মূকাভিনয়। নাটক ও মূকাভিনয় ছাড়াও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন এ মঞ্চের দর্শনীয় বিনিময়ে নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করে।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার — ১৮৭৩ সালে ভুবনমোহন নিয়োগী কর্তৃক কলকাতার বিডন স্ট্রিটে (বর্তমান মিনার্ভা থিয়েটারের স্থলে) প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছুদিন পরে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চটি লিজ নিয়ে ‘ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার’ নামে পরিচালনা করেন; কিন্তু মাত্র চার মাসের মধ্যেই কৃষ্ণধন ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং ভুবনমোহন পুনরায় থিয়েটারটি নিজের হাতে নিয়ে পূর্ব নামেই চালাতে থাকেন। ১৮৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে অমৃতলাল বসুর হীরকচূর্ণ ও উপেন্দ্রনাথ দাসের সুরেন্দ্র বিনোদিনী নাটক এখানে অভিনীত হয়। হীরকচূর্ণ নাটকে বাংলার রঙ্গমঞ্চের প্রথম রেলগাড়ি দেখানো হয়। পরবর্তীকালে এ মঞ্চের অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হলো : প্রকৃত বন্ধু, সরোজিনী, বিদ্যাসুন্দর, গজদানন্দ ও যুবরাজ, কর্ণটিকুমার ইত্যাদি।

গজদানন্দ ও যুবরাজ একটি কৌতুক নাটক; মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পুত্র প্রিন্স অব ওয়েলস (সপ্তম এডওয়ার্ড) ১৮৭৫ সালের ১৩ ডিসেম্বর কলকাতায় এলে তাঁর আগমনকে কেন্দ্র করে নাটকটি রচিত হয়। এতে সরকারি মহলে অসন্তোষ দেখা দেয় এবং পুলিশ এর প্রদর্শনী বন্ধ করে দেয়। রচয়িতা উপেন্দ্রনাথ পুলিশকে বিদ্রোহ করে The Police of Pig and Sheep নামে আরও একটি কৌতুক নাটক রচনা করেন এবং ১৮৭৬ সালের ১ মার্চ নাটকটি এখানে মঞ্চস্থ হয়। এর পরিণতি হিসেবে নাট্যাভিনয়কে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকার ঐ বছরই অভিনয়

নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করে। এভাবে নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে এক কালো অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়। অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন, মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদি কারণে ভুবনমোহন সর্বস্বান্ত হয়ে থিয়েটারের সংস্রব ত্যাগ করেন এবং অন্যরাও থিয়েটার ছেড়ে চলে যান। ১৮৮০ সালে প্রতাপচাঁদ জহুরী নামে এক মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী এটি ক্রয় করে গিরিশ ঘোষকে পরিচালনার দায়িত্ব দেন।

জোড়াসাঁকো নাট্যশালা-১ — প্যারীমোহন বসু কর্তৃক ১৮৫৪ সালে তাঁর কলকাতাস্থ জোড়াসাঁকো বারানসী ঘোষ স্ট্রিটের নিজস্ব বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বছরই ৩ মে এই মঞ্চে শেক্সপীয়রের জুলিয়াস সিজার নাটকটি অভিনীত হয়। মহেন্দ্রনাথ বসু, কৃষ্ণধন দত্ত, যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। সংবাদ প্রভাকর (৫ মে, ১৮৫৪) পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায় যে, প্রায় চারশত ভারতীয় ও ইংরেজ দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিল। হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকা (১১ মে, ১৮৫৪) নাট্যশালার নিকট বাঙালি দর্শকদের জন্য বাংলা ভাষায় নাটক অভিনয়ের প্রস্তাব দেয়।

জোড়াসাঁকো নাট্যশালা-২ — ১৮৬৫ সালে কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেকালের বিখ্যাত গোপাল উড়িয়ার যাত্রাগান জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মঞ্চাভিনয়ে উদ্বুদ্ধ করে এবং তিনি গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সারদাপ্রসাদ গাঙ্গুলীর সহায়তায় এ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী, একেই কি বলে সভ্যতা এবং গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাবুবিলাস নাটক অভিনীত হয়। এরপর উদ্যোক্তাগণ সমকালীন সমাজের সমস্যা নিয়ে রচিত নাটক আহ্বান করে পুরস্কারসহ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেন। বিচারকদের বিচারে রামনারায়ণ তর্করত্নের নবনাটক শ্রেষ্ঠরূপে নির্বাচিত হয় এবং নাট্যকারকে একটি রূপার থালায় ২০০ রৌপ্যমুদ্রা পুরস্কার প্রদান করা হয়। ১৮৬৭ সালের ৫ জানুয়ারি নাটকটি অভিনীত হয়। অক্ষয় মজুমদার, সারদা গাঙ্গুলী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ এতে অভিনয় করেন। ৯ জানুয়ারি ন্যাশনাল ও ২৮ জানুয়ারি সোমপ্রকাশ পত্রিকায় উক্ত প্রযোজনার উচ্চ প্রশংসা করা হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি ছিল জোড়াসাঁকো নাট্যশালার শেষ অভিনয়।

ডায়মণ্ড জুবিলি থিয়েটার — জমিদার কিশোরীলাল রায়চৌধুরী কর্তৃক ১৮৯৭ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কিশোরীলাল প্রথমে ক্রাউন থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন; কিন্তু এক সময় এর শিল্পী ও কর্মকর্তাদের মধ্যে সমঝোতার অভাব দেখা দিলে তিনি ক্রাউনেরই কতিপয় শিল্পী নিয়ে ‘ডায়মণ্ড জুবিলি থিয়েটার’ নামে একটি নাট্যগোষ্ঠী ও রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন। পুরনো ঢাকার ইসলামপুরে বর্তমান লায়ন সিনেমা হলের জায়গায় এ মঞ্চটি নির্মিত হয়েছিল।

ডায়মণ্ড কলকাতা থেকে অভিনেত্রী এনে, স্থানীয় বাইজিদের দিয়ে অভিনয় করাত। এ মঞ্চে অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হলো : দুর্গেশনন্দিনী, দেবীচৌধুরানী, বিজয় বসন্ত, আলীবাবা, নবীন তপস্বিনী, বিশ্বমঙ্গল, নন্দদুলাল, তরুবালা ইত্যাদি। এর টিকেটের হার ছিল দুই টাকা, এক টাকা, আট আনা ও চার আনা। ঢাকায় পেশাদার থিয়েটার প্রচলনের পেছনে ডায়মণ্ড জুবিলি থিয়েটারের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল।

ন্যাশনাল থিয়েটার — ১৮৭২ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটারের সভ্যগণ সর্বশ্রেণির দর্শকদের সুবিধার্থে একটি সাধারণ রঙ্গালয় প্রবর্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং সে অনুযায়ী এটি নির্মিত হয়। এ কারণে মঞ্চটি প্রথম বাংলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চ হিসেবে খ্যাত।

রঙ্গালয়ের টিকেট বিক্রয়ের অর্থে শুধু নিয়মিত নাট্য প্রযোজনার ব্যয়টুকু নির্বাহ করাই ছিল ন্যাশনালের

কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যে ৩৩ নং চিৎপুর রোডে মধুসূদন সান্যালের মন্দির ভবনে একটি অস্থায়ী মঞ্চ নির্মাণ করা হয় এবং মঞ্চের নাম দেওয়া হয় ‘ন্যাশনাল থিয়েটার’। কিন্তু এরূপ একটি অস্থায়ী ও যৎকিঞ্চিৎ সজ্জিত মঞ্চের ‘ন্যাশনাল’ নাম নিয়ে দলপতি গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে সাধারণ সভ্যদের মতবিরোধ দেখা দেয় এবং তিনি দলত্যাগ করেন। এমতাবস্থায় কার্যনির্বাহকের দায়িত্ব পালন করেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি। প্রতিষ্ঠা বছরেরই ৭ ডিসেম্বর দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে ন্যাশনাল থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। প্রথম দিকে প্রতি শনিবার এখানে অভিনয় হতো; পরের দিকে সপ্তাহে দু’দিনও হয়েছে।

দীনবন্ধু মিত্র ছাড়াও শিশিরকুমার ঘোষ, কিরণচন্দ্র ব্যানার্জী, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং রামনারায়ণ তর্করত্নেরও কয়েকটি নাটক ন্যাশনালে অভিনীত হয়েছে। মাঝে মাঝে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি হাস্যরসাত্মক প্যাটোমাইম পরিবেশন করতেন। উল্লেখযোগ্য অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন অর্ধেন্দু মুস্তফি, নগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, মতিলাল সুর, মহেন্দ্রনাথ বসু, অমৃতলাল বসু প্রমুখ। ১৮৭৩ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি হিন্দুমেলা নাটকে অভিনয়ের জন্য গিরিশচন্দ্র পুনরায় এতে যোগ দেন।

ন্যাশনাল থিয়েটারে যে অভিনয় হয় ১৮৭৩ সালের ৮ মার্চ। এর অল্পদিন পরেই ন্যাশনাল দুটি দলে ভাগ হয়ে যায় এবং নতুন দলের নাম হয় ‘হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার’। সমকালীন সুলভ সমাচার, অমৃতবাজার পত্রিকা, ইন্ডিয়ান মিরর, ইংলিশম্যান ইত্যাদি পত্রিকায় ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনয় সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছে।

পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি — ১৯৬৫ সালে (মতান্তরে ১৮৭০-৭২ সালের মধ্যে) পুরান ঢাকায় বর্তমান জগন্নাথ কলেজের স্থানে জমিদার মোহিনীমোহন দাসের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। একে কেন্দ্র করে একটি নাট্যসমাজও গড়ে উঠেছিল। ১৮৭২ সালে রামাভিষেক নাটক মঞ্চায়নের মাধ্যমে এই রঙ্গমঞ্চই ঢাকায় প্রথম দর্শনীয় বিনিময়ে নাট্যাভিনয় শুরু করে। টিকেটের হার ছিল চার, দুই ও এক টাকা, যা সময়ের বিবেচনায় ছিল অনেক বেশি। পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে রচিত রামাভিষেক নাটকটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল।

‘প্রাইড অব বেঙ্গল থিয়েটার’— (১৮৬১) নামে একটি নাট্যাগোষ্ঠী পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি ভাড়া নিয়ে অভিনয় করত। তবে এ মঞ্চে শুধু নাটকই প্রদর্শিত হতো না, ঢাকার অধিকাংশ সভাও এখানেই অনুষ্ঠিত হতো। এদিক থেকে এটি তখন টাউন হলের প্রয়োজন মিটিয়েছে। ১৮৭৩ সালে মোহিনীমোহন দাসের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতার হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার ঢাকায় এসে পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমিতে নীলদর্পণ, নবীন তপস্বিনী, সধবার একাদশী, যেমন কর্ম তেমন ফল, বুড় শালিকের ঘাড়ে রৌঁ, ভারত মাতা ইত্যাদি নাটক মঞ্চস্থ করে। ১৮৭৬ সালে নবাব আবদুল গনির আমন্ত্রণে মুন্সাই থেকে একটি দল ঢাকায় এসে হিন্দি নাটক ইন্দ্রসভা মঞ্চস্থ করে। গনুবান্ধি, আনুবান্ধি ও নবায়ন এই তিনবোন ইন্দ্রসভায় অভিনয় করেন। ঢাকায় মহিলাদের দ্বারা অভিনয় এই প্রথম। তাঁরা যদুনগর নামে অপর একটি নাটকও মঞ্চস্থ করেন। ১৮৮৪ সালে এখানে অভিনীত হয় উত্তররামচরিত।

বঙ্গ নাট্যালয়-১ — ১৮৫৯ সালে জমিদার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রচেষ্টায় তাঁদের কলকাতাস্থ পাথুরিয়া ঘাটা প্রাসাদে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠা বছর জুলাই মাসে কালিদাসের সংস্কৃত নাটক মালবিকাগ্নিমিত্রম্-এর অভিনয়ের মাধ্যমে এর যাত্রা শুরু হয়। পরের বছর ৭ জুলাই অভিনীত হয় রামনারায়ণ তর্করত্নকৃত উক্ত নাটকের বঙ্গানুবাদ। এরপর পাঁচ বছর এই নাট্যালয়ের কার্যক্রম বন্ধ থাকে। ১৮৬৬ সালের ৬ জানুয়ারি যতীন্দ্রমোহন নতুন দল গঠন করে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করেন। এরপরেই

অভিনীত হয় বুঝলে কিনা ব্যঙ্গনাট্য। পরবর্তীকালে অভিনীত নাটকগুলি সবই রামনারায়ণকৃত: যেমন কর্ম তেমন ফল, চক্ষুদান, মালতীমাধব, উভয়সঙ্কট ও রুক্মিণীহরণ।

বঙ্গ নাট্যালয়ে উল্লেখযোগ্য নাট্য ব্যক্তিত্বগণের মধ্যে ছিলেন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মদনমোহন বর্মণ, মহেন্দ্র মুখার্জী, রাধাপ্রসাদ বসাক, কৃষ্ণধন ব্যানার্জী প্রমুখ। ১৮৭২ সালে এর কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যায়।

বঙ্গ নাট্যালয়-২ — বলদেব ধর ও চুনিলাল ধরের যৌথ প্রচেষ্টায় ১৮৬৮ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বছরেরই মার্চ মাসে মনোমোহন বসুর রামাভিষেক নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে কলকাতার ২৫ নং বিশ্বনাথ মতিলাল লেনের (বহুবাজার) গেবিন্দচন্দ্র সরকারের বাড়িতে এর যাত্রা শুরু হয়। উমাচরণ ঘোষ, অম্বিকা ব্যানার্জী, বিহারীলাল ধর, বলদেব ধর, আশুতোষ চক্রবর্তী প্রমুখ অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন।

পরবর্তী পাঁচ বছর বঙ্গ নাট্যালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। ১৮৭৪ সালে এলাহাবাদের নীলকমল মিত্রসহ কয়েকজন নাট্যমোদী ব্যক্তির প্রচেষ্টায় পুনরায় এর কার্যক্রম শুরু হয় এবং ১৭ জানুয়ারি তাঁরা মনোমোহন বসুর সতী নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। একই নাট্যকারের হরিশ্চন্দ্র নাটকটি মঞ্চস্থ হয় ১৮৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে এবং এটিই ছিল বঙ্গ নাট্যালয়ের শেষ প্রযোজনা। বঙ্গ নাট্যালয়ই প্রথম বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রবেশপত্র ব্যবহার করে।

বিদ্যোৎসাহিনী মঞ্চ — ১৮৫৭ সালে উত্তর কলকাতার জোড়াসাঁকো সিংহ বাড়িতে কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ছিল কালীপ্রসন্ন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভা নামক একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের অঙ্গবিশেষ। প্রতিষ্ঠা বছর ১১ এপ্রিল ভট্টনারায়ণের সংস্কৃত নাটক বেণীসংহার-এর রামনারায়ণ তর্করত্নকৃত বঙ্গানুবাদের অভিনয়ের মাধ্যমে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধন হয়। কালীপ্রসন্ন স্বয়ং ‘ভানুমতী’ নামে একটি মহিলা চরিত্রে অভিনয় করেন। সংবাদ প্রভাকর (১৫ এপ্রিল) পত্রিকায় এই অভিনয়ের উচ্চ প্রশংসাসহ সংবাদ পরিবেশিত হয়।

এই রঙ্গমঞ্চে অভিনীত দ্বিতীয় নাটক কালীপ্রসন্ন অনূদিত কালিদাসের বিক্রমোর্বশী (২৪ নভেম্বর)। কালীপ্রসন্ন সিংহ, মহেন্দ্রনাথ মুখার্জী, উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী (ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি) প্রমুখ প্রখ্যাত ব্যক্তি বিদ্যোৎসাহিনী মঞ্চে অভিনয় করেন।

বেঙ্গল থিয়েটার — ১৮৭৩ সালের ১৬ আগস্ট আশুতোষ দেবের দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক কলকাতার ৯ নং বিডন স্ট্রিটে প্রতিষ্ঠিত হয়। মিসেস লুইস-এর টোরঙ্গীর ‘লাইসিয়াম’ থিয়েটারের অনুকরণে শরৎচন্দ্র থিয়েটার বাড়িটি নির্মাণ করেন। নিজস্ব জমির ওপর নির্মিত বাংলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চ এটিই প্রথম।

শরৎচন্দ্র এই নাট্যশালাটি যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ মনীষীর সমন্বয়ে একটি পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করেন। প্রতিষ্ঠা দিবসে এখানে মাইকেলের শর্মিষ্ঠা নাটকটি অভিনীত হয়। তারপর সুদীর্ঘ ২৮ বছরের পথপরিভ্রমায় বেঙ্গল থিয়েটার ১১০টিরও বেশি নাটক মঞ্চস্থ করে। স্ত্রী-চরিত্র অভিনয়ের জন্য এই থিয়েটারেই প্রথম জগত্তারিণী, এলোকেশী, গোলাপ (সুকুমারী) এবং শ্যামা নামে চারজন মহিলা অভিনেত্রীকে নিযুক্ত করা হয়।

বেঙ্গল থিয়েটার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজকৃষ্ণ রায়, অমৃতলাল বসু এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদসহ বহু প্রখ্যাত নাট্যকারের পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক এবং ব্যঙ্গনাট্য, প্রহসন ইত্যাদি

মঞ্চস্থ করে। শরৎচন্দ্র ঘোষ, বিহারীলাল চ্যাটার্জী, অমৃতলাল বসু, খগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, মহেন্দ্রলাল বসু, এলোকেশী, গোলাপ, শ্যামা, জগত্তারিণী, কুসুম কুমারী এবং আরও অনেক প্রখ্যাত শিল্পীর অভিনয়ে বেঙ্গল থিয়েটার বিপুল খ্যাতি অর্জন করে। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের সম্রাজ্ঞী উপাধিতে ভূষিত অভিনেত্রী বিনোদিনী এই বেঙ্গল থিয়েটারেই তাঁর অভিনয়-জীবন শুরু করেন। ১৯০১ সালের এপ্রিল মাসে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের প্রমোদরঞ্জনী নাটকখানির অভিনয়ের পর বেঙ্গল থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়।

বেঙ্গলী থিয়েটার প্রথম বাংলা প্রসেনিয়াম থিয়েটার, ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে রুশ মনীষী হেরাসিম লেবেদেফ কর্তৃক কলকাতার ২৫ নং ডোমতলায় (বর্তমান এজরা স্ট্রিট) প্রতিষ্ঠিত হয়। লেবেদেফ তাঁর বাংলা ভাষার শিক্ষক গোলকনাথ দাসের সহায়তায় এটি নির্মাণ করেন। তিনি দি ডিসসাইজ ও লাভ ইজ দি বেস্ট ডক্টর নামক দুটি ইংরেজি নাটক বাংলায় অনুবাদ করেন। গোলকনাথের প্রস্তাবে দি ডিসসাইজ-এর বাংলা অনুবাদ কাল্পনিক সংবদল মঞ্চস্থ করার ব্যবস্থা হয়। এ ব্যাপারে ক্যালকাটা গেজেট-এর ২৬ নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় যে, টিকিট বিক্রির হার ছিল এরূপ : বক্স ও পিট-৮ টাকা এবং গ্যালারি-৪ টাকা। পরের দিন ২৭ নভেম্বর নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

বেঙ্গলী থিয়েটারে যে নাটক মঞ্চস্থ হয় ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দের ২১ মার্চ। এদিন বিশেষ আসনের মূল্য ছিল এক স্বর্ণমুদ্রা। বেঙ্গলী থিয়েটারে সপ্তাহে মাত্র দুটি প্রদর্শনী হতো। উল্লেখ্য যে, লেবেদেফের বেঙ্গলী থিয়েটারই প্রথম এশীয় ভাষায় প্রসেনিয়াম থিয়েটার-রীতি প্রয়োগ করে।

বেলগাছিয়া থিয়েটার — ১৮৫৮ সালে কলকাতার পাইকপাড়ার রাজভ্রাতৃদ্বয় ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও প্রতাপচন্দ্র সিংহের উদ্যোগে তাঁদের বেলগাছিয়া ভিলায় প্রতিষ্ঠিত হয়। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, গৌরদাস বসাক ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রতিষ্ঠা বছর ৩১ জুলাই রামনারায়ণ তর্করত্নকৃত সংস্কৃত নাটক রত্নাবলীর বঙ্গানুবাদ মঞ্চায়নের মাধ্যমে বেলগাছিয়া থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। ইংরেজ দর্শকদের সুবিধার্থে মধুসূদন ইংরেজিতে নাটকের সারাংশ লিখে দেন।

পরের বছর ৩ সেপ্টেম্বর বেলগাছিয়া থিয়েটারে অভিনীত হয় মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটক। প্রিয়নাথ দত্ত, হেমচন্দ্র মুখার্জী, গৌরদাস বসাক, কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলী, মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ অভিনেতা মুখ্যচরিত্রে অভিনয় করেন। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। বাংলা থিয়েটারে এই প্রথম ভারতীয় ঐকতান বাদন ব্যবহৃত হয়; এতে নেতৃত্ব দেন ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও যদুনাথ পাল। তৎকালীন সংবাদ প্রভাকর ও হিন্দু পত্রিকায় বেলগাছিয়া থিয়েটারের অভিনয়ের প্রশংসা করা হয়। ১৮৬১ সালের মার্চ মাসে বেলগাছিয়া থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়।

মহিলা সমিতি মিলনায়তন — ঢাকা বেইলী রোডে অবস্থিত। এর মঞ্চটি সাধারণভাবে ‘মহিলা সমিতি মঞ্চ’ নামে পরিচিত এবং স্বাধীনতা-উত্তরকালে এটি ঢাকার নাট্যচর্চায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে। গ্রুপ থিয়েটার-চর্চাভিত্তিক নাট্যমঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। এখানে দীর্ঘদিন থেকে বিভিন্ন নাট্যদল নিয়মিতভাবে নাটক মঞ্চস্থ করে আসছে। ঢাকায় নাটকের দর্শক সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই মঞ্চ প্রদর্শিত নাট্যসমূহ বিশেষ ভূমিকা রেখেছে, যদিও নাট্যমঞ্চায়নের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা এখানে নেই। এ মঞ্চ নাট্যপ্রদর্শনী ব্যতীত অন্য কোন সভা-সমাবেশ কিংবা রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা হয় না বললেই চলে।

১৯৭৩ সালে এ মঞ্চে প্রথম মঞ্চস্থ হয় বার্নার্ড শ' রচিত এবং ড্রামা সার্কল প্রযোজিত দান্তের মৃত্যু নাটকটি। এই দলের পরবর্তী দুটি প্রযোজনা হলো মনেজ মিত্রের সাজানো বাগান (১৯৮০) এবং বিজয় তেগুলাকার চুপ আদালত চলছে (১৯৮৪)। নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় ১৯৭৩ সালে মঞ্চস্থ করে বিদগ্ধ রমণীকুল, তৈল সঙ্কট, ত্রাস পারপাস ও নিষিদ্ধ পল্লীতে। এভাবে আরণ্যক নাট্যদল, ঢাকা থিয়েটার, নান্দনিক নাট্য সম্প্রদায়, ঢাকা পদাতিক, বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী (নাটক বিভাগ), বিবর্তন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, লোকনাট্যদল, ঢাকা লিটল থিয়েটার, সড়ক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, লায়ন থিয়েটার প্রভৃতি নাট্যগোষ্ঠী ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের নাটক মঞ্চস্থ করেছে।

বাংলাদেশের প্রথম মুকাভিনয় দল ঢাকা প্যান্টোমাইম (১৯৮৯) মহিলা সমিতি মঞ্চে ১৯৯০ সালে প্রদর্শন করে বখাটে ছেলের পরিণতি, বালক ও পাখি, জেলে, প্রেম এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা শীর্ষক মুকাভিনয়। ঢাকাভিত্তিক নাট্যদল ছাড়াও দেশের বিভিন্ন জেলার বেশ কয়েকটি নাট্যদল, একাধিক ভারতীয় নাট্যদল এবং ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউট (আই.টি.আই), বাংলাদেশ কেন্দ্র আয়োজিত উৎসবে আগত বিদেশি কয়েকটি নাট্য সংগঠনের নাটকও এই মঞ্চে দর্শনীয় বিনিময়ে প্রদর্শিত হয়েছে।

মাহবুব আলী ইনস্টিটিউট — ১৯৫০ সালে পুরনো ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরের বছর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের নাট্যরূপ বিজয়া-র প্রদর্শনী দিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। এখানে বিজন ভট্টাচার্যের নাটক জবানবন্দি মঞ্চস্থ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র-সংসদ। ১৯৫২ সালে মঞ্চস্থ হয় সিকান্দার আবু জাফরের ঐতিহাসিক নাটক সিরাজউদ্দৌলা। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ডক্টরস ক্লাব ও কলেজ ছাত্র-সংসদ যথাক্রমে মানময়ী গার্লস স্কুল ও তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বীপান্তর এবং অগ্রদূত নাট্যসঙ্ঘ বিধায়ক ভট্টাচার্যের মাটির ঘর মঞ্চস্থ করে। নাটক মঞ্চায়নের পাশাপাশি এ মঞ্চে অন্যান্য সভা-সমাবেশও অনুষ্ঠিত হয়।

মিনার্ভা থিয়েটার — ১৮৯৩ সালে কলকাতার ৬ নং বিডন স্ট্রিটস্থ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের জমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বছরেরই ২৮ জানুয়ারী নগেন্দ্রভূষণ মুখার্জীর অর্থানুকূলে গিরিশচন্দ্র অনুদিত শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে এর যাত্রা শুরু হয়। তখন থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত গিরিশচন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, অমৃতলাল, অমরেন্দ্রনাথসহ অন্যান্য নাট্যকার রচিত প্রায় ৬০ খানা নাটক এখানে মঞ্চস্থ হয়। ১৯১৩ সালে উপেন্দ্রনাথ মিত্র কর্তৃক পুনর্গঠিত হয়ে তাঁর ব্যবস্থাপনায় ১৯২২ সাল পর্যন্ত এটি পরিচালিত হয়। এই পর্যায়ে মিনার্ভায় বিভিন্ন ধরনের পঞ্চাশোর্ধ নাটক অভিনীত হয়। ১৯২২ সালের ১৮ অক্টোবর এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে মিনার্ভা ভস্মীভূত হয়ে যায়।

১৯২৫ সালে উপেন্দ্রনাথ মিত্রের নেতৃত্বে মিনার্ভা পুনর্নির্মিত হয় এবং ৮ আগস্ট মহাতাপচন্দ্র ঘোষের আত্মদর্শন নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে এর দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। নানা প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে উপেন্দ্রনাথ ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত মিনার্ভা পরিচালনা করেন। তিনি চলে যাওয়ার পর হেমেন্দ্র মজুমদার, দিলোয়ার হোসেন, চণ্ডীচরণ ব্যানার্জী, এল. সি. গুপ্ত, রাসবিহারী সরকার প্রমুখ ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত সাধারণ রঙ্গালয় হিসেবে মিনার্ভাকে সৃষ্টিভাব পরিচালিত করেন।

১৯৫৯ সালে শম্ভু মিত্র মিনার্ভায় নাট্য প্রযোজনা করেন। ঐ বছর জুন মাসে উৎপল দত্ত তাঁর লিটল থিয়েটার গ্রুপ নিয়ে নিয়মিতভাবে পেশাদারি ভিত্তিতে নাট্য প্রযোজনা শুরু করলে মিনার্ভা থিয়েটারের আমূল পরিবর্তন ঘটে। দীর্ঘ এক দশক উৎপল দত্ত অনুদিত ও পরিচালিত শেক্সপীয়রের কয়েকটি নাটকসহ ছায়ানট, নীচের মহল, অঙ্গার,

ফেরারী ফৌজ, ভি-আই-পি, তিতাস একটি নদীর নাম, কল্লোল, মানুষের অধিকার প্রভৃতি নাটক সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। ১৯৬৮ সালে লিটল থিয়েটারের প্রস্থানের পর মিনার্ভায় এক অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হয়; তবে অদ্যাবধি থিয়েটারের ভগ্নপ্রায় বাড়িটি উনিশ শতকের বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের এক গৌরবময় অধ্যায়ের সাক্ষ্য বহন করছে।

মেট্রোপলিটন থিয়েটার — হিন্দু ‘বিধবা বিবাহ’ প্রথা প্রচলনের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার মানসে ১৮৫৯ সালে মুরলীধর সেন কর্তৃক কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রখ্যাত বক্তা ও সমাজ-সংস্কারক কেশবচন্দ্র সেন, ধর্মীয় নেতা রেভারেণ্ড প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর উদ্যোক্তা ছিলেন। প্রতিষ্ঠা বছরের ২৩ এপ্রিল কলকাতার চিৎপুর সিঁদুরিয়া পট্টির গোপাল মল্লিকের বাড়িতে উমেশচন্দ্র সেনের নাটক বিধবা বিবাহ মঞ্চায়নের মাধ্যমে এটি উদ্বোধিত হয়। বিহারীলাল চ্যাটার্জী, অক্ষয় মজুমদার, মহেন্দ্রনাথ সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, কুঞ্জবিহারী সেন প্রমুখ অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন অভিনয় পরিচালনা করেন কেশবচন্দ্র সেন এবং দৃশ্যপট অঙ্কন করেন ইউরোপীয় চিত্রশিল্পী মি. ইল বাইন। সংবাদ প্রভাকর (১৪ মে) পত্রিকায় এ অভিনয়ের বিবরণ প্রকাশিত হয়।

রঙমহল থিয়েটার — ১৯৩১ সালে কলকাতার কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে (বর্তমান বিধান সরণী) রবীন্দ্রনাথ রায় (রবি রায়) ও সতু সেনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ গায়ক) ও রবি রায় পরিচালকের এবং অমর ঘোষ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়াও ষষ্ঠী গাঙ্গুলী, নির্মলচন্দ্র, এস আহমেদ, ডি. এন. ধর, হরচন্দ্র ঘোষ, হেমচন্দ্র দে প্রমুখ মিলে রঙমহল থিয়েটারকে একটি যৌথ কোম্পানির চরিত্র দান করেন।

প্রতিষ্ঠা বছরের ৮ আগস্ট যোগেশ চৌধুরীর লেখা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নাটকটি অভিনয়ের মাধ্যমে রঙমহল থিয়েটারের যাত্রা শুরু হয়। শিশিরকুমার ভাদুড়ী এর পরিচালনা ও অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটন করেন আর্ট থিয়েটারের পরিচালক, নাট্যকার ও অভিনেতা অপারেশনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

১৯৩২ সালের ১৭ জানুয়ারি রঙমহল থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয় বিজয়িনী নাটক; ২ এপ্রিল বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের বনের পাখি এবং ২৫ জুন উৎপলেন্দু সেনের সিঙ্কুগৌরব। বনের পাখি নাটকটি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই নাটকে অভিনয় করেন রবি রায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে, সন্তোষ সিংহ, ধীরাজ ভট্টাচার্য, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, চরুবালা, শশীবালা, শেফালিকা, সরযুবালা দেবী প্রমুখ। এঁরা প্রত্যেকেই সেকালের খ্যাতিমান অভিনেতা-অভিনেত্রী ছিলেন। ১৯৩৩ সালের ১৫ এপ্রিল অভিনীত হয় অনুরূপা দেবীর উপন্যাস অবলম্বনে রচিত নাটক মহানিশা। এ নাটকটিও জনপ্রিয় হয় এবং এতেই সতু সেনের প্রচেষ্টা ও কর্মদক্ষতায় প্রথম ঘূর্ণায়মান মঞ্চ ব্যবহৃত হয়।

এরপর বহু ভাঙা-গড়ার ভেতর দিয়ে রঙমহল থিয়েটার অগ্রসর হয়। থিয়েটারের মালিকানাও পরিবর্তিত হয় এবং অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রীর পরিবর্তন ঘটে। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ব্যঙ্গবিষয়ক নাটক এখানে অভিনীত হয়েছে। কোন কোন নাটক (যেমন উল্কা) একাদিক্রমে ৫০০ রজনী অভিনীত হয়ে বাংলা থিয়েটারে সাড়া জাগিয়েছে। পরবর্তীকালে এই মঞ্চ যাঁরা নাট্য পরিচালনা করেন কিংবা অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন তাঁরা হলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, মহেন্দ্র গুপ্ত, তরুণ রায় (ধনঞ্জয় বৈরাগী) প্রমুখ। মঞ্চস্থ কয়েকটি প্রধান নাটক হলো : শতবর্ষ আগে, কবি, দুই পুরুষ, মায়ামৃগ, একমুঠো আকাশ, এক পেয়ালা কফি, সাহেব বিবি গোলাম, অনর্থ, চক্র ইত্যাদি। ১৯৭৫ সাল থেকে ক্যাবারে নৃত্য চালু হলে রঙমহলের দীর্ঘকালের ঐতিহ্য বিনষ্ট হয়; রুচিবান অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রী রঙমহল ত্যাগ করেন এবং এর ব্যবস্থাপনাও দুর্বল হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় রঙমহল থিয়েটার এখনও টিকে আছে।

লায়ন থিয়েটার — ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত। বিশ শতকের প্রথম দিকে মীর্জা আবদুল কাদের ডায়মণ্ড জুবিলি থিয়েটার ত্রয় করে এর নতুন নামকরণ করেন লায়ন থিয়েটার। এখানে বাংলা নাটকের পাশাপাশি উর্দু নাটকও মঞ্চস্থ হতো। উর্দু নাটকগুলির মধ্যে ছিল জালমা ও পারস্তা, বুলবুল এ বিমার ইত্যাদি। ঢাকার নাট্যকার যোগেন গুপ্তের চিড়িয়াখানা এবং বিপিন বিহারী চামের লাঞ্ছনা নামক দুটি প্রহসনও এখানে মঞ্চস্থ হয়। পরবর্তীকালে ঢাকায় ফিল্মের আবির্ভাব হলে লায়ন থিয়েটারে নাটক প্রদর্শন বন্ধ করে ‘লায়ন সিনেমা’ নামে এটিকে প্রেক্ষাগৃহে পরিণত করা হয় এবং চলচ্চিত্র প্রদর্শন শুরু হয়।

স্টার থিয়েটার-১ — ১৮৮৩ সালে কলকাতার ৬৮ নং বিডন স্ট্রিটে (বর্তমান বিডন স্ট্রিট ও সেন্ট্রাল এভিনিউর সংযোগস্থল) প্রতিষ্ঠিত হয়। গিরিশ ঘোষ, বিনোদিনী, অমৃতলাল বসু প্রমুখ নাট্যব্যক্তিত্ব এই থিয়েটার প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা ছিলেন। গুরুমুখ রায় নামে জনৈক অবাঙালি যুবক থিয়েটারে অর্থলব্ধি করেন। তিনি সুন্দরী নটী বিনোদিনীর নামানুসারে ‘বি’ থিয়েটার নামকরণের শর্ত আরোপ করেন; কিন্তু শেষপর্যন্ত ‘স্টার’ থিয়েটার নাম হয়।

প্রতিষ্ঠা বছর ২১ জুলাই গিরিশচন্দ্রের দক্ষযজ্ঞ নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে স্টার থিয়েটারের যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু ছয় মাসের মধ্যে গুরুমুখ রায় থিয়েটার বিক্রি করে দিলে অমৃতলাল বসু, দাসু নিয়োগী ও হরি বোস এটি ক্রয় করেন এবং ১৮৮৭ সালের পর্যন্ত সুনামের সঙ্গে পরিচালন করেন। এরপর স্টার থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়।

স্টার থিয়েটারে মোট ২০ খানি নাটক মঞ্চস্থ হয় এবং সেসবের অভিনয় অংশগ্রহণ করেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল হয়, অমৃত মিত্র, বিনোদিনী, কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি প্রমুখ খ্যাতনামা শিল্পী। একবার রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ধর্মীয় নাটক চৈতন্যলীলা দেখতে এসে চৈতন্যের ভূমিকায় বিনোদিনীর অভিনয়ে মুগ্ধ হন এবং তাঁকে আশীর্বাদ করেন। ১৮৮৭ সালের ৩১ জুলাই স্টার থিয়েটারে শেষ অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়।

স্টার থিয়েটার-২ — ১৮৮৮ সালে কলকাতার হাতিবাগানে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটার ভেঙে যাওয়ার পর মূলত তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নাট্যকর্মীদের উদ্যোগেই এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্মদাস সুর এবং ইঞ্জিনিয়ার যোগেন গুপ্তের নকশা অনুযায়ী থিয়েটার হাউস ও তার মঞ্চ নির্মিত হয়। এক সময় গিরিশচন্দ্র ঘোষও এর সঙ্গে যুক্ত হন। প্রতিষ্ঠা বছরের ২৫ মে ‘সেবক’ ছদ্মনামে গিরিশ ঘোষ রচিত নসীরাম নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে নবনির্মিত হাতিবাগান স্টার থিয়েটারের উদ্বোধন হয়।

১৯৮৮ সালে স্টার থিয়েটার তার গৌরবের একশ বছর পূর্ণ করে। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে বহুবার স্টারের মালিকানা পরিবর্তিত হয়। বিভিন্ন সময়ে এর সংস্কার ও আধুনিকীকরণও হয়েছে। শেষদিকে এর মঞ্চটি ছিল ঘূর্ণায়মান। গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, অপরেশচন্দ্র, মহেন্দ্র গুপ্ত, দেবনারায়ণ গুপ্তসহ ৮০ জনেরও বেশি নাট্যকারের প্রায় ২৫০টি বাংলা নাটক এ মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। হিন্দি নাটক অভিনীত হয়েছে ১২টিরও বেশি। গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, গঙ্গামণি, কাদম্বিনী, অমর দত্ত, দানীবাবু, তারাসুন্দরী, কুসুমকুমারী, অপরেশচন্দ্র, শিশিরকুমার, অহীন্দ্র চৌধুরী, নীহারবালা, সরযুবালা, ছবি বিশ্বাস, উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, প্রেমাংশু বসু, অনুপকুমার প্রমুখ খ্যাতনামা শিল্পী স্টারে অভিনয় করেছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯৯১ সালের ১৬ অক্টোবর এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ঐতিহ্যমণ্ডিত এ থিয়েটার হাউসটি ভস্মীভূত হয়ে যায়।

হিন্দু থিয়েটার — ১৮৩১ সালে কলকাতার প্রান্তে গুঁড়ো-নারিকেলডাঙ্গায় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাগান-বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙালি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হলেও এ মঞ্চে কোন বাংলা নাটক অভিনীত হয়নি প্রতিষ্ঠা বছর ২৮ ডিসেম্বর শেক্সপীয়রের জুলিয়াস সিজার নাটকের পঞ্চম অঙ্ক এবং ভবভূতির সংস্কৃত নাটক উত্তররামচরিতম্-এর প্রথম অঙ্কের ইংরেজি অনুবাদ অভিনয়ের মাধ্যমে এর দ্বারোদ্ঘাটন হয়। গঙ্গাচরণ সেন, রামচন্দ্র মিত্র, হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের ছাত্রবৃন্দ অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। ১৮৩২ সালের ২৯ মার্চ নাথিং সুপারফ্লুয়াস নামে একখানি ইংরেজি প্রহসন অভিনীত হওয়ার পর হিন্দু থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়, কারণ এটি বাঙালি দর্শকদের আকর্ষণ করতে পারেনি।

৫.৪.১২.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

- ১) বাংলা নাটকের ইতিহাসে নাট্যমঞ্চের গুরুত্ব আলোচনা করো।
- ২) বঙ্গীয় নাট্যমঞ্চগুলির কালানুক্রমিক বিবরণ দাও।
- ৩) বাংলা নাট্যসাহিত্যে নাট্যমঞ্চগুলির অবদান লেখো।
- ৪) বাংলা নাটকের বিবর্তনে উভয় বঙ্গের নাট্যশালাগুলির গুরুত্ব নির্ণয় করো।
- ৫) সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো — গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার, জোড়াসাঁকো নাট্যশালা, বঙ্গ নাট্যালয়, মিনার্ভা থিয়েটার, বিদ্যোৎসাহিনী মঞ্চ, বেঙ্গল থিয়েটার, বেলগাছিয়া থিয়েটার, লায়ন থিয়েটার, স্টার থিয়েটার।

৫.৪.১২.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

- ১) বঙ্গরঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক — পুলিন দাস।
- ২) বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস — ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ৩) বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (১৭৯৫-১৯২০) — শিবব্রত চট্টোপাধ্যায়।
- ৪) নাট্যমঞ্চ নাট্যরূপ — পবিত্র সরকার।

পর্যায় গ্রন্থ - ৫
বাংলা ছোটগল্প
একক ১৩
প্রাক-চল্লিশ বাংলা ছোটগল্প
উপএকক-১
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-কাশীবাসিনী
বনফুল-ক্যানভাসার

বিন্যাসক্রম

- ৫.৫.১৩.১.১ : ভূমিকা
৫.৫.১৩.১.২ : ছোটগল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
৫.৫.১৩.১.৩ : কাশীবাসিনী—সাধারণ পরিচিতি
৫.৫.১৩.১.৪ : নামকরণ
৫.৫.১৩.১.৫ : ছোটগল্পকার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)
৫.৫.১৩.১.৬ : ক্যানভাসার—সাধারণ পরিচিতি
৫.৫.১৩.১.৭ : নামকরণ
৫.৫.১৩.১.৮ : সহায়ক গ্রন্থ
৫.৫.১৩.১.৯ : আদর্শ প্রশাবলী

৫.৫.১৩.১.১ : ভূমিকা

ছোটগল্প কথাসাহিত্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সজীব ও গতিশীল শিল্পরূপ। অন্যান্য সাহিত্য শিল্প অপেক্ষা ছোটগল্পের বিষয়-বৈচিত্র্য যেমন সমৃদ্ধ, তেমনি তার পাঠকসংখ্যাও দিন দিন বেড়ে চলেছে। কথাসাহিত্যের এই কনিষ্ঠ শাখাটির মধ্যে যুগ যন্ত্রণার ছবি ফুটে উঠেছে। পাঠক একাকিত্বের জ্বালা থেকে মুক্তি পেতে সেই জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। কথাসাহিত্যের প্রধান অবলম্বন হল রক্ত-মাংসের মানুষ। কথাসাহিত্যের প্রাচীন শাখা যেমন উপন্যাস, তেমনি নবীনতম শাখা হল ছোটগল্প। কথাসাহিত্যিক ঐ নবীনতম শাখাটির উপর মানুষের জীবনের কোন একটি বিশেষ দিকের উপর আলোকপাত করেন। যে জীবন মানুষের চোখে দেখা, বাস্তব জীবন।

বাংলা ছোটগল্পও বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে পরিবর্তিত হয়েছে। তার ফলে ছোটগল্পের জগতে এসে গেছে নতুন বৈশিষ্ট্য ও নতুন আঙ্গিক। বর্তমান আলোচনায়, বাংলা ছোটগল্পের প্রাক্-চল্লিশ পর্বের চার জন গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), প্রেমেন্দ্র মিত্র ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়' সম্পর্কে আলোচনা করতে সমর্থ হয়েছি। প্রাক্ চল্লিশ বাংলা ছোটগল্প ও গল্পকার যারা আছেন, সবার কথা আমরা এখানে আলোচনা করব না। যে কথাসাহিত্যিকরা আমাদের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত, তাঁদের ছোটগল্পের আলোচনায় আমরা অগ্রসর হবো।

৫.৫.১৩.১.২ : ছোটগল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২) মূলত কথাসাহিত্যিক। রবীন্দ্র সমসাময়িক বাংলা ছোটগল্পকারদের মধ্যে তিনি অন্যতম। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সবচেয়ে বড় গুণ রমণীয়তা। তিনি গল্পের বিষয়-বস্তুতে নিষ্ঠুরতার ছাপ রাখেননি, শেষপর্যন্ত তা মধুর রসে পরিণত হয়ে গেছে। ‘বাংলা ছোটগল্প’ গ্রন্থে শিশিরকুমার দাস বলেছেন— “ছোট হাসি, ছোট দুঃখ, ছোট কান্নার যে কাহিনী তিনি লিখেছেন, তার মধ্যে কোথাও কোনো জীবনের অতলস্পর্শ অনুভূতির সন্ধান নেই। সে যেন আমাদের প্রতিদিনের ঘরকন্নার কথা।” (পৃ ১৫০) রবীন্দ্রনাথের মতো জীবনকে দেখার মানসিকতা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছিল না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তিনি জীবনযুদ্ধে সামীল হননি। ঐ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষদের দুঃখে তিনিও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তাদের জীবনবোধের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। ‘বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’ গ্রন্থে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — “তাঁহার অগভীর আলোচনা প্রবণতা ও ছোটগল্পের উৎকর্ষ বিধানে সহায়তা করিয়াছে। জীবনের খণ্ডাংশ নির্বাচনে, তাহার ছোটখাট বৈষম্য অসংগতির উদ্ঘাটনের দ্বারা তাহার উপর মৃদু হাস্যকিরণ-সম্পাতে, আলোচনার লঘু-কোমল স্পর্শে, দ্রুত অথচ অকম্পিত রেখাঙ্কনে, সকল প্রকার গভীরতা ও আতিশয্যের সযত্ন পরিহারে আকস্মিক অথচ অভ্রান্ত যবনিকাপাতের সমাপ্তি কৌশলে এই সমস্ত দিক দিয়েই তিনি উচ্চাঙ্গের নিপুণতার নিদর্শন দিয়াছেন।” (পৃ ২১৭)

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অনেকগুলি ছোটগল্প লিখেছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ গুলি হল— ‘নবকথা’ (১৮৯৯), ‘ষোড়শী’ (১৯০৬), ‘দেশী ও বিলাতী’ (১৯০৯), ‘গল্পাঞ্জলি’ (১৯১৩), ‘গল্পবীথি’ (১৯১৬), ‘পত্রপুষ্প’ (১৯১৭), ‘গহনার বাক্স ও অন্যান্য গল্প’ (১৯২১), ‘হতাশ প্রেমিক ও অন্যান্য গল্প’ (১৯২৩), ‘বিলাসিনী’ (১৯২৬), ‘যুবকের প্রেম’ (১৯২৮), ‘নতুন বউ’ (১৯২৯) ও ‘জামাতা বাবাজী’ (১৯৩১) প্রভৃতি। সর্বোপরি সহজ-সরল জীবনছন্দে বিশ্বাসী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বাংলা কথাসাহিত্যে স্মরণীয় ব্যক্তি ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

৫.৫.১৩.১.৩ : কাশীবাসিনী—সাধারণ পরিচিতি

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি প্রধানত তাঁর কৌতুক গল্পের কারণেই। যে কয়েকটি গল্পে করুণ ও সন্তান বাৎসল্যের পরিচয় পাওয়া যায়, সেগুলি হল— ‘ফুলের মূল্য’, ‘কাশীবাসিনী’, ‘আদরিণী’ এবং ‘দেবী’ গল্প। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘কাশীবাসিনী’ গল্পে কন্যা মালতীর প্রতি স্নেহ-বাৎসল্য ধরা পড়েছে। গল্পটি ‘ভারতী’ পত্রিকায় ১৯০১ খ্রিঃ প্রকাশিত ও ‘ষোড়শী’ নামের গল্পগ্রন্থে ১৯০৬ খ্রিঃ সংকলিত হয়। কন্যার

টানেই কাশীবাসিনীকে বারবার হাজির হতে হয়েছে। গল্পটির মূল চরিত্র তিনটি, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চরিত্র, গিরীন্দ্রনাথ, স্ত্রী-মালতী এবং নামহীনা এক কাশীবাসিনী। তিনজনের মধ্যে কাশীবাসিনী হল মূল কেন্দ্রীয় চরিত্র।

‘কাশীবাসিনী’ গল্পটির কাহিনীর পটভূমি সেকালের খগোল নামের জায়গাকে কেন্দ্র করে। গল্পে দানাপুর স্টেশন ও তার আশে-পাশের অঞ্চলের বিবরণ রয়েছে। গল্পের পুরুষ চরিত্র গিরীন্দ্রনাথ কর্মসূত্রে দানাপুর স্টেশনের মালগুদামের ছোটবাবু। তার সঙ্গে কর্মস্থলে তার স্ত্রী মালতীও বসবাস করে। একদিন শীতকালে দুপুরবেলায় মালতীর বাসাবাড়িতে একটি তোরঙ্গ ও পুটুলি নিয়ে অপরিচিতা বিধবা বয়স্ক বাঙালির আবির্ভাব ঘটেছে। মালতী এক সরল, নিষ্পাপ, অতিথিপরায়ণ, সেকালের নিঃসঙ্গ গৃহবধূ। সে বিশ্বাস করে, ঐ বৃদ্ধাকে তাদের পরিবারে আশ্রয় দিয়েছে। বৃদ্ধাকে লক্ষ্য করে বলেছে—“হাত পা ধুয়ে ফেলুন।... খাওয়া-দাওয়া হয়নি বোধ হয়?” এরপর কাশীবাসিনীর সঙ্গে কথাবার্তায় জানা গেছে— কাশী থেকে গাড়ীতে যাবার সময় টিকিট হারিয়ে যায়, তার ফলে ট্রেন থেকে নেমে পড়তে বাধ্য হয়েছে। এরপরের ট্রেন রাত্রি একটার সময়, তাই ভাবলেন গিরীন্দ্রনাথের এখানে একটু আশ্রয় নেবেন। সেইজন্য এই বাড়িতে আসা। মালতীর সঙ্গে কথাবার্তায় কাশীবাসিনী জিজ্ঞেস করেছেন—“তোমার মা, বাপ সবাই আছেন? মালতী মুখখানি অন্ধকার করিয়া বলিল, ...মা মারা গেছেন যখন আমি এক বছরের”।

গিরীন্দ্রনাথ, অফিস থেকে ফিরে স্ত্রী মালতীর কাছে অতিথির কথা শুনেছে, কিছুক্ষণ পর তার সঙ্গে আলাপ করতে গেছে। কাশীবাসিনীর সঙ্গে কথা বলে তারপর সে বাইরে আড্ডা মারতে চলে যায়। ফিরে এসে মালতীকে তার তাড়িঘাটে বদলির শুভ খবর জানিয়েছে। তার জন্য তার মাইনে বাড়বে মাত্র পাঁচ টাকা। অপরদিকে ঐ সময়টুকুর মধ্যে মালতীর কাছ থেকে কাশীবাসিনী জেনে নিয়েছে, মালতীর বাপের বাড়ির ঠিকানা, মা-বাবার খবর, গিরীন্দ্রনাথের সঙ্গে কতদিন আগে তার বিয়ে হয়েছে, স্বামী কখন কাজে যায়, কখন ফেরে, কত পারিশ্রমিক পায় সংসারের যাবতীয় খবর। এমনকী মালতী বিশ্বাস করে নিষ্পাপ সারল্যে বিধবা কাশীবাসিনীকে নিজের গহনার বাস্তু পর্যন্ত দেখিয়েছে।

এরপর গিরীন্দ্রনাথের বদলির খবরে তার বন্ধুরা খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে বললে নিজের বাড়িতে তার আয়োজন করেছে। কিন্তু গিরীন্দ্রনাথ যে দুপুরে কুলি পাঠাতে বলেছিল বিধবার ফিরে যাওয়ার জন্য, তা ভুলে গেছে। সেই পরিস্থিতিতে দেখা যায় কাশীবাসিনী রান্নার কাজে মালতীকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। কখনও জলখাবার তৈরী করে দিয়েছে, কখনও বা টাকা দিয়েছে। পরে অবশ্য গিরীন্দ্রনাথ সেই তিরিশ টাকা শোধ করে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এমনকী গিরীন্দ্রনাথ, কাশীবাসিনীকে বলেছে, তিনি যদি তাড়িঘাটে তাদের সঙ্গে যায়, তবে এক সপ্তাহের মধ্যে টাকা ফেরৎ দিয়ে দেবে। কিন্তু কাশীবাসিনী আর ওদের সঙ্গে তাড়িঘাটে যেতে রাজী হননি।

এদিকে তাড়িঘাটে এসে স্টেশন সংলগ্ন নতুন বাসায় মালতী স্নান সেরে কাপড় বের করতে গিয়ে দেখে তোরঙ্গে গয়নার বাস্কাটি নেই। তখন গিরীন্দ্রনাথের সন্দেহ হয় কাশীবাসিনীকেই। কারণ মালতী, কথা প্রসঙ্গে সব গহনার কথা তার সামনে বলেছিল। তখন এই দম্পতি পড়েছে মহা সমস্যায়। তারা কাশীবাসিনী কোন মঠে থাকেন তার ঠিকানা পর্যন্ত নিয়ে রাখেনি। শেষমেশ কোন উপায় না দেখে গিরীন্দ্রনাথ থানায় ডায়েরি করেছে। দিন পনের পর হঠাৎ একদিন সকালে কাশীবাসিনীকে দেখে ওরা অবাক হয়ে যায়। পরে জানা যায় তারা ডায়েরী করেছে বলে কাশীবাসিনী পুলিশকে দুশো টাকা ঘুষ দিয়ে মুক্তি পেয়েছে। নানান কথায় মান-অভিमानে কাশীবাসিনী পরবর্তীকালে জানায় সে মালতীর মা। “অতীতে কুলটার জীবন কাটিয়েছিল বলে লজ্জায় মেয়ের কাছে আসেনি। মালতী

জেনেছিল ওর মা বেঁচে আছে। এই প্রথম ওর স্বপ্নের মা কে দেখল।” এরপর কাশীবাসিনী, মালতীকে অনেক গয়না দিতে চাইলেও সে নিতে রাজী হল না। তখন কাশীবাসিনী, কষ্ট পেয়ে বলতে লাগলেন—“আপনার সন্তানকে কেউ কি ভুলতে পারে?”

‘কাশীবাসিনী’ গল্প পাঠ করে আমরা জানতে পেরেছি গল্পটিতে স্নেহবাৎসল্য প্রধান হয়ে উঠেছে। গল্পের পরিণতিতে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মা ও মেয়ের সম্পর্কের বন্ধনকে করুণ রসে আর্দ্র করে তুলেছেন। গল্পের শেষে, কাশীবাসিনী মেয়েকে গহনা দিতে চাইলে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন— “কাশীবাসিনী কন্যার মুখপানে চাহিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিলেন। বলিলেন, যা ভেবেছো তা নয়। এ তুমি স্বচ্ছন্দে পোরো, নইলে আমিই তোমায়—দিতাম না। জীবনে একবার যে পাপ করেছি, আজ চৌদ্দ বছর ধরে তার প্রায়শ্চিত্ত করলাম। আর এর একখানিও পাপের অর্জন নয়। আমি মস্ত বড় মানুষের মেয়ে ছিলাম— শোন নি?” এমন কী কাশীবাসিনী মালতীকে আরো জানায় —“যদি তিনি তা পরতে না দেন, তবে এগুলি দেবসেবায় দিও।” এরপর কাশীবাসিনী যাবার জন্য উদ্যত হলে, মালতী আর থাকতে না পেরে বলেছে— “মা আবার দেখা দিও”—বলিয়া কাঁদিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল, প্রণাম করিল।” কাশীবাসিনী তখন মেয়েকে “মা সাবিত্রী হও, রাজরাণী হও।” আমাদের পরিবারের পিতা-মাতা-যেমন সন্তান-সন্ততির মঙ্গল কামনা করে, তেমনি কাশীবাসিনীও মালতীর সমৃদ্ধি চেয়ে, চলে গেলেন। গল্পকার, ‘কাশীবাসিনী’ গল্পটিতে মাতা ও কন্যার সম্পর্কের বন্ধনটিকে মমতার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন।

৫.৫.১৩.১.৪ : নামকরণ

‘কাশীবাসিনী’ গল্পে যেমন সন্তান বাৎসল্য প্রাধান্য পেয়েছে। তেমনি গল্পের নাম ‘কাশীবাসিনী’ রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তীর্থ করে আসা এক বিধবার কথা বলেছেন। গল্পে যার প্রকৃত নাম কোথাও দেননি। তখনকার দিনে একাল্লবতী পরিবারে বয়স্ক পুরুষ-মহিলার নাম মুখে উচ্চারণ করা হতো না। যদি কোন ব্যক্তি নাম উচ্চারণ করতো, তাহলে পরিবারের অকল্যাণ হতো বলে তখনকার মানুষ বিশ্বাস করতো।

এই প্রসঙ্গে বর্তমান কালের প্রেক্ষাপট বুঝে নেওয়া দরকার। এখনকার দিনে বৃদ্ধ বাবা-মাকে ছেলে-মেয়েরা কেউ গুরুত্ব দিতে চায় না, এমনকী তাদের সংসারে রাখতে পর্যন্ত চায় না। শেষ পর্যন্ত তাদের ঠাই হয় বৃদ্ধাশ্রমে। গল্পে আমরা দেখেছি বৃদ্ধা, মালতীকে দেখে ও তার সম্পত্তির সং ব্যবহার করে আবার বাড়ির বাইরে চলে গেলেন। আধুনিক জীবন ধারণ পদ্ধতিতে বৃদ্ধাশ্রম প্রথা এলেও তখনকার দিনে বাড়ির বয়স্ক ব্যক্তির কাশী চলে যেতেন। গল্পের মালতীর মাও কাশীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে বলে ধরে নিতে পারি। সেইজন্য ‘কাশীবাসিনী’ নামটি সার্থক হয়েছে।

৫.৫.১৩.১.৫ : ছোটগল্পকার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯) বাংলা সাহিত্যে একটি অতি প্রিয় নাম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর বাংলা ছোটগল্পের স্বনামধন্য শিল্পী ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমসাময়িক ছোটগল্পকার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় স্বতন্ত্র প্রতিভা হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। ‘বনফুল’ ছদ্মনামেই যিনি পাঠকদের

কাছে অধিকতর পরিচিত। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন বিখ্যাত চিকিৎসক। আর সাহিত্যজীবনে তাঁর চমকে দেওয়ার বিষয় ছিল ছোটগল্পের আঙ্গিক। জীবনের খণ্ডাংশকে তিনি পোস্টকার্ডের সাইজের মতো ছোটগল্পে তুলতে ধরতে পেরেছেন। সেইজন্য ছোটগল্পের সংযম তাঁর লেখনীর একটি বড় বৈশিষ্ট্য। কথাসাহিত্যিক বনফুল নাটকের জগতেও তাঁর সৃষ্টিকর্মকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। সর্বোপরি বনফুলের সাহিত্য সৃষ্টির মূলে ছিল তাঁর জীবনদর্শন। বনফুলের জীবনবোধের অভিনবত্বকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘বিজ্ঞানী মেজাজের’ ও বলেছিলেন। অবশ্যই তাঁর সাহিত্যে জীবনবোধের মূলে রয়েছে লেখকের প্রত্যক্ষ জীবন অভিজ্ঞতা। তাঁর উপন্যাসের কথা যদি ধরা হয়, তাহলে—‘তৃণখণ্ড’, ‘বৈতরণী-তীরে’, ‘কিছুক্ষণ’, ‘মৃগয়া’ থেকে শুরু করে ‘দ্বৈরথ’, ‘নির্মোক’, ‘রাত্রি’, ‘সে ও আমি’, ‘সপ্তর্ষি’, ‘জন্ম’, ‘ডানা’ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বনফুলের ছোটগল্পেই রয়েছে, তার নিজস্বতা ও প্রতিভার স্বাক্ষর। সমালোচকদের মতে বনফুলের উপন্যাসের থেকে ছোটগল্পের পরিচিতি পাঠকদের কাছে বেশী করে নজর কেড়েছে। তাঁর জীবনদর্শন ও শিল্পরীতি ছোটগল্পের ক্ষেত্রেই অন্যমাত্রা এনে দিয়েছে। সেইজন্য তিনি সুন্দর গল্প পাঠকদের উপহার দিতে পেরেছেন। বনফুলের গল্প রচনায় আমরা দেখেছি, তিনি পাঠককে দিয়ে অনেক কিছু বলিয়ে নেন। গল্পের কাহিনী গঠনে বেশী কথা যেমন তিনি বলেন না, তেমনি স্বল্প কথায় জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলোকে তুলে ধরেন। বনফুলের ছোটগল্পে মানবজীবনের এই বহুরূপী রূপটিই বিচিত্রভাবে ধরা পড়েছে বিভিন্ন গল্পে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ‘না বলা বাণী যেমন বলা বাণীর থেকে বেশী বলে’ তা বোধকরি বনফুলের ছোটগল্পের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বনফুলের গল্পের প্রকৃতি বুঝতে পারা যাবে এই গল্পগুলি পাঠ করলে —‘অজান্তে’ ‘সমাধান’, ক্যানভাসার ‘ছোটলোক’, ‘বুধনী’, বৈষ্ণব-শাক্ত’, ‘তপন’ ‘লাল বনাত’, ‘নিমগাছ’ প্রভৃতি।

৫.৫.১৩.১.৬ : ক্যানভাসার—সাধারণ পরিচিতি

বনফুলের ‘আরও গল্প’ (১৯৩৮) সংকলনে ‘ক্যানভাসার’ অনুগল্পটি স্থান পেয়েছে। ক্যানভাসার যাদের জীবিকা, তাদের নিয়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একই নামে একটি গল্প আছে। গল্পটির নাম ‘ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল’। আর আমাদের এখন আলোচ্য বিষয় বনফুলের ‘ক্যানভাসার’ গল্পটি।

বনফুল একেবারে ভিন্ন স্বাদের কাহিনী সংযোজন করেছেন ‘ক্যানভাসার’ গল্পে। এই গল্পটির প্রধান চরিত্রের নাম ক্যানভাসার হীরালাল। তাছাড়াও রয়েছে বিবাহিত ভৈরব ও তার স্ত্রী কাত্যায়নী। ভৈরব অর্থনৈতিক সংকটের কারণে স্ত্রীকে শাড়ি কিনে দিতে পারেনি। ভৈরবের কাছে এই পরিস্থিতিতে তার স্ত্রীর শাড়ি চাওয়া আবদার বলে মনে হয়েছে। কেননা সংসার সুখের হয় দু’জনের গুণে। তাই স্বামী-স্ত্রী পরস্পর-পরস্পরের মনোভাব বুঝে চলবে, তা না হলে কিসের পরিবার-পরিজন। গল্পপাঠে আমরা জানতে পেরেছি ‘কলহের মূল কারণ অবশ্য কাত্যায়নী’। বেকার ভৈরব অর্থনৈতিক হাহাকারের জন্য কাত্যায়নীর শখ মেটাতে পারে না। কাত্যায়নীর ইচ্ছে ছিল একটি শৌখিন শাড়ি কেনার। সংসারের চাপে তা আর হয়ে উঠেনি। সেইজন্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ বেঁধেছে। তারপর ঝগড়া-ঝাটির পরে ঐ দম্পতির মনের অবস্থাও ভালো ছিল না। এইসময় হঠাৎ করে ক্যানভাসার হীরালালের অনর্গল চিৎকার নিশ্চয়ই ভালো লাগবে না। তখন ভৈরব রেগে গিয়ে “খানিকটা তেল মাথায় চাপড়াইয়া হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে চতুর্দিক পুড়িয়া যাইতেছে। বাহির হইয়াই সম্মুখে দেখিল নিমগাছ। সকাল হইতে দাঁতন পর্যন্ত করা হয় নাই। ভৈরব নিমগাছটার একটা ডাল নোয়াইয়া মটাস্ করিয়া একটা দাঁতন

ভাঙিল।” এমন সময় ক্যানভাসার হীরালালের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। হীরালাল চিৎকার করে হাঁকতে হাঁকতে ফেরি করে ‘মাজন চাই—ভাল দাঁতের মাজন’।

বেকার ভৈরব তার গ্রামের মধ্যে এক অচেনা লোককে দাঁতের মাজনের ব্যবসা করতে দেখে রেগে যায়। এর আগে হীরালাল এই পল্লীগ্রামে কোন দিন আসেনি। হীরালাল দাঁতের মাজনের ব্যবসা করে শহরের রাস্তায়। কিন্তু ট্রেন বিভ্রাটের কারণে বেচারা এখানে নেমে পড়েছে। “সন্ধ্যার আগে ফিরিবাব ট্রেন নাই। যদি কিছু বিজ্ঞেস হয়, এই আশায় বেচারা দুপুর রোদেও চতুর্দিকটা একবার ঘুরিয়া দেখিতেছে।” তাই ভৈরবের মুখোমুখি হয়ে ক্যানভাসার হীরালাল কিছু বিক্রি করার চেষ্টা করেছে। তাই ভৈরবকে কিছু নেওয়ার জন্য কাকুতি-মিনতি করেছে, আর হেঁকে চলেছে—“মাজন আছে —ভাল দাঁতের মাজন। দাঁতের পোকা, দাঁতের গোড়া ফোলা, পুঁজ পড়া, রক্ত পড়া, মুখে গন্ধ-সব ভাল হয়ে যাবে মশাই—ভাল মাজন আছে।”

এরপর গল্প পাঠ করে আমরা জানতে পারি ক্যানভাসার হীরালালের সঙ্গে ভৈরবের কথা কাটাকাটি হয়েছে। আসলে যার যেটা বৃত্তি, সে তো চেষ্টা করবে উপার্জন করার জন্যে। তাই হীরালাল, খুব পীড়াপীড়ি করতে থাকে ভৈরবকে। এ যেন নিমের দাঁতনের সঙ্গে আধুনিক দাঁতের মাজনের লড়াই শুরু হয়ে গেল। সেই পরিস্থিতিতে গল্পকার হীরালালকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন—“আপনার দাঁতগুলি তো খাসা—এই মাজনই ব্যবহার করেন নাকি?” তখন হীরালালের বকবাকে দাঁতগুলি দেখে ভৈরবের হিংসা হল। এমনকী সে ভাবতে থাকে তাহলে নিমের দাঁতনের যতই পুষ্টিগুণ থাকুক, বোধহয় আধুনিক জীবনধারণ পদ্ধতির কারণে লোকে আর নিমের দাঁতন ব্যবহার করবে না। কাজেই মানুষের মধ্যে এর প্রচার বন্ধ করা উচিত। এমনকী ক্যানভাসার হীরালালের মতো মানুষদের গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া খুবই প্রয়োজন। “বেরিয়ে যান আপনি এ গাঁ থেকে! ওসব মাজন—ফাজন বুজরুকি এখানে চলবে না।”

আসলে হীরালালও তো রক্ত-মাংসের মানুষ। বেকার ভৈরবের মতো ওর তো অর্থনৈতিক হাহাকার রয়েছে। সেইজনেই তো ক্যানভাসারের জীবিকা গ্রহণ করে কিছু অর্থ উপার্জন ওর মূল লক্ষ্য। কিন্তু ভৈরব চায়, এখনি হীরালাল এই গ্রাম থেকে বের হয়ে যাক। এই নিয়ে সে যুবক-যুবতীদের ক্ষেপাইয়া তুলেছে। যেখানে দু’বেলা দু’মুঠো পেট ভরে খাবার জোটে না, সেখানে বিলাসিতা করতে দাঁতের মাজন ব্যবহার ভৈরবকে হতাশ করেছে। তখন প্রতিবাদের ফলস্বরূপ ভৈরব হীরালালের গালে চড় মারলে বাঁধানো দাঁত খুলে পড়ে যায়। “চড় খাইয়া হীরালাল সঙ্গে সঙ্গে ফোকলা হইয়া গেল। তাহার বাঁধানো দন্তপাটি ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল।” গল্পপাঠে আমরা জানতে পারি ক্যানভাসার হীরালালের কাছে শুধু দাঁতের মাজন নয়, চুলের কলপও পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক সংকটের কারণে সকলের অবস্থা খুবই দুর্বিষহ। এই পরিস্থিতিতে বনফুল ‘ক্যানভাসার’ গল্পটি শেষ করেছেন এইভাবে—“স্তুস্তিত ভৈরব তাহার কালো কুচকুচে গোঁফ—জোড়াটার পানে চাহিয়া আছে দেখিয়া হীরালাল একটু হাসিয়া বলিল, আজে হ্যাঁ, ওটাও। ভাল কলপও আমি রাখি। নেবেন? কেন মার-ধোর করছেন মশাই? গরিব মানুষ—এই ক’রে কষ্টে-সৃষ্টে সংসার চালাই। বুড়ো বয়সে উপযুক্ত ছেলেটি মারা গেছে।” হীরালালের কথা শুনে ভৈরব নিজেই এক কৌটা দাঁতের মাজন কিনে নেয়। গল্পকার বনফুল, গল্পটি এখানেই শেষ করেছেন। একটু আগে ভৈরব আধুনিক যুবক-যুবতীদের দাঁতের মাজন ব্যবহারকে বিলাসিতা বলে চালালেও পরিবেশ-পরিস্থিতির বিবর্তনে বেকার ভৈরবও সেই রীতি-নীতিতে, জীবন-ধারণ পদ্ধতিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে।

৫.৫.১৩.১.৭ : নামকরণ

বনফুলের ‘ক্যানভাসার’ গল্পে আমরা দেখি ক্যানভাসার হীরালাল নিজের অর্থ উপার্জনের জন্য সব কিছু করতে রাজী। কারণ বুড়ো বয়সে বেকার হবার যে জ্বালা, তাতে করে ক্যানভাসিং করে জীবিকা নির্বাহ ছাড়া আর কোন রাস্তা নেই। এমনকী তার উপযুক্ত ছেলে ছিল, সেও মারা গেছে। এই পরিবেশ-পরিস্থিতিতে জীবন ধারণের জন্য তার সামনে সহজ পদ্ধতিতে ক্যানভাসিং করা ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না। তাছাড়া এই ব্যবসায় এখান-ওখান ঘুরে, মানুষের মন জয় করতে হয় ঠিকই। তবে ব্যবসার ক্ষতির কোনও সম্ভাবনা নেই। বরঞ্চ কোম্পানীর কাছ থেকে কিস্তিতে কিস্তিতে মাল নিয়ে, বিক্রি করে তারপর অর্থ শোধ করলেও চলে যায়। সবদিক বিচার করে এই গল্পের নামকরণ ‘ক্যানভাসার’ যথোপযুক্ত হয়েছে। এমনকী এই গল্প পড়ে, গল্পের পরিণামে যে হাস্যরসের উদ্বেক হয়েছে, সেই দিকটির প্রতিও বনফুল আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

৫.৫.১৩.১.৮ : সহায়ক গ্রন্থ

- ১। সাহিত্যে ছোটগল্প—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
- ২। বাংলা ছোটগল্প—ভূদেব চৌধুরী
- ৩। ছোটগল্পের কথা— রথীন্দ্রনাথ রায়
- ৪। বাংলা ছোটগল্প— শিশির কুমার দাশ
- ৫। কালের পুত্তলিকা— অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
- ৬। বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ (১ম-২য় খণ্ড) —বীরেন্দ্র দত্ত
- ৭। বাংলা ছোটগল্প তত্ত্ব ও গতি-প্রকৃতি—সোহরাব হোসেন

৫.৫.১৩.১.৯ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

- ১। গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্বের পরিচয় দাও।
- ২। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কাশীবাসিনী গল্পের বাৎসল্য রসের পরিচয় দাও।
- ৩। গল্পকার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের (বনফুল) কৃতিত্বের পরিচয় দাও।
- ৪। বনফুলের ক্যানভাসার গল্পের মনস্তত্ত্বের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা লেখ।
- ৫। বনফুলের ক্যানভাসার গল্পের হাস্যরসের পরিচয় দাও।

একক ১৪
প্রাক্-চল্লিশ বাংলা ছোটগল্প
উপএকক - ২
প্রেমেন্দ্র মিত্র—সংসার সীমান্তে
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—টোপ

বিন্যাসক্রম

- ৫.৫.১৪.২.১ : ভূমিকা
৫.৫.১৪.২.২ : ছোটগল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র
৫.৫.১৪.২.৩ : সংসার সীমান্তে—সাধারণ পরিচিতি
৫.৫.১৪.২.৪ : নামকরণ
৫.৫.১৪.২.৫ : ছোটগল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
৫.৫.১৪.২.৬ : টোপ—সাধারণ পরিচিতি
৫.৫.১৪.২.৭ : নামকরণ
৫.৫.১৪.২.৮ : সহায়ক গ্রন্থ
৫.৫.১৪.২.৯ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৫.৫.১৪.২.১ : ভূমিকা

বাংলা ছোটগল্পের প্রচলিত ধারায় প্রাক্-চল্লিশ বাংলা ছোটগল্পকারদের মধ্যে এই এককে প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০) বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। ছোটগল্পকার হিসেবে দু'জনেই বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন পেয়েছেন। বিশ শতকের দু-এর দশক ও তিনের দশকের পর মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ, বেকারী ও দারিদ্র্য প্রভৃতি বহুবিধ সমস্যার মধ্যেই গল্পকারের গল্প রচনার সূত্রপাত। স্বাভাবিক কারণেই সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি দুই গল্পকারের গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে। সে সময় বাংলা কথাসাহিত্যে এক দল তরুণ লেখক হাজির হয়ে নানামুখী ভাবে সাহিত্য সৃজন করে চলেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাবে নাম করতে পারি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। প্রাক্ চল্লিশ বাংলা ছোটগল্পের লেখকরা তাঁদের গল্প বিষয়কে স্বতন্ত্র করে অঙ্কন করেছেন। বর্তমান আলোচনায় আমাদের নির্বাচিত গল্পকারদের, গল্প-বিশ্লেষণে অগ্রসর হবো।

৫.৫.১৪.২.২ : ছোটগল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র

বাংলা ছোটগল্পের জগতে প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। বিশিষ্ট এই কারণে যে, দুই মহাযুদ্ধের ফলে পৃথিবীর সর্বত্র বহুবিধ সংকট তৈরি হয়েছিল। তার ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ চরম বিপর্যয়ের মধ্যে দিন কাটিয়েছে। একদিকে হাহাকার, শূন্যতা কথাসাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠেছে। সেইসময় প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমসাময়িক মনীষ ঘটক, গোকুলচন্দ্র নাগ, জগদীশ গুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লেখক সাহিত্য সৃজনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেঁচে থাকতেই ‘রবীন্দ্র-উত্তর’ যুগের ভিত্তি স্থাপন হয়েছিল এঁদের হাতেই। তার ফলে রবীন্দ্রোত্তর কালের এক অনন্য ছোটগল্প লেখক হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্র উঠে এলেন। কবিতার জগতেও প্রেমেন্দ্র মিত্র বিচরণ করেছেন, তার ফলে কবি হিসেবে ও তাঁর খ্যাতি জগৎ জোড়া। সর্বোপরি বলা যায় প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন কল্লোলের লেখক। “বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ গ্রন্থে” বীরেন্দ্র দত্ত বলেছেন— “আসলে তিনি ছিলেন মনে-প্রাণে কল্লোলীয়া। অর্থাৎ ‘কল্লোল’ পত্রিকা প্রকাশের কালে ‘কল্লোল’ জন্মের মূলে; প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর মতো, যে মানসভূমি রচিত হচ্ছিল, প্রেমেন্দ্র মিত্রের মানসিকতা তার ঘনিষ্ঠ অনুবর্তী ছিল।” (পৃ: ৬২৩) প্রেমেন্দ্র মিত্র বহুমুখী সমস্যায় জর্জরিত হয়ে, মানব মনস্তত্ত্বের কথাকে ছোটগল্পের মধ্যে রূপ দিলেন। মানব মনোজগৎ রহস্যময়, প্রেমেন্দ্র মিত্র এই মনস্তত্ত্বকে ছোটগল্পে চিত্রার আলোকে ধরেছেন। তারফলে গোটা মানুষের মানে খুঁজতেই তিনি একের পর এক জীবনপর্বে অগ্রসর হয়েছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম ছোটগল্প ‘শুধু কেরানী’। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল প্রবাসী পত্রিকায় ১৯২৩ খ্রিঃ। তারপর কয়েকদিন পর ‘কল্লোল’ পত্রিকায় ‘শুধু কেরানী’ গল্পের সমালোচনা বের হয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পগুলিকে বিষয়বস্তুর দিক থেকে অনেকগুলি বিভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন, মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয়ের গল্প, মনস্তাত্ত্বিক গল্প, সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষের গল্প ইত্যাদি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—পুন্নাম, ভবিষ্যতের ভার, হয়তো, সাগরসংগম, মৃত্তিকা, অনাবশ্যক, মহানগর, জনৈক কাপুরুষের কাহিনী, কুয়াশায়, সংসার সীমান্তে, পুনর্মিলন, ভাস্মশেষ, শৃঙ্খল, স্টোভ, তেলেনাপোতা আবিষ্কার, রবিনসন ক্রুশো মেয়ে ছিলেন প্রভৃতি।

৫.৫.১৪.২.৩ : সংসার সীমান্তে —সাধারণ পরিচিতি

প্রেমেন্দ্র মিত্র মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার। মধ্যবিত্ত মানসিকতার মানুষের পায়ের তলার মাটি সরতে আরম্ভ করেছিল বহুবিধ কারণে। দুটি বিশ্বযুদ্ধের ফলে সেই সংকটের চেহারাটি লেখক তুলে ধরেছেন তাঁর গল্পগুলির মধ্যে। তিনি একে একে লিখে গেছেন—পুন্নাম, হয়তো, সাগর সঙ্গম, সংসার সীমান্তে, স্টোভ, মহানগর, তেলেনাপোতা আবিষ্কার প্রভৃতি ছোটগল্প।

আমাদের আলোচ্য ‘সংসার সীমান্তে’ গল্পে রজনী ও অঘোর সমাজের দুই বঞ্চিত নারী-পুরুষের জীবনচিত্র ফুটে উঠতে দেখা গেছে। সমাজের নীচের তলায় বসবাস করে বলে এদেরকে কেউ গুরুত্ব দিতে চায় না। আবার তাদের জীবনে অর্থনৈতিক হাহাকার ও নানা সমস্যা শূন্যতায় ভরে উঠেছিল। তারফলে তাদের জীবনে নেমে আসে কালো ধোঁয়া। গল্পের শুরুতে রজনীর জীবনের একটি দিক তুলে ধরেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র— “বৃষ্টির ঝাপটা হইতে সযত্নে দুই হাতে কেরোসিনের ধুমবহুল শিখাটিকে যে আড়াল করিয়া বসিয়া আছে তাহার দুরাশার বুঝি আর অস্ত নাই। কিম্বা হয়তো হতাশার শেষ সীমায় সে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহার মৃত মনের কাছে বাহিরের দুর্যোগের কোন অর্থই আর নেই।”

‘সংসার সীমান্ত’ গল্পের পাকা চোরের নাম অঘোর দাস। হঠাৎ ঝড়-জলের রাতে তাড়া খেয়ে অঘোর দাস রজনীর ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। বাড়িতে থাকার জন্য রজনীকে ভাড়া বাবদ সে দিয়েছে এক টাকা। কিন্তু রাতের অন্ধকার দূরীভূত হওয়ার আগে ঐ এক টাকা নিয়ে অঘোর দাস পালিয়ে গেছে। রজনীর হতাশা হওয়ার কিছু নেই, সংকটময় পরিস্থিতিতে মানুষের থেকে এরকম ব্যবহার পাবে, তাতে আর নতুনত্ব কি? “মানুষের কাছ হইতে আশঙ্কা করিবার তাহার আর কিছু নাই। জীবনের চরম ক্ষতি তাহার হইয়া গিয়াছে।” আবার এক দিনে কি মনে করে দুপুরবেলায় রজনীর কাছে অঘোর হাজির হয়েছে। তারপর জনগণের হাতে প্রচণ্ড মার খাবার পরিবেশ তৈরি হলেও বেঁচে গেছে। যদিও মার খাওয়ার মূলে অবশ্য রজনী। “রজনীর সাহস বাড়িয়াছে। রাগের মাথায় সে বলে, হ্যাঁ, হাতে হাত কড়া সবাই দিচ্ছে। যা না তুই পুলিশে। আমি ও বলতে জানি, সিঁদকাঠি নিয়ে প্রথমদিন ঘরে ঢুকেছিলি মনে নেই।” তারপর অঘোর দাসও রেগে গিয়ে রজনীকে কথা শুনিয়েছে। সে বলেছে, অঘোর দাস কাউকে ভয় পায় না। তখন রজনী আবার বলতে শুরু করেছে—“দেখিনি আবার, সেদিন পুঁটলির ভিতর কি ছিল? তাড়া খেয়ে আমার ঘরে তো ঢুকেছিলি লুকোতে। বুঝি না আমি কিছু।”

মানুষকে মারধর করা উচিত নয়। মানুষ যে চুরি করে, তা নিজের ইচ্ছেয় করে না। পরিবেশ-পরিস্থিতি তাকে চুরি করতে বাধ্য করে। ‘সংসার -সীমান্তে’ গল্পের অঘোর দাস ও সামাজিক সংকট ও অর্থনৈতিক সংকটের কারণে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। সে ও এই পরিস্থিতিতে কি করবে, কি খাবে, কিছুরই ঠিক-ঠিকানা করতে পারছে না। তাই রজনীর ঘরে আশ্রয় নিয়েছে বলে দোষের কিছু নয়। তখন রজনী অন্য লোকদের বুঝিয়ে অঘোরকে মারধর করতে নিষেধ করেছে। এমনকী রজনী, অঘোর দাসের সেবা-শুশ্রূষার দায়িত্ব নিয়েছে। “কিন্তু হপ্তা কাবার হইবার পরও লোকটার যে সারিবার লক্ষণ নাই। রজনীর ধৈর্য আর কতদিন থাকে।”

রজনী ও অঘোর দাস সমাজের নিম্নবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি। সেইজন্য তাদের জীবন-ধারণ পদ্ধতিও আলাদা। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্র শহরের অলিতে-গলিতে যে জীবনকে দেখেছেন, সেই জীবনের খণ্ডচিত্রকে ‘সংসার -সীমান্তে’ ছোটগল্পে স্থান দিয়েছেন। গল্পের রজনী ও অঘোর দাস সুস্থ ও সুন্দরভাবে ঘর বাঁধতে চেয়েছে। দু’জন, দু’জনকে কাছে পেয়ে যেমন মনের কথা বলেছে, তেমনি পরস্পরের ভালোবাসারও প্রকাশ লক্ষ্য করা গেছে। দু’জন অপরিচিত হলেও ধর্মণের শিকার হয়নি বরঞ্চ নিখাদ ভালোবাসা ও সীমান্তের বিশ্বাস নিয়েই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে চেয়েছে। নগরের বিশাল জনারণের মধ্যে যৌবনের সীমান্তে তারা পরস্পর সবকিছু বুঝে নিতে সচেষ্ট হয়েছে। “বর্তমান যাহাদের ক্রুদ্ধপঙ্কিল, তাহারও ঘর বাঁধতে চায়, পৃথিবীর ভাগ্যবান নর-নারীদের জীবন লীলার অনুকরণ করিতে তাহাদের সাধ যায়।” কিন্তু সংসার সীমান্ত রেখায় দাঁড়িয়ে, দুটি নর-নারী সংসারে প্রবেশ করতে চায়। কিন্তু অস্তিত্বের সংকটের কারণে শেষ পর্যন্ত তা পারেনি। পরিবেশ-পরিস্থিতি সংকটজনক হওয়া সত্ত্বেও দুটি নর-নারী নিঃশ্বাস নিয়ে আশায় বুক বাঁধতে চেয়েছে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের আশা ব্যর্থ হয়েছে। অঘোর দাস আবার কুড়ি টাকা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। আর কুড়িটা টাকা থাকলে বাড়ি ভাড়া শোধ করে তারা নিশ্চিন্ত হতে পারতো। কিন্তু তা আর হল না। “সে হুজুরের পা ছুঁইয়া ও ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া শপথ করিতেছে যে সত্যিই আর সে এমন কাজ করিবে না। এ পথ ছাড়িয়া দিতে সত্যিই সে চায়। এবার জেল হইলে তাহার সর্বনাশ হইয়া যাইবে।”

দুটি নর-নারী সব কিছু পরিত্যাগ করে, সবুজ মন নিয়ে সংসারের যাতাকলে আবদ্ধ হতে চেয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাগ্যের পরিহাসে তারা দিক্‌ভ্রান্ত। এই পরিস্থিতিতে দু'জনের এখন অস্তিত্বের সংকট। বিচারক চুরির দায়ে অঘোর দাসকে পাঁচ বছরের জেলের রায় দিয়েছেন। সেই রায় শুনে অঘোর দাস মাথা ঠিক রাখতে পারে নি। তারপর বিচারককে দু'চার কথা শুনি দিয়েছে—“হঠাৎ কাঠগড়া হইতে হুংকার দিয়া লাফ মারিয়া উঠিয়া বিচারককে সে আক্রমণ করিয়াছে।” সেই পরিস্থিতিতে বিচারকের আইনের বাইরে কিছু করার নেই। তারও হাত-পা বাঁধা। আইনের চোখে সবাই সমান। সেইজন্য বিচারকও কিছু করতে পারেননি।

‘সংসার সীমান্তে’ গল্পটির এই উপস্থাপন কৌশলে লেখক ভেবেছেন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সংকটের চেহারাটি তুলে ধরার জন্য। গল্পের শেষে প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন— “অঘোর দাস এখনও জেলে পচিতেছে। ডিবিয়ার ধূম শিখাকে শীর্ণ হাতে সযত্নে বৃষ্টির ঝাপটা হইতে আড়াল করিয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত এখনও নিশ্চয় বিগত যৌবনা রূপহীনা রজনী এক রাতের অতিথির জন্য হতাশ নয়নে পথের দিকে চাহিয়া প্রতীক্ষা করে।”

৫.৫.১৪.২.৪ : নামকরণ

প্রেমেন্দ্র মিত্র এ গল্পের নামকরণ করেছেন ‘সংসার সীমান্তে’। সংসার সীমান্তে, বিচিত্র জীবন জটিলতায় মানুষ কত অসহায় তা লেখক দেখাতে চেয়েছেন এ গল্পে। গল্পের শুরুতেই লেখক পাঠককে আহ্বান জানিয়েছেন—তখনই বোঝা গেছে তিনি সামাজিক সংকটের গল্প শোনাতে বসেছেন। সমাজের যারা অবহেলিত, যারা লাঞ্ছিতা, হাল ভাঙা, পালছেড়ার মতো যাদের কোমর ভেঙে গেছে, তারা প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে উঠে এসেছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র সংসারের সেইসব মানুষদের জীবন-ধারণ পদ্ধতি তুলে ধরেছেন গল্পটির মধ্যে। সমাজের যাদের জন্য, ঐ নিরন্ন মানুষগুলির এমন দুর্দশা লেখক তাঁর অনুসন্ধান করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি বারবার ঠিকানা পরিবর্তন করেছেন, তারই প্রকাশ তাঁর সাহিত্য রচনায় লক্ষ্য করা গেছে। অর্থনৈতিক হাহাকারে যাদের নিজের বাড়ি নেই, বাড়ির ঠিকানা নেই। এমনকী টাকার অভাবে বাড়ী ভাড়া পর্যন্ত নিতে পারে না। শেষপর্যন্ত তাদের স্থায়ী ঠিকানা হয় ভদ্রসমাজের রাস্তার ধারে। পথই তখন তাদের শেষ সম্বল। পথই রজনীর মতো মানুষদের শেষ ঠিকানা। লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র তাই গোটা মানুষের মানে খুঁজতে একের পর এক বন্দরে পাড়ি দিয়েছেন। তাঁর ‘প্রথমা’ কাব্যের ‘মানে’ কবিতায় বলেছেন—

“মানুষের মানে চাই—

গোটা মানুষের মানে।

রক্ত মাংস হাড় মেদ মজ্জা

ক্ষুধা তৃষ্ণা লোভ কাম হিংসা সমেত

গোটা মানুষের মানে চাই। ”

মানুষের মানে খুঁজতে খুঁজতে তিনি পথের শেষ প্রান্তে যদি কিছু থেকে থাকে তাঁর চেষ্টায় ব্যস্ত থেকেছেন। যৌবনের সীমান্তে বা সংসারের অপরপারে যে জীবন রয়েছে, তাঁর চুরচুরা বিশ্লেষণ তিনি করেছেন। সংসার সীমান্তে রজনীর পথ চলা কিন্তু শেষ হয়নি। তাই জীবন পর্বে এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে যাওয়ার পর যদি কোনদিন

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজ পান, তাহলে তার সুদিন আসবে। সেই আশাতেই জীবনের স্থায়ী ঠিকানা আপাতত সংসার সীমান্তে, সেই দিক থেকে নামকরণ সার্থক।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘সংসার সীমান্তে’ গল্পের চরিত্র গুলির প্রতি লেখকের সমবেদনা গভীর। মার্কসবাদী কবি ও গল্পকার এখানেও মেহনতী মানুষের পাশে তাদেরই হয়ে থাকতে চেয়েছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র পতিতা রজনী ও বিড়ম্বিত চোর অঘোর দাসের জীবনের বিবর্তন শুনিয়েছেন ‘সংসার সীমান্তে’ গল্পে। আমাদের ভদ্রসমাজের বাইরে দুটি নর-নারী অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়ে থেকেছে। “শহরের এক প্রান্তের রাস্তাটিতে আমাদের গল্প শুরু হইবে সাধারণ অবস্থাতেই তাহাতে চলা দায়।” গল্পকার এইভাবেই কাহিনী শুরু করে দিয়েছেন। তিনি কিছুক্ষণ পরেই আবার বলেছেন—“রাস্তাটির নাম নাই বলিলাম—দুই পার্শ্বের যে কুৎসিত খোলা ও টিনের চালে ছাওয়া খুপরিগুলি তাহার শোভাবর্ধন করিয়াছে, তাহাদের চেহারা হইতেই রাস্তাটির পরিচয় মিলিবে।” এর থেকে বোঝা যায় গল্পকার ভদ্রসমাজের বাইরের চাল চিত্র তুলে ধরেছেন। এমনকী গল্পের রজনী ও অঘোর দাস ভদ্র পরিবারের কেউ নয়, তা বলতে ভুল করেননি। এই নর-নারী দুটিকে নিয়েই গল্পকার কাহিনীর অগ্রসর ঘটিয়েছেন। “মনে হয় যে দুটি মানুষকে লইয়া এই গল্পের আয়োজন, তাহাদের কথা লিখিবার অধিকার আমার নেই।...এই দুইটি জীবনের গভীর মর্ম বুঝিবার মত দরদ আমারও আছে কিনা সন্দেহ হয়।” প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমবেদনা ছিল বলেই এরকম কথা বলতে পারেন। গল্প পাঠ করে আমরা অনুভব করেছি সংসারের প্রান্তবর্তী রজনী ও অঘোর দাসের করুণ পরিণতি এই গল্পের মূল উপজীব্য। নির্যাতিতা মানুষদের প্রতি গল্পকারের ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। সুধী সমালোচক অন্নদাশঙ্কর রায় কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রকে একবার বলেছিলেন— "Broken hearted dreamer"। অন্নদাশঙ্করের বিশ্লেষণ ছিল যে ভগ্ন হৃদয় স্বপ্নদর্শী প্রেমেন্দ্র। কিন্তু আমাদের পাঠ্য ‘সংসার সীমান্তে’ ছোট গল্পে রজনী ও অঘোর দাস সংসারের স্বপ্ন দেখেছিল কিন্তু পরিস্থিতির চাপে আর সংসার করা হলো না। সেই দিকেও ‘সংসার সীমান্তে’ নামকরণ যথোপযুক্ত হয়েছে।

৫.৫.১৪.২.৫ : ছোটগল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০) ছিলেন বাংলাসাহিত্যের প্রাবন্ধিক ও কথাসাহিত্যিক। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্যে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লেও প্রাক্-চল্লিশ বাংলা ছোটগল্পকারদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। যে কোন সৃজনশীল মানুষের মতই তাঁর গল্প, উপন্যাস ইত্যাদির সঙ্গে মিলে মিশে আছে নিজের জীবন অভিজ্ঞতার কথা। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় শুধু প্রতিভাবান সাহিত্যিক ছিলেন না, প্রাক্-চল্লিশ বাংলা ছোটগল্পের জগতে প্রতিনিধি স্থানীয়ও বটেন। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে রূপে ও রসে, ভাবনায় ও বেদনায় তিনি অগ্রণী শিল্পী। তারফলে নিজের জীবনদর্শন দিয়ে বাংলা ছোটগল্পের জন্য স্বতন্ত্র এক জগৎ তৈরি করেছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতিভা নব নব দিগন্তে প্রসারিত হয়ে পাঠককুলের কাছে খ্যাতি অর্জন করেছে। তাঁর সমসাময়িক ছোটগল্পকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, সুবোধ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সতীনাথ ভাদুড়ী প্রমুখ। সমরেশ মজুমদারের ভাষায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন—“সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মাষ্টারমশাই নারায়ণবাবুর বাইরে আর একজন নারায়ণবাবু আমাকে আকর্ষণ করতেন, তিনি এক রোমান্টিক পুরুষ।” প্রথম জীবনে কবিতা লিখলেও, ছোটগল্পের জগৎই তাঁকে স্থায়ী আসন এনে দিয়েছে। কালক্রমে তিনি অনেকগুলি উপন্যাসও রচনা করেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল— ‘উপনিবেশ’ (১৯৪৪), ‘সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী’ (১৯৪৪), ‘মন্দ্রমুখর’ (১৯৪৫), ‘শিলালিপি’ (১৯৪৯), ‘লালমাটি’ (১৯৫১), ‘কৃষ্ণপক্ষ’ (১৯৫১), ‘বৈতালিক’ (১৯৫৫) প্রভৃতি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প ‘নিশীথের মায়া’। গল্পটি প্রথম দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর একে একে তিনি লিখেছেন— ‘বীতংস’, ‘জন্মান্তর’, ‘ভাস্করবন্দর’, ‘দুঃশাসন’ প্রভৃতি গল্প গ্রন্থ। তাছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হল— ‘নক্রচরিত’, ‘কালোজল’, ‘পুষ্করা’, ‘মৃত্যুবান’, ‘ভোগবতী’, ‘হাড়’, ‘টোপ’, ‘ভাঙাচশমা’, ‘বনতুলসী’, ‘সৈনিক’ প্রভৃতি গল্প। জীবন পথে চলতে গিয়ে কত বিচিত্র মানুষের সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছেন। তারপর সাহিত্য সৃজন করে বাংলা সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকাদের নানা স্বাদের ছোটগল্প উপহার দিয়েছেন। “বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ” গ্রন্থে বীরেন্দ্র দত্ত বলেছেন— “নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে তাঁর সময়কে পাশে নিয়ে মানুষ আর জীবনের বাঁচার কথা স্পষ্ট করে বলারই প্রয়াস একমাত্র সত্য। এই বাঁচা মূলত যৌনতার বিকৃতি থেকে বাঁচা, পেটের ক্ষুধা থেকে বাঁচা, মানুষের জন্য মানুষের বাঁচা, জীবনকে বলিষ্ঠ এক বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাঁচা, নরনারীর হৃদয়ের গভীরতম সম্পর্কের সুস্থতার জন্য বাঁচা।” (পৃ: ২৮৪)

৫.৫.১৪.২.৬ : টোপ—সাধারণ পরিচিতি

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘টোপ’ গল্পটি খুব বিখ্যাত ছোটগল্প। ‘টোপ’ শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, মাছ ধরার সময় তাকে লোভ দেখিয়ে বাঁড়শিতে বিদ্ধ করতে যা ব্যবহার করা হয়। এ গল্পের রামগঙ্গা এস্টেট-এর জমিদার রাজাবাহাদুর এন. আর. চৌধুরীর বাসনা হল শিকার করা। লেখক গল্পের শুরুতেই বলেছেন—“এক আরণ্যক ইতিহাস, একটি বিচিত্র শিকার-কাহিনী।” আর শিকার দেখতে আসা কথককে শিকারের আগে রাজাবাহাদুর জানিয়েছেন—“দেখছেন তো, পেছনে চারশো ফুট খাড়া পাহাড়। আজ পর্যন্ত ওখানে কোনো শিকারীর বন্দুক গিয়ে পৌঁছোয়নি। তবে হ্যাঁ, ঠিক শিকার করি না বটে, আমি মাঝে মাঝে মাছ ধরি ওখান থেকে।” গল্পের পরিণতিতে আমরা জানতে পেরেছি রাজাবাহাদুর যে শিকার করেন মাছ, তা ব্যঞ্জন্যের মধ্যে দিয়ে ধরা পড়েছে। “কিছু না জুটলে মাছের চেষ্টাই করা যাবে। তবে ভালো টোপ ছাড়া আমার পছন্দ হয় না, আর তাতে অনেক হাস্যম।” গল্পপাঠে বোঝা যায় মাছ শিকার করার জন্য যে টোপ ব্যবহার করেন, তা আসলে ‘জীবন্ত দু’বছরের মানবশিশু’। ছাগ শিশু নয়, গরুর বাচ্চা নয়, একেবারে মানবশিশু ব্যবহারের মধ্যে গল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সমাজের নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষের করুণ দূর্দশার ছবি তুলে ধরতে চেয়েছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে মন্বন্তর, দাঙ্গা, অনিশ্চয়তা বহুবিধ সংকট প্রকটভাবে আছড়ে পড়েছে পশ্চিম বাংলার জনজীবনে। তারফলে দ্রষ্টা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘টোপ’ গল্পের পরিণতিতে বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের ভাঙন, সন্দেহ, অবিশ্বাস, হতাশা-ব্যর্থতা প্রকাশ পেয়েছে। সমাজের উচ্চবিত্ত মানুষদের কাছে নিম্নবিত্ত মানুষের কোন মান-মর্যাদা নেই। তারা মানুষকে মানুষ বলেই গণ্য করে না। তারফলে নিম্ন শ্রেণির মানুষকে নানাভাবে শোষণ করতে থাকে। রাজাবাহাদুরের মতো আমাদের সমাজের মানুষেরা নেশা করে, গরিব মানুষকে অত্যাচার করে। এমনকী বিলাসিতার মধ্যে দিয়ে ভোগবাদী জীবন কামনা করেছে। তাই রাজাবাহাদুরের হিন্দুস্থানী কীপারের মাতৃহীন ছেলেমেয়েগুলি খুবই অনাদরে, অবহেলায় দিন কাটালেও এদের কোন মাথা-ব্যথা নেই। ঐ সব মাতৃহীন শিশুরা ঠিকমতো খেতেও পায় না। তবুও রাজাবাহাদুরের মতো মানুষেরা নিরন্ন মানুষগুলিকে খাবার দিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন না। কেননা এরা হল বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিভূ। তাই গরিব মানুষগুলোকে অতিরিক্ত খাটালেও যেমন বেশি পারিশ্রমিক দেন না তেমনি নিজেদের সুবিধার জন্য নির্দিষ্ট কাজের বাইরেও মজদুর শ্রেণির মানুষকে কাজে লাগিয়েছেন। ‘টোপ’

গল্পেও দেখা যায় রাজাবাহাদুর কীপারকে কখনও কখনও শহরে পাঠিয়ে দিয়েছেন, নিজের কাজ হাসিল করার জন্য। সেই পরিস্থিতিতে “মাতৃহীন ছেলেমেয়েগুলো সারাদিন ছটোপুটি করে ডাক বাংলোর সামনে। রাজাবাহাদুর বেশ অনুগ্রহের চোখে দেখেন ওদের। দোতলার জানলা থেকে পয়সা, রুটি কিংবা বিস্কুট ছুঁড়ে দেন, নিচে ওরা সেগুলো নিয়ে কুকুরের মতো লোফালুফি করে। রাজাবাহাদুর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন সেকৌতুকে।” রাজাবাহাদুর বাঘ শিকারের উদ্দেশ্যে, কীপারের অনুপস্থিতিতে তারই একটি দু'বছরের সন্তানকে ‘টোপ’ হিসেবে কাজে লাগিয়েছেন। রাজাবাহাদুরের শিকারের আয়োজন দেখে গল্প কথকও স্তম্ভিত। “দু খানা চেয়ার পাতা, দুটো তৈরী রাইফেল। দুজন বেয়ারা একটা কপিকলের চাকা ঘুরিয়ে কী একটা জিনিস নামিয়ে দিচ্ছে নিচের দিকে। এক মুহূর্তের জন্য রাজাবাহাদুর তাঁর নয় সেলের হান্টিং টর্চটা নিচের দিকে ফ্লাশ করলেন। প্রায় আড়াইশো ফুট নিচে সাদা পুঁটলির মতো কী একটা জিনিস কপিকলের দড়ির সঙ্গে নেমে যাচ্ছে দ্রুতবেগে।”

কিছুক্ষণ পরে টোপের পুঁটলি থেকে ছোট শিশুর স্পষ্ট গোঙানি শুনতে পেয়েছেন গল্পের কথক। চারশো ফুট নিচে থেকে সেই শব্দটা ভেসে আসছে। আবার কীপারের সন্তানকে শিকারের টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছেন, অথচ দু'জন বেয়ারা সব দেখে শুনেও চুপ থেকে গেছে। তারা রাজাবাহাদুরের প্রতি প্রতিবাদ পর্যন্ত করেনি। এর থেকে মনে হয়, একই শ্রেণির মানুষ হলেও কাউকে শোষণ করা, আবার কাউকে বেশি করে পাইয়ে দেওয়ার যে রাজনীতি আমাদের সমাজে শুরু হয়েছে, তার পরিণতি কিন্তু ভয়ংকর। “আমার বুক রক্ত হিম হয়ে গেল, আমার চুল খাড়া হয়ে উঠল। আমি পাগলের মতো চীৎকার করে উঠলাম, রাজাবাহাদুর, কিসের টোপ।” গল্পকার কাহিনীকে এখানে শেষ না করে, এই ঘটনার আটমাস পরে রাজাবাহাদুর কথককে একটি উপহার পাঠিয়েছেন ডাকযোগে। “আট মাস পরে এই চমৎকার চটিজোড়া উপহার এসেছে। আট মাস আগেকার সে রাত্রি এখন স্বপ্ন হয়ে যাওয়াই ভালো, কিন্তু এই চটিজোড়া অতি মনোরম বাস্তব। পায়ে দিয়ে একবার হেঁটে দেখলাম, যেমন নরম, তেমনি আরাম।” নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় দেখাতে চেয়েছেন আমাদের সমাজে রাজাবাহাদুরের মতো মানুষ যেমন দোষী তেমনি সেই শ্রেণির মানুষকে যারা সমানভাবে তোষামোদ করে তারাও দায়ী। কেননা কথক নিজে প্রতিবাদ করতে পারতেন, কিন্তু করেননি। বাঘের চামড়ার চটির আরামের পিছনে যে সামাজিক সংকট বা মানবিক সংকট রয়েছে গল্পের কথক তাতে প্রশয় দিয়ে গেছেন। তারফলে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় যে শ্রেণি বিভাজন চলেছে, তার থেকে আমাদের মুক্তি নেই। সবাই নিজের সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তি নিয়েই ব্যস্ত থেকেছে, তার বাইরে যে সমাজ রয়েছে, মানুষের অত্যাচার রয়েছে, মানবিকতার সংকট রয়েছে, তার দিকে আমরা খেয়াল পর্যন্ত করি না। লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ‘টোপ’ গল্পের মধ্যে দিয়ে সেই অস্তিত্বের সংকটকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন।

৫.৫.১৪.২.৭ : নামকরণ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘টোপ’ গল্পের বিষয়টি একটি শিকারকাহিনী। রামগঙ্গা এস্টেট এর জমিদার রাজাবাহাদুর এন. আর. চৌধুরীর শিকারের আয়োজনে সাড়া দিয়েছেন গল্পের কথক। টোপ ফেলে মাছ ধরেছেন রাজাবাহাদুর। সেই পরিবেশে দেখা যায়— “ঝিঝির ডাক, দূরে হাতীর গর্জন, শাল পাতার মর্মর। এ প্রতীক্ষার তত্ত্ব আমার কাছে দুর্বোধ্য।” যেখানে ছাগশিশুকে টোপ হিসেবে কাজে না লাগিয়ে দু'বছরের মানব শিশুকে ‘টোপ’ হিসেবে ব্যবহার করে শিকার করা হয়েছে। তারপর আনন্দে আটখানা হয়ে বাঘের চামড়া দিয়ে চটিজুতো পরার যে আরাম প্রিয়তা সেই দিকটিকে লেখক ব্যঞ্জনার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। “কীপারের একটা বেওয়ারিশ ছেলে যদি জঙ্গলে হারিয়ে

গিয়ে থাকে, তা অস্বাভাবিক নয়, তাতে কারো ক্ষতি নেই। কিন্তু প্রকাণ্ড রয়্যাল বেঙ্গল মেরে ছিলেন রাজাবাহাদুর—লোককে ডেকে দেখানোর মতো।”

আমরা জানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে মানবজীবনে নানা সংকট ঘনীভূত হয়েছিল। ধনতন্ত্রের প্রভাবে বিশ্বের মানবসমাজ টাকার পিছনে ছুটতে ছুটতে হয়ে পড়েছিল ক্লান্ত। মানুষের মনে তখন কোনো সুখ ছিল না। এমনকী হতাশা, নৈরাশ্য ও ক্লান্তি মানুষকে ঘিরে ধরেছিল। তারফলে অস্তিত্বের সংকট মানুষের জীবনে এমনভাবে নেমে এসেছে, তখন তার যন্ত্রণা সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়েছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ‘টোপ’ গল্পের মধ্যে দিয়ে হত দরিদ্র মানুষগুলির অন্যায়ের প্রতিবাদে গর্জে উঠতে না পারাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। রাজাবাহাদুর এন.আর.চৌধুরীর মতো সুবিধাবাদী মানুষরা, সমাজের অন্যান্য শ্রেণির মানুষের কথা ভাবেন না। তারা সাধারণ মানুষদের দুর্বলতার সুযোগে নিজেদের প্রয়োজনে তাদেরকে ‘টোপ’ হিসেবে ব্যবহার করেছে। সেইদিক থেকে ‘টোপ’ গল্পটির নামকরণ সার্থক। তবে মানুষ— মানুষ বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও আদান-প্রদানের মধ্যেই রচিত হয়েছে সুস্থ সামাজিক জীবন। আর তা থাকে না বলেই মানবজীবনে সংকট নেমে আসে। ছোটগল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মনে করেন ভালোবাসার মধ্যেই খুঁজে নিতে হবে জীবনের আলোকময় দিকটিকে। আর তা যদি না হয়, তাহলে বুর্জোয়া শ্রেণি সাধারণ মানুষকে নানা দিক থেকে ‘টোপ’ হিসেবে কাজে লাগাবে। তারফলে তার পরিণতি হবে খুবই ভয়ংকর। আর মানুষ দিন দিন শোষিত হয়েই থেকেই যাবে। একদিকে দারিদ্র্য আর অপরদিকে বিলাসিতার ছবির মাধ্যমে লেখক গল্পের মূল রসকে স্পষ্ট করে তুলেছেন।

৫.৫.১৪.২.৮ : সহায়ক গ্রন্থ

- ১। বাংলা ছোটগল্প—শিশিরকুমার দাশ
- ২। কালের পুত্তলিকা— অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়
- ৩। বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ (১ম-২য়খণ্ড)—বীরেন্দ্র দত্ত
- ৪। বাংলা ছোটগল্প তত্ত্ব ও গতি প্রকৃতি—সোহরাব হোসেন
- ৫। সাম্প্রতিক কথাসাহিত্য— হীরেন চট্টোপাধ্যায়

৫.৫.১৪.২.৯ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

- ১। গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্রের কৃতিত্বের পরিচয় দাও
- ২। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘সংসার সীমান্তে’ গল্পে সমাজ ও মনস্তত্ত্বের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা লেখ।
- ৩। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘সংসার সীমান্তে’ গল্পের নামকরণ সম্পর্কে আলোচনা করো।
- ৪। গল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কৃতিত্বের পরিচয় দাও।
- ৫। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘টোপ’ গল্পের নামকরণ সম্পর্কে আলোকপাত করো।
- ৬। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘টোপ’ গল্পের সামাজিক সংকটের পরিচয় দাও।

একক ১৫
চল্লিশোত্তর বাংলা ছোটগল্প
উপএকক -১
বিমল কর—আঙুরলতা
রমাপদ চৌধুরী—আমি ও আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া

বিন্যাসক্রম

- ৫.৫.১৫.১.১ : ভূমিকা
৫.৫.১৫.১.২ : ছোটগল্পকার বিমল কর
৫.৫.১৫.১.৩ : আঙুরলতা সাধারণ পরিচিতি
৫.৫.১৫.১.৪ : নামকরণ
৫.৫.১৫.১.৫ : ছোটগল্পকার রমাপদ চৌধুরী
৫.৫.১৫.১.৬ : আমি ও আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া সাধারণ পরিচিতি
৫.৫.১৫.১.৭ : নামকরণ
৫.৫.১৫.১.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলী
৫.৫.১৫.১.৯ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৫.৫.১৫.১.১ : ভূমিকা

উপন্যাস আর ছোটগল্পকেই আধুনিক বাংলায় ‘কথাসাহিত্য’ বলা হয়ে থাকে। চলমান জগতে কত কিছুর পরিবর্তন হয়। জীবনের রূপ—রস গ্রহণ করতে গেলে পাঠককে বারবার জীবনের কাছে আসতে হয়েছে। যে জীবন মানুষের চোখে দেখা বাস্তব জীবন। প্রাক্ চল্লিশের ছোটগল্পকারদের মধ্যে যে জীবনজিজ্ঞাসা ছিল তা তারপরবর্তী চল্লিশোত্তর বাংলা ছোটগল্পকার মধ্যে পাওয়া যাবে না। কারণ সময়ের পরিবর্তনে মানুষের চাহিদারও পরিবর্তন হয়েছে। তেমনি লেখকদের জীবনদর্শনও পরিবর্তিত হয়েছে। এমনকী প্রায় প্রতিটি দশকেই দেখা যায় নতুন নতুন সমস্যা সাধারণ মানুষকে জর্জরিত করে তুলেছিল। আবার জীবনের জটিল সম্পর্ক, দুঃখ-যন্ত্রণার কথা এক এক জন লেখক, একেকরকম ভাবে লেখেন। সেইজন্য জীবনকে দেখার ভঙ্গি এবং অনুভব করার স্বতন্ত্র মানসিকতাই একজন লেখককে মৌলিক করে তুলেছে।

প্রকৃত শিল্পমনস্ক লেখকেরা মনে করেন, জীবনের সব মাত্রাকে টাকার মূল্যে দিয়ে মাপা যায় না। আর তা যারা করতে চায়, তাতে জীবনের পথ তাদের কাছে জটিল হয়ে ওঠে। আরো লক্ষণীয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙে দিয়ে নারীরা অনেক কাজে এগিয়ে গেলেও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানামুখী সংকট কিন্তু রয়েই গেছে। আধুনিক জীবনের এইসব খুঁটি নাটি বর্ণনা এই এককের ছোটগল্পকারদের লেখায় পাওয়া যাবে। এই এককে চল্লিশোত্তর বাংলা ছোটগল্প লেখক হিসেবে আমাদের আলোচ্য গল্পকার বিমল কর ও রমাপদ চৌধুরী। তাঁদের নির্বাচিত গল্পগুলি নিয়ে আমরা এখন আলোকপাত করব।

৫.৫.১৫.১.২ : ছোটগল্পকার বিমল কর

বিমল করের জন্ম ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২১ খ্রিঃ। বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব এক ত্রাণ্ডিলগ্নে। কর্মসূত্রে তাঁকে নানা জায়গায় যেতে হয়েছে, তবে কলকাতাতে বেশি সময় কাটিয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর চারের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে তিনি সাহিত্যচর্চা শুরু করেছিলেন। তাঁর লেখা প্রথম গল্প হল— ‘অম্বিকানাথের মুক্তি’। গল্পটি ১৯৪৪ খ্রিঃ ‘প্রবর্তক’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়াও তিনি ‘পিয়রীলাল বার্জ’ (১৯৪৭), ‘ভয়’ (১৯৪৭), ‘ইঁদুর’ (১৯৫২), ‘আঙুরলতা’ (১৯৫৬), ‘অর্ধবৃত্ত’, ‘যযাতি’, ‘জানোয়ার’, ‘খড়ির দাগ’, ‘শূন্য’ প্রভৃতি ছোটগল্প রচনা করেছিলেন। বাংলা পাঠকদের কাছে বিমল কর অন্তর্মুখী লেখক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ‘বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ গ্রন্থে’—বীরেন্দ্র দত্ত লিখেছেন—“বিমল কর মনস্তত্ত্বের মৃত্যু, যুদ্ধের মৃত্যু—এমন সব অসহায়তার মৃত্যু—ভাবনাকে মনের নির্জন নিঃশব্দ কোণে নিজের মতো গ্রহণ করেছিলেন।” (পৃ. ৪০২) বিমল কর প্রথম থেকে মননশীল গল্পরীতিতে সাহিত্যচর্চা শুরু করেছিলেন। মানব-মনের অতলান্ত রসকে তিনি নিঙড়ে বের করে নিয়েছেন। চল্লিশোত্তর বাংলা -ছোটগল্পকার হিসেবে তিনি স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। গল্পের চরিত্রগুলির মনের কথাকে টেনে বের করতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। বিমল করের অধিকাংশ গল্পে মৃত্যুচেতনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর লেখা ‘আঙুরলতা’ গল্পে নন্দ চক্রবর্তীর মৃত্যু, ‘নিষাদ’ গল্পে ছাগল ছানার মৃত্যু উল্লেখযোগ্য বিষয়। যাইহোক গল্পলেখার বিষয়ে তিনি সর্বদায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। ‘পঞ্চাশের দশকের কথাকার’ গ্রন্থে, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (সম্পাদনা) বলেছেন—“গল্পকার বিমল কর প্রথম থেকেই চরিত্রের আত্মমগ্নতায় ডুব দিয়েছেন। আর সেই আত্মমগ্নতায় তিনি এক গভীর জীবন—দর্শনকে ধরতে চেয়েছেন, সেটি হল জীবনের একাকিত্ব ঘরে বিচরণ এবং পরিণামী মৃত্যুর পরোয়ানায় জীবনকে অবলোকন।” (পৃ. ৩৩৩) বিমল করের প্রথম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল ‘দেওয়াল’। উপন্যাসটি ১৯৫৬ খ্রিঃ প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়াও ‘বনভূমি’ (১৯৫৭), মল্লিকা (১৯৬০), যদুবংশ (১৯৬৮), অসময় (১৯৭২), সংশয় (১৯৮০) প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। ২৬ শে আগস্ট ২০০৩ খ্রিঃ বিমল কর পরলোক গমন করেন।

৫.৫.১৫.১.৩ : আঙুরলতা—সাধারণ পরিচিতি

বিমল করের ‘আঙুরলতা’ গল্পটি ১৯৫৬ খ্রিঃ সাপ্তাহিক ‘দেশ’ পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পের সূচনায় দেখা যায়, আঙুরলতার জীবনে সর্বনাশ ঘটে গেছে। কারণ তার পূর্ব পরিচিত নন্দ চক্রবর্তীর মৃত্যু হয়েছে। এরপর গল্পকার গল্পের কাহিনীতে আগের কিছু ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। তার থেকে আমরা জানতে পারি

নন্দ চক্রবর্তীর সঙ্গে আঙুরলতার বিয়ে হয়েছিল বছর পাঁচেক আগে। নন্দের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে প্রায় এক বছর আঙুরলতা সংসার করেছিল। বিয়ে করলেও ওদের বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি। একবছর যেতে না যেতেই ওদের বিবাহিত জীবনে ছন্দ পতন ঘটেছে। তারপর থেকে আঙুরলতা ‘বেশ্যাপাড়ায়, নানা কাজে ব্যস্ত থেকেছে। যদিও এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, আঙুরলতা দেহপজীবিনী হিসেবে, বিয়ের আগে থেকেই এখানে বসবাস করতো। আঙুরলতা’ গল্পটি যে ‘বেশ্যারকাহিনী’ তা আমরা গল্পপাঠ করেই জানতে পারি।

গল্পে দেখা যায়, আঙুরলতার ঘরে নন্দ চক্রবর্তী বছর পাঁচেক পর এল অসুস্থ শরীর নিয়ে। নন্দের সঙ্গে বছর পাঁচেক আগে যখন আঙুরের বিয়ে হয়েছিল, তখন তার গায়ে মাংস ছিল। শরীরের হাড় বেরনো চেহারাটি চোখে পড়ত না। আর এখন নন্দের শরীরের যা অবস্থা, শরীরের হাড়গুলো বাইরে থেকেই গোনা যায়। এরপর পরম যত্নে আঙুরলতা নন্দ চক্রবর্তীকে সেবা করেছে। মধুর সঙ্গে চ্যবনপ্রাশ, নন্দের জিভে ভালো করে মাখিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কোন কিছুতেই কোন কাজ হয়নি। শেষপর্যন্ত নন্দ চক্রবর্তীর ঘাড়টা কাত হয়ে গিয়েছিল। নন্দ চক্রবর্তীর মুখখানা লেখক তুলনা করেছেন— “সেদ্ধ করা বাসী ডিমের মতন শুকনো, শক্ত শক্ত, ফ্যাকাশে।” সেই পরিস্থিতিতে আঙুরলতা নন্দের নাকের তলায় আঙুলটা ধরল, কিন্তু কোন নিশ্বাস পড়ছিল না। তার কিছুক্ষণ পর নন্দ চক্রবর্তী মারা গেল।

আঙুরলতার ঘরে নন্দের মৃত্যু ঘটে যাওয়ায়, সে খুব অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেছে। একা অসহায় নারী, কি করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। কাকে ডাকলে সহযোগিতা পেতে পারে, তাও মাথায় আসছে না। পরক্ষণেই ভেবেছে ‘বেশ্যাপাড়ায়’ সবাই কাজে ব্যস্ত থাকে। এমনকী বাইরে থেকে যে লোকজন আসে, তারাও নেশার ঘোরে থাকে। তাই তারা অন্য কারোর কথা শুনতে আগ্রহী নন। কিন্তু নন্দের মৃতদেহের সৎকার্যের জন্য কিছু টাকাও প্রয়োজন। অবশ্য, কিছু লোকের সহযোগিতা পেলে মন্দ হয় না, তখন আঙুরলতা মনে মনে ভেবেছে— “নন্দ তো মরে জুড়াল কিন্তু আমায় যে এই শেষ সময়েও জ্বালিয়ে গেল।” কেননা নন্দের মৃতদেহকে তো আর বেশিক্ষণ ঘরে আটকে রাখা উচিত নয়। অগত্যা কোন উপায় না দেখে, আঙুরলতা ওদের বেশ্যাপল্লীতেই বের হয়েছে। যেতে যেতে আঙুরলতা ভাবছিল, নন্দের সঙ্গে ওর বিবাহিত জীবন সুখী ও স্থায়ী হয়নি, তারজন্য ওর মনে কোন দুঃখ নেই। — “সেই শাঁখা জোড়া আঙুর কবে যেন টান মেরে খুলে ফেলেছিল হাত থেকে। তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল নর্দমায়।” আর আজকে পারলৌকিক কর্মকাণ্ডের জন্য তার দুশ্চিন্তার শেষ নেই। সে তো পরিবারের মধ্যেও থাকে না, যে তাকে পারিবারিক নিয়ম-কানন মেনে চলতে হবে। অথচ কীসের কর্তব্যবোধে নন্দের শবদেহকে কেন্দ্র করে নানা চিন্তা তাকে গ্রাস করেছে। সর্বসাকুল্যে আঙুরের কাছে সাড়ে এগার আনা ও একটা অচল টাকা ছাড়া আর কিছু নেই— “এক টাকা সাড়ে এগার আনায় কি একটা লোককে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া, পোড়ান টোড়ান সম্ভব! আঙুর যদিও এমন ফ্যাসাদে আগে পড়েনি, তবু জানা কথাই, গোটা দুয়েক টাকায় শ্মশান খরচ চলে না।”

আঙুরলতা এরপর অর্থ সাহায্যের আশায় প্রথমে হিমুর কাছে যায়, সে তাকে দুটো টাকা দিয়েছিল। এরপর আঙুরলতা আতার কাছে একটা পুরনো শাড়ী বিক্রি করে কিছু টাকা পেয়েছে। তারপর বিশ্বর কাছে গেছে, কিন্তু বিশ্ব তাকে বলেছে— “তুই মাইরি, অকারণে বিগড়োচ্ছিস, পটলি! এই বৃষ্টিবাদলার দিন—এখন শালা শ্মশানে যেতে হলে পেঁচো, বীরে, কেলো-তিন শালাকে খুঁজে বের করে ধরতে হবে।” এই পরিস্থিতিতে বেদানামাসির মনোভাবও লেখক ব্যক্ত করেছেন— “মেথর মুদ্দফরাস দিয়ে নন্দের মৃতদেহটা বাইরে ফেলে দিতে।” কিন্তু জীবনে সর্বত্রই হাহাকার থাকা সত্ত্বেও আঙুরলতা তা কোনভাবেই করতে পারে না। সে নিজের লোক নয় জেনেও তাকে

রাস্তায় ফেলে দিতে পারে না। নন্দ তার জীবনে যতই ক্ষতি করুক, তবুও আঙুরলতা—“শয়তান মানুষের কি আর দাহ হবার পুণ্য আছে। একে বলে প্রায়শ্চিত্ত। বামুনের ছেলে হয়ে মেথর ধাঙড়ের হাতে যাবে।”

এরপর আঙুরলতা মানিক মুন্সীর সঙ্গে দেখা করতে যায়। তাকে নন্দ সম্পর্কে সব কথা বলার পরও কোন সুরাহা হল না। আঙুরলতা তখন বুঝতে পেরেছে— “দায়টা আর কারুর নয়— তারই। যে দায়ে তাদের বেশ্যাপট্টির ঘরে ঘরে ঘুরেছে, পান মিষ্টি খেতে জনে জনে টাকা দিয়েছে। আজ তার দায় নেই।”

নন্দ চক্রবর্তীর শবদাহ করার জন্য সবশেষে আঙুরলতা কামুক প্রভুলালের কাছে গেল। এর আগে প্রভুলাল, আঙুরলতার কাছে অনেকবার গেছে, প্রতিবারই তাকে সে ফিরিয়ে দিয়েছে। প্রভুলাল বীভৎস রকমের দেখতে, সেইজন্য আঙুরলতার মতো মানুষও তার সঙ্গে মিলিত হতে চায়নি। অথচ এরকম পরিস্থিতিতে অতকিছু ভাবার সময় নেই। যদি প্রভুলাল কিছু টাকা দিতো, তাহলে নন্দর মৃতদেহের সংস্কার করা যেত। শেষ মেঘ তাই আঙুরলতা প্রভুলালের কাছে হাজির হয়েছে। তখন “—প্রভুলালের একটা চোখ চক-চক করে, ভীষণ চক-চক, আর অন্য চোখটা—যেটা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এসেছে, বুলে পড়েছে, মাছের পিণ্ডির মতন গলা গলা সবুজ—সেটা যেন আরও কুচিছত হয়ে ওঠে।” প্রভুলাল সব কথা শুনে আট টাকা দিতে রাজী হয়েছে।

এরপর আঙুরলতা বাড়ি ফিরে এসেছে। তারপর নন্দর মৃতদেহ, বিছানার চৌকির নিচে সাময়িকভাবে লুকিয়ে রেখেছে। অন্ধকার ঘরে আঙুরলতা কুপির আলো জ্বালিয়েছে। গল্পে দেখা যায়— “একটা ভাগাড়ের খ্যাপা কুকুর দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে তাকে।” প্রভুলাল তখন চর্ব্য-চুষ্য-লেখ্য পেয়ে পরম খুশী হয়েছে। তার বিনিময়ে আঙুরলতাকে আটটি টাকা দিয়েছে। বিমল কর, গল্পের চরিত্রগুলির মধ্যে দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন, আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় দেহপজীবিনী নারীদের দুর্দশার কথা। আঙুরলতা বিপদে পড়েছে, তার নিজের জন্য নয়; তারই পূর্বপরিচিতর জন্য। নন্দ চক্রবর্তীর শবদাহ করাকে কেন্দ্র করে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের ব্যবহার অত্যন্ত পীড়াদায়ক। আবার বেদনাদায়ক পরিস্থিতিতে প্রভুলালের মতো মানুষ, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেও বিনিময়ে চেয়েছে আঙুরলতার দেহ। লেখক এই পরিস্থিতিতে প্রভুলালের মতো মানুষদের কষাঘাত করতে চেয়েছেন।

টাকা যোগাড় হয়ে যাওয়ার পর, সবাই নন্দর মৃতদেহ গঙ্গার ঘাটে নিয়ে গেছে। নন্দ চক্রবর্তীর আঙুরলতা ছাড়া আর কেইবা আছে। তাই আঙুরলতা গঙ্গাস্নান করে নন্দর মুখে আগুন দেবে বলে মনস্তির করেছে। সেইসময় আঙুরলতা দেখল, তার মনের জ্বালাটা আরও বেড়ে গেছে। “বড় দুঃসহ সে-আগুন। বড় স্পষ্ট। সবকিছু তার আলোয় ঝকঝকে হয়ে উঠেছে। এই সংসার, এখানের ভালবাসা, ঘর গড়া, ঘর ভাঙা, মানুষ, মানুষের ব্যবহার, মন।” আঙুরলতা এসব কথা ভাবতে ভাবতে নন্দর মৃত্যু ভাবনা থেকে সরে এসেছে। তারপর পরিবেশ— পরিস্থিতিতে মানুষের দুঃখ, যন্ত্রণার কথা স্বীকার করে নতুন পথের সন্ধান পেয়েছে। নিজের জীবনের অর্থনৈতিক সংকট, সামাজিক সংকট ও অস্তিত্বের সংকটের কথা ভেবে এক গভীর উপলব্ধির জগতে প্রবেশ করেছে। তখন আঙুরলতার মনে হয়েছে,—“না, আঙুর মরবে না। চোখ তুলে বিশ্বের দিকে চাইলও। তারপর আকাশের দিকে। এ-পাশ, ও-পাশ। চিতা এবং গঙ্গার দিকেও। যেন এই সংসারের আকাশ, মাটি, মানুষ, জন-সব তার চেনা হয়ে গেল। আর সে মরবে না, কাঁদবে না।” এইভাবেই বিমল কর আঙুরলতা গল্পটি শেষ করেছেন।

বিমল কর ‘আঙুরলতা’ গল্পের কাহিনীর মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে দুটি ঘটনাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। প্রথম ঘটনাটি হল আঙুরলতার ঘরের মধ্যে নন্দ চক্রবর্তীর মৃত্যু। নন্দ চক্রবর্তী ঠগ, জোচ্চোর

মানুষ হলেও আঙুরলতা তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়নি। বরঞ্চ তার অর্থনৈতিক হাহাকারের মধ্যেও নিজের অসুস্থ শরীরে কিছুক্ষণ নন্দকে সেবা করে গেছে। আর দ্বিতীয় ঘটনাটি হল, নন্দ চক্রবর্তীর মৃত্যুর পর, আঙুরলতা যখন অনেক চেষ্টা করেও অর্থ সংগ্রহ করতে পারল না। অবশেষে প্রভুলালের কাছে গেল। প্রভুলাল, সেইসময় আঙুরলতার দেহের বিনিময়ে আটটাকা দিতে রাজী হয়েছে। “তু যা পাগলি, ঘর যা সুরতটুরত খোড়া ঠিক করে লিগে যা; একদম কলকাতাবালী হয়ে যা। দোকান বন্ধ করে আমি আসছি। টাকা লিয়ে যাব।” নন্দর মৃতদেহ চোঁকির নিচে রেখে, টাকার জন্য প্রভুলালকে দেহ দান করায় আঙুরলতার আত্মিক সংকট লক্ষ্য করা গেছে। আঙুরলতা চরিত্রের মধ্য দিয়ে গল্পকার নিপুণ তুলিতে গল্পের কাহিনীকে বিস্তারিত করেছেন। তাই এই গল্পে মানুষের ঘর গড়া ও ঘর ভাঙার বর্ণনা দিয়ে মানুষের মনের বাসনাকে তুলে ধরেছেন। সর্বোপরি বলা যায় আঙুরলতার মনের কারখানা ঘরে যে জীবনের স্রোত প্রবহমান, তার স্বরূপটি লেখক তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

৫.৫.১৫.১.৪ : নামকরণ

‘আঙুরলতা’ গল্পটির নামকরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, বিমল কর এই গল্পে চরিত্রভিত্তিক নামকরণ করেছেন। আঙুরলতার অন্ধকার জীবন, তার অর্থনৈতিক সংকট, বেঁচে থাকার জন্য, অর্থ উপার্জনের জন্য বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন সবই লেখক নিপুণ তুলিতে এঁকেছেন। গল্পের মূল চরিত্র আঙুরলতাকে কেন্দ্র করে নন্দ চক্রবর্তী, হিমু, বেদানামাসি, আতা নামের বেশ্যা, প্রভুলাল সবাই একে একে হাজির হয়েছে। তাই বলা যায় ‘আঙুরলতা’ নামকরণ সবদিক থেকে সার্থক। যে মানুষেরা সংগ্রামী তাদের কোলাহল শোনা যাচ্ছে, তাদের জীবন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আগামী জীবন গড়ে উঠবে। ‘আঙুরলতা’ গল্পের পরিণতিতে গল্পকার এই আশাই ব্যঞ্জিত করেছেন।

৫.৫.১৫.১.৫ : ছোটগল্পকার রমাপদ চৌধুরী

বর্তমান আলোচনায় আমরা চল্লিশোত্তর বাংলা ছোটগল্পকার হিসেবে রমাপদ চৌধুরীর (১৯২২- ২০১৮) অবদান স্মরণ করতে পারি। রমাপদ চৌধুরী খজাপুরে কিছুদিন থাকার পর পড়াশোনার সূত্রে কলকাতায় চলে এলেন। মেদিনীপুর জেলার রেলশহর খজাপুর, সত্যিই ‘মিনি ইণ্ডিয়া’। সেই শহরের নানা অভিজ্ঞতার কথা, জীবনে বড় হয়ে ওঠার কাহিনী প্রথম উপন্যাস ‘প্রথম প্রহর’—এ আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়াও ‘বনপলাশীর পদাবলী’ স্রষ্টা রমাপদ চৌধুরী সাহিত্য চর্চা করার সুবাদে কলকাতা শহরেই থেকে গেলেন। তবে জীবিকার জন্য তিনি কিছুদিন বাইরে থেকেছেন। ১৯৪৪ খ্রিঃ ‘উদয়াস্ত’ নামে রমাপদ চৌধুরী একটি ছোটগল্প লিখেছিলেন। তারপর একে একে তিনি লিখলেন—‘রত্নকূট’, ‘সহযোগ’, ‘বনবাতাস’, ‘কুসীদাশ্রিত’ চন্দ্রভাস্মের মতো বিখ্যাত সব গল্প। তাছাড়াও স্বাধীনতার পর, তার যেসব গল্পগুলি উল্লেখযোগ্য, সেগুলি হল— ‘বাবুই’, ‘তিনতারা’, ‘স্বর্ণমারীচ’, ‘আতসী উজ্জ্বল’, ‘তীর-ধনুক’ ‘রক্তবীজ’, ‘জলরঙ’, ‘রাঙা পিসীমা’, ‘নির্জনতা নেই’, ‘লীলাময়ী’ প্রভৃতি।

বিশ শতকের চারের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে সাহিত্য রচনায় রমাপদ চৌধুরীর অগ্রগতি ঘটে। সেই সময় বহুবিধ সংকট নিজে দেখেছেন ও সেই বিষয়গুলিকে নিয়ে সাহিত্য সৃজন করেছেন। ভারতবর্ষের অস্থিরতার সময়, লেখক নিজে মন্বন্তর ও গণবিক্ষোভ এর সঙ্গে যেমন পরিচিত হয়েছিলেন, তেমনি—আর্ত মানুষদের দুঃখ-যন্ত্রণাকে নিজে অনুভব করেছিলেন। আর জীবনের নানা ঘটনা থেকে রমাপদ চৌধুরী যে অভিজ্ঞতা অর্জন

করেছিলেন, তারই প্রেরণা রূপে সাহিত্যের প্রবহমান গতিতে তিনি টিকে আছেন। সর্বোপরি বলা যায় গল্পকার হিসেবে রমাপদ চৌধুরীর একটা স্বাতন্ত্র্য আছে, তা জোর দিয়েই বলা যায়। রমাপদ চৌধুরী ‘এখনই’ উপন্যাসের অষ্টা হিসেবে রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছিলেন। এছাড়াও তাঁর লেখা উপন্যাসগুলি হল— ‘বাহিরি’, ‘চড়াই’ ‘স্বজন’, ‘দ্বিতীয়া’, ‘রূপ’, ‘বীজ’, ‘হৃদয়’, ‘লজ্জা’, ‘খারিজ’, ‘পিকনিক’, ‘বনপলাশীর পদাবলী’, ‘পরাজিত সম্রাট’, ‘লালবাঈ’, প্রভৃতি উপন্যাস। রমাপদ চৌধুরী আনন্দ পুরস্কারেও সম্মানিত হয়েছেন।

৫.৫.১৫.১.৬ : আমি ও আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া—সাধারণ পরিচিতি

‘আমি, আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া’ গল্পটিতে একান্নবতী পরিবারের কথা তুলে ধরা হয়েছে। সংসারে সবার পরিবারটির প্রতি দায়বদ্ধতা রয়েছে। বাবা-কাকা, বড় জা, ননদ, ভাইপো-ভাইঝি প্রত্যেকেরই চাহিদা আছে ও কর্তব্য আছে পরিবারটির প্রতি। পরিবারের কর্মকর্তারা সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত প্রচুর পরিশ্রম করে সংসার প্রতিপালন করেছে। তবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েদের অবস্থান একটু নীচে তা গল্পকার দেখিয়েছেন। একান্নবতী পরিবারে শ্বশুর-ভাসুরকে যেমন মেনে চলতে হয়েছে, তেমনি মাথায় কাপড় দিয়ে ঘরবার করতে হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করি—“বড় জা জোর করে ঠেলে পাঠালো। বললে, নতুন, অত লজ্জা দেখাসনি। ঐ লজ্জা করে করেই আমরা সব হারিয়েছি।” এর থেকে বোঝা যায়, গল্পকার পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সমাজে নারীদেরকে বিয়ের নামে চলেছে নিপীড়ন, অত্যাচারের কাহিনী, মুখ বুজে তারা সব সহ্য করেও শেষপর্যন্ত তাদের পরিণতি হয়েছে খুবই দুর্বিষহ। এই ভাবেই প্রতিটি পরিবারের নারীদেরকে আঁঠে-পৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয়েছে।

গল্পটিতে একান্নবতী পরিবারের নব বর-বধূ পুরীতে বেড়াতে গেছে। আধুনিক ভাষায় যাকে বলে ‘হানিমুন’ করতে যাওয়া। ছোট ঠাকুরপোর নাম গৌতম। বড় জা ও ভাসুর যখন বিয়ে করে সংসার পেতেছিল তখন এইসবের বলাই ছিল না। শুধু সংসারের নানারকম কাজকর্ম করে তাদের জীবন চলে যেত। বড় জা বলেছে—“দেখ, নতুন, যা কিছু ফুটিতুটি এখন করে নে, এরপর তো সারাটা জীবন আমাদের মতো হাঁড়ি ঠেলেতে হবে।” তখনকার দিনে পরিবারে নতুন বউ এলে, নাম ধরে ডাকার রীতি ছিল না। সবাই তখন নতুন বউ বলে ডাকত। নতুন বউ এর থেকে বড় জার বয়স অনেক বড়। কেননা পূর্ববতী সময়ে পরিবারের মহিলাদের সখ-আহ্লাদ বলে কিছু ছিল না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা হাড় ভাঙা পরিশ্রম করে সংসারটিকে ধরে রেখেছে। এরপর গল্প পাঠে জানা যায়—নতুন বৌ ও গৌতম বেড়াতে গেল, পুরীতে। তারা সমুদ্রের গা ঘেষে একটি হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করেছিল। “সমুদ্র আমি আগে তো কখনো দেখিনি। দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। অভিভূত হয়ে গেলাম। সমুদ্র এত সুন্দর! সমুদ্র এমন বিশাল! মনে হলো, কোথায় ছিলাম আমি এতদিন! এমন একটা রূপের পৃথিবী আছে আমি জানতামই না।” সমুদ্রের তীরের সৌন্দর্য, প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশ, ঢেউগুলো যখন তীরে আঘাত করছে তার সৌন্দর্য দেখে নতুন বউ ও গৌতম অভিভূত হয়ে গেছে। কেউ আবার সমুদ্র সৈকতে বিনুক কুড়ুচ্ছে— “দেখলাম ছোট বড় নানারকমের সাদা আর রঙিন বিনুকের রাশি এসে পড়েছে ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে। ঢেউ সরে গেলেই সেগুলো চিক চিক করছে বালির ওপর।” ওরা যে নব বর-বধূ তা ওদের দেখেই বোঝা যাচ্ছে। কেননা বিয়ের জল পড়লে মেয়েদের চেহারার অন্যরকম একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। নতুন বউয়ের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। সেও বোধহয় সিঁথিতে সিঁদুর একটু বেশী দিয়ে ফেলেছে।

আমরা জানি, সমুদ্রে স্নান করতে যাওয়ার একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে। তা না হলে অনেকেই নুলিয়া সঙ্গে নিয়েও স্নান করে। নুলিয়ারা দু'আনা পয়সা পেলেই খুশী হয়। তাই সঙ্গে নুলিয়া নিলে বিপদের কোন সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু গৌতম ও নতুন বৌ সমুদ্র স্নানে গেছে, কোন নুলিয়া না নিয়ে। নতুন বৌ আবার সমুদ্রে স্নান করতে ভয় পায় বলে বেশী দূরে যাবে না। তখন— “গৌতম টানতে টানতে আমাকে তখন জলে নামিয়ে নিয়ে গেছে। ওর হাত ধরে ধরেই ঢেউয়ের ঘা খেতে খেতে ভয়ে ভয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম।” গৌতম আর একটু দূরে এগিয়ে গিয়ে স্নান করবে বলে মনস্থির করেছে—গৌতমের মনে তখন— “বাহাদুরি দেখানোর নেশা ঢুকেছে। বিয়ের পর তখন একটা মাসও কাটেনি, এ সময়ে নতুন বউটির চোখে নিজেকে নেপোলিয়ান বানানোর ইচ্ছা কোন স্বামীর না হয়।” এরপর গৌতম একটার পর একটা ঢেউয়ের মাথায় লাফ দিয়ে, ঢেউ ভেঙে দূরে চলে গেছে। গৌতম এত দূরে যাচ্ছে দেখে নতুন বৌ ভয় পর্যন্ত পেয়েছে। এমনকী অন্যান্য যাত্রীরা গৌতমের প্রশংসা পর্যন্ত করতে শুরু করে দিয়েছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই নতুন বউয়ের মনে হয়েছে—“গৌতম যেন নিজে ইচ্ছে করে এগিয়ে যাচ্ছে না, গৌতম বুঝি বা স্রোতের টানে তাল রাখতে না পেরে ভেসে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তাই। হাত তুলে বারবার যেন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। যেন হাত তুলে চীৎকার করে বলছে, আমাকে বাঁচাও।” এইরকম ভয়ানক পরিবেশে নতুন বউ তখন কি করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছে না। তখন নতুন বৌ নুলিয়ার কাছে গিয়ে কাকুতি-মিনতি করে সেই ভয়ানক অবস্থার বর্ণনা দিতে লাগল। নুলিয়া তখন এক বিন্দু দেৱী না করে সমুদ্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তারপর নুলিয়া একটার পর একটা ঢেউ পার করে গৌতমকে সমুদ্র থেকে তীরে নিয়ে এসেছিল ও প্রাণ বাঁচিয়েছিল।

নুলিয়ার কাজের জন্য পুরস্কার স্বরূপ তখন নতুন বউ তাকে সোনার চুড়ি দিতে চাইলেও, মন তাতে সায় দিল না। নতুন বউ মধ্যবিত্ত জীবনধারণ পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হয়ে সংসার পেতেছে। তাই তাদের বিপদে যে ব্যক্তি সাহায্য করলো, তখন তার কাজকে কর্তব্য বলে গুরুত্ব দিয়েছে। তাই নুলিয়াকে সোনার চুড়ি দিতে পারল না। কেননা সমুদ্রে কেউ ডুবে গেলে, নুলিয়াদের কাজ মানুষকে বাঁচানো। নুলিয়াটা সত্যিই গৌতমকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। “শুনলাম গরমেন্ট নাকি টাকা দেয় সেইজন্যে। সত্যি? নুলিয়ারা না থাকলে কি যে হতো।” ডুবন্ত মানুষ দেখলে তাকে বাঁচানো তো নুলিয়াদের কাজ। তাছাড়াও তারা ডিঙি করে মাছধরে নিয়ে আসে, তারপর বাজারে বিক্রি করে। তার থেকে যা অর্থ উপার্জন হয় তাতে তাদের কোনরকমে চলে যায়। মধ্যবিত্ত মানুষদের অনেক অভাব অনটন থাকা সত্ত্বেও হাতে অর্থ এলে সোনার আংটি, চুড়ি, বালা গড়িয়ে রাখে। তাই সোনার জিনিসের প্রতি মধ্যবিত্ত মানসিকতার মানুষদের একটা আলাদা আকর্ষণ রয়েছে। আসলে বেঁচে থাকার জন্য জীবনে কত কষ্ট করে তিল তিল করে অর্থ উপার্জন করতে হয়। তাই হাত থেকে সহজেই টাকা বের করার সময় তো একটু কষ্ট হবে। নতুন বউ, নুলিয়াটার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ হাতের সোনার চুড়ি দিতে চেয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা পারল না। আর স্টেশনে ট্রেন ধরার সময় ঐ নুলিয়াটার সঙ্গে দেখা হলে তার হাতে এক টাকার নোট দিয়েই নবদম্পতি খুশী থেকেছে। “বটুয়া খুলে দেখলাম, দশ টাকার নোটই চার-পাঁচখানা, খুচরো মাত্র দুটি টাকা আর কয়েক আনা পয়সা।” মধ্যবিত্ত মানসিকতার মানুষ হিসেব করে সংসার চালায়। তারা জীবনে সুবিধা নিতে ভালোবাসে। কিন্তু তার পরিবর্তে যে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত তা তারা জানে না। আসলে প্রতিটি মানুষই নিজের স্বার্থ দেখে বাঁচে। নতুন বউয়ের ক্ষেত্রেও তাই। সেও বটুয়া খুলে এক টাকার পরিবর্তে বেশি টাকা দিতে পারল না। কেননা—‘স্টেশনে পৌঁছেই তো রিকশার ভাড়া দিতে হবে। কুলির পয়সা দিতে হবে। সব খুচরোগুলো তো দিয়ে দেওয়া যায় না।’ নুলিয়ারা তো সমুদ্রে চান করাতে গেলে দু'আনা করেই নেয়। আর আমি আসার সময় তো

তাকে এক টাকাই বকশিশ দিয়ে এলাম। তাহলে কি বেশি টাকা দেওয়া হয়ে গেল। এসব সাত-পাঁচ ভেবে নতুন বৌ আর স্থির থাকতে পারলো না। তখন আবার সে ভাবতে শুরু করেছে—“সত্যিই কি বালা দুটো দেবো বলেছিলাম নুলিয়াটাকে? বোধ হয় না।” আসলে নুলিয়াটা, গৌতম ডুবে যাচ্ছিল দেখে ঝাপিয়ে পড়েছে। “কেউ ডুবে গেলে তাকে বাঁচানো তো ওদের কাজ।”

৫.৫.১৫.১.৭ : নামকরণ

রমাপদ চৌধুরীর ‘আমি, আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া’ গল্পের নামকরণ যথাযথ হয়েছে। লেখক মধ্যবিত্ত মানসিকতার জীবনচিত্র যেমন তুলে ধরেছেন তেমনি পুরীর সমুদ্র সৈকতের বর্ণনা দিয়েছেন। সেখানকার পরিবেশ—পরিস্থিতি, সমুদ্র দর্শনার্থীদের আচার-আচরণ ও তাদের স্নান করার বর্ণনা সবই কিন্তু নিখুঁতভাবে লেখক বর্ণনা দিয়েছেন। গল্পের কাহিনীর প্রথম দিকে বড় জার কথা এলেও তা পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর পুরীর হোটেল বেড়াতে যাওয়া সাজুস্তি ও তার স্বামীর কথাও প্রসঙ্গ ক্রমে এসেছে। কিন্তু গল্পের মূল কাহিনী এগিয়ে গেছে নতুন বৌ, তার স্বামী গৌতম ও একটি নুলিয়া চরিত্রকে কেন্দ্র করে। তাই সবদিক বিচার করে গল্পের নামকরণ যথোপযুক্ত হয়েছে বলা চলে। গল্পের নামকরণে নুলিয়া চরিত্রটির নির্লোভ, ত্যাগী ও কর্মব্রতী ভাবনা ধরা পড়েছে। ভারতবর্ষের সমাজজীবনের প্রেক্ষিতে ‘নুলিয়া’দের শত চেষ্টায় কত মানুষের জীবন ফিরে পাওয়ার দিকটিও লক্ষণীয় বিষয়।

ব্যঞ্জনা : ‘আমি, আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া’ গল্পের কাহিনী চরম শিখরে পৌঁছে গেছে, যখন গৌতম সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছিল। “গৌতমের সারা দেহে তখনো ব্যথা, অসহ্য ব্যথা। দৈত্যের মতো শক্তিশালী অবিশ্রান্ত চেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে পরাজিত সৈনিকদের মতো ক্লান্ত আর লজ্জিত সে।” ঐ গুজবটা সারা হোটেলেরটে গিয়েছিল, সবাই এসে সমবেদনা ও জানিয়েছিল। কিন্তু নুলিয়াটা না থাকলে গৌতমের কি যে হতো সেই চিন্তাতেই নতুন বউয়ের চিন্তার শেষ ছিল না। গল্পকার গল্পের শেষে বলেছেন— “কেউ ডুবে গেলে তাকে বাঁচানো তো ওদের কাজ।” তখন মনে হয় নুলিয়াদের কথা বলতে গিয়ে লেখক ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত মানুষকে আঘাত করেছেন। কেননা মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ, সব সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে, আর অপরকে সাহায্য করার সময় দশবার ভাববে। অর্থনৈতিক সংকটের ক্ষেত্রেই হোক বা হাহাকারের সময়ই হোক মধ্যবিত্ত মানুষের আর একটি গুণ অপরকে জ্ঞান দেওয়া। তখন তারা বলে সব কাজ মন দিয়ে করা উচিত। প্রতিটি মানুষের নিজের কাজ সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত অথচ নিজে সব সুবিধা ভোগ করে স্বার্থপরের মতো বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে চায়। আমাদের আলোচ্য গল্পের মধ্যবিত্ত শ্রেণির নতুন বউ কিন্তু পারতো নুলিয়াকে বেশি করে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে, কিন্তু তা করেনি। দুঃসময় পেরিয়ে যাওয়ার পর নতুন বউয়ের নুলিয়ার টাকা দেওয়াকে কেন্দ্র করে লেখক যে মনস্তাত্ত্বিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ডুবন্ত গৌতমকে বাঁচিয়েছিল বলে নতুন বৌ নুলিয়া সম্পর্কে যে মনোভাব ব্যক্ত করেছে—“কেউ ডুবে গেলে তাকে বাঁচানো তো ওদের কাজ।” অথচ নিজের কর্তব্য সম্পর্কে নতুন বউয়ের মতো আমরাও সকলেই উদাসীন।

সবশেষে একথা বলা যায়, মানবতার স্পষ্ট চিহ্ন খেটে খাওয়া নুলিয়াদের স্বভাবধর্মের মধ্যে ছিল। সমুদ্রসৈকতে কোন প্রলোভনে তাদের জীবন ধারণ পদ্ধতিতে মানবিকতা নষ্ট হয়ে যায়নি। বরঞ্চ তাকে পুরস্কার দেওয়ার ইচ্ছায়, আমাদের সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষরা বারবার দ্বন্দ্ব পড়েছে। তাকে পুরস্কার না দিলেও ওর কিছু এসে যায়

না। ওর কর্তব্যও ঠিক পালন করেছে ও আগামী দিনেও পালন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নুলিয়াকে গয়না দিলেও নতুন বউয়ের অনেক লোকসান হয়ে যাবে, আবার বেশি টাকা দিলেও অর্থের অপচয় হবে। সেইসঙ্গে আবার নতুন বউকে রিক্সা ভাড়া দেওয়ার কথাও ভাবতে হয়েছে। গল্পকার মধ্যবিত্ত মানুষদের বহুমুখী দৃষ্টিকে ছোটগল্পের উপযোগী ব্যঞ্জনধর্মিতা এবং একমুখিনতা দিয়ে গল্পটিতে রক্ষা করেছেন। গল্পকার অধিকাংশ মধ্যবিত্ত বাঙালির প্রথাবদ্ধ জীবনযাত্রার সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে। তিনি মনে করেন, মধ্যবিত্ত বাঙালি কোনো কাজের কাজ করে না, শুধু বিলাসে-বিশ্রামে সময় নষ্ট করে। তাই মনে হয় মধ্যবিত্ত বাঙালির অতি শান্ত, আয়েসী ও হিসেবী জীবনযাত্রার প্রতি গল্পকার খিকার জানিয়েছেন। সর্বোপরি ‘আমি ও আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া’ গল্পটিকে সমাজ ভাবনাশ্রয়ী গল্প বলা যেতে পারে। লেখক যেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নর-নারীর দিকে হতাশ চোখে তাকিয়ে শুধু নুলিয়ার কথা ভেবে মনে মনে গর্ববোধ করেছেন।

৫.৫.১৫.১.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

- ১। বাংলা ছোটগল্প—শিশির কুমার দাশ
- ২। কালের পুন্ডলিকা— অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
- ৩। বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ— বীরেন্দ্র দত্ত
- ৪। পঞ্চাশের দশকের কথাকার —উজ্জ্বল কুমার মজুমদার সম্পাদিত
- ৫। সাম্প্রতিক কথাসাহিত্য—হীরেন চট্টোপাধ্যায়
- ৬। বাংলা ছোটগল্প তত্ত্ব ও গতি -প্রকৃতি— সোহরাব হোসেন

৫.৫.১৫.১.৯ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

- ১। গল্পকার বিমল করের কৃতিত্বের পরিচয় দাও।
- ২। বিমলকরের আঙুরলতা গল্পের নামকরণ সম্পর্কে আলোচনা করো।
- ৩। বিমল করের আঙুরলতা গল্পের অর্থনৈতিক সংকটের পরিচয় দাও।
- ৪। গল্পকার রমাপদ চৌধুরীর কৃতিত্বের পরিচয় দাও।
- ৫। রমাপদ চৌধুরীর আমি ও আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া গল্পের মনস্তত্ত্বের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা লেখ।

একক ১৬

চল্লিশোত্তর বাংলা ছোটগল্প

উপএকক-২

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়—কাফের

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়—স্বপ্নের ভিতর মৃত্যু

বিন্যাসক্রম

- ৫.৫.১৬.২.১ : ভূমিকা
- ৫.৫.১৬.২.২ : ছোটগল্পকার অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
- ৫.৫.১৬.২.৩ : কাফের —সাধারণ পরিচিতি
- ৫.৫.১৬.২.৪ : নামকরণ
- ৫.৫.১৬.২.৫ : ছোটগল্পকার শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
- ৫.৫.১৬.২.৬ : স্বপ্নের ভিতর মৃত্যু—সাধারণ পরিচিতি
- ৫.৫.১৬.২.৭ : নামকরণ
- ৫.৫.১৬.২.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলী
- ৫.৫.১৬.২.৯ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৫.৫.১৬.২.১ : ভূমিকা

সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা কথাসাহিত্যেও আসে পরিবর্তন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ আগস্ট মধ্যরাত্রে জন্ম নিল স্বাধীন সার্বভৌম ভারতরাষ্ট্র। প্রায় দুশো বছর পর অনেক রক্ত আর অশ্রুর বিনিময়ে এই স্বাধীনতা প্রাপ্তি। এই সময় বিভিন্ন জায়গায় ‘বন্দেমাতরম্’ গীত হয়েছিল। সেইদিন ভারতের সর্বত্র উঠেছিল তেরঙ্গা পতাকা। ১৯৪৭ খ্রিঃ ১৫ আগস্ট এলো বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। কিন্তু তার পরেও রয়ে গেছে ভারতবর্ষের বহুবিধ সমস্যা। এইসময় পূর্ব পাকিস্তান থেকে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু পশ্চিমবাংলায় আসতে থাকে। এখনও পর্যন্ত উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান হয়নি। তাই দেশভাগের অকথ্য যন্ত্রণার অংশীদার হতে হয়েছে সমস্ত ভারতবাসীকে প্রত্যক্ষ— পরোক্ষ। তার উপর আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ সাধারণ মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। এই পরিস্থিতিতে ব্যাপক বেকারি এবং বহুবিধ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যায় সারা ভারতবর্ষ জর্জরিত। ফলে ভারতের জাতীয় ঐক্য ব্যাহত না হয়ে পারেনা। যখনই কোন অশান্তি ঘটেছে, তখনই রাজনৈতিক সংকটের আভাস পাওয়া

গেছে। যা অনিবার্যভাবে গণজীবনে বিপুল টালমাটাল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। বিশ শতকের পাঁচের দশকে, ছয়ের দশকে এবং সাতের দশকে বাঙালির জন্মান্তর হয়েছে ঠিকই। তবে এই সময় আবার শুরু হয়েছিল নকশাল বাড়ি আন্দোলন। সশস্ত্র সংগ্রাম চলেছিল দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার তিনটি গ্রামে। সেগুলি হল— নকশাল বাড়ি, খড়ি বাড়ি ও ফাঁসি দেওয়া। এই সময় আবার দুর্নীতি ও কালো টাকা প্রচুর পরিমাণে বেড়েছিল। ফলে গ্রাম ও শহরের মধ্যে ব্যাপক অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল। যাইহোক নানা আন্দোলন—সংগ্রামের চড়াই উতরাই পেরিয়ে ১৯৭৭ খ্রিঃ জুন মাসে বামফ্রন্ট সরকার শাসনক্ষমতা লাভ করেছিল। প্রতিটি মুহূর্তে মত এবং আদর্শকে সামনে রেখে বামফ্রন্ট সরকারকে কাজ চালিয়ে যেতে হয়েছিল। কেননা শ্রমজীবী, খেতমজুর, মধ্যবিত্ত মানুষের স্বার্থরক্ষায় হল বামফ্রন্ট সরকারের মূল লক্ষ্য। তারপর দীর্ঘ ৩৪ বছর পর ২০১১ খ্রিঃ ১৩ই মে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের অপসারণ ঘটেছে। পশ্চিমবঙ্গের শাসন ক্ষমতায় তৃণমূল কংগ্রেস-কংগ্রেস জোট সরকার ২০ শে মে ২০১১ খ্রিঃ ক্ষমতাসীন হয়েছে। চল্লিশোত্তর বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে বিবর্তনের চিত্রকে দেখানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাস প্রসঙ্গক্রমে তুলে ধরা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের ইতিহাসে একদিকে পুনঃ পুনঃ রাজনৈতিক পালাবদল ও মানসিকতার পরিবর্তনে সংকটের পরিবেশ তৈরি করেছিল। এই এককে যে দুজন গল্পকার আমাদের আলোচ্য, তারা হলেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। ব্যক্তিগত জীবনে দুই লেখককে এই সময় বিবিধ দুঃখ বরণ করে নিতে হয়েছে। সমগ্র জীবনব্যাপী দুঃখের কষাঘাতে তাঁদের জীবনও হয়ে উঠেছিল জর্জরিত।

৫.৫.১৬.২.২ : ছোটগল্পকার অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩০-২০১৯) এর জন্ম বাংলাদেশের ঢাকা জেলার আড়াই হাজার থানার অন্তর্গত রাইনাদি গ্রামে। পড়াশোনা করেছিলেন সোনারগাঁও পানাম স্কুলে। ১৯৪৭ খ্রিঃ বর্ষার সময় স্বাধীনতা ও দেশভাগের পনেরো দিনের মধ্যে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবার অন্যান্য হিন্দু-বাঙালিদের সঙ্গে ভারতে চলে আসেন। কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য তখনও অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশেই থেকে যান। তারপর পরীক্ষার পর অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় চলে আসেন এ-পার বাংলায় কাকার বাড়ি মুর্শিদাবাদে। ১৯৫৬ খ্রিঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বাণিজ্যে স্নাতক হয়েছিলেন। তারপর বিটি পরীক্ষাও পাশ করেন। উদ্বাস্তু হওয়ার যন্ত্রণা অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সারা জীবন তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। সেই কারণে হাতের কাছে যা কাজ পেয়েছেন তাই সানন্দে গ্রহণ করেছেন। এইরকম একটি সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে কেটেছিল একালের স্বনামধন্য কথাসাহিত্যিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনকাল।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনে কোন কিছু চেয়ে না পেয়ে; শিখেছিলেন সংযমী হবার মন্ত্র। তবে একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে সহজেই অনুধাবন করতে পারা যায় তাঁর জীবনব্যাপী অনুসন্ধিৎসা, অনুশীলন ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। কখনও লরির খালাসি, জাহাজের নাবিক, আবার কখনও প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক। বিশ শতকের আটের দশকের মাঝামাঝি তিনি পাকাপাকি ভাবে কলকাতায় বসবাস শুরু করলেন। এরপর কখনও কারখানার ম্যানেজার, কখনও প্রকাশনার উপদেষ্টা এবং সাংবাদিকতার কাজও করেছেন। শেষে ‘যুগান্তর’ পত্রিকাতেও কিছুদিন কাজ করেছিলেন। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমসাময়িক কথাসাহিত্যিক যাঁরা ছিলেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, অমলেন্দু চক্রবর্তী, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, দেবেশ রায় প্রমুখ।

১৯৫৬ খ্রি: ছাব্বিশ বছর বয়সে বহরমপুরে থাকাকালীন ‘অবসর’ পত্রিকার হাত ধরে বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর প্রথম প্রবেশ। তাঁর লেখা প্রথম গল্প ‘কার্ডিফের রাজপথ’। ‘সমুদ্রমানুষ’ উপন্যাসটি তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস। ‘সমুদ্রমানুষ’ উপন্যাসের জন্য ১৯৫৮ খ্রি: পেয়েছিলেন ‘মাণিক স্মৃতি পুরস্কার’। এরপর সাহিত্যজীবনই লেখককে দিয়েছে অমরত্বের বর। তারপর একে একে রচনা করেছেন—‘নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে’, ‘মানুষের ঘরবাড়ি’, ‘অলৌকিক জলযান’, ‘ঈশ্বরের বাগান’, ‘আবাদ’, ‘সুন্দর অপমান’ ও ‘যুবতী পরম রূপবতী’-র মতো উপন্যাস।

বাংলা কথাসাহিত্যে শুধুমাত্র বঞ্চিত, শোষিত মানুষদের কথা বলেননি। তিনি রোম্যান্টিক মন নিয়ে জীবনকে অন্যভাবে দেখার চেষ্টা করেছিলেন। তারপর একে একে রচনা করলেন কতকগুলি ছোটগল্প। সেগুলি হল— ‘বয়স সাতাশি’, ‘ছেঁড়া পাজামা’, ‘রাজারটুপি’, ‘সাদা অ্যান্ডুলেস’, ‘কাফের’, ‘জীবন-সত্য’, ‘একান্ত ব্যক্তিগত’, ‘ডাকাতের বউ’, ‘অবাস্তব গল্প’, ‘ফুলের টব’ প্রভৃতি। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০১ খ্রি: সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন ‘পঞ্চাশটি গল্প’ গ্রন্থের জন্য। সর্বোপরি বলা যায় অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনাভিজ্ঞতার ঋদ্ধিময় সঞ্চয়ই যে তাঁকে সাহিত্য রচনায় অনুপ্রাণিত করেছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সবশেষে, লেখকের নিজের কথাতেই বলি—“গল্পগুলির মধ্যে যেমন মানবিক সম্পর্ক এবং সংকটের কথা আছে, তেমনি আছে দায়হীন দিশাহীন সমাজের কথাও।” প্রিয় কথাসাহিত্যিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে (১৯ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি:)। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৮৮ বছর।

৫.৫.১৬.২.৩ : কাফের গল্পের — সাধারণ পরিচিতি

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বড়দের পাশাপাশি কিশোরদের জন্যও গল্প লিখেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য — ‘উড়ন্ত তরবারি’, ‘গিনি রহস্য’, ‘ফেন্টুর সাদা ঘোড়া’, ‘বিম্লির খই’, ‘লালবাতাসা’ প্রভৃতি। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প লেখার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম-কানন নেই। নিজের জীবন অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি কথাসাহিত্য রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। সেইজন্য তাঁর লেখা গল্পগুলিতে একটা দেশজ গন্ধ পাওয়া যায়। আবার সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতির অবস্থানও গল্প পাঠে অনুভব করা যায়। আমাদের আলোচ্য সেই রকম একটি গল্প ‘কাফের’। গল্পের শুরুতেই দেখা যায়, গাধা, গরু, ঘোড়ার চিৎকার শোনা যাচ্ছে। নিশ্চিতি রাতে, পাশাপাশি গ্রামগুলি দাউ দাউ করে জ্বলছে তার খবর পাওয়া যাচ্ছে। তখন মনে হয় কোথাও সংঘর্ষ বেঁধেছে, যার থেকে গবাদি প্রাণীগুলোকে পর্যন্ত বাদ দেওয়া হচ্ছে না। সেইরকম সংকটজনক পরিস্থিতির খবর আমরা গল্পের শুরুতেই লক্ষ্য করেছি। “মাঠে মাঠে মানুষের আত্ননাদ, কখনও পোড়া মাংসের গন্ধ আর এক হাহাকারের ছবি মাঠময় প্রেতের মতো ভেসে বেড়াচ্ছিল।”

সেই পরিবেশ - পরিস্থিতিতে জীবন-ধারণ করা মোটেও সহজ ব্যাপার ছিল না। তাই সকলে সেখান থেকে পালিয়ে আসছে। যে-যেদিকে পেরেছে ছুটে পালিয়েছে। তারা কোথায় চলেছে, তারও কোন নির্দিষ্ট ঠিক-ঠিকানা নেই। এই রকম ভয়ানক পরিবেশে বাড়ির যুবতী-নারীদের পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। গল্প পাঠে লক্ষ্য করা যায়—“পরান ওর স্ত্রীর নাম ধরে মাঠের ভিতরে দুবার চিৎকার দিয়েছিল—ঠিক তখন একদল মানুষ ছুটে আসছে, হাতে মশাল, আগুন ওদের হাতে—ওই যায়, চলে যাচ্ছে।”

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ‘কাফের’ গল্পে হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষের কথা যেমন তুলে ধরেছেন। তেমনি দেশভাগের ফলে বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মানুষদের মধ্যে দাঙ্গা শুরু হয়ে যায় সে প্রসঙ্গও

এনেছেন। ফলে বাংলাদেশ থেকে অধিকাংশ মানুষ এপার বাংলায় চলে এসেছে। সেই পরিস্থিতির কথাও লেখক গল্পটিতে তুলে ধরেছেন। তবে এই প্রসঙ্গে আমরা মনে করতে পারি অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় যে গ্রামটিতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, তার নাম রাইনাদি গ্রাম। সেখানে হিন্দু ও মুসলিম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষেরা পাশাপাশি বসবাস করতো। এমনকী দাঙ্গার সময় মুসলিম পড়শিরা লেখকদের পরিবারকে বাংলাদেশ ছেড়ে যেতে বারণ করেছিলেন। কারণ তাঁদের গ্রামে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কখনও নষ্ট হয়নি। হিন্দু-মুসলিম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষদের মধ্যে ভাবেরও আদান প্রদান হতো।

‘কাফের’ গল্পের পরাণের স্ত্রীর নাম ছিল কিরণী। আর অপরদিকে হাসিমের স্ত্রী জাবিদার পরিচয় পাওয়া যায়। হাসিম জাতিতে, মুসলমান হলেও কিন্তু পরাণের সঙ্গে তার সহযোগিতার সম্পর্ক বর্তমান। এইরকম ভয়ংকর দাঙ্গার মধ্যে পরাণ, তার স্ত্রী কিরণী কে খুঁজে পাচ্ছে না, সে কোথায় হারিয়ে গেছে। লেখক পরাণের দুঃখ ও যন্ত্রণার দিকটিও গল্পে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে হাসিমের ভালোবাসা পরাণ সব সময় পেয়েছে। তাই স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে পরাণ দিশেহারা হয়ে পড়লে, তখন কি করবে আর কি না করবে এই নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। এমনকী মুসলিম ধর্মে বিশ্বাসী অন্যান্য মানুষ পরাণকে দেখলে মেরে ফেলতে পারে। চারদিকে সংকটময় পরিস্থিতির কারণে পরাণ নদীর জলে কিছুক্ষণ ডুব দিয়ে থাকার পর হাসিমের বাড়িতে গেল। হাসিমকে গিয়ে বলেছে — “একটা তফন দ্যাও আমারে হাসিম। আমি মুসলমানের মতো এক টুপি পইরা চইলা যামু।” পরাণ, মুসলিম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষদের মতো জীবন-ধারণ পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হয়ে আত্মগোপন করতে চেয়েছে। হিন্দু হওয়ার কারণে তাকে সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়েছে। মুসলিম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষদের অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এক ফাঁকে জলে ঝাঁপ পর্যন্ত দিতে হয়েছে। এই অবস্থায় পরাণকে আবার হাসিম ও জাবিদা ঘরে বেশিক্ষণ আটকে রাখতেও পারে না। কেননা চারিদিকেই চর আছে, কেউ জেনে গেলে পরাণের যেমন সর্বনাশ হবে, তেমনি জাবিদাদের জীবনে সামাজিক সংকট নেমে আসবে। মুসলিম সমাজ থেকে হাসিম ও জাবিদাকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে, তারপর তাদের একঘরে করে রাখবে।

পরাণ ও হাসিম দুই বন্ধু ভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী হলেও তারা আচার-নিয়ম মেনে চলতে রাজী নয়। কারণ তারা যা হারিয়েছে তা আর কোনদিন ফিরে পাবে না। দাঙ্গার মধ্যে, হাঙ্গামার মধ্যে মানুষ সুস্থ ভাবে বসবাস করতে পারে না। দুই বন্ধু মধ্যবিত্ত মানসিকতার আদলে বিশ্বাসী বলে অনেক ভেবে চিন্তে জীবন অতিবাহিত করেছে। তাই শীতের রাতে অন্য কোথাও খেতে না গিয়ে হাসিম সামান্য গরুর দুধ নিয়ে এসেছে। তারপর জাবিদা দুধ গরম করে চারিদিকে তাকাল, যদি কেউ দেখে ফেলে, পরাণকে আপ্যায়ণ করা হচ্ছে, তাহলে ওদের আর নিস্তার নেই। গল্পে দেখা যায়—“মশালের আলো নিয়ে যারা মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা পর্যন্ত টের পেয়ে যাবে।” তারপর রাতেই তারা পরাণকে নদী পার করে দেবে বলে মনস্তির করেছে। পাতিলের নীচে পরাণ থাকবে, তারপর জলের নীচে সাঁতার কাটলে কেউ টের পাবে না। তখন পরাণ মাছের মতো জল কেটে শহরে গিয়ে উঠতে পারবে। তাহলে অন্তত পরাণের প্রাণ রক্ষা হবে। এই রকম সংকটময় পরিস্থিতিতে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় তখনকার বাংলাদেশের জঘন্য অত্যাচারের ছবিকে গল্পে তুলে ধরেছেন। তাই ‘কাফের’ গল্পটি হয়ে উঠেছে যুগের, সমাজের, রাষ্ট্রের প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ। লেখক কোন জাতিকে আঘাত করে সাহিত্যসৃজন করতে চাননি। বরঞ্চ পাঠকদের সামনে সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্ব মানবিকতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

দেশভাগ মানুষের জীবনের সুন্দরদিনগুলিকে কিভাবে কেড়ে নিয়েছিল তারই বাস্তব বিবরণ গল্পটিতে পাওয়া যায়। এমনকী সাধারণ মানুষের গৃহচ্যুত হওয়ার যন্ত্রণা থেকে সংকট ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। দাঙ্গার পরিস্থিতিতে পরাণ, স্ত্রীকে হারিয়ে, খুঁজে পায়নি। “মাটির মতো আর কী প্রিয় জিনিস আছে চাষি মানুষের”। সেই সকল প্রিয় বস্তুকে ফেলে দিয়ে পরাণকে চলে যেতে হবে, তারজন্য তো কষ্ট হবেই! এই পরিস্থিতিতে জাবিদার চোখেও জল এসে গেছে। দাঙ্গার ফলে পরাণের পারিবারিক মর্যাদা যেমন নষ্ট হয়ে গিয়েছে তেমনি বাংলাদেশের মাটি-কিরণীর জন্য পরাণের মনে আত্মিক সংকট তৈরি হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে পরাণ বার বার হাসিমকে বলেছে —“আমার বাইচা থাইকা কী হইব হাসিম।” কেননা পরিবার -পরিজন, নিজের লোক সঙ্গে না থাকলে সেই জীবনের কোন মূল্য নেই। সেইসঙ্গে শস্য-শ্যামলা বাংলাদেশের জন্য ও পরাণের মন কেমন করেছে।

আবার সেই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে থাকতে হলে হিন্দু হয়ে থাকা যাবে না, তাদেরকে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। সেইজন্য হাসিম চেষ্টা করেছে তার বন্ধুটি যদি কোন মুসলিম নাম ব্যবহার করে তাহলে এ যাত্রায় রক্ষা পেয়ে যাবে। এমনকী পরাণ, গুপ্তচরদের হাতেও ধরা পড়বে না। তাই হাসিম পরাণের নতুন মুসলিম নাম ও তার বাবার নাম শেখাতে পেরেছে। পরাণের ও হাসিমের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভালোবাসা সবসময় বজায় থাকেছে। কিন্তু দাঙ্গার কারণে এখনও “উত্তর দক্ষিণে সোনার গাঁ, পূবে পশ্চিমে মহেশ্বরদি অথবা শীতলক্ষ্যার দুই তীর ধরে ধবংসের উল্লাস। মানুষের ভয়ানক দুর্দিনে-ধর্মের কথা কেউ শুনছে না, ধর্মবোধ নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, উগ্র বিদ্বেষ ক্রমশ এক ভূজঙ্গের মতো গোটা অঞ্চলকে গ্রাস করে ফেলেছে।” তবুও হাসিম যেন তেন প্রকারে পরাণকে বাঁচাবে ও পরাণের সম্মান ফিরিয়ে দেবে।

তারপর হাসিম ও পরাণ দু’জনেই গরিবপদীর আশ্রমে হাজির হয়েছে। আগে হাসিম, পরাণকে নদীর জলে নামিয়ে দিয়ে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গেছে—“যেন হাসিম এখন যথার্থই তীর্থযাত্রায় বের হয়ে পড়েছে, মক্কা মদিনা যাচ্ছে, মানুষের ভালবাসার স্থান, যেখানে মানুষে মানুষে কোনও বিভেদ থাকে না। সবই ঈশ্বরপ্রেমিত, জীব মাত্রেরই করুণার যোগ্য।” তাই মনে হয় ‘কাফের’ গল্পের চরিত্রগুলির আপন আপন অস্তিত্ব ঘিরে ব্যক্তি সত্তার যে যন্ত্রণা ও সংকট ঘনীভূত হয়ে উঠেছে তা অসীম তাৎপর্যে এমন করে খুব কম গল্পকারই ধরতে পারেন। আর পরাণ যেতে যেতে বলেছে—“কিরণী, তুই কোনখানে আছস ক। আমি পরাণ তরে ফালাইয়া কই যামু।” আসলে কিরণীকে হারিয়ে, পরাণের সব শাস্তি নষ্ট হতে বসেছে। দাঙ্গার ফলে, চারিদিকে মারামারি, হানাহানি, কাটাকাটিতে মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়েছে। আর এই মর্মান্তিক বিচ্ছেদের স্বীকার হয়েছিল পরাণের স্ত্রী কিরণী। হাসিম সেইজন্য পরাণকে প্রেরণা দিয়ে বলেছে—“আর একটু যেতে পারলেই সেই বাতিঘর, বাতিঘরে আমাদের পৌঁছাতে হবেই।” এরপর পরাণ চিৎকার করে বলে উঠেছে— “কিরণীরে পাইছি।” তারপর আবার সে জলে ডুব দিয়েছে। কিছুক্ষণ পর দেখল— “মানুষ দুজন হা হা করে হাসল, তারপর যদিকে হাসিম পাগলের মতো পালাবার জন্য ছুটছে সেদিকে ওরা ছুটতে থাকল। ‘কাফের যায়’।” অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রতিযোগিতা সর্বস্ব জীবন সঙ্গত নয়, বরঞ্চ মানুষের বিপদে তার পাশে দাঁড়ানোই হল মানুষের কর্তব্য। লেখক এমনও মনে করেন সংকটময় পরিস্থিতিতে জীবনপ্রেম নিয়ে টিকে থাকতে হবে, তাহলেই বাতিঘরে মানুষ পৌঁছে যাবে। আসলে ঈশ্বরের বা আল্লার পৃথিবীতে মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকাটাই হল আসল কথা। দাঙ্গা, বিরোধ ভুলে জীবনে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়াই হল মূল লক্ষ্য।

গল্পের পরিণতিতে আমরা জানতে পারি দাঙ্গা বন্ধ হয়ে গেছে। মানুষের মধ্যে মারামারি— হানাহানি আর নেই বললেই চলে। এমনকী বিরোধ নেই হিন্দু-মুসলিম ধর্মে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের বেঁচে থাকার মানেরটাও পাল্টে গেছে। যে মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষরা হিন্দুদের উপর অত্যাচার করেছিল, নিপীড়ন চালিয়েছিল তারাও এখন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তখন হিন্দুরাও বলতে শুরু করেছে—“ওই দ্যাখ কাফের যাইত্যাছে। দ্যাখ এক কাফের যায়, যব গম খেতের ভিতর দিয়া এক কাফের যায়। সন্ধ্যা হয় হয়, যব গম খেতের ভিতর এক কাফের ছুইটা যায়।” যব গমের খেতে লণ্ঠন হাতে শেষপর্যন্ত মানুষ নেমে এসেছে। হাসিমের কথা থেকে এক অপরিসীম আনন্দ পাওয়া যেতে লাগল। আর সেই সুস্থ পরিবেশ হারিয়ে ফেলার বেদনা থেকে মানুষ হিংস্র হয়ে গিয়েছিল। আর এখন মানুষ মানবিক হয়ে উঠেছে, মানুষের মন সবুজ হয়ে উঠেছে। সেই পরিস্থিতিতে মানুষ ভেদাভেদ ভুলে ঈশ্বরের বাগানে এসে হাজির হয়েছে আপন মহিমায়। তখন হাসিম বলেছে — “দ্যাখ দুই কাফের জীবন্ত কবর যায়।” কেননা পরাণও আগে নিজের নাম গোপন করে, মুসলিম নাম ব্যবহার করেছে। আমরা জানি মানুষের ব্যবহারই মানুষের পরিচয়। সে হিন্দু হোক, বা মুসলিম ধর্মে বিশ্বাসী হোক। তার আগে পরিচয় সে মানুষ। আর তার ধর্ম হল মানবতা। মানুষের বিপদে তার পাশে থাকাই হল আসল কর্তব্য। গল্পের শেষে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন— “পরাণের বউ কিরণীকে তুইলা দিয়া আইলাম।” দাঙ্গার যে পরিবেশ ছিল, তাও ক্রমশ বন্ধ হয়ে গেছে। সুস্থ-পরিবেশে, মানুষ নিজের জীবন ধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। এমনকী নতুন জীবনে মানুষ কিছু করার জন্য সামনের দিকে এগিয়েও গেছে। সর্বোপরি মানুষ, সংকটের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে। “নিজের দেশ, নিজের এই মাটিতে শুয়ে পরাণ স্বপ্ন দেখছে— কলমিলতায় আবার ফুল ফুটেছে। পাখি উড়ছে আকাশে। যব গম খেতের ভিতর পরাণ কিরণীর সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে।”

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এই গল্পের মধ্যে দিয়ে বলতে চেয়েছেন দাঙ্গার ফলে সাধারণ মানুষের জীবনে দুঃসময় নেমে এসেছে। জাতপাতের সংকট থেকে পরাণ, হাসিম কেউই রক্ষা পায়নি। দাঙ্গার কারণে পরাণ হারিয়েছিল কিরণীকে। তখন বাংলাদেশে সুস্থ পরিবেশ ছিল না। তাদেরকে বাংলাদেশের মাঠ-ঘাট থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয়েছিল সংকটের কারণে। অনেকেই বাংলাদেশে থেকে গেলেও অনেকে আবার এপার বাংলায় চলে এসেছে। গল্পের শেষে দাঙ্গার পরিবেশ বন্ধ হওয়ায়, পরাণ যেমন ফিরে পেয়েছে কিরণীকে তেমনি হাসিম জাবিদাকে সঙ্গে নিয়ে সুস্থ ভাবে সংসার অতিবাহিত করবে বলে মনস্থির করেছে। পত্নীর প্রেম-ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েও দুটি পুরুষ স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেয়েছে। আর মাটির আগাছা পরিষ্কার করে জমিতে আলো-বাতাস প্রবেশ করালে এই মাটি চারিদিকে সবুজে ঢেকে যাবে। তখন মনের হিংসা দূর হয়ে যাবে। আর মানুষের মন সবুজ হয়ে উঠবে।

৫.৫.১৬.২.৪ : নামকরণ

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কাফের’ গল্পটির নামকরণ সার্থক হয়েছে। গল্পের মধ্যে দেখা যায় দাঙ্গার পরিবেশ তৈরি হয়েছিল দেশভাগের ফলে। তারফলে পাশাপাশি গ্রাম, মাঠ-ঘাট, মুক্ত আকাশ, যব খেত সব যেন সংকটে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। পরাণ ও তার স্ত্রী কিরণী, হাসিম ও তার স্ত্রী জাবিদা বিভিন্ন ভাবে পর্যদস্ত হয়েছে। কেননা যে স্বাধীনতা মানুষকে ঘরছাড়া করেছে, তা সত্যিই স্বাধীনতা পদবাচ্য হয় কেমন করে, কোন অর্থে—সেই প্রশ্ন নিয়ে পরাণ ও হাসিমকে সুস্থ পরিবেশ ত্যাগ করতে হয়েছিল। এমনকী দাঙ্গার ফলে গল্পের প্রতিটি চরিত্র, পরিবেশ-পরিস্থিতিতে উদ্বেগজনক হয়ে পড়েছে। দাঙ্গার সময় হিন্দু-মুসলমানের ধর্মযুদ্ধ, মানুষ খুন, বাড়ি-ঘর

জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল হিন্দুধর্মাবলম্বী মানুষেরা। সেই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সব মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষই যে খারাপ তা নয়। আমাদের আলোচ্য গল্পে হাসিম, বন্ধু পরাণকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে। পরাণের বিপদে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতি এমন ভয়ানক জায়গায় চলে গিয়েছিল যে পরাণকে নিজের নাম পর্যন্ত ত্যাগ করতে হয়েছে। বাবার দেওয়া নাম ভুলে বন্ধুর দেওয়া নাম গ্রহণ করে সংকটের মধ্যে টিকে থাকতে হয়েছে। লেখক বলেছেন “দ্যাখ দুই কাফের জীবন্ত কবর যায়।”

সব দিক বিবেচনা করে অতীত বন্দ্যোপাধ্যায় বলতে চেয়েছেন মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রতিযোগিতা সর্বস্ব জীবন সঙ্গত নয়। সে হিন্দু হোক, সে মুসলিম হোক মানুষের হাহাকারের মধ্যে তার পাশে দাড়ানোই হল মানুষের কর্তব্য। আসলে মানুষের জীবন এই রকম। এক জায়গায় থেমে থাকে না। পথ চলার মধ্যেই আনন্দ রয়েছে। তাই মানুষকে জীবনযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হবে ও সংকটময় পরিস্থিতিতে জীবন প্রেম নিয়ে টিকে থাকতে হবে। গল্পে হাসিম ও পরাণের ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে সেই বার্তাটি দিতে চেয়েছেন। কারণ দুই বন্ধু দুটি আলাদা ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে তাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কখনই নষ্ট হয়নি। তাই ‘কাফের’ নামকরণ যথোপযুক্ত হয়েছে।

৫.৫.১৬.২.৫ : ছোটগল্পকার শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে এক কিংবদন্তী পুরুষ। তিনি ১৯৩৫ খ্রিঃ ২রা নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেছিলেন বাংলাদেশের ময়মনসিংহে। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে বিশ শতকের ছয়ের দশকে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁর লেখা প্রথম ছোটগল্প ‘জলতরঙ্গ’ ১৯৫৮খ্রিঃ প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়াও তিনি লিখেছিলেন ‘অবেলায়’, ‘আমার মেয়ের পুতুল’, ‘আমাকে দেখুন’, ‘উকিলের চিঠি’, খেলা, ‘ডুবুরি’, ‘নীলুর দুঃখ’, ‘পরপুরুষ’, ‘লক্ষীপেঁচা’, স্বপ্নের ভিতর মৃত্যু’, ‘হাতুড়ি’, প্রভৃতি ছোটগল্প। ‘পঞ্চাশের দশকের কথাকার’ গ্রন্থে, বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন—“শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্পের অঞ্চল এই বাংলাদেশ, তাঁর গল্পের পাত্র-পাত্রী বিভিন্ন বয়সের বাঙালি নারী-পুরুষ যারা ‘স্পেস’ ও ‘টাইমের’ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে স্বাভাবিকভাবে, অথচ গাঢ়তম অনুভবে একান্ত বাঙালি। বারবার মনে হয়, নির্মম ‘ন্যারেটার’ অথবা নিরপেক্ষ বিশ্লেষক -এর দূরত্ব মানতে পারেননি শীর্ষেন্দু।” (পৃ. ২৫২)

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় উপন্যাসও লিখেছেন। তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস ‘ঘুণপোকা’ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৭ খ্রিঃ। প্রথম উপন্যাসে সমাজ-সমস্যার কথা যেমন আছে, তেমনি চরিত্রগুলির আত্মিক সংকট লক্ষণীয়। তাছাড়াও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় একের পর এক লিখে চলেছেন, ‘পারাপার’, ফুলচোর (১৯৮২), ‘গোলাপের কাটা’ (১৯৮৫), ‘উজান’ (১৯৮৬), ‘কাঁচের মানুষ’ (১৯৮৭), ‘চোখ’ (১৯৮৮), ‘মানব জমিন’ (১৯৮৮) প্রভৃতি উপন্যাস।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেছেন— “জীবনের একটা গভীরতম তাৎপর্য আছে।” তাই সে জীবনকে জানার জন্যেই লেখক বিচিত্র সম্পর্কের, চেনা-সংসারের জটিলতাকে বাংলা কথাসাহিত্যে তুলে ধরেছেন। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের এখন ৮৪ বছর বয়স হলেও তাঁর লেখনী কিন্তু থেমে নেয়। এখনও তিনি নিয়মিত নিজের জীবনদর্শনের মধ্যে দিয়ে সাহিত্যচর্চা করে চলেছেন।

৫.৫.১৬.২.৬ : স্বপ্নের ভিতর মৃত্যু—সাধারণ পরিচিতি

গল্পের শুরুতে দেখা যায়— মাখনলালকে অফিসে একটানা কাজ করতে হয়েছে, সন্ধ্যা ছ’টা পর্যন্ত সে ব্যস্ত থেকেছে। এরফলে অনেকদিন মাখনলাল অফিসের বাইরের জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়নি। “চারদিকে জনশূন্য নিঃশব্দ ঘরটা প্রকাণ্ড হয়ে আছে। মনে হল তাকে অন্যমনস্ক রেখে সারা বিকেল ধরে তার জ্বর এসেছে।” অফিসের দারোয়াণ রামজীবন চাবির গোছা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর কথা না বলে কাশির শব্দ করছে। তার গলার আওয়াজ থেকে জানা যায়, সে অফিসের কাছাকাছি আছে। মাখনলাল এরপর পুরনো অফিস বাড়িটার ভিতরে প্রবেশ করেছে। গল্পে দেখা যায়— “বাইরের হাওয়ায় দোকানের উজ্জ্বল আলো আর লোকজনের ভিড়ের ভিতরে নেমে এসে হঠাৎ ঘুম এবং স্বপ্ন ভেঙে গেলে যেমন হয়, তার তেমনি সবকিছু খুব অচেনা লাগছিল।” এদিকে মাখনলালের স্ত্রী ললিতা তার জন্য বাড়িতে অপেক্ষা করে রয়েছে। মাখনলালের খিদে পেয়েছে, তা এখন টের পেল। কেননা অন্যদিন, এইসময় মাখনলালের বাড়ি পৌঁছে খাওয়া হয়ে যেত। কিন্তু মাখনলাল আজকে বাড়ি ফিরতে চাইছে না। তখন তার মনে হয়েছে—‘কতকাল সে কলকাতার রাস্তায়, ময়দানে, এসপ্ল্যান্ডে ঘুরে বেড়ায়নি, দোকানের শো— কেসে সাজানো জিনিস, আলো, লোকজন দেখতে দেখতে দু’পয়সার বাদাম শেষ করে খামোকা কোনও রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়েনি।’

এই পরিস্থিতিতে গল্প করে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বলতে চেয়েছেন, মাখনলাল অনেকদিন পর চোখ তুলে লাল আকাশ দেখেছে। ওজন নেওয়ার যন্ত্রের ভিতর পয়সা ফেলে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। এমনকী লিভারের ওঠানামার সঙ্গে সঙ্গে মাখনলাল যন্ত্রটার জেগে ওঠা টের পেয়েছে। লেখক বলেছেন, “একটুক্কণের জন্য জেগে ওঠে, তারপর জাগরণ ক্লাস্তিকর দেখে যন্ত্রটা আসতে আসতে আবার তার শীতল চিন্তাহীন ঘুম এবং স্বপ্নের ভিতরে চলে গেছে।” সেই পরিস্থিতিতে মাখনলাল ওজন করার টিকিটের মধ্যে একটি মেয়ের ছবি দেখতে পেয়েছে। এমনকী মাখনলাল হিসেব করে দেখেছে, তার বয়স অনুযায়ী যতটা ওজন হওয়া উচিত, তার চেয়ে এখন ওজন অনেকটাই কম।

এরপর মাখনলাল রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করেছে। খিদেও পেয়েছে অথচ রেস্টুরেন্টের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে অস্বস্তি অনুভব করেছে। তখন মাখনলালের মনে হয়েছে— “এইসব আলো, গান, মেয়ে, তার জন্যে নয়। মনে হল— সে ভুল জায়গায় এসেছে, ভাবল ফিরে যাই।” তার কিছুক্ষণ পর খাবার না খেয়ে রেস্টুরেন্ট থেকে সে বেরিয়ে গেল। রাস্তায় বেরিয়ে অনুভব করলো, খিদের কারণে তার মাথা ঘুরছে, এমনকী হাতে-পায়ে বশ পর্যন্ত নেই। সেই মুহূর্তে মাখনলালের স্তম্ভিত ফেরে, যে এই সময় অন্যদিন এতক্ষণ সে বাড়ি ফিরে যেত। মাখনলাল আরো ভাবতে থাকে— “তার দেরি দেখে নিশ্চিত ললিতা এখন ছয় বছরের বুকুকে পাশে নিয়ে মেঝের ওপর গড়াচ্ছে। সে ফিরলে উঠে দরজা খুলে দিতে ললিতার ঘুমন্ত মুখ বেয়ে পড়া চুল, স্বলিত আঁচল দেখা যাবে।”

এই পরিস্থিতিতে মাখনলাল খানিকটা ঘুমের ভিতরে হেঁটে গেল। মনে পড়ার মধ্যে স্মৃতির গোপন কাজটুকু রয়ে গিয়েছে। মাখনলাল তবে রেস্টুরেন্টে কার চোখ দেখে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল, হয়তো কেউ ছিল। এই

ভাবনাতেই মাতালের মতো টলে টলে পড়ে আর দোল খায়। আবার পরক্ষণেই চোখের চাউনি নিষ্ঠুর ছিল বলে, মাখনলালের পছন্দ হয়নি। ‘পঞ্চাশের দশকের কথাকার গ্রন্থে’, বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন— “তঁার গল্প-উপন্যাসের চরিত্রগুলির ভিতরে ও বাইরে কথার স্ফুলিঙ্গ ঝরে পড়ে না সমানভাবে। বেশিরভাগ সময়েই অন্তরের গভীরে কথার পাহাড়। তাই বিপুল আন্দোলন না তুলে তঁার গল্পে গ্রীষ্মের দন্ধপথে বৃষ্টি পড়ে হাজারটা থার্মোমিটার ভেঙে পড়ার মতো। আবার এই তিনিই বৃষ্টির গন্ধ খোঁজেন। সে গন্ধ ভালোবাসার গন্ধ নয়, নেশাডু গন্ধ নয়, তুলসী ও চন্দনের গন্ধ নয়, এই গন্ধ বড্ড মন খারাপ করে দেয়।” (পৃ.২৫২) এভাবেই মাখনলালও নিঃসঙ্গ মানুষ হিসেবে জীবন সংকটের সম্মুখীন হয়েছে।

গল্পপাঠে আমরা জানতে পারি, হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়েছে। মাখনলাল বৃষ্টির সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। তখন মাখনলালের কাছে চেনা রাস্তাও অচেনা মনে হয়েছে। “এই বৃষ্টি যেন তার চেনা-পরিচয়কে ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। যেন সে এক অদ্ভুত পর্দার আড়ালে আছে, পর্দা সরালেই দেখতে পাবে-বিদেশ।” গল্পকার এখানে মাখনলাল চরিত্রে নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্বের অনুভবকে শিল্পিত করতে চেয়েছেন।

এই পরিস্থিতিতে মাখনলাল এমনই অন্যমনস্ক ছিল যে তার জুতোয় ফুটপাথ থেকে জল চলকে উঠে বয়ে যাচ্ছিল, সে খেয়াল পর্যন্ত করল না। এর থেকে মনে হয় মাখনলাল আত্মমগ্ন ছিলেন। তার পরিবার-পরিজন থাকা সত্ত্বেও সে ছিল নিঃসঙ্গ। সেইভাবে ভাবতে ভাবতে মাখনলালের মনে হয়েছে, কতদিন সে অবহেলা করে জীবনকে কাটিয়ে দিয়েছে। নিজের অফিসের কাজের কথা ভেবে, সংসারের কথা ভেবে, জীবনকে সে ঠিকমতো বুঝতেই পারেনি। এমনকী জীবনের আনন্দকে উপভোগ পর্যন্ত করতে পারেনি। তখন মনে হয় মাখনলালের নিজের দ্বন্দ্বই প্রধান হয়ে উঠেছে। সেইজন্য একঘেয়ে, রুটিন মাসিক জীবন থেকে মাখনলাল মুক্তি পেতে চেয়েছে। তখন মাখনলাল আত্মিক সংকটের মুখোমুখি হয়ে উপলব্ধি করেছে—“কতদিন সে বৃষ্টিতে ভেজেনি, রোদে আপাদমস্তক পোড়েনি। মনে হয় প্রেমহীন প্রকৃতিহীন কতগুলো দিন সে স্বপ্নের ভিতরে কাটিয়ে দিয়েছে। কখনও ফিরেও দেখেনি দিনগুলি।”

মাখনলালের পরিবারে সবকিছু থাকা সত্ত্বেও তার বড় একা মনে হয়েছে। কেননা নিজের কাজ-কাজ করেই সে এতদিন সময় কাটিয়ে দিয়েছে। এর বাইরে যে জীবন রয়েছে, পথ চলাতে আনন্দ রয়েছে তা সে অনুভব করতে পারেনি। সর্বোপরি মানুষ নিজের ইচ্ছাশক্তির জোরে সব কিছুর পরিবর্তন করে নিতে পারে। সংসারে-সমাজে এমন কোন কাজ নেই, যা মানুষ পারে না। তেমনি মাখনলালও যা মনে করবে, তাই করতে পারবে। শুধুমাত্র নিজের গণ্ডির মধ্যে থেকে বাকি জীবনটা সে নিজের ইচ্ছে মতো চালিয়ে নেবে। তখনই মাখনলালের দুঃস্বপ্নে ঘুম ভেঙে গেছে। তখন মাখনলালের মনে হয়েছে — “কে যেন তাকে ধীরে টেনে নিচ্ছিল ঘুমে স্বপ্নের ভিতরে!” শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এই গল্পের মাখনলাল চরিত্রের দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে সেই সত্য উপনীত হতে চেয়েছেন যে অস্তিত্বের সংকটের মুখোমুখি আমরা সকলে।

তাই লেখক মনে করেন সংসারে আবদ্ধ হয়ে, কর্মরত হয়ে বাধাবদ্ধ ক্ষুদ্র জীবনে শান্তি কোথাও মেলে না। প্রতিটি মুহূর্তে মানুষকে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এটা করা উচিত, এটা করা উচিত নয় এই আত্মিক সংকটে আমরা জর্জরিত। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ‘স্বপ্নের ভিতরে মৃত্যু’ গল্পের মাখনলালকে ও এইভাবে অসহায়তার মধ্যে, নিঃসঙ্গতার মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছে। তখন আত্মিক সংকটের সম্মুখীন হয়ে মাখনলালের মনে হয়েছে

—“বহুকাল ধরে একটা অন্ধকার ঘরের ভিতরে কোথায় একটা সিগারেট জ্বলছে— সে খুঁজছে, খুঁজছে।” এই খোঁজার মধ্যে দিয়ে সংকট থেকে পরিব্রাণ পেতে চেয়েছে। চেনা-জানা মানুষগুলিকে নিয়ে জোটবদ্ধভাবে চেষ্টা করেছে সর্ব-বিধ সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। সমাজ ব্যবস্থায় যে কোন প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে, মানুষকে জোটবদ্ধভাবে তা করতে হবে। গল্পের মাখনলালের মতো মানুষরাও সেই সিগারেটের আগুনের খোঁজ পেলে সমস্ত অরাজকতার বিষয় পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারে। তার ফলে মানুষের দ্বারাই আবার নতুন পথ আবিস্কৃত হবে, যে পথে থাকবে না কোন পাথর, যেখানে থাকবে শুধুই ফুল বিছানো।

৫.৫.১৬.২.৭ : নামকরণ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ‘স্বপ্নের ভিতর মৃত্যু’ গল্পের মাখনলাল চরিত্রে যে কষ্ট আছে তা পাঠকদের কাছে করুণার উদ্রেক করেছে। কেননা নাগরিক ছন্দে বিশ্বাসী মাখনলাল আত্মিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। সকাল থেকে রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত রুটিন মারফিক জীবনে প্রচুর কাজ করলেও অর্থ উপার্জনের বাইরে সে কিছু চিন্তা না। তারফলে মাখনলালের জীবন থেকে আনন্দ হারিয়ে যেতে বসেছিল। আর রুটিন মারফিক কাজ তার কাছে জটিল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন নিয়ম মারফিক জীবন থেকে মাখনলাল বেরিয়ে এসেছে। তারফলে অফিসের ছুটির পর বাড়ি না ফিরে কলকাতার ময়দান এলাকায় কিছুক্ষণ সময় কাটিয়েছে। অনেকক্ষণ ঘুম এবং জাগরণের মাঝখানে মাখনলালের অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয়েছে—“বুকের পাশে একটা অস্পষ্ট ব্যথা ডাক-টিকিটের মতো লেগে আছে। মনে হল স্বপ্নগুলো এখনও তার মাথা থেকে সম্পূর্ণ সরে যায়নি। কোথাও খুব কাছাকাছি তারা অপেক্ষা করে আছে। সুযোগ পেলেই স্বপ্নের ভিতরে— ঢাকনা খুলে রাখা ম্যানহোলে টেনে নিয়ে যাবে।”

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্পের মধ্যে দিয়ে পাঠক, লেখকের জীবনদর্শনের সন্ধান পেয়েছে। গল্পে মাখনলালের জীবনের যে সংকটের কথা তুলে ধরেছেন, তা তিনি মানুষকে ভালোবেসেই করেছিলেন। ফলে লেখকের দর্শন গভীর মানবিকতা বোধে পৌঁছে গেছে। লেখক দ্রষ্টা হয়ে যেমন সমাজের বহুবিধ সমস্যার ভয়াবহ রূপ দেখেছিলেন, তেমনি স্রষ্টা হয়ে গল্পে তার বাস্তব ও শিল্পিত চিত্র তুলে ধরেছেন। গল্পের শেষে তিনি বলেছেন— “তখন তটভূমি ছেড়ে দিয়ে ঢেউয়ে দুলে দুলে যাওয়ার মতো মাঝ সমুদ্রের দিকে চলে যাচ্ছিল মাখনলাল।” গল্পকার মাখনলালকে নিঃসঙ্গতা থেকে দূরে সরিয়ে বৃহত্তর জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে যেতে চেয়েছেন। এমনকী তিনি বলতে চেয়েছেন ওপার বাংলা থেকে উদ্বাস্তু মানুষের ঢল পশ্চিমবঙ্গে এসে নানামুখী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। তারা বিভিন্ন বস্তু অঞ্চলে দিন কাটালেও মনে শান্তি ছিল না। তারফলে উদ্বাস্তু, মানুষরা ছিলেন চরম সংকটের সম্মুখীন। মাখনলালের মতো মানুষকে লেখক সেই জনসমুদ্রে মিশিয়ে দিতে চেয়েছেন। তারফলে সমস্ত মানবজাতি একসঙ্গে লড়াই করবে, সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্যে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় মানবজীবনের গভীরতর লোকে ডুব দিয়ে সংকটের মধ্যে ও মানুষ কিভাবে বেঁচে থাকতে পারে সেই আশাবাদী জীবনদর্শন পাঠকের দরবারে তুলে ধরেছেন। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের বৈচিত্রপূর্ণ অভিজ্ঞতা না থাকলে হয়তো এমনটা সম্ভব হতো না। সেইজন্য মনে হয়, গল্পের নামকরণ ‘স্বপ্নের ভিতর মৃত্যু’ যথোপযুক্ত হয়েছে।

৫.৫.১৬.২.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

- ১। কালের পুন্ডলিকা—অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়
- ২। পঞ্চাশের দশকের কথাকার — উজ্জ্বলকুমার মজুমদার সম্পাদিত
- ৩। সাম্প্রতিক কথাসাহিত্য— হীরেন চট্টোপাধ্যায়
- ৪। বাংলা ছোটগল্প তত্ত্ব ও গতি -প্রকৃতি — সোহারাব হোসেন।

৫.৫.১৬.২.৯ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

- ১। গল্পকার অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্বের পরিচয় দাও।
- ২। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কাফের’ গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।
- ৩। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কাফের’ গল্পের সামাজিক সংকটের পরিচয় দাও।
- ৪। গল্পকার শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্বের পরিচয় দাও।
- ৫। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ‘স্বপ্নের ভিতর মৃত্যু’ গল্পের নামকরণ সম্পর্কে আলোকপাত করো।
- ৬। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ‘স্বপ্নের ভিতর মৃত্যু’ গল্পের মাখনলাল চরিত্রসৃষ্টির সার্থকতা বিচার করো।

NOTES

NOTES

বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম.এ

দ্বিতীয় সেমেস্টার

ষষ্ঠ পত্র

(সিবিসিএস)

পাঠ-সহায়ক উপাদান



মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ

ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যান্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫

পশ্চিমবঙ্গ

পাঠ-প্রণেতা

ড. কেকা ঘটক — প্রাক্তন অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায় — প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

ড. শ্রাবন্তী পান — সহকারী অধ্যাপক (চুক্তিভিত্তিক) বাংলা বিভাগ, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

জুন ২০১৯

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও

প্রিন্টটেক, ১৫এ, অম্বিকা মুখার্জী রোড, কলকাতা-৭০০০৫৬ দ্বারা মুদ্রিত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ-সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোন অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইনানুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের লেখক/পাঠপ্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Message

Satisfying the varied needs of distance learners, overcoming the obstacle of distance and reaching the unreached students are the threefold functions catered by Open and Distance Learning (ODL) systems. The onus lies on writers, editors, production professionals and other personnel involved in the process to overcome the challenges inherent to curriculum design and production of relevant Self Learning Materials (SLMs). At the University of Kalyani a dedicated team under the able guidance of the Hon'ble Vice-Chancellor has invested its best efforts, professionally and in keeping with the demands of Post Graduate CBCS Programmes in Distance Mode to devise a self-sufficient curriculum for each course offered by the Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Development of printed SLMs for students admitted to the DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2017 had been our endeavour. We are happy to have achieved our goal.

Utmost care and precision have been ensured in the development of the SLMs, making them useful to the learners, besides avoiding errors as far as practicable. Further suggestions from the stakeholders in this would be welcome.

During the production-process of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) Sankar Kumar Ghosh, Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Sincere gratitude is due to the respective chairpersons as well as each and every member of PGBOS (DODL), University of Kalyani. Heartfelt thanks is also due to the Course Writers-faculty members at the DODL, subject-experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have enriched the SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would especially like to convey gratitude to all other University dignitaries and personnel involved either at the conceptual or operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their persistent and co-ordinated efforts have resulted in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any form without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Director
Directorate of Open and Distance Learning
University of Kalyani

পাঠক্রম
ষষ্ঠ পত্র
উনিশ ও বিশ শতকের বাংলা কাব্যকবিতা

পর্যায় গ্রন্থ : ১ মেঘনাদবধ কাব্য : মধুসূদন দত্ত (নির্বাচিত ২টি সর্গ, ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ সর্গ)
(সময় : ৪ ঘণ্টা)

একক ১. কবিমানস

একক ২. চতুর্থ সর্গ

একক ৩. ষষ্ঠ সর্গ

একক ৪. রসবিচার

পর্যায় গ্রন্থ : ২ সারদামঙ্গল : বিহারীলাল চক্রবর্তী (সময় : ৪ ঘণ্টা)

একক ৫. বিহারীলালের কবিমানস

একক ৬. বিহারীলালের ত্রিবিধ বিরহ

একক ৭. নিসর্গপ্রীতি ও সৌন্দর্যচেতনা

একক ৮. সারদা সাধনার ত্রিস্তর : জাগর-স্বপ্ন-সুষুপ্তি

পর্যায় গ্রন্থ : ৩ জীবনানন্দ দাশ (আটটি নির্বাচিত কবিতা) (সময় : ৪ ঘণ্টা)

একক ৯. বোধ, বনলতা সেন

একক ১০. নগ্ন নির্জন হাত, আট বছর আগের একদিন

একক ১১. আবার আসিব ফিরে, তিমির হননের গান

একক ১২. সুচেতনা, শিকার

পর্যায় গ্রন্থ : ৪ আধুনিক বাংলা কবিতা (বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত) (সময় : ৪ ঘণ্টা)

একক ১৩. বুদ্ধদেব বসু : ব্যাং, প্রত্যহের ভার, শীতরাত্রির প্রার্থনা

একক ১৪. বিষ্ণু দে : ক্রেসিডা, ঘোড়সওয়ার, ভিলানেল

একক ১৫. সুভাষ মুখোপাধ্যায় : আমার কাজ, যত দূরেই যাই, একটি কবিতার জন্য

একক ১৬. সমর সেন : মেঘদূত, মুক্তি, রোমন্থন

সূচিপত্র

ষষ্ঠ পত্র

পঞ্চম পত্র	একক	শিরোনাম	পাঠ প্রণেতা	পৃষ্ঠা
পর্যায় গ্রন্থ ১	১.	কবিমানস	ড. শ্রাবস্তী পান	১-৮
	২.	চতুর্থ সর্গ	ড. শ্রাবস্তী পান	৯-১৬
	৩.	ষষ্ঠ সর্গ	ড. শ্রাবস্তী পান	১৭-২১
	৪.	রসবিচার	ড. শ্রাবস্তী পান	২২-২৯
পর্যায় গ্রন্থ ২	৫.	বিহালীলালের কবিমানস	অধ্যাপিকা ড. কেকা ঘটক	৩০-৩৪
	৬.	বিহারীলালের ত্রিবিধ বিরহ	অধ্যাপিকা ড. কেকা ঘটক	৩৫-৩৮
	৭.	নিসর্গপ্রীতি ও সৌন্দর্য চেতনা	অধ্যাপিকা ড. কেকা ঘটক	৩৯-৪১
	৮.	সারদা সাধনার ত্রিস্তর : জাগর-স্বপ্ন-সুষুপ্তি	অধ্যাপিকা ড. কেকা ঘটক	৪২-৪৭
পর্যায় গ্রন্থ ৩	৯.	বোধ, বনলতা সেন	ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায়	৪৮-৬১
	১০.	নগ্ন নির্জন হাত, আট বছর আগের একদিন	ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায়	৬২-৭০
	১১.	আবার আসিব ফিরে, তিমির হনের গান	ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায়	৭১-৭৬
	১২.	সুচেতনা, শিকার	ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায়	৭৭-৮৪
পর্যায় গ্রন্থ ৪	১৩.	বুদ্ধদেব বসু : ব্যাং, প্রত্যহের ভার, শীত রাত্রির প্রার্থনা	ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায়	৮৫-৯০
	১৪.	বিষ্ণু দে : ক্রেসিডা, ঘোড়সওয়ার, ভিলানেল	ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায়	৯১-৯৩
	১৫.	সুভাষ মুখোপাধ্যায় : আমার কাজ, যত দূরেই যাই, একটি কবিতার জন্য	ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায়	৯৪-৯৭
	১৬.	সমর সেন : মেঘদূত, মুক্তি, রোমন্থন	ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায়	৯৮-১০০

পর্যায় গ্রন্থ-১

মেঘনাদবধ কাব্য

একক-১

কবিমানস

বিন্যাস ক্রম :

- | | | |
|---------|---|----------------------------|
| ৬.১.১.১ | : | ভূমিকা |
| ৬.১.১.২ | : | ব্যক্তিজীবন |
| ৬.১.১.৩ | : | সাহিত্যকর্ম |
| ৬.১.১.৪ | : | মেঘনাদবধ কাব্যের প্রাগ্ভাষ |
| ৬.১.১.৫ | : | আদর্শ প্রশ্নাবলি |
| ৬.১.১.৬ | : | সহায়ক গ্রন্থাবলি |
-

৬.১.১.১ : কবিমানস

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ণগর্ভের পরিপুষ্ট জাতক হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)। নব্য-বাংলাকাব্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এই বাঙালি কবি। ‘মাইকেল’ ও ‘মধু’ দুটি বিজাতীয় নামের সমন্বয়ের ইতিহাসে স্বরচিত তাঁর কাব্যজীবন। ক্ষণায়ু জীবনচক্রে তিনি বাংলা সাহিত্যকে যে ঐশ্বর্যভাণ্ডার সমর্পণ করেছেন তাতে তাঁর শক্তিমত্তা ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বলতা সবার কাছে ঈর্ষণীয়। বুৎপন্ন কবিপ্রতিভার সঙ্গে ইতিহাসের নীরব মেলবন্ধনে যে স্বতন্ত্র কাব্যকলা নির্মাণশৈলী তৈরি হয়েছিল, তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ ‘মধুসূদন রচনাবলী’। আসলে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে পাশ্চাত্যদর্শন ও সাহিত্যের অভিঘাতে ইতিহাসের অভ্যন্তরে এক নির্মাণকলা চলছিল, তা হল প্রবর্তকস্রষ্টার খোঁজে ছিল ইতিহাস। শতাব্দীর সেই ক্রমস্ফুট অভিপ্রায়কে ধারণ করার জন্য যোগ্য প্রজননক্ষম কবি প্রতিভার প্রয়োজন ছিল। ইতিহাসের সেই যোগক্রিয়ার ক্ষণে প্রস্তুত কবি মধুসূদন মহাকাব্য-গীতিকাব্য-সনেট-পত্রকাব্য-নব্যছন্দের প্রবর্তনার পসরা সাজিয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন। কালের এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে মধুসূদন নিজের অভিষেক ঘটান বাংলা সাহিত্যে নব্য আঙ্গিকের প্রবর্তক রূপে। নাটকেও সেই আনুষ্ঠানিক আহ্বান এলো সিংহভ্রাতাদের (বেলগাছিয়া নাট্যশালার কর্তৃপক্ষ) কাছ থেকে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রেরণাকে মনোধর্মে পরিণত করে মধুসূদন ইংরেজ কবির সমকক্ষতা অর্জনের অভিলাষে বিদেশে পাড়ি দেন। প্রবাসে থেকেও তিনি দেশকে যেভাবে মনের আঙিনায় মণিকোঠায় স্থান দিয়েছেন, তার প্রতিলিপি পাই ছন্দবদ্ধ সনেটের আঙ্গিকে রচিত ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’তে (১৮৬৬)। আত্মায়ুর স্বল্পতার কোনো নিঃশব্দ তর্জনী যেন মধুসূদনকে তাড়া করছিল।

তাই আত্মবল ক্ষয় হবার পূর্বে তিনি অস্থির উদ্দীপনার আবেগে তাঁর সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ করেছেন, ১৮৬০ এ পাঁচটি এবং ১৮৬১ তে ৪টি, ২ বছরে মোট নয়টি নাট্য ও কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করে। বাংলা কাব্যধারার যে পুনরুজ্জীবন মধুসূদনের হাত ধরে ঘটেছিল তাই সৃষ্টিরূপে স্বাভাবিক গতিতে প্রবাহিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে পরিণতি পেয়ে নিঃশেষিত হয়। মধুসূদন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ একালের ভাবধারার পারস্পরিক সাহিত্যতরঙ্গ। ১৮৬০ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত মোটামুটি ৪০ বছর কাল বাংলা সাহিত্যে সুস্থভাবে বাঙালিত্ব বজায় ছিল। পরবর্তীকালে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রাবল্যে সেই জাতীয় চেতনা থেকে বিযুক্তি ঘটে। আজ একবিংশ শতকে দাঁড়িয়েও বঙ্গসাহিত্যের সেই প্রাক্পর্বকে আমরা কোনোভাবেই চিরবিস্মৃতির অন্ধকারে ঠেলে দিতে পারিনি। তা সত্ত্বেও বাঙালিচিন্তে যদি কখনও মনে হয় এই আদি পর্ব অনাবশ্যক; সেই ক্ষণকে স্মরণ করে মধু কবি নিজেই তাঁর সমাধিলিপিতে আহ্বান করে গেছেন বঙ্গবাসীকে—“দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে”—কবির আহ্বানে সাড়া দিয়ে কেউই আর এই বিজাতীয় কবির প্রতিভার স্পর্শে জাজ্জল্যমান হয়ে উঠতে পারেনি। বীরপতনের সেই শ্রেষ্ঠ উপমা ‘বিসর্জিত প্রতিমা যেন দশমী দিবসে!’ শ্রবণে বাঙালি আজ আর ব্রহ্মদেব আকুল হয় না। এই ঈর্ষাযোগ্য হৃদয়তার কল্যাণস্পর্শ ঘটেছিল ‘কবি শ্রীমধুসূদন’ দত্ত রচিত ‘মেঘনাদবধ কাব্যে’, যা তার কবিত্বকে সর্ব প্রত্যাঘাত থেকে বর্মের মতো রক্ষা করে গেছে, এটাই ঐতিহাসিক সত্য।

৬.১.১.২ : ব্যক্তিজীবন

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জাতীয় জীবনের এক সংকট মুহূর্তে মধুসূদন লক্ষপ্রতিষ্ঠ প্রতিভাবান পুরুষ রূপে বাংলায় জন্মগ্রহণ করেন। বহিজ্জীবন ঘটিত ‘মাইকেল’ নামক যে বিজাতীয় শব্দটি সংযুক্ত ছিল, তাকে তিনি বিশেষ মূল্য দেননি। নিজস্বমানসেই তাঁর সেই আত্মসাক্ষাৎকার ঘটেছিল, নিজের সমাধি-লিপিতে—

মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দন্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন।
যশোরে সাগরদাঁড়ী কবতক্ষ-তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী!

সমাধি লিপি (মাইকেল মধুসূদন দত্ত)

কপোতাক্ষ নদের তীরবর্তী অধুনা পূর্ববঙ্গের যশোহর জেলার অন্তর্গত সাগরদাঁড়ি গ্রামে ১৮২৪ (মতান্তরে ১৮২৩) খ্রিস্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি শনিবার এক সম্পন্ন জমিদার বংশের কায়েস্থ পরিবারে কবি শ্রীমধুসূদন জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত, ছিলেন কলকাতার একজন প্রতিষ্ঠিত উকিল। মাতা জাহ্নবী দেবীর তত্ত্বাবধানে মধুসূদনের শিক্ষারম্ভ হয়। প্রথমে তিনি সাগরদাঁড়ির পাঠশালায় পড়াশোনা করেন। পরে সাত বছর বয়সে তিনি কলকাতা যান এবং খিদিরপুর স্কুলে দুবছর পড়ার পর ১৮৩৩ সালে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তিনি বাংলা, সংস্কৃত ও ফারসি ভাষা শেখেন।

হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালেই মধুসূদনের প্রতিভার বিকাশ ঘটে। ১৮৩৪ সালে তিনি কলেজের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ইংরেজি ‘নাট্য-বিষয়ক প্রস্তাব’ আবৃত্তি করে উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এখানে

তঁার সহপাঠী ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, গৌরদাস বসাক প্রমুখ, যাঁরা পরবর্তী জীবনে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কিন্তু এঁদের মধ্যে মধুসূদন উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কলেজের পরীক্ষার তিনি বরাবর বৃত্তি পেতেন। এ সময় নারীশিক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করে তিনি স্বর্ণপদক লাভ করেন।

হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের সময়েই মধুসূদন কাব্যচর্চা শুরু করেন। তখন তাঁর কবিতা জ্ঞানান্বেষণ, Bengal Spectator, Literary Gleamer, Calcutta Library Gazette, Literary Blossom, Comet প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হত। এ সময় থেকেই তিনি স্বপ্ন দেখতেন বিলেত যাওয়ার। তাঁর ধারণা ছিল বিলেতে যেতে পারলেই বড় কবি হওয়া যাবে। তাই পিতা তাঁর বিবাহ ঠিক করলে তিনি ১৮৪৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং তখন থেকে তাঁর নামের পূর্বে ‘মাইকেল’ শব্দটি যুক্ত হয়। কিন্তু হিন্দু কলেজে খ্রিস্টানদের অধ্যয়ন নিষিদ্ধ থাকায় মধুসূদনকে কলেজ ত্যাগ করতে হয়। তাই ১৮৪৪ সালে তিনি বিশপস্ কলেজে ভর্তি হন এবং ১৮৪৭ পর্যন্ত এখানে অধ্যয়ন করেন। এখানে তিনি ইংরেজি ছাড়াও গ্রিক, ল্যাটিন ও সংস্কৃত ভাষা শেখার সুযোগ পান। এইসময় ধর্মাস্তরের কারণে মধুসূদন তাঁর আত্মীয়স্বজনদের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। একসময় পিতা অর্থ পাঠানো বন্ধ করে দেন। অগত্যা ভাগ্যান্বেষণে ১৮৪৮ সালে মাদ্রাজ গমন করেন। সেখানে তিনি দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেন। প্রথমে মাদ্রাজ মেইল অরফ্যান অ্যাসাইলাম স্কুলে (১৮৪৮-১৮৫২) এবং পরে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হাইস্কুলে শিক্ষকতা (১৮৫২-১৮৫৬) করেন।

মাদ্রাজের সঙ্গে মধুসূদনের জীবনের অনেক ঘটনা জড়িত। এখানেই তিনি সাংবাদিক ও কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি Eurasian (পরে Eastern Guardian), Madras Circulator and Chronicle ও Hindu Chronicle পত্রিকা সম্পাদনা করেন এবং Madras Spectator এর সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন (১৮৪৮-১৮৫৬)। মাদ্রাজে অবস্থানকালেই Timothy Penpoem ছদ্মনামে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ The Captive Lady (১৮৪৮) এবং দ্বিতীয় গ্রন্থ Visions of the Past প্রকাশিত হয়। রেবেকা ও হেনরিয়েটার সঙ্গে তাঁর যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় বিবাহ এখানেই সংঘটিত হয়। মাদ্রাজে বসেই তিনি হিব্রু, ফরাসি, জার্মান, ইটালিয়া, তামিল ও তেলেগু ভাষা শিক্ষা করেন।

এরমধ্যে পিতা-মাতা উভয়ের মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর খবর শুনে তিনি দ্বিতীয় স্ত্রী হেনরিয়েটাকে নিয়ে ১৮৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা আসেন। সেখানে তিনি প্রথমে পুলিশ কোর্টের কেরানি এবং পরে দোভাষীর কাজ করেন। তাঁর বন্ধু-বান্ধবরা এ সময় তাঁকে বাংলায় সাহিত্যচর্চা করতে অনুরোধ জানান এবং তিনি নিজেও ভেতর থেকে এরূপ একটি তাগিদ অনুভব করেন। রামনারায়ণ তর্করত্নের রত্নাবলী (১৮৫৮) নাটক ইংরেজিতে অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি বাংলা নাট্যসাহিত্যে উপযুক্ত নাটকের অভাব অনুভব করেন এবং তাঁর মধ্যে তখন বাংলা নাটক রচনার সংকল্প জাগে। এই সূত্রে তিনি কলকাতার পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়া থিয়েটারের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। এমন একটি পরিস্থিতিতে নাট্যকার হিসেবেই মধুসূদনের বাংলা সাহিত্যঙ্গনে পদার্পণ ঘটে। তিনি মহাভারতের দেবযানী-যযাতি কাহিনি অবলম্বনে ১৮৫৯ সালে পাশ্চাত্য রীতিতে রচনা করেন শর্মিষ্ঠা নাটক। এটিই প্রকৃত অর্থে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মৌলিক নাটক এবং একই অর্থে মধুসূদনও বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাট্যকার। পরের বছরই মধুসূদন দুটি প্রহসন রচনা করেন ; একেই কি বলে সভ্যতা

(১৮৬০) এবং বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রৌঁ (১৮৬০)। প্রথমটিতে তিনি ইংরেজি শিক্ষিত ইয়ং বেঙ্গলের মাদকাসক্তি, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনাচারকে কটাক্ষ করেন এবং দ্বিতীয়টিতে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের আচারসর্বস্ব নীতিভ্রষ্ট সমাজপতিদের গোপন লাম্পট্য তুলে ধরেন। এ ক্ষেত্রেও মধুসূদন পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। তাঁর প্রহসন দুটি কাহিনি, সংলাপ ও চরিত্রসৃষ্টির দিক থেকে আজও অতুলনীয়।

মধুসূদনের কাব্যে উনিশ শতকীয় নারী কণ্ঠের স্বর বেশ স্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে তাঁর বীরাঙ্গনা (১৮৬২) কাব্যের পৌরাণিক নায়িকাগণের পত্রাকারে কামনা-বাসনা অভিমান ও অভিযোগ রূপে প্রকাশিত। মধুসূদনের অপর দুটি রচনা হল ব্রজাঙ্গনা (১৮৬১), রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গীতিকাব্য এবং কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১) রাজপুত উপাখ্যানে রচিত একটি অবলম্বনে রচিত বিয়োগান্তক নাটক। এ পর্বে মধুসূদন দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন এবং কিছুদিন হিন্দু প্যাট্রিয়ট (১৮৬২) পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৮৬২ সালের ৯ জুন মধুসূদন ব্যারিস্টারি পড়ার উদ্দেশ্যে বিলেত যান এবং গ্রেজ-ইন-এ যোগদান করেন। সেখান থেকে ১৮৬৩ সালে তিনি প্যারিস হয়ে ভার্সাই নগরীতে যান এবং সেখানে প্রায় দু'বছর অবস্থান করেন। ভার্সাইতে অবস্থানকালে তাঁর জীবনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। এখানে বসেই তিনি ইতালীয় কবি পেত্রার্কের অনুকরণে বাংলায় সনেট লিখতে শুরু করেন। বাংলা ভাষায় এটিও এক বিস্ময়কর নতুন সৃষ্টি। এর আগে বাংলা ভাষায় সনেটের প্রচলন ছিল না। দ্বিতীয় বিষয়টি হল ভার্সাই নগরীতে থেকেই তিনি যেন মাতৃভাষাকে নতুনভাবে এবং একান্ত আপনভাবে দেখতে ও বুঝতে পারেন, যার চমৎকার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর 'বঙ্গভাষা' 'কপোতাক্ষ নদ' ইত্যাদি সনেটে। তাঁর এই সনেটগুলি ১৮৬৬ সালে চতুর্দশপদী কবিতাবলী নামে প্রকাশিত হয়।

ভার্সাই নগরীতে দু'বছর থাকার পর মধুসূদন ১৮৬৫ সালে পুনরায় ইংল্যান্ড যান এবং ১৮৬৬ সালে গ্রেজ-ইন থেকে ব্যারিস্টারি পাস করেন। ১৮৬৭ সালের ৫ই জানুয়ারি দেশে ফিরে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগ দেন। কিন্তু ওকালতিতে সুবিধে করতে না পেরে ১৮৭০ সালের জুন মাসে মাসিক এক হাজার টাকা বেতনে হাইকোর্টের অনুবাদ বিভাগে যোগদান করেন। দু'বছর পর এ চাকরি ছেড়ে তিনি পুনরায় আইন ব্যবসা শুরু করেন। এবারে তিনি সফল হন, কিন্তু অমিতব্যয়িতার ব্যাপারটি ছিল তাঁর স্বভাবগত। একই কারণে তিনি বিদেশে অবস্থানকালেও একবার বিপদগ্রস্ত হয়েছিলেন এবং বিদ্যাসাগরের আনুকূল্যে সেবার উদ্ধার পান। ১৮৭২ সালে মধুসূদন কিছুদিন পঞ্চকোটের রাজা নীলমণি সিংহ দেও এর ম্যানেজার ছিলেন।

জীবনের টানাপোড়েনের মধ্য দিয়েও মধুসূদন কাব্যচর্চা অব্যাহত রাখেন। হোমারের ইলিয়াড অবলম্বনে ১৮৭১ সালে তিনি রচনা করেন হেক্টরবধ। তাঁর শেষ রচনা মায়াকানন (১৮৭৩) নাটক। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত তাঁর ১২টি গ্রন্থ এবং ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত ৫টি গ্রন্থ রয়েছে।

মধুসূদন ছিলেন বাংলা সাহিত্যের যুগপ্রবর্তক কবি। তিনি তাঁর কাব্যের বিষয় সংগ্রহ করেছিলেন প্রধানত সংস্কৃত কাব্য থেকে, কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শ অনুযায়ী সমকালীন ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির জীবনদর্শন ও রুচি উপযোগী করে তিনি তা কাব্যে রূপায়িত করেন এবং তার মধ্য দিয়েই বাংলা সাহিত্যে এক নবযুগের সূচনা হয়। উনিশ শতকের বাঙালি নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ মধুসূদন তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার দ্বারা বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি আবিষ্কার করে এই ভাষা ও সাহিত্যের যে উৎকর্ষ সাধন করেন, এর ফলেই তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। বাংলা সাহিত্যে তিনি 'মধুকবি' নামে পরিচিত।

বাংলার এই মহান কবির শেষজীবন অত্যন্ত দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে। স্বাণের দায়, অর্থান্ধাভাব, অসুস্থতা, চিকিৎসাহীনতা ইত্যাদি কারণে তাঁর জীবন হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ। শেষজীবনে তিনি উত্তরপাড়ার জমিদারদের লাইব্রেরি ঘরে বসবাস করতেন। স্ত্রী হেনরিয়েটার মৃত্যুর তিনদিন পরে ১৮৭৩ সালের ২৯ জুন বাংলার এই মহান কবি কপর্দকহীন অবস্থায় জেনারেল হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

৬.১.১.৩ : সাহিত্যকর্ম

বাল্যকাল থেকেই চরিত্রে দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়, প্রথমটি অধ্যয়নস্পৃহা, দ্বিতীয়টি কাব্যপ্রীতি। অসম্ভব আত্মবিশ্বাস নিয়ে মধুসূদন শৈশবে গ্রাম্য পাঠশালা, যৌবনে হিন্দু কলেজ অথবা বিশপস্কলেজ সহপাঠীদের মধ্যে সর্বাগ্রে স্থান করে নিয়েছিলেন। শৈশবে মায়ের কাছে তন্ময়চিত্তে শোনা অত্যন্ত প্রিয় রামায়ণ—মহাভারত আর অন্যদিকে বাল্যকালে শুনে অভ্যস্ত গ্রাম্য আগমনী—বিজয়ার পালাগান এই ছিল তাঁর কবিজীবনের ভিত্তিস্বরূপ—‘বিসর্জিত প্রতিমা দেন দশমী-দিবসে’ জীবনের সমস্ত সুখ বিসর্জন দিয়ে রিক্ত হৃদয়ের আলংকারিক উপমা রূপে এ যেন বাঙালির চিরন্তন সেতুবন্ধ। ১৮৫৯-৬২ এই চার বছর এবং তিন বছরের টানা বিরতির পর আবার ১৮৬৬। বিষয় ধরলে পর্যায় তিনটি, ১৮৫৯-৬০ নাট্যচর্চা, ১৮৬০-১৮৬২ কাব্যচর্চা এবং ১৮৬৬তে আবারও কাব্যচর্চা—‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’। মোট চার বছরকেই (ধারাবাহিক) তাঁর পরিণত প্রতিভার সৃষ্টিকাল বলা যায়। চতুর্দশপদী কবিতাবলী ক্লাস্ত অবসিতপ্রায় প্রতিভার বহিঃপ্রকাশমাত্র। ১৮৬০-এ পাঁচটি এবং ১৮৬১-তে ৪টি, দুয়ে মিলে ২৬ বছরে নয়টি নাট্য ও কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ নিশ্চয়ই কৌতুকের বিষয় নয়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুকুমার সেনের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য “উল্কার জীবনে উদয়-অস্ত, তাহার দীপ্তিতে হাস-বৃদ্ধি নাই...মধুসূদনের মত প্রচণ্ড potential প্রতিভা আমাদের দেশের কেন, যে কোন দেশের ইতিহাসে সুদূর্লভ। মধুসূদন যে প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তাহার সম্ভাবনা যেমন বিরূপ ছিল পরিণতি তেমন ফলবান হয় নাই।”

(ক) প্রকাশিত গ্রন্থাবলি : মাইকেল মধুসূদন দত্ত নাট্যকার হিসেবেই প্রথম বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে পদার্পণ করেন। রামনারায়ণ তর্করত্ন বিরচিত ‘রত্নাবলী’ নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি বাংলা নাট্যসাহিত্যে উপযুক্ত নাটকের অভাব বোধ করেন। এই অভাব পূরণের লক্ষ্য নিয়েই তিনি নাটক লেখায় আগ্রহী হয়েছিলেন। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি রচনা করেন ‘শর্মিষ্ঠা’ নাটক। এটিই প্রকৃত অর্থে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মৌলিক নাটক। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি রচনা করেন দুটি প্রহসন, যথা ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ এবং ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রৌ’ এবং পূর্ণাঙ্গ ‘পদ্মাবতী’ নাটক। পদ্মাবতী নাটকেই তিনি প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি অমিত্রাক্ষরে লেখেন ‘তিলোত্তমাসম্ভব’ কাব্য। এরপর একে একে রচিত হয় ‘মেঘনাদ বধ কাব্য’ (১৮৬১) নামে মহাকাব্য, ‘ব্রজাঙ্গনা’ কাব্য (১৮৬১), ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটক (১৮৬১), ‘বীরাঙ্গনা’ কাব্য (১৮৬২), চতুর্দশপদী কবিতা (১৮৬৬), হেষ্টিবধ (১৮৭১), মায়াকানন (মৃত্যুর পরে প্রকাশিত ১৮৭৪)

এছাড়াও মধুসূদনের কিছু অসম্পূর্ণ বাংলা রচনাবলি পাওয়া যায়—(১) বীরাঙ্গনা কাব্য (২য় ভাগ) (২) ব্রজাঙ্গনা কাব্য (২য় ভাগ) (৩) সিংহল বিজয় কাব্য (৪) পাণ্ডব বিজয় কাব্য (৫) সুভদ্রাহরণ কাব্য (৬) দ্রৌপদী স্বয়ম্বর কাব্য (৭) মৎস্যগন্ধা (কাব্য) (৮) বিষ না ধনুর্গুণ (নাটক) (৯) নীতিমূলক কবিতাবলী (১০) রিজিয়া (নাট্যকাব্য) (১১) বিবিধ কবিতাবলী।

মধুসূদনের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যচর্চার কিছু অপূর্ব নমুনা বর্তমান—১) Captive Ladie (Poetry) and Visions of Past (Poetry) (1849) ২) Rizia : Empress of India (Drama) (1849) ৩) The Anglo-Saxon and the Hindu (1854) ৪) Ratnavali (1858) (Drama : translated from the Bengali) ৫) Sermistha (1859) (Drama : Author's translation of his Sermistha) ৬) Tilottoma (Poem, Incomplete) ৭) Queen Sita (Poem, Incomplete) ৮) Upsori (Poem, Incomplete) ৯) Miscellaneous Poem ১০) Letters ১১) Nil Durpan (The Indigo Planting Mirror, A Drama Translated from the Bengali/By A Native with Introduction by Rev. j. Long (1861)

৬.১.১.৪ : মেঘনাদবধ কাব্যের প্রাগ্ভাষ

‘মেঘনাদবধ কাব্য’ মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা দ্বিতীয় কাব্য। বাংলা কাব্য-সাহিত্যের আধুনিক ইতিহাসের এটি অন্যতম কীর্তিস্তম্ভ। ১৮৬১ সালে ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এর প্রথম খণ্ড (১-৫ সর্গ) ১৮৬১ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হলে বাংলা কাব্যের যথার্থ নবযুগ আরম্ভ হল। দ্বিতীয় খণ্ড (৬-৯ সর্গ) প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালের মাঝামাঝি। এ কাব্যের প্রথম সম্পাদনা করেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (আশ্বিন ১২৭৪, ১৮৬৭ সাল)। উনিশ শতকীয় নতুন মূল্যবোধের প্রেরণায় রামায়ণ কাহিনিকে নতুন করে মধুসূদন রূপ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্মরণ করেও বলা যায় ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ বাঙালির নবজাগরণের অন্যতম কীর্তিস্থাপনের প্রথম ধাপ। সেজন্যই এ কাব্যপ্রকাশিত হবার প্রায় দেড় বছর পরও নানাকারণেই বাংলার পাঠক-সমালোচকেরা অবহেলা করতে পারেন নি। এই দেড়শ বছর নানা ভঙ্গি ও পদ্ধতিতে মেঘনাদবধের মূল্যবিচারের চেষ্টা হয়েছে এবং বিচিত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বিবিধার্থসংগ্রহের কালীপ্রসন্ন সিংহ, সোমপ্রকাশের দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ এবং রাজনারায়ণ বসু মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সমালোচক।

মেঘনাদবধ কাব্যের মূল আখ্যায়িকা রামায়ণ থেকে গৃহীত হয়েছে। রামানুজ লক্ষণ কর্তৃক রাবণ পুত্র মেঘনাদের নিধনই হল এর মূল বর্ণিতব্য বিষয়। প্রাচ্যের এই বিষয়বস্তু বর্ণনার জন্য বহু গ্রন্থপাঠী মধু পাশ্চাত্যের বহু কাব্য থেকে নানা উপকরণ আহরণ করে বাংলা সাহিত্যে এক যুগান্তর সৃষ্টি করেছেন। হোমারের ইলিয়াড, দান্তের ডিভাইনা, কমেডিয়া, টাসোর জেরুজালেম ডেলিভার্ড, মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট, বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরামের মহাভারত, কালিদাসের কুমারসম্ভব প্রভৃতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে গ্রন্থের ভাবকল্পনা ও বিষয়বস্তু সাহায্যে অবলম্বনে ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ এর সৌন্দর্য সাধিত হয়েছে। এতে তাঁর কাব্যের মৌলিকত্ব এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি বরং বৃদ্ধি হয়েছে। কাব্য, নাটক প্রভৃতিতে প্রথাগত পদ্ধতিতে নান্দী, স্তুতি বা মঙ্গলাচরণের পর যেভাবে গ্রন্থ আরম্ভ হয়, সেই রীতি পরিত্যাগ করে এই কাব্যে প্রথমেই বীণাপাণির বন্দনা-গীতি গেয়েছেন। এখানে গ্রীক কবি হোমার, ইতালীয় কবি ভার্জিল ও ইংরেজ কবি মিলটনের প্রভাব সুন্দররূপে দৃষ্ট হয়।

রামায়ণের কাহিনি অবলম্বন করে রচিত হলেও ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ এ অনেক নতুনত্ব বর্তমান। রামচন্দ্রসহ রঘুকুলের প্রতি সহানুভূতি এবং রাক্ষসদিগের প্রতি বিরাগ উদ্রেক করাই ছিল রামায়ণের কবিগণের উদ্দেশ্য। কিন্তু মধুসূদন ‘মেঘনাদবধ’ এ এই চিরপুরাতন আদর্শ পরিত্যাগ করে রাক্ষসদিগের প্রতি সহানুভূতিসহ অনুকম্পা

প্রদর্শন করেছেন। কবির বর্ণনাগুণেও আমরাও রাক্ষস পরিবারের জন্য অশ্রুমোচন না করে পারি না। রাক্ষস পরিবারে স্বজাতিপ্রেমে আমরা মুগ্ধ হই। রাক্ষসগণ বীরত্বে, গৌরবে, ঐশ্বর্যে ও সৌন্দর্যে সাধারণ মানুষের থেকে শ্রেষ্ঠ হলেও, তারাও মানুষ, মানবত্ব আরোপিত তাদের চরিত্রে। দেবগণের পূজা, যজ্ঞ আচার-আচরণ সবই পালন করেন। এমনকি রাক্ষস কুলবধু স্বামীপুত্রের কল্যাণের জন্য শিবারাধনা করেন এবং সতী পতির সঙ্গে সহমৃত্যু হন। মধুসূদন রাক্ষসকুলকে এভাবেই মানবত্বের না করে মানবজাতিরই এক অংশ করে এঁকেছেন। কবির নিজের স্বদেশপ্রেমের প্রতিফলন ঘটেছে রাক্ষসকুলের সমবেদনায়। রাম-রাবণের যুদ্ধে রাম পরবাসী হয়ে রাবণের লঙ্কায় প্রবেশ করে। সেখানে নিজের মাতৃভূমিকে সুরক্ষার জন্য তাদের যে প্রাণপণ লড়াই এবং শেষে পরাজয়। এই চিত্রকে তিনি ইংরেজ আক্রান্ত ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির সঙ্গে সাদৃশ্য করেছেন। লঙ্কার বীরবধুগণ যখন বৈধব্যবেশে ভূষিত, ঠিক সেইসময় জাতির রাজার চিত্রটিও খুব তাৎপর্যপূর্ণ—‘ধুতরার মালা যেন ধূজ্জটীর গলে’। আসলে রাবণ ও মেঘনাদ, বীরবাহু প্রমুখ বীরগণের স্বদেশরক্ষার জন্য আত্মত্যাগ পরাধীন এবং পরবাসে অভিজ্ঞ কবি মধুসূদন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না করে পারেননি।

মেঘনাদবধ কাব্য করুণরস-প্রধান। যদিও কবি কাব্যের প্রথমেই বলেছেন ‘গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত’, তা সত্ত্বেও কাব্যের অদ্যপান্ত বিচার করলেই দেখা যায় করুণরসই প্রধান, স্থানে স্থানে বীররসই উৎসারিত হয়েছে মাত্র। সমগ্র কাব্যে এক সুকরুণ সুর ধ্বনিত হয়ে কাব্যটিকে অপূর্ব মাধুর্যে মণ্ডিত করেছে। ক্রৌঞ্চবধুর ক্রন্দন আদি কবি বাস্তবিকর হৃদয়বীণায় যেমন করুণ রসের স্রোতধারার সৃষ্টি করেছিল, ঠিক তেমনভাবেই মধুসূদনের হৃদয়তন্ত্র ও ভগ্নহৃদয় দশানন এবং পুত্রশোকাতুর মন্দোদরীর বিলাপে যে করুণসুরের বাজার উঠেছিল, রক্ষোদরার সংগ্রামের বিশ্ববধিরকারী রুদ্রনাদও সেই করুণসুরকে অতিক্রম করতে পারে নাই। মেঘনাদকে বরণকালে রাবণের উচ্ছ্বাস, সীতা-সরমার কথোপকথন, লক্ষ্মণের শক্তিশেলের রামের বিলাপ প্রভৃতি সকল উৎকৃষ্ট অংশেই করুণরস প্রাধান্য লাভ করেছে। কাব্যের আরম্ভ হয়েছে রাবণের বীরবাহুর মৃত্যুতে করুণ বিলাপে এবং পরিসমাপ্তি ঘটেছে মেঘনাদের মৃত্যুতে প্রমলীলার সহমরণ ও রাবণের করুণ মর্মভেদী আতর্নাদে। পরাজয়ের কারণেই সমগ্র ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ এর বিষয়বস্তু এবং কাব্যে বর্ণিত ঘটনাপরম্পার কেন্দ্রস্বরূপ।

মেঘনাদবধ কাব্য-এ মধুসূদনের উদ্ভাবিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের পূর্ণ পরিণতি—ঐশ্বর্য ও মাধুর্য দেখে সকলেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত। সত্যিই ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ এ অমিত্রাক্ষর ছন্দের বাহনে করুণ সুর এবং বীরোচিত ভাব উভয়ই অতি চমৎকারভাবে উৎসারিত হয়েছে। পয়ারের বেড়ি ভেঙে মধুসূদন যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করেছিলেন, সে বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। জানতেন কাব্যের বাহন হল ছন্দ; এর স্বাভাবিক বিকাশের জন্য চাই শৃঙ্খলমুক্তি। বাঙালির স্বাভাবিক বাগরীতির বিষয়ে তিনি যথেষ্ট শক্ত বা উপযুক্ত নয় তা তিনি জানতেন। ফলে তিনি বহুবার বহুজনকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ বিষয়ে মনযোগী করার চেষ্টা করেছেন। পরবর্তী ছন্দ-ধারায় মধুসূদনের প্রভাব অপরিসীম। তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দের হাত ধরেই গৈরিশ ছন্দের আবির্ভাব। তাঁর পূর্বে কলাবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত রীতির ব্যবহার বাংলায় ছিল না। তিনি সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য হিসাবে মিশ্রবৃত্তকেই কাব্যের বাহন হিসাবে গ্রহণ করেছেন। পরবর্তীকালে মিশ্রবৃত্তের সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার উৎস হিসাবে কবি মধুসূদনকেই ধরা হয়। যদিও ভারতী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেঘনাদবধের বিরোধী সমালোচনাকে তিনি নিজেই ‘অল্পবয়সে স্বর্ধাভরে... কাঁচা সমালোচনা’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। সেই সমালোচনারও একটা দিক ছিল ছন্দ। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

‘সাহিত্যরূপ’ প্রবন্ধে বলেছেন—“আধুনিক বাংলা কাব্য সাহিত্য শুরু হয়েছে মধুসূদন দত্ত থেকে। তিনি প্রথম ভাঙনের এবং সেই ভাঙনের ভূমিকার উপরে গড়নের কাজে লেগেছিলেন খুব সাহসের সঙ্গে...একথা সত্য, বাংলা সাহিত্যে মেঘনাদবধ কাব্য তার দোহার পেল না। সম্পূর্ণ একলা রয়ে গেল। অর্থাৎ মাইকেল বাংলা ভাষায় এমন একটি পথ খুলেছিলেন, যে পথে কেবলমাত্র তাঁরই একটি মাত্র মহাকাব্যের রথ চলেছিল। তিনি বাংলা ভাষায় স্বভাবকে মেনে চলেননি।” আর এখানেই মাইকেলের স্বাভাবিকতা এবং অভিনবত্ব।

৬.১.১.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

- ১। মাইকেল মধুসূদন দত্ত কোন সালে জন্মগ্রহণ করেন?
- ২। মধুসূদনের ব্যক্তিজীবন সংক্ষেপে লেখো।
- ৩। মধুসূদনের কবিমানস সম্পর্কিত একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা করো।
- ৪। মেঘনাদবধ কাব্য রচনার প্রেক্ষাপটটি নিজের ভাষায় লেখো।
- ৫। মেঘনাদবধ কাব্যটিতে মোট কটি সর্গ বর্তমান? সর্গগুলির নাম লেখো।
- ৬। মেঘনাদ কাব্যটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
- ৭। কাব্যটির ভূমিকা কে লেখেন?

৬.১.১.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

- ১। কবি শ্রী মধুসূদন—মোহিতলাল মজুমদার
- ২। মেঘনাদবধ কাব্যচর্চা—উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (সম্পাদিত)
- ৩। মধুসূদনের কবি আত্মা ও কাব্য শিল্প—ক্ষেত্র গুপ্ত
- ৪। মধুসূদন কবি ও নাট্যকার—সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
- ৫। মাইকেল মধুসূদন—প্রমথনাথ বিশী
- ৬। ঈশ্বর গুপ্ত রচিত কবিজীবনী—ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত
- ৭। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত—যোগীন্দ্রনাথ বসু

পর্যায় গ্রন্থ-১

মেঘনাদবধ কাব্য

একক-২

চতুর্থ সর্গ

বিন্যাস ক্রম :

৬.১.২.১	:	ভূমিকা
৬.১.২.২	:	কথাবস্তু
৬.১.২.৩	:	চতুর্থ সর্গের প্রয়োজনীয়তা
৬.১.২.৪	:	কাব্যসৌন্দর্য
৬.১.২.৫	:	আদর্শ প্রশ্নাবলি
৬.১.১.৬	:	সহায়ক গ্রন্থাবলি

৬.১.২.১ : ভূমিকা

মেঘনাদবধ কাব্যের নয়টি সর্গের মধ্যে কবি সুকৌশলে লক্ষ্যযুদ্ধের তিনদিন ও দুই রাত্রির ঘটনা গ্রথিত করেছেন। কাব্যের বিষয় প্রধানত লক্ষ্মণের হাতে বীরশ্রেষ্ঠ মেঘনাদের নিধন। কাব্যের সূচনা পুত্র বীরবাহুর যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর কথা শুনে রাবণ এবং বীরবাহু জননী চিত্রাঙ্গদার শোকপ্রকাশের মধ্য দিয়ে। শেষ মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে শোকাক্ত রাবণের লক্ষাপুরীতে ফিরে আসায়। কাহিনির মূল গঠন প্রধান ঘটনা, বাণ্মীকির রামায়ণ থেকেই গৃহীত। তবে মাঝে মাঝে নতুন চরিত্র এবং ঘটনা সংযোজিত হয়েছে। এতে অবশ্য মূল বিষয়ের গতি বা কাব্যসৌন্দর্য নষ্ট হয়নি এবং মেঘনাদের নিধন ব্যাপারটি আরও তাৎপর্য মণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

সর্গের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রেখে কবি প্রত্যেকটি সর্গের নামকরণ করেছেন। সর্গগুলির কবিপ্রদত্ত নামগুলি হল যথাক্রমে—অভিষেক, অস্ত্রলাভ, সমাগম, অশোকবন, উদ্যোগ, বধ, শক্তনির্ভেদ, প্রেতপুরী, সংক্রিয়া।

৬.১.২.২ : কথাবস্তু

সর্গারম্ভে নমস্ক্রিয়া ও আশীর্বাদ প্রার্থনাকে মহাকাব্যের অন্যতম শর্ত হিসাবে নির্ধারণ করেছিলেন বিশ্বনাথ কবিরাজ। চতুর্থ সর্গে ‘সাহিত্যদর্পণ’ কাব্যের এই শর্তটি মধুসূদন পালন করেছেন সহর্ষে। এর কারণ এ সর্গে তিনি

সরাসরি অনুসরণ করেছেন বাঙ্গালীকে। বাঙ্গালীকে অনুসরণ করেই ভবভূতি রচনা করেছিলেন ‘উত্তরচরিতম্’ ও ‘বীরচরিতম্’ নাটক, ভর্তৃহরি রচনা করেছিলেন রামচরিতাম্ভক ভট্টিকাব্য, কালিদাস লিখেছিলেন ‘রঘুবংশম্’ এবং বাংলায় কৃত্তিবাস রচনা করেছিলেন অনুবাদাত্মক রাম-পাঁচালি। কবির বিশ্বাস, বাঙ্গালীকি দয়া না করলে এই সব কবিদের এইসব কবিদের পাশাপাশি কাব্যবিশ্বে তিনি ‘নূতন মালা’ গাঁথতে পারবেন না। লক্ষণীয়, এই বাঙ্গালীকি-বন্দনায় পরোক্ষ কবি স্বীকার করে নিলেন যে এ-সর্গ রচনায় তিনি রসদ সংগ্রহ করবেন বাঙ্গালীকি থেকেই। অর্থাৎ মাইকেল এখানে নিঃশেষে মগ্ন ভারতীয় ঐতিহ্যে।—সর্গটির নাম ‘অশোকবন’, এই নাম-শব্দটিও বাঙ্গালীকিরই উদ্ভাবিত। কোন কথাবস্তুতে প্রতিফলিত করতে আদিকবি উদ্ভাবিত ও নামশব্দে সর্গের নামকরণ করলেন মধুসূদন এবং সে-নাম কতদূর শিল্প সার্থক হল। তা পর্যালোচনা করতে আমরা প্রথমে দেখে নেব এ সর্গে কথাবস্তুর সমায়োজন।

অশোকবনে বন্দিনী সীতার সঙ্গে বিভীষণ পত্নী সরমার মধুর কথোপকথন চতুর্থ সর্গে পরিবেশিত হয়েছে। মেঘনাদ সেনাপতিত্বে বৃত্ত হয়েছেন, সমস্ত লঙ্কাপুরী আজ উৎসব মুখরিত। ভীষণ চেড়ীর দল সীতাকে একাকিনী অবস্থায় এই অশোকবনে রেখে উৎসবে যোগ দিতে গেছে। এই অবকাশে সরমা এসে বসলেন সীতার পায়ে তলায় এবং সীতার কাছ থেকেই শুনতে চাইলেন তাঁর অপহরণ বৃত্তান্ত। রাক্ষসাদিপতি রাবণ পঞ্চবটী বন থেকে কেমন ভাবে সীতাকে অপহরণ করে লঙ্কায় নিয়ে এলেন, সরমার কাছে সীতা সেই বৃত্তান্ত প্রথম থেকে শেষ অবধি প্রকাশ করলেন। চতুর্থ সর্গের সীতা-সরমা সংবাদ অবশ্যই ‘মেঘনাদবধ’ এর মূল ঘটনা প্রবাহের অন্তর্গত নয়। একে বলতে পারি শাখা কাহিনি। এই শাখা কাহিনির মধ্য দিয়েই কবি চমৎকারভাবে অনেকগুলি অতীত ও ভবিষ্যত ঘটনার ওপর আলো ফেলেছেন।

৬.১.২.৩ : চতুর্থ সর্গের প্রয়োজনীয়তা

সাহিত্যিক মহাকাব্য রূপে মেঘনাদবধ কাব্যের উচ্চতার শিখর গগনস্পর্শী। নয়টি সর্গের কথাবস্তুতে তিনি রামায়ণের রাম-রাবণের যুদ্ধকে নতুন করে উজ্জীবিত করেছেন। পৌরাণিক রসের প্রথাগত পরিণতির পরিবর্তে তিনি রাক্ষসকুলের গর্ব মেঘনাদের বধের ঘটনাটিকে অধিক তাৎপর্যপূর্ণ করেছেন, যা কিনা করুণরসের আকর রূপে গঠন করেছে। কিন্তু বীররসের মহাকাব্যে চতুর্থ সর্গটি একমাত্র শান্তরসের সর্গ, সেক্ষেত্রে এই সর্গটির গুরুত্ব কতখানি। এ প্রসঙ্গে মধুসূদন রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন “I showed your letter in which you say that you prefer the I and IV Book to the rest, to a friend. He said your silence about Promila’s entry into Lanka in the III Book surprised him. The silly fellow went on to say that episode roused him like the clang of a martial trumpet!”****

মেঘনাদবধের চতুর্থ সর্গে মধুসূদনের কবি আত্মার পূর্ণ জাগরণ কী করে ঘটল তা রহস্যাবৃত। সীতার প্রতি কবিচিন্তের দুর্বলতার ফলে এ সাফল্য এসেছে বলে সমালোচকগণ মনে করে থাকেন। সীতা চরিত্রটি চিত্রণের ক্ষেত্রে কবিচিন্তের কোমলতা ছিল এটা ঠিকই কিন্তু এটাই একমাত্র কারণ বলে সবশেষ হয়ে যায় না। মধুসূদনের বাঙালিয়ানাংকও অনেকে এর কারণ বলে নির্দেশ করতে চেয়েছেন, এই সঙ্গেই প্রশ্ন আসে তাহলে অন্য কোনো সর্গের ক্ষেত্রে সেটি দেখা যায়নি কেন? এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নিতেই আমাদের আলোচ্য সর্গটি গুরুত্ব বিচার করব।

মধুসূদনের শিল্পবোধে একটা সুসামঞ্জস্য ছিল। অন্তত মেঘনাদবধ কাব্যের বহু অংশে এই সিদ্ধি অনাবৃতভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে। বিদ্রোহী কাব্য-সংস্কারের বাসনা, ব্যক্তিগত জিগীষাবৃত্তি শিল্পচেতনাকে আদৌ আচ্ছন্ন করতে পারেনি, তার প্রমাণ এ কাব্যে অজস্র ছড়িয়ে আছে। চতুর্থ সর্গে কবি আপন আত্মস্বরূপ রাবণকে ধিকৃত করেছেন, কিন্তু রাম-বিভীষণের মত মানুষের মুখে যে ভৎসনা তাকে স্বয়ং কবি সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখেননি। শিল্পসৃষ্টি হিসাবে সেই ভৎসনা শত্রুর ক্রোধ-ক্ষোভের প্রকাশ মাত্র হয়ে আছে। কিন্তু রাবণের দ্বারা অপহৃত সীতার প্রতি কবির সুকোমল ও গভীর সহানুভূতি রাবণকাহিনির অন্য একটি দিক উন্মুক্ত করেছে। প্রথম সর্গে চিত্রাঙ্গদার মৃদু গুঞ্জে যে যবনিকা দুলাছিল, সীতার বিবরণে তা উন্মোচিত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে শিল্পী মধুসূদনের জীবনজিজ্ঞাসার একটা গভীরতার দিক প্রকাশিত হয়েছে। মধুসূদনের কবিচিন্তের অন্তরে আত্মপ্রসারণ ও আত্মপ্রতিফলন সত্ত্বেও তিনি কাব্যরচনায় অদ্ভুত এক নৈবর্ত্তিক মন ছিল। প্রত্যক্ষ ক্লাসিক পদ্ধতির চিত্রাঙ্কনে এই ভাববীজের অপ্রত্যক্ষ প্রকাশ বারবার ঘটলেও সীতাকাহিনির পরিকল্পনাকেন্দ্রে ও রূপায়ণসাফল্যে সেই বীজটি প্রকাশিত হয়েছে বলেই মনে হয়।

সম্ভবত সীতাকাহিনির উপস্থাপনার পিছনে কবির সচেতন উদ্দেশ্যে ছিল তিনটি। প্রথমত, সীতাহরণ-কাহিনিটি বিবৃত করা। বীরবাত্তর মৃত্যু, ইন্দ্রজিতের সৈন্যপতন সব কিছুর পিছনে ঘটনার দিক থেকে যে মূল কারণটি বিদ্যমান সেই সীতাহরণ এই সর্গে কৌশলে বিবৃত হয়েছে। উপরন্তু সীতাহরণের পর থেকে লঙ্কায়ুদ্ধ আরম্ভ হওয়া পর্যন্তও সীতার স্বপ্নবিবরণের মধ্যে স্থানলাভ করেছে।

দ্বিতীয়ত, রসসৌন্দর্যে বৈচিত্র্য সাধনের চেষ্টা। মোহিতলাল ঠিকই বলেছেন যে, সমগ্র মেঘনাদবধের রথরথী— অশ্ব-গজে কম্পিত মেদিনীতে জন্ম-মৃত্যু-যুদ্ধ-হাহাকারের মধ্যে এই চতুর্থ সর্গে একটি কোমল শান্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এখানে ক্রন্দন আছে, কিন্তু অগ্নিস্রাবী বিশ্ববিদারী আতর্নাদ নেই, এখানে ক্রোধের কারণ আছে কিন্তু ক্রোধ নেই, বীরত্বের বর্ণনা আছে কিন্তু বীররসের প্রাধান্য নেই। এখানে প্রকৃতি মধুবর্ষী, রুদ্রডম্বরর তালে তালে বসে নৃত্য করে নি। এই রসবৈচিত্র্য-সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্তমান সর্গে সম্পূর্ণ সফল হয়েছে।

তৃতীয়ত, রাবণের পাপকে লুকিয়ে রেখে তার মহিমায় ট্রাজেডি অঙ্কন না করে—পাপের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে তার চরিত্র গৌরবের প্রতিষ্ঠা।

তৃতীয় সর্গ রচনার পর চতুর্থ সর্গের এইরূপ সৃজনের পিছনে শুধু স্বাভাবিক নয়, আছে শিল্পবোধের নৈপুণ্য যা গভীরভাবে এই সর্গের কেন্দ্রীয় নারীচরিত্রসহ সমগ্র সর্গের মধ্যে নারীচরিত্রগুলির ভাব ও বোধের ক্ষেত্রে এক বৈচিত্র্যের সুর জাগ্রত করেছে।

৬.১.২.৪ : কাব্যসৌন্দর্য

“সোনার তরী” কাব্যের ‘পুরস্কার’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কবির ধর্ম ও অভিপ্রায় কী, তা চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন। কবি জানিয়েছেন,

...শুধু বাঁশিখানি হাতে দাও তুলি,

বাজাই বসিয়া প্রাণমন খুলি,
 পুষ্পের মতো সংগীতগুলি
 ফুটাই আকাশভালে।
 অন্তর হতে আহরি বচন
 আনন্দলোক করি বিরচন,
 গীতরসধারা করি সিঞ্চন
 সংসার ধূলিজালে।...

এই আনন্দবাদই কাব্যের শেষ লক্ষ্য কিনা সে বিষয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে। তবে কবিতাপাঠে আমরা সবাই সৌন্দর্যস্বরূপ আনন্দাবেগে আন্মুত হই। কবি আমাদের সামনে সৌন্দর্যের জগৎ উন্মোচিত করে তাকে মূর্ত করতে উন্মুখ। ‘তোমায় চেয়ে বসে আছি পথের ধারে, সুন্দর হে’—এই আকুলতা যেমন প্রেমিকের, তেমনি কবিরও।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত কি সৌন্দর্যের পূজারী? তিনি কি রোমান্টিক? এমন প্রশ্নের সামনে আমরা স্বাভাবিকভাবে একটু থমকে যাই কারণ ক্লাসিক কবি শ্রীমধুসূদনের স্বীকারোক্তি—একজন গ্রীকের মতো তিনি লিখতে চান। তাই গীতিকাব্যের বদলে বেছে নেন মহাকাব্য। এইজন্যই তিনি বাঙালির কাছে মহাকবি মধুসূদন দত্ত। তবু সনেট বা ওড কিংবা খণ্ডকবিতা রচয়িতা মধুকবির এটাই তার শেষ পরিচয় নয়। সেরকমই তাঁর মেঘনাদবধ কাব্যও শুধুই এপিকের গাভীরে গড়া ভাস্কর্যমাত্র হয়নি। নয়টি সর্গে গড়া এই মহাকাব্যেরও কয়েকটি সর্গে আছে অশ্রুজলের রোমান্টিক লিরিকের স্পর্শ। স্বপ্ন সুন্দরের বেশে রোমান্টিক কবিকে শান্তির আশ্রয় দেয় আর সেই স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় কবি আত্ননাদ করে ওঠে—I fall upn the thorns of life. I bleed. কবি শেলির মতো মধুকবির কণ্ঠেও সেই আর্তি শূনি—‘মজিনু বিফল তাপে অবরণ্যে বরি’। অন্যদিকে দৈবাহত শোকাক্ত রাবণ বলে

হায় ইচ্ছা করে,
 ছাড়িয়া কনকলঙ্কা, নিবিড় কাননে
 পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে!

এই স্বেচ্ছানির্বাসন ও আত্মবিলাপের মূলে আছে সৌন্দর্য জগৎ থেকে তাঁর বিচ্ছেদ। নঞর্থক ভঙ্গিতে রাবণ যা বলেছে, যা সেই সৌন্দর্যেরই ধ্যান—

কুসুমদাম সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
 উজ্জলিত নাট্যশালাসম রে আছিল
 এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে
 শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটি;

এই সুন্দরের সন্ধান মধুসূদন প্রথম করেছিলেন তাঁর ‘তিলোত্তমাসম্ভব’ কাব্যে। বিশ্বকর্মার অপরূপ সৃষ্টি তিলোত্তমা সৌন্দর্যের সারাৎসার—যাকে পেতে সুন্দ-উপসুন্দ দুই দৈত্য ভ্রাতৃত্ব ভুলে পরস্পরকে সংহারে ব্যস্ত। যে সুন্দরের আদর্শ, মহৎ সে চিরকালই অধরা থেকে যায়। তাকে গৃহবন্দী বা তালুবন্দী করা যায় না। পুরাণে

যেমন তা সত্য, বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলায় তেমনি তা সত্য। নবকুমারও ব্যর্থ হয়েছে পরম সৌন্দর্যকে মৃন্ময়ী করতে। আসলে তিলোত্তমা শুধু সৌন্দর্য প্রতিমা, কামনার ধন নয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী থেকে একালের শিশিরকুমার দাস পর্যন্ত সকলেই মনে করেন—এই প্রথম শুরু হলো সুন্দরের সন্ধান এবং ‘আদর্শ সুন্দরের জন্য দ্বিমুখী শক্তির দ্বন্দ্ব’। আমরা ‘মেঘনাদবধ কাব্যে’ এ ধরনের কোনো মানস সুন্দরীর বন্দনা পাই না। কবির সৌন্দর্য পিপাসা কিংবা সুন্দর অন্বেষণে এক্ষেত্রে ঠিক তাত্ত্বিকভাবে প্রকাশিত হয়নি। এ প্রসঙ্গে ড. শিশিরকুমার দাশের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য— “বাংলাদেশের রোমান্টিক আন্দোলনের নায়ক মধুসূদন। যে অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য জাতির চিত্তকে আচ্ছন্ন করেছিল, তারই প্রকাশ সেখানে। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব সেদিনের সাহিত্য চিন্তায়, দর্শনে, সমাজভঙ্গীতে দেখা দিয়েছিল—আধুনিক কাল পর্যন্ত সে ধারাই চলেছে। সেই ব্যক্তিত্ব খুঁজছে সুন্দরকে, রহস্যময়কে, ঐশ্বর্যকে, রাবণের মতো elemental শক্তিকে।” (মধুসূদনের কবিমানস)

জীবনটাকে সুন্দর ও সাবলীল করতে মধুসূদন চেয়েছিলেন প্রচুর অর্থ ও যশ, দুইই পেয়েছিলেন। তবু তার অন্তহীন প্রত্যাশার সঙ্গে কখনোই মেলবন্ধন ঘটেনি। ফলে আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাব বারংবার বোধ করে পীড়িত হয়েছেন। মধুকবির সেই ভাঙা স্বপ্নগুলিই তাঁর কাব্যে সৌন্দর্য আর ঐশ্বর্য হয়ে উঠেছে। বাস্তবে যা পাননি, সাহিত্যে তাকেই চরম প্রাপ্তিতে নিয়ে গেছেন। যার নিদর্শন দেখে মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গ থেকেই আমরা বিস্মিত ও ব্যাগ্র হয়ে উঠি—

১. কনক আসনে বসে দশানন বলী

হেমকূট

২. ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা,

পদ্মরাগ, মরকত হীরা।

হৈম শিরে শৃঙ্গবর যথা

তেজঃপুঞ্জ।

মেঘনাদবধ কাব্যের বিষয় রামায়ণ থেকে আহরিত হলেও তা মধুসূদনের অপূর্বনির্মাণ প্রতিভায় শুধু মহাকাব্য নয়, যুগোচিত মহাকাব্য হয়ে উঠেছে। আপাতদৃষ্টিতে মেঘনাদ হত্যায় ইন্দ্রের আগ্রহ এবং রাম লক্ষ্মণের উদ্যোগেই এই কাব্যে প্রাধান্য পেয়েছে। কবি সেক্ষেত্রে রাম নয়, রাবণকে বরণীয় মনে করেছেন। তাঁর কাছে একজন দেশবৈরী, অন্যজন দেশপ্রেমিক; কিন্তু ভাগ্যহত। যেমন মধুসূদন নিজে নিয়তি লাঞ্চিত পুরুষ। তাঁর নিজ সন্তাই মেঘনাদ, সে দৈব বা ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করতে চায় কিন্তু তাকেও অকালে অন্যায় ষড়যন্ত্রে মারা যেতে হয়। মধুসূদনের ‘ফেভারিট হীরো’ কে মারার পরামর্শ বা আয়োজন যেখানে ঘটেছে, সেখানে কবি অকরণ হতে পারেননি—

অস্ত্রে গোলা দিনমণি; আইলা গোধূলি,-

একটি রতনভালে। ফুটিলা কুমুদী;

মুদীলা সরসে আঁখি বিরসবদনা

নলিনী; কুজনি পাখি পশিল কুলায়ে;

এখানেও আছে সৌন্দর্য দর্শন। শুধু রাজপুরী, স্বর্গপুরী, প্রকৃতি বর্ণনা নয় বীরমূর্তি, এমনকি বীরঙ্গনা মূর্তিতেও তাঁর সৌন্দর্যজ্ঞান অসাধারণ। প্রমীলা মূর্তি তারই দৃষ্টান্ত—

রোষে লাজ-ভয় ত্যাজি, সাজে তেজস্বিনী
প্রমীলা, কিরীট ছটা কবরী-উপারি,
হায় রে, শোভিল যথা কাদম্বরী শিরে
ইন্দ্রচাপ।

চতুর্থ সর্গে মধুসূদনের এই কবি আত্মার সৌন্দর্যরূপের যথার্থ জাগরণ ঘটেছে। শিল্পসার্থকতা অনন্য। এই জাগরণের কারণ পূর্বেই ব্যক্ত করা হয়েছে। তার স্বরূপ লক্ষণের কিছু পরিচয় দেওয়া যাক।

পূর্ববর্তী সর্গে বীরঙ্গনা রূপে যদি আমরা চমকিত, ভীত হই, তবে চতুর্থ সর্গে শোকবর্ষিতা সীতার বিষাদিনীরূপে আমরা অন্য এক সৌন্দর্যের আভাস পাই—

মলিন-বদনা দেবী, হায় রে, যেমতি
খনির তিমির গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌরকর রাশি যথা) সূর্যকান্ত মণি
কিন্মা বিশ্বাধরা রমা অম্বুরাশি তলে!

মধুকবির বাঙালিয়ানা তাঁর সৌন্দর্য চেতনায় কতখানি মিশেছিল, তাও বোঝা যায় এই চতুর্থ সর্গে সীতা ও সরমার রূপ বর্ণনায়—

আহা মরি, সুবর্ণ দেউটী
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল উজলি
দশদিশ।

বনবাস রাজ্য সুখভোগ অপেক্ষা কত ভালো, তা সীতার “ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী তীরে” ইত্যাদি বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। আরণ্যক জীবনযাত্রায় অপূর্ব ছবি কবি এঁকেছেন, যা পড়তে গিয়ে শকুন্তলার কথা মনে পড়ে—

কুরঙ্গিনী-সঙ্গে সঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি!
নবলতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ
তরুসহ;

মধুসূদনের চিত্ররচনায় বর্ণ ও ঐশ্বর্যময় শোভাযাত্রার প্রাধান্য। রাজসিকতকায় তাঁর মনের তার বাঁধা, তুলির রঙেরও ঐ একই উৎস। কিন্তু সীতার অশোকনিবাসিনী মূর্তির যে চিত্র প্রকাশ পেয়েছে তা একেবারে ভিন্নজাতের। তাই চতুর্থ সর্গ পাঠশেষে পাঠকের মনে ও চোখ বিদ্ধ হয়ে থাকে সেই বিষাদময়ী, শোকাকুলা স্মৃতিভারমহুরাসীতার রূপ—‘একটি কুসুমমাত্র অরণ্যে যেমতি।’

সীতা চরিত্র অঙ্কনসহ সমগ্র চতুর্থ সর্গে ব্যবহৃত চিত্রকল্পগুলি কখনও প্রত্যক্ষ ভাষায়, কখনো উপমায় এমন এক মায়ালোক সৃষ্টি করেছে মধুসূদনের কবিকল্পনার দিক থেকে যায় অভিনবত্ব ও বিস্ময়কর—

‘হীন-প্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী’

যদিও হীনপ্রাণা হরিণী অপেক্ষা বাঘিনীর ত্রুদ্বীর্ঘ্যেই মধুসূদন চিরকাল অধিক আকর্ষণ বোধ করেছেন, সীতা রূপ হীনপ্রাণা হরিণী কবিকে মুগ্ধ করেছে। আবার যখন সরমাও সীতার কথোপকথনে উঠে আসে যে সখ্যতা তার চিত্রণে—

কৌটা খুলি, রক্ষোবধু যত্নে দিলা ফোঁটা
সীমন্তে; সিন্দুর-বিন্দু শোভিল ললাটে,
গোধূলি-ললাটে, আহা! তারা—রত্ন যথা!

এই চিত্রগুলির মধ্যে একটা পেলবতা, বিষণ্ণ একাকিত্ব, কচিৎ একটা সুদূরপ্রসারী স্বপ্ন ভেসে এসেছে। একটা সাদৃশ্য ভাব—পরিবেশ রাজসিক চেতনামত্ত মধুসূদনের রচনায় সার্থক হয়ে উঠল কী করে তা ভাববার মত। মধুসূদনের রাজসিকতার মধ্যে বিপুলকে চাইবার একটা প্রেরণা ছিল। সমস্ত ক্ষুদ্রের গণ্ডি ছাড়িয়ে, প্রাপ্তির অতীতলোকে পৌঁছে যাওয়া; এটাই ছিল তাঁর কামনা ও সাধনা। এইধরনের রাজসিকতা সাদৃশ্যিকতারই অপর পিঠ।

চতুর্থ সর্গে সীতা কাহিনির চারপাশে সাদৃশ্যিকতার যে একটা পূত পরিবেশ ব্যঞ্জিত হয়েছে। কবি আত্মার কতগুলি নিগূঢ় উপলব্ধি এই সূত্র ধরে চতুর্থ সর্গে প্রকাশিত হয়েছে। মধুসূদনের কাব্যে প্রকৃতির আমন্ত্রণ ঘটেছে বারবার। কোথাও উপমাদি প্রয়োজনে, কোথাও পরিবেশ রচনায়, কখনও মণ্ডনের উদ্দেশ্যে। তিলোত্তমায় প্রকৃতি-চিত্রণে রোমান্টিক সৌন্দর্যসৃষ্টি কতকাংশে প্রকাশিত হয়েছে। মেঘনাদবধে এবং অন্যত্র প্রকৃতির প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়নি। কিন্তু চতুর্দশপদীর কয়েকটি মাত্র কবিতায় উৎসমুখী কবি এই বোধ-কেন্দ্রে পৌঁছেছেন।

আখ্যানকাব্যে প্রকৃতি বর্ণনায় দুটি ভিন্ন রীতি প্রচলিত। এক। সুখদুঃখাদি মানবমনোভাবকে বহন করা। স্থান, ঋতু, প্রভাত-সন্ধ্যাদি কাল প্রভৃতির পরিবেশ সৃষ্টি। দুই। প্রকৃতির রূপমুগ্ধ বর্ণনা। প্রথমক্ষেত্রে প্রকৃতি প্রয়োজন সিদ্ধ করে। দ্বিতীয়ক্ষেত্রে কবির একটি বিশিষ্ট মুড ও সৌন্দর্যপ্রীতি প্রকৃতিকে আশ্রয় করে এমন একটা আশ্বাদের সৃষ্টি করে যা আখ্যানাংশের অধীন নয়। প্রথম রীতির পরিচয় মেঘনাদবধে বারবার আছে। চতুর্থ সর্গেও সীতার বিষণ্ণ একাকীত্বের ছায়ায় অশোককাননের শোকমুহমান চিত্র অঙ্কিত হয়েছে—

স্বনিছে পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া
উচ্ছ্বাসে বিলাসী যথা! লড়িছে বিষাদে
মর্মরিয়া পাতাকুল! বসেছে অরবে
শাখে পাখী! রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
তরুমূলে, যেন তরু, তাপি মনস্তাপে,
ফেলিয়াছে খুলি সাজ!

পঞ্চবটী বনে রাম-সীতার সুখের জীবনের সৌন্দর্যের আভাস পাওয়া যায় এখানে। কিন্তু তার প্রাণময়তা রূপাঙ্কনে কবি যখন সীতাকে দিয়ে স্বীকার করান—

ভুলিনু পূর্বের সুখ। রাজার নন্দিনী,
রঘুকুল-বধু আমি; কিন্তু এ কাননে,
পাইনু, সরমা সই, পরম পিরীতি!

তখন রাজনন্দিনীর পূর্ব সুখের কথা ভুলে যাওয়া প্রকৃতির সাহচর্যে, এর আর বড় স্বীকৃতি প্রকৃতির সৌন্দর্যের কী হতে পারে! মধুসূদনের কাব্যে এরূপ ভাবনা অদৃষ্টপূর্ব। নানাদিক থেকে তাই মনে হয় যে চতুর্থ সর্গের কল্পনার উৎসেই একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। সমগ্র কাব্যে পৌরাণিক চরিত্র, কাহিনি প্রায় সার্থশতবর্ষের প্রাপ্তে এসে কেমন জীবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে, আমরা তাই দেখি। এই প্রাণশক্তির মূলে হয়ত অনেক কিছুই আছে; কিন্তু কবির রোমান্টিকতা, সুন্দরের ধ্যান যে শেষপর্যন্ত বড়ো হয়ে উঠেছে, এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

৬.১.২.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

- ১। মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গের নাম কী?
- ২। চতুর্থ সর্গের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লেখো।
- ৩। কাব্যে চতুর্থ সর্গের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করো।
- ৪। মেঘনাদবধ কাব্যে চতুর্থ সর্গের গুরুত্ব নির্ণয় করো।
- ৫। মহাকাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে চতুর্থ সর্গের পরিকল্পনা কতদূর সার্থক বিবেচনা করো।

৬.১.২.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

- ১। কবি শ্রী মধুসূদন—মোহিতলাল মজুমদার।
- ২। মেঘনাদবধ কাব্যচর্চা—উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (সম্পাদিত)।
- ৩। মধুসূদনের কবি আত্মা ও কাব্যশিল্প—ক্ষেত্র গুপ্ত।
- ৪। মধুসূদন কবি ও নাট্যকার—সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত।
- ৫। মাইকেল মধুসূদন—প্রমথনাথ বিশী।
- ৬। ঈশ্বর গুপ্ত রচিত কবিজীবনী—ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত।
- ৭। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত—যোগীন্দ্রনাথ বসু।

পর্যায় গ্রন্থ-১

মেঘনাদবধ কাব্য

একক-৩

ষষ্ঠ সর্গ

বিন্যাস ক্রম :

৬.১.৩.১	:	বিষয়বস্তু
৬.১.৩.২	:	শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা
৬.১.৩.৩	:	Climax পর্ব
৬.১.৩.৪	:	বর্ণনার স্রোতের গতিমুখ
৬.১.৩.৫	:	মুখ্য ঘটনা
৬.১.৩.৬	:	মহাকাব্যিক বিস্তার
৬.১.৩.৭	:	উপযোগিতা
৬.১.৩.৮	:	আদর্শ প্রশ্নাবলি
৬.১.৩.৯	:	সহায়ক গ্রন্থাবলি

৬.১.৩.১ : বিষয়বস্তু

ষষ্ঠ সর্গের নাম ‘বধো’। এই পর্বে মেঘনাদকে বধ করা হয়। মায়াদেবীর বরে রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বিভীষণ সভা শিবিরে পৌঁছে দেয়। তাকে মায়াদেবী বর দিয়ে বলে যে, নিকুন্ডিলা যজ্ঞগারে আচমকা বাঘের মত আক্রমণ করে মেঘনাদকে হত্যা করতে। এবার রামের পরামর্শ চাইলে রাম বলে যে, সপবিবরে কী করে প্রাণাধিক লক্ষ্মণকে পাঠাবে। লক্ষ্মণ প্রশ্ন করে “নাহি কাজ মিত্রবর সীতায় উদ্ধারি”, কিন্তু রাম দৈব আশীর্বাদ পুষ্ট। অতএব তাঁর ভয়ের কারণ নেই। বিভীষণও তার সঙ্গে একমত হয়ে বলে, দেবতার আদেশ মানা কর্তব্য। আমিও লক্ষ্মণের সাথে যাব। তখন রাম লক্ষ্মণের মা সুমিত্রার কথা স্মরণ করে, যার অনুরোধ ছিল লক্ষ্মণকে রক্ষা করা। তাই রাম বলে, “নাহি কাজ, মিত্রবর, সীতায় উদ্ধারি।” সরস্বতী সহসা আবির্ভূত হয়ে ভবিষ্যত দেখায়। এবং বলে দেববাক্যে তার সন্দেহ থাকা উচিত নয়। এবার রাম রাজি হয়ে লক্ষ্মণকে প্রস্তুত করে এবং বিভীষণকে বলে, আমি ভিখারী রাঘব আমার অমূল্য রত্ন লক্ষ্মণকে আজ তোমার হাতে তুলে দিলাম। আমার জীবন তোমার হাতে। বিভীষণ-লক্ষ্মণ লঙ্কা যাত্রা করল।

৬.১.৩.২ : শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা

মেঘনাদবধ কাব্য মধুসূদনের একটি অন্যতম সৃষ্টি। এই কাব্যের কবিরও প্রথম সর্ববহিঃরাবরণ মুক্ত বিশুদ্ধ রসপ্রেরণার সৃষ্টি মেঘনাদবধ। মেঘনাদবধ কাব্য নয়টি সর্গে বিভক্ত। এই কাব্যটি মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ রচনা হয়েও বিতর্কের আকর হয়ে রয়েছে। যেমন এর ছন্দ-ভাষা বৈদেশিক উপাদান নিয়েও বিতর্ক দেখা যায়। সেইরকম এ কাব্যের কোন সর্গটি শ্রেষ্ঠ এ নিয়েও বিতর্ক কম নেই। বিভিন্ন সমালোচকের মতে, বিভিন্ন সর্গ শ্রেষ্ঠ কারণ প্রত্যেকের কাছে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি ভিন্ন। আমাদের মনে হয় মেঘনাদবধ কাব্যের ষষ্ঠ সর্গই শ্রেষ্ঠ।

৬.১.৩.৩ : Climax পর্ব

মেঘনাদবধ কাব্যের কাহিনিবৃত্তের climax ষষ্ঠ সর্গ। কেবল ঘটনার দিক থেকে নয়, রচনার দিক থেকেও এর সৌন্দর্য অতুলনীয়। ষষ্ঠ সর্গের বর্ণনাভঙ্গীর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে কবির দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন। রামচন্দ্রের শিবির থেকে লক্ষ্মণ বিভীষণের লঙ্কাভিমুখে যাত্রার আগে পর্যন্ত রাম-লক্ষ্মণ বিভীষণের স্বার্থ ও প্রয়োজনবোধের বর্ণে বর্ণানাংশ চিত্রিত। তাদের ভীতি সংশয় আত্মবিশ্বাস ও দৈববিশ্বাসের সুর সেখানে মুখ্য। কিন্তু বিভীষণ লক্ষ্মণের লঙ্কাপ্রবেশের পূর্বমুহূর্ত থেকেই কবির দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। এই সুরটি পটভূমিতে ধরে রেখেছেন কবি। কিন্তু সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে লঙ্কার অতুল বৈভব বীরত্ব ও অপরাধ সৌন্দর্য। বিভীষণের ভ্রাতৃবিদ্বেষ ও লক্ষ্মণের পরমক্রোধ এবং শত্রুতাও যেন স্তম্ভিত হয় গেছে লঙ্কাপুরীর সৌন্দর্য বৈভব ও বীরত্বে। আর নিকুন্ডালা যজ্ঞাগারে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে কাব্য বর্ণনা, লক্ষ্মণ বিভীষণকে সম্পূর্ণ বর্জন করে মেঘনাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে আশ্রয় করেছে। ইন্দ্রজিৎ অনিবার্য মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে মহাপরাক্রমশালী বীরযোদ্ধা হওয়ার সত্বেও সে নিরস্ত্র, তার এই অসহায়তার চিত্র কবি ফুটিয়ে তুলেছেন অতুলনীয়ভাবে।

৬.১.৩.৪ : বর্ণনাস্রোতের গতিমুখ

ষষ্ঠ সর্গের শুরুতে রামের শিবিরে ভীতি ও আতঙ্কের একটি ভাবপরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। লক্ষ্মণকে একাকী নিকুন্ডালা যজ্ঞাগারে প্রেরণ করতে গিয়ে রামচন্দ্র আকুল হয়ে উঠেছেন। কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্মণ লঙ্কার বৈভব ও বীরত্ব দর্শনে বিহ্বল হয়ে পড়েছে। এই আকুলতা যেমন স্পষ্টত মেঘনাদের দিকে অঙ্গুলিসংকেত করেছে, এই সৌন্দর্য ঐশ্বর্য বীরত্ব মুগ্ধতা তেমনই ঐ একটি নামের চারিপাশে আন্দোলিত। ষষ্ঠ সর্গের মেঘনাদের আবির্ভাব বহু পরে ঘটলেও কবি প্রথমাবধি ঐ একটি ব্যক্তির দিকে আলো ফেলেছেন। এই সর্গের সমগ্র বর্ণনার স্রোত শুরু থেকেই যজ্ঞরত ইন্দ্রজিৎের দিকে ধাবমান রামচন্দ্র বারবার সভয়ে বলেছেন—

নাহি কাজ মিত্রবর, সীতায় উদ্ধারি

ফিরি যাই বনবাসে। দুর্ব্বার সমরে,

দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস, রথীন্দ্র রাবণি।

কিন্তু ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদের এই বীরত্ব আজ মৃত্যুর মধ্যে সমাহিত হবে। গল্পের চমকরক্ষার জন্য কবি সেই

অবশ্যস্তাবী পরিণতিকে আবৃত করে রাখেননি। বরং মেঘনাদের বীরত্বের ও আসন্ন ধ্বংসের উল্লেখ করেছেন বারবার। লক্ষ্মণ আশ্বাস দিয়ে দেবকুলের আশীর্বাদের কথা বলেছেন। বিভীষণ বলেছেন—

দেবকুলে প্রিয় তুমি, রঘুকুলমণি;
কাহারে ডরাও, প্রভু! অবশ্য নাশিবে
সমরে সৌমিত্রী শূর মেঘনাদ শূরে!

কবি এই সর্গে লক্ষ্মণের তুলনায় বিভীষণকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছেন। এই সর্গে মেঘনাদই মুখ্য চরিত্র হয়ে উঠেছে।

৬.১.৩.৫ : মুখ্য ঘটনা

মেঘনাদবধ কাব্যের মুখ্য ঘটনা হল মেঘনাদবধ, তা এই কাব্যের নামকরণ থেকেই বোঝা যায়। এই মেঘনাদবধের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ষষ্ঠ সর্গে। সমগ্র কাব্যের নায়ক রাবণের উৎসাহ, উত্তেজনা, ক্রোধ সর্বোপরি প্রতিহিংসাকে দেখানোই এ কাব্যের উদ্দেশ্য। এই রাবণের সমস্ত উৎসাহ উত্তেজনা নির্ভর করে আছে মেঘনাদবধ অর্থাৎ ষষ্ঠ সর্গের উপর। মেঘনাদের মৃত্যু বা হত্যা এই সর্গে সংঘটিত না হলে এই সর্গটিকে গুরুত্বপূর্ণ বলা যেত না। কাব্যের ষষ্ঠ সর্গটি সমগ্র কাব্যটিকে নিয়ন্ত্রণ করছে বলা যায়। এদিক থেকেও উক্ত সর্গটি শ্রেষ্ঠ।

ষষ্ঠ সর্গে মেঘনাদের প্রতিপক্ষ রূপে মধুসূদন দাঁড় করিয়েছেন লক্ষ্মণকে কিন্তু লক্ষ্মণকে কবি বীরোচিত চরিত্র করে আঁকেননি। লক্ষ্মণ হয়তো বাহ্যিক দিক থেকে বীর কিন্তু তাকে প্রকৃত বীর বলা যায় না। কারণ নিরস্ত্র অবস্থায় একজনকে হত্যা করা প্রকৃত বীরের ধর্ম নয়। লক্ষ্মণ নিরস্ত্র ইন্দ্রজিতকে হত্যা করেছে; তখন উষাকাল, ইন্দ্রজিত পূজায় মগ্ন, চতুর্দিকে পূজোপকরণ, পরিধানের শুচিবাস,

বসেছে একাকী—

রথীন্দ্র, নিমগ্ন তপে চন্দ্রচূর যেন।

চোখ খুলেই লক্ষ্মণকে দেখে ভ্রমবশত বৈশ্বানরকে মনে করলেন এ বর্ণনায় মেঘনাদের প্রতি কবিহৃদয়ের সন্ত্রস্ত প্রকাশিত। মিহির, গরুড় বা মহাদেবের সঙ্গে তুলনায় তার সেই মহিমা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। লক্ষ্মণকে কবি বারে বারে কলি, রাহু, সর্প, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীর সঙ্গে উপমিত করেছেন। ফলে এই সর্গেই একদিকে বীর ইন্দ্রজিতের ধর্মবোধ তার মাহাত্ম্য অন্যদিকে লক্ষ্মণের হীনতার পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে।

৬.১.৩.৬ : মহাকাব্যিক বিস্তার

অস্তিমু মুহূর্তে মেঘনাদের বর্ণনায় কবি সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বজ্ঞান দিয়ে তাঁকে পূর্ণাঙ্গ মানবীয় মহিমায় ভূষিত করেছেন। এদিক দিয়েও ষষ্ঠ সর্গ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকার পাবার যোগ্য। শেষমুহূর্ত আসন্ন জেনে মেঘনাদ পিতামাতার পাদপদ্ম এবং প্রেমময়ী প্রমীলাকে স্মরণ করেছে। মৃত্যুকালে লক্ষ্মণের প্রতি অসীম ঘৃণা এবং রাবণের প্রতিশোধের

কথা ব্যক্ত করেছে। অসহায়, নিরস্ত্র, অভিমানী বীরের মনোবিশ্লেষণে আধুনিক কবি যে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তাতে তাঁর কল্পনার আধুনিক ভঙ্গীটি ফুটে উঠেছে বিশেষভাবে ষষ্ঠ সর্গেই। মহাকাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্রটির পতনকে মহিমাম্বিত করে তুলেছেন এখানেই। বীরের পতনকে কবির বক্তব্য—

থরহরি কাঁপিলা বসুধা;
গর্জিলা উথলি সিঙ্কু! ভৈরব—আরাবে
সহসা পুরিল বিশ্ব,
মরামর জীব প্রমাদ গণিলা
আতঙ্কে!

এ মৃত্যু আর বহুশত মৃত্যুর একটি হয়ে রইল না। সমগ্র কাহিনির গতির মূল আকর্ষণস্থল হয়ে উঠল। এ বর্ণনার মধ্য দিয়ে কবি মেঘনাদের মৃত্যু ঘটনাকে মহাকাব্যিক বিস্তার দিলেন।

৬.১.৩.৭ : উপযোগিতা

ষষ্ঠ সর্গের মেঘনাদ হত্যার পরিপ্রেক্ষিতেই সপ্তম সর্গের সূচনা বলা যায়। মধুসূদন নিজেও এই সর্গটিকে নিয়ে অসম্ভব অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছিলেন—‘It was a struggle whether Meghnad, will finish me or I finish him.’ আমরা দেখেছি ইন্দ্রজিতের অসম্ভাব্য মৃত্যুর প্রতিবিধান করতেই সপ্তম সর্গে রাবণ যুদ্ধাযাত্রা করেছেন। প্রথমেই দূতের ছদ্মবেশে বীরভদ্রের মুখে অন্যায় যুদ্ধে মেঘনাদের মৃত্যু সংবাদ শুনে রাবণ শরবিদ্ধ সিংহের মত ভূতলে পরিণত হয়েছেন। পরে শিবের প্রেরিত রুদ্রতেজে রাবণ শোকভুলে রণসাজে সজ্জিত হয়েছেন। লঙ্কাদ্বীপ রণনাদে ভরে উঠেছে। স্বর্গবাসী দেবতারাও চকিত হয়েছেন। এতকিছুর কারণ কিন্তু ষষ্ঠ সর্গে অন্যায় যুদ্ধে মেঘনাদের হত্যা। ফলে এই সর্গের উপযোগিতার কথা সহজেই স্মরণে আসে।

নয়টি সর্গে রচিত মেঘনাদবধ কাব্য যা বীরবাহুর মৃত্যু দিয়ে কবি শুরু করেছিলেন তারই চূড়ান্ত পর্যায় বা climax রচনা করেছেন ষষ্ঠ সর্গে। কাব্যসাহিত্যের দ্বন্দ্বজটিল চূড়ান্ত অবস্থাই শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। অন্যান্য অংশগুলি চূড়ান্ত অবস্থার রূপদানে সাহায্য করে। ঘটনার পরিণতি ও নির্ভর করে climax এর উপর। মেঘনাদবধ কাব্যে তাই হয়েছে। ফলে ষষ্ঠ সর্গকে আমরা শ্রেষ্ঠ বলতে পারি কাব্যে এই সর্গের উপযোগিতাও অনন্য।

৬.১.৩.৮ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

- ১। মেঘনাদবধ কাব্যের মোট কয়টি সর্গ?
- ২। ষষ্ঠ সর্গের নাম কী?
- ৩। এই সর্গের মূল বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লেখো।

- ৪। তোমার মতে মেঘনাদবধ কাব্যের কোন সর্গটি শ্রেষ্ঠ? যুক্তিসহ আলোচনা করো।
- ৫। ষষ্ঠ সর্গের উপযোগিতা কী তা বর্ণনা করো।
- ৬। মেঘনাদবধ কাব্যের climax কোন সর্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে? এটি সংগঠনে কবি কতদূর সার্থক হয়েছেন বিবেচনা করো।
- ৭। মেঘনাদবধ কাব্যে ইন্দ্রজিতের মৃত্যু কোন সর্গে ঘটেছে?
- ৮। কাব্যের নামকরণে ষষ্ঠ সর্গের উপযোগিতা সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো।
- ৯। ষষ্ঠ সর্গের গুরুত্ব নির্ণয় করো।

৬.১.৩.৯ : সহায়ক গ্রন্থ

- ১। কবি শ্রী মধুসূদন—মোহিতলাল মজুমদার।
- ২। মেঘনাদবধ কাব্যচর্চা—উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (সম্পাদিত)।
- ৩। মধুসূদনের কবি আত্মা ও কাব্যশিল্প—ক্ষেত্র গুপ্ত।
- ৪। মধুসূদন কবি ও নাট্যকার—সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত।
- ৫। মাইকেল মধুসূদন—প্রমথনাথ বিশী।
- ৬। ঈশ্বর গুপ্ত রচিত কবীজীবনী—ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত।
- ৭। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত—যোগীন্দ্রনাথ বসু।

পর্যায় গ্রন্থ-১

মেঘনাদবধ কাব্য

একক-৪

রসবিচার

বিন্যাস ক্রম :

৬.১.৪.১	:	ভূমিকা
৬.১.৪.২	:	বীররস
৬.১.৪.৩	:	করণরস
৬.১.৪.৪	:	রৌদ্ররস
৬.১.৪.৫	:	অদ্ভুতরস
৬.১.৪.৬	:	ভয়ানক ও বীভৎস রস
৬.১.৪.৭	:	হাস্যরস
৬.১.৪.৮	:	শান্তরস
৬.১.৪.১০	:	উপসংহার
৬.১.৪.১১	:	আদর্শ প্রশ্নাবলি
৬.১.৪.১২	:	সহায়ক গ্রন্থাবলি

৬.১.৪.১ : ভূমিকা

‘বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।’ সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে এটাই কাব্যের মূলসূত্র। অর্থাৎ রস যার আত্মা এমন যে বাক্য, তাই কাব্য। শব্দ ও অর্থ যে কাব্য পুরুষের শরীর, উপমাদি যার অলংকার, মাধুর্য্যাদি যার গুণ, ধ্বনি যার জীবন, রস সেই কাব্য-পুরুষের আত্মা অর্থাৎ সারস্বরূপ। আলংকারিকগণ কাব্যে দশ প্রকার রসের কথা উল্লেখ করেন, যথা—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, বীর, অদ্ভুত, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র, বাৎসল্য ও শান্ত। যে ভাব স্থায়ী হলে যে রসের উৎপত্তি হয়, সেই ভাবকে সেই রসের স্থায়ীভাব বলা হয়। আর স্থায়ীভাব পুষ্ট করে কাব্যমধ্যে আরও যেসব গৌণভাবের প্রকাশ লক্ষ করা যায় তাকে সঞ্চরী বলা হয়। কাব্যে লক্ষ করা উচিত যখন স্থায়ীভাবের ফলে রসের উৎপত্তি হয়। তখন অন্যভাবের আগমনে যেন ভাবান্তর ঘটে রসভঙ্গ না হয়। তাহলে সে কাব্য অনুপভোগ্য হয়ে ওঠে।

যাইহোক আমরা দেখব মেঘনাদবধ কাব্যে কমবেশি সকল প্রকার রসেরই প্রকাশ আছে। এর মধ্যে বীররস ও করুণরসই প্রাধান্য লাভ করেছে। তাই আমরা প্রথমে বীররস ও করুণরস নিয়ে আলোচনা করে। অন্যান্য গৌণরসের অধিকার লক্ষ্য করার চেষ্টা করব।

৬.১.৪.২ : বীররস

দান, ধর্ম, দয়া ও যুদ্ধ বিগ্রহ উপলক্ষে উৎসাহ থেকে বীররসের উৎপত্তি। তা পাঠক বা শ্রোতার মনে বীরভাব উদ্দীপিত করে। লক্ষা যুদ্ধ এবং তার উদ্যোগাযোজন যে কাব্যের বিষয়; রাবণ, মেঘনাদ, লক্ষ্মণ যে কাব্যে যোদ্ধা বীরপুরুষ এমনকি যুবরাজ মহিষী প্রমীলা ও তার চেড়ীগণ যে কাব্যে বীর রমণী রূপে বর্ণিত, সে কাব্যে তো বীররসের প্রাধান্য থাকবেই। তাই কবি স্বয়ং গ্রন্থস্রোতে বলেছেন—

‘গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত’

কবি বাংলা কাব্যে ছন্দক্ষেত্রে যেমন এক সুন্দর নতুনত্ব দিয়েছেন। তেমনই নতুন ছন্দে বীররসের যে কেমন চমৎকার অভিব্যক্তি হতে পারে, তার আদর্শ দিয়ে গেছেন। বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তনে মধুসূদনের যেমন অতুলনীয় কীর্তি, তেমন ঐ ছন্দে বীর রসের চমৎকার অভিব্যক্তিতেও তার অসাধারণ কৃতিত্ব।

কাব্যারম্ভেই ভগ্নদূতের মুখে বীরবাহুর বীরত্ব কাহিনি শুনে শোকাক্ত রাবণের হৃদয় বীরোচিত উৎসাহে পূর্ণ হল—

“—সাবাসি, দূত, তোর কথা শুনি
কোন্ বীর—হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে
সংগ্রামে?”

পুত্রশোকে কাতর হয়েও তার উক্তি—

“বীরশূন্য লক্ষা মম। কে আর রাখিবে
রাক্ষস-কুলের মান? যাইব আপনি।
সাজ, হে বীরেন্দ্র-বৃন্দ, লক্ষার ভূষণ।”

লক্ষার যোদ্ধাগণ রাক্ষসকুলের সঙ্গে সমরে প্রায় সকলেই মৃত। এই বীরশূন্য লক্ষা মহাসংকটে পতিত। তাই রাক্ষস কুলের মান রাখতে রাবণের এরূপ উক্তি। এইরূপ উৎসাহব্যাঞ্জক উক্তিতে উদ্যোগে বীর রস সত্যই উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

পরবর্তী অংশে আমরা দেখি রাক্ষসকুলের একমাত্র সহায়সম্বল মেঘনাদকে রাবণ বারবার যুদ্ধে পাঠাতে অনিচ্ছুক হলে, মেঘনাদের উৎসাহব্যাঞ্জক উক্তি—

“কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি,
রাজেন্দ্র! থাকিতে দাস, যদি যাও রণে
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ ঘুষিবে জগতে।”

একথা তো একজন সত্যিকারের বীরই বলতে পারে। মেঘনাদের এই বীরভাবসম্পন্ন উক্তি আমাদের মনে বীরভাবের উদ্রেক ঘটায়।

এছাড়া তৃতীয় সর্গে প্রমীলা পতি মেঘনাদের অনুসন্ধান লক্ষ্যপূরে যেতে চাইলে, সখীগণ রাঘবসেনা থাকায় তার যাত্রাপথে আশঙ্কার কথা বলেন। এই আশঙ্কা নস্যাত করে প্রমীলার উক্তি—

দানব-নন্দিনী আমি; রক্ষঃ কুল-বধু;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,-
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?
পশিব লক্ষ্য আজি নিজ ভূজ—বলে;
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি?

এ তো একজন বীরঙ্গনা নারীরই কণ্ঠস্বর। শুধু কথা নয় তাদের সাজ সজ্জাতেও বীরঙ্গনার প্রকাশ পাওয়া যায়—“যথা যাব পরম্পদ পার্থ মহারথী-”

শুধু রক্ষোকুল নয়, রাঘবকুলেও আমরা বীররসের ভাব লক্ষ্য করি। মেঘনাদের মৃত্যুতে গোটা স্বর্ণলক্ষা যখন শোকে আকুল, তখন এই শোকে প্রতিশোধ স্বরূপ লক্ষ্যরাজ রাবণ চতুরঙ্গ সহযোগে যুদ্ধে রাঘবকুলকে আহ্বান করে। এই বিশাল রাক্ষস বাহিনীর কাছে রাঘবকুলের সেনাবাহিনী সত্যিই তুচ্ছ। তাই একমাত্র সহায় অনুজকে আশঙ্কা প্রকাশ করে এই কাল সমরে যেতে নিষেধ করে। এবং ভ্রাতা লক্ষণের রাবণের বীররসাত্মক উক্তি

ক্ষত্রকূলে জন্ম মম, রক্ষঃকুল পতি,
নাহি ডরি যমে আমি; কেন ডরাইব
তোমায়? আকুল তুমি পুত্রশোকে আজি,
যথা সাধ্যকর, রথি, আশু নিবারিব
শোক তব, প্রেরি তোমা পুত্রবর যথা।

এ তো সম্মুখ সমরের এক যোদ্ধার অপর যোদ্ধাকে আহ্বান।

এছাড়াও রাঘবকুলের সমুদ্রবন্দন, বালীবধ, হনুমানের গন্ধমাদন পর্বে বিশল্যকরণী লতার আনয়নে, সর্বোপরি পুনরায় লক্ষ্মণসহ রামচন্দ্রের রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে গমনে এতো বীরভাবের পরিচায়ক। যদিও রাঘবকুলের সহায়করূপে দেব-দেবী ছিলেন। কিন্তু দেব-দেবী যে কুলের ভয়ে সন্ত্রস্ত। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ তো সত্যি বীরত্বের পরিচায়ক।

এইরূপ উৎসাহব্যঞ্জক যুদ্ধোদ্যোগ বর্ণনা কাব্যের বিভিন্ন জায়গায় বর্তমান—পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম সর্গের অনেকস্থলেই বর্ণনায় ও বাক্যে বীর রস উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে। কব্যখানিমূলত যুদ্ধ সম্বন্ধীয় বীররসাত্মক স্বয়ং কবি মধুসূদন এই অঙ্গীকার করলেও এর নানাস্থলে করুণ রসের অতিসুন্দর অভিব্যক্তি দেখতে পাই, বিশেষত; শেষ সর্গে করুণ রস যেন মূর্তিমান হয়ে পাঠককে অভিভূত করে তোলে।

৬.১.৪.৩ : করুণরস

সাধারণত ইষ্টনাশে বা অনিষ্টপাতে বা প্রিয়বিরোধে যে শোক, তা থেকেই এই রসের উৎপত্তি। সংস্কৃত আলংকারিকগণ শাস্ত্রে তা কপোতবর্ণ ও যম দেবতা বলে বর্ণনা করেছেন। শোক এর স্থায়ীভাব; শোকাক্ত ব্যক্তি বা বিষয় এর আলম্বন বিভাব, তদ্বিষয় দর্শন, শ্রবণ, মননাদি এর উদ্দীপন বিভাব এবং ক্রন্দনাদি এর অনুভাব।

একাত্তর বীর রসের পরেই করুণ রসের প্রাধান্য এবং অসামান্য তুলিকা গুণে এ কাব্য করুণ রসের অভিব্যক্তি বঙ্গসাহিত্যে অতুলনীয় হয়ে রয়েছে। কাব্যের শুরুতেই মূর্তিমান করুণরস—

এ হেন সভায় বসে রক্ষকুল পতি,
বাক্য-হীন পুত্র-শোকে। বারবার-বারে
অবিরল অশ্রুধারা, তিতিয়া বসনে

বীরবাহুর শোকে রাবণের বিলাপ—“নিশার স্বপ্নসম, তোর এ বারতা।’ লক্ষার রণক্ষেত্র বর্ণন, সভাস্থলে বীরবাহু জননী চিত্রাঙ্গদার বিলাপ, চতুর্থ সর্গে সীতা ও সরমার কথোপকথন; অষ্টম সর্গে মৃতপ্রায় লক্ষ্মণকে ক্রোড়ে করে রামের ক্রন্দন এবং সর্বশেষে নবম সর্গে মৃত মেঘনাদের সাময়িক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বর্ণনা ও প্রমীলার সহমরণ—এইসব স্থলের করুণরস কেবল বাংলা সাহিত্য কেন, যে কোনো সাহিত্যেই গৌরবের বিষয় হতে পারে। তাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। চিতারোহণ কালে প্রমীলার মুখে—

“-লো সহচরি, এতদিনে আজি
ফুরাইল জীব-লীলা জীবলীলাস্থলে”

এবং তারপরে মেঘনাদ ও প্রমীলার চিতা সমক্ষে “বিশদ বস্ত্র” ও “বিশদ উত্তরী” রাবণের মুখে—

ছিল আশা মেঘনাদ, মুদিব অস্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে;

এ তো করুণরসের উৎসস্রাব। যা নির্ব্বারের মতো ঝরে মেঘনাদের শব্দদাহ করার পর কাব্যের সমাপ্তিতে—

করি স্নান সিঙ্কুনিরে রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লক্ষার পানে আর্দ্র অশ্রুনিরে—
বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে!
সপ্ত দিবানিশি লক্ষা কাঁদিলা বিষাদে।

এ তে পাঠকের মনে সপ্ত দিবানিশির অপেক্ষাও যে বেশি দিন কাঁদতে হয়, তা কবি নিজেও জানতেন। লিখতে লিখতে তিনি নিজেও অশ্রুসিক্ততা অনুভব করেছিলেন। তাই তাঁর এক বন্ধুকে তিনি লিখেছিলেন—“I can tell you that you have to shed many a tear for the glorious Rakhasas, for poor Lakhana, for Promila. I never thought. I was such a fellow for the pathetic.”

৬.১.৪.৪ : রৌদ্ররস

এই দুটি অঙ্গীরস ছাড়াও আমরা অন্যান্য রসের প্রকাশ দেখতে পাই। যেমন রৌদ্ররস যা ক্রোধ থেকে জাত। এর প্রকাশ বহুস্থলে লক্ষ্য করি। যেমন বাসন্তী প্রমীলাকে লক্ষায় যেতে বারণ করায় প্রমীলার উক্তি—“কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি? আবার এছাড়া মেঘনাদ লক্ষ্মণকে ছদ্মবেশী অগ্নিদেব বলে ভ্রম হলে, দাশরথির রুষ্ট বচন। তাছাড়া সপ্তম সর্গে রাক্ষস সৈন্যদিগের প্রতি মেঘনাদ বধের প্রতিবিধানে উদ্যোগী রাবণের ক্রোধান্বিত অভিভাষণ—

দেব দৈত্য নর-রণে যার পরাক্রমে
জয়ী রক্ষঃ অনীকিনি”

এতো রৌদ্ররসের সুন্দর উদাহরণ স্থল।

৬.১.৪.৫ : অদ্ভুতরস

অদ্ভুতরস যার উৎপত্তি আশ্চর্য জনক বিষয়ে বা দৃশ্য থেকে। যুদ্ধাদির ব্যাপার নিয়ে যে কাব্যের বর্ণনা সে কাব্যে যদি প্রেতপুরীর বর্ণনা থাকে সেখানে তো অদ্ভুত রসের প্রকাশ ঘটবেই। প্রথম সর্গে বিস্ময় ও ভয়ে ভগ্নদূতের মুখে বীরবাহুর যুদ্ধকাহিনি বর্ণনা। তৃতীয় সর্গে বীরবেশধারী প্রমীলাকে দেখে হনুমানের বিস্ময়ভাবাত্মক উক্তি। এবং নৃমুণ্ডমালিনীকে বিদায় দিয়ে বিভীষণের কাছে রামের উক্তি—‘দেবী কি দানবী, সখে, দেখ নিরখিয়া’ তাছাড়া লক্ষ্মণের চণ্ডী পূজার্থে বনে গমন। এসবই অদ্ভুত রসের সুন্দর উদাহরণ।

৬.১.৪.৬ : ভয়ানক ও বীভৎস রস

এছাড়া ভয়ানক ও বীভৎস রস উভয়ই আমাদের একসঙ্গে প্রেতপুরী ও নরকবর্ণনা অংশে একসঙ্গে ধরা পড়ে। শৃঙ্গারসের প্রকাশ আমরা মেঘনাদ ও প্রমীলার দাম্পত্যলীলায় দেখি। তাছাড়া কিছুটা প্রেতপুরীতে কামাতুর প্রেত-প্রেতিনীর আচার-আচরণে।

৬.১.৪.৭ : হাস্যরস

হাস্যকৌতুকের প্রকাশও গৌণ হলেও লক্ষ করা যায়। যেমন প্রমীলা বাহিনীর হনুমানের প্রতি কথোপকথন এবং সুগ্রীবের প্রতি রাবণের উক্তি—

হাসিয়া কহিলা—

লঙ্কানাথ—‘রাজ্যভোগ ত্যাজি কি কুক্ষণে

বর্বর, আইলি তুই এ কনক-পুরে?

৬.১.৪.৮ : শান্তরস

শান্তরস শান্তি বা নির্বেদ থেকে এই রসের উৎপত্তি। বীরবাহুর শোকে রাবণের উক্তি। সীতার মুখে পঞ্চবটী বাস বর্ণনায় করুণ রসের সঙ্গে শান্তরসের সুন্দর অভিব্যক্তি। নিকুন্ডিলা যজ্ঞাগারে রাবণের খ্যাতি দেখে লক্ষ্মণের ঐশ্বর্য মহিমা জ্ঞাপন করলে বিভীষণের শান্ত রসাত্মক উক্তি—

এক যায়, আর আসে, জগতের রীতি,

সাগর-তরঙ্গ যথা!

৬.১.৪.৯ : বাৎসল্য রস

উপরিউক্ত নয় প্রকার রস ছাড়াও সংস্কৃত আলংকারিকগণ বাৎসল্যকেও একপ্রকার রস বলে গণ্য করেছেন। স্নেহ থেকে যার উৎপত্তি। সংসারের যাবতীয় মাস্টলিক কার্যে যাঁহাদের কাছে করজোড়ে কল্যাণ প্রার্থনা করতে হয়, সেই সর্ব কল্যাণদায়ী লোক মাতৃকাগণ ভিন্ন বাৎসল্যরসের দেবতা আর কে হতে পারে? উদাহরণ মেঘনাদের প্রতি রাবণের উক্তি—

এ কাল সমরে

নাহি হে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা

বারম্বার।

মেঘনাদের প্রতি মন্দোদরীর স্নেহ, চিত্রাঙ্গদার বীরবাহুর প্রতি স্নেহ। তাছাড়া রামের ভ্রাতৃস্নেহ তো মাতৃস্নেহ হত কিছুমাত্র কম নয়—‘কেমনে পাঠাই তোরে সে সপবিবরে,/প্রাণাধিক? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।’

৬.১.৪.১০ : উপসংহার

এইসব রসের বিশেষত বীররস ও করুণরসের সংযত সমাবেশে মেঘনাদবধ কাব্যখানি সত্যিই উপভোগ্য। এতে ছন্দের স্বাধীনতা ভাষা রসোপযোগিতা ও বিবিধ অলংকারের পরিপাট্য সর্বত্রই রসের উৎকর্ষ ও পরিপুষ্টি সাধন করেছে।

তবে মেঘনাদবধ কাব্যে কোন রসের প্রাধান্য, এ নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। একদল সমালোচকের মতে এটা বীররসের কাব্য। আবার অন্যদল এর মতে করুণ রসই প্রধান। মধুসূদন জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু এ সম্পর্কে বলেছেন—‘মেঘনাদবধে বীররসের অপেক্ষা করুণরসেরই প্রাধান্য।’ একথার যুক্তি বলা যেতে পারে যে, আমরা দেখি বীরবাহুর শোকে কাতর রাক্ষসরাজের আর্তনাদের সঙ্গে গ্রন্থের সূচনা এবং মেঘনাদের মৃত্যু ও প্রমীলার চিতারোহণে লঙ্কার নর-নারীর করুণ বিলাপে এর শেষ। এর আদি, মধ্য, অন্ত সমস্ত বিষাদপূর্ণ। এজন্যই আমরা মেঘনাদবধে বীররস অপেক্ষা করুণরসের প্রাধান্য লক্ষ্য করি। কিন্তু এর বিপক্ষে একটি তর্ক সহজেই কবির অঙ্গীকার—‘গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত।’ এ তো কাব্যের গুণের একটা বড় ব্যর্থতা বলে আমরা মনে করি কিন্তু এর কারণ যদি অনুসন্ধান করতে চাই তাহলে তা কবির জীবনের মধ্যেই এর উত্তর খুঁজতে হবে। একটু ঘনিষ্ঠভাবে নিরীক্ষণ করলে মেঘনাদবধের রস-বিচারে রস প্রাধান্য নির্ণয়ে মতানৈক্যের কোনো অবসর নাই। বীররস এ কাব্যের আভরণ মাত্র, দেহখানি করুণরসেই অভিসিদ্ধিত। কাব্যখানি যেন একেবারে তার জীবনের প্রতিচ্ছবি—উপরে সাহেবী পোশাকে আচ্ছাদিত সাহেবীয়ানা, অন্তরে সেই স্নেহকোমল বাংলা মায়ের দরদী সন্তান।

তবে আভরণ হোক, আর আভরণই হোক যতটুকু বীররস এই কাব্যে দেখতে পাই, তার সমকক্ষ বাংলা কাব্যের আর কোথাও এখনও পর্যন্ত দেখতে পাই না। হয়ত দীর্ঘ জীবন পেলে তিনি তার নিজের স্বপ্নে সত্যিই সফল হতেন কারণ মধুসূদনের মত প্রচণ্ড Political প্রতিভা আমাদের দেশের কেন, যে কোনো দেশের ইতিহাসেই দুর্লভ। মধুসূদন যে প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তার সৃষ্ট সাহিত্য পর্যাপ্ত হয় না। তাই মধুসূদন যে কাব্য লিখতে চেয়েছিলেন, যার জন্য তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন, তিনি সেই অলিখিত মহাকাব্যের মহাকবি। তিনি পাঠককুলকে আশ্বস্ত করে গেছেন এই বলে—‘Do not be frightened, my dear fellow, I won’t trouble my readers with Viraras.’”

৬.১.৪.১১ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

- ১। আলংকারিকগণের মতে রস কয়প্রকার ও কী কী?
- ২। মেঘনাদবধ কাব্যে প্রধান দুটি রস কী?
- ৩। বীররসের কাব্য হিসাবে মেঘনাদবধ কাব্যের সার্থকতা বিচার করো।
- ৪। মেঘনাদবধ কাব্য সম্পর্কে কোনো কোনো সমালোচক এরূপ মন্তব্য করেছেন—‘সামগ্রিকভাবে ইহার মধ্যে যে রস বিকাশ লাভ করিয়াছে তাহা বীররস নহে এবং তাহার বিপরীতধর্মী রস করুণরস’—এই অভিমত কতখানি গ্রহণযোগ্য বিচার করো।
- ৫। মেঘনাদবধ কাব্যের রসবিচার করো।

৬.১.৩.৯ : সহায়ক গ্রন্থ

- ১। কবি শ্রী মধুসূদন—মোহিতলাল মজুমদার।
- ২। মেঘনাদবধ কাব্যচর্চা—উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (সম্পাদিত)।
- ৩। মধুসূদনের কবি আত্মা ও কাব্যশিল্প—ক্ষেত্র গুপ্ত।
- ৪। মধুসূদন কবি ও নাট্যকার—সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত।
- ৫। মাইকেল মধুসূদন—প্রমথনাথ বিশী।
- ৬। ঈশ্বর গুপ্ত রচিত কবিজীবনী—ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত।
- ৭। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত—যোগীন্দ্রনাথ বসু।

পর্যায় গ্রন্থ-২

সারদামঙ্গল : বিহারীলাল চক্রবর্তী

একক-৫

বিহারীলালের কবিমানস

বিন্যাস ক্রম :

- ৬.২.৫.১ : বিহারীলাল চক্রবর্তী : পরিচয়
৬.২.৫.২ : বিহারীলালের কবিমানস
৬.২.৫.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি
৬.২.৫.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৬.২.৫.১ : বিহারীলাল চক্রবর্তী : পরিচয়

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রকে নিয়ে যে বীরযুগের বিস্তৃতি বা মহাকাব্য রচনার ঝাঁক সেই যুগে জন্মগ্রহণ করেও কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী তাঁর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব তথা কবিমানসের অধিকারী, সম্পূর্ণ একক। বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম কবি যাঁর কবিসত্তা সম্পূর্ণরূপে গীতিকাব্যধর্মী। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই কাব্যজগতে তাঁর বিশেষ স্থান।

বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিসত্তা সম্পূর্ণরূপে গীতিকাব্যধর্মী। ১৮৬২ খ্রীঃ বিহারীলাল ‘সঙ্গীত শতক’ নামে কবিতা সমগ্র প্রকাশ করেন। তিনি বাংলার প্রথম রোমান্টিক গীতিকবি। ১৮৭৯ খ্রীঃ ‘সারদামঙ্গল ও ১৮৮৯ খ্রীঃ ‘সাধের আসন’ কবির উল্লেখযোগ্য কাব্য। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালকে ‘ভোরের পাখি’ আখ্যা দিয়েছিলেন।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১ মে কলকাতার এক যজমানসেবিত ব্রাহ্মণ পরিবারে বিহারীলালের জন্ম। পিতার একমাত্র সন্তান এবং মাত্র চার বছর বয়সে মাতৃহারা হবার ফলে বিহারীলালের শিশুমনে সংবেদনশীলতার একটি বিশেষ স্থান ছিল। উনিশ বছর বয়সে

পূর্বপরিচিতি যে নারীকে স্ত্রীরূপে পেয়ে বিহারীলাল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন, তিনিও সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে অকালে মারা গেলেন। মা এবং স্ত্রী—এই দুই মৃত্যু কবির জীবনের গভীর বেদনার স্বাক্ষর মুদ্রিত করে দিয়ে যায় চিরদিনের মতো করে। গীতিকবির অনুভূতিতে যে অনিবার্য এক অনির্দেশ্য বেদনার ক্ষরণ ফুটে ওঠে তারই সূচনা হয়তো কবির ব্যক্তিজীবনের সূচনাতেই এইভাবে পথ ধরে নেয়।

বাল্যাবস্থায় বিহারীলাল জেনারেল এ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশন ও পরে সংস্কৃত কলেজে পড়াশোনা করেন। স্কুল কলেজের পড়া তাঁকে আকৃষ্ট করেনি। কিন্তু নিজের অধ্যবসায়ে এবং পাঠাগ্রহে তিনি ‘মুগ্ধবোধ’ পড়েছিলেন। যেমন পাঠ করেছিলেন রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, ভারবি, মুদ্রারাক্ষস, উত্তররামচরিত, শকুন্তলা—তেমনি তাঁর অধিগত হয়েছিল শেক্সপীয়ারের বিখ্যাত নাটকগুলি, বায়রণের চাইল্ড হ্যারল্ড। আবার ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা, দাশুয়ারের গান, কুন্ডিবাসী রামায়ণ আর কাশীদাসী মহাভারত বিহারীলালের প্রিয় ছিল।

গীতিকবি বিহারীলালের চেতনার জগতকে উদ্ভাসিত করে রেখেছিল তাঁর সঙ্গীতপ্রীতি। গান শোনা এবং গানের চর্চা থেকে সঙ্গীত রচনার দিকে তাঁর প্রবণতা ফুটে উঠতে থাকে।

বিহারীলালের সাংস্কৃতিক জীবনে পত্রপত্রিকার ভূমিকার কথা উল্লেখযোগ্য। তাঁর সম্পাদিত ‘অবোধবন্ধু’ পত্রিকা মাসিক পত্রিকা হিসাবে কতখানি বিশিষ্ট, রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বলিত তার প্রমাণ পাওয়া যায়—“বঙ্গদর্শনকে যদি আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যের প্রভাসূর্য বলা যায় তবে ক্ষুদ্রায়তন অবোধবন্ধুকে প্রত্যুষের শুকতারার বলা যাইতে পারে”।

১৮৫৮ তে বিহারীলালের ‘স্বপ্নদর্শন’ নামে গদ্যরূপক কাব্য প্রকাশিত হলে ঈশ্বর গুপ্তের ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকা তার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হন। তারপর ১৮৬২ তে বিহারীলাল ‘সঙ্গীত শতক’ নামে কবিতাসংগ্রহ প্রকাশ করেন। আচার্য সুকুমার সেন তাকে বলেছেন ‘গান কবিতার বই’। বাংলা গীতিকবিতায় সম্ভাবনার প্রায় সমস্ত লক্ষণসূত্রগুলি যে বিহারীলালের শতসংখ্যক সঙ্গীত কবিতা খণ্ডে ধরা রয়েছে তা রসিকজনের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। এঁদের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম সর্বাপেক্ষে উল্লেখনীয়।

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ‘ভোরের পাখি’ আখ্যা দিয়ে বলেছেন ‘ঠিক ইতিহাসের কথা বলিতে পারি না কিন্তু আমি সেই প্রথম বাংলা কবিতায় নিজের সুর শুনিলাম।’ কবি তখনকার রীতি অনুসারে রণকৌশলমুখর অনুকারমূলক মহাকাব্য বা স্বদেশানুরাগমূলক কাব্য না লিখে বিজনে বসে আপন ছন্দে আপন রাগিণী গেয়েছেন। মহাকাব্যের পূর্ণবিকাশের যুগে বিহারীলালের অর্ন্তমুখী আত্মসত্তার প্রতিফলনে সৃষ্ট ভাবোজ্জ্বল গীতিকবিতার দিকে অনেকেই লক্ষ করেন নি। কিন্তু রবীন্দ্রযুগে যখন গীতিকবিতা চরমোৎকর্ষ লাভ করে, তখন সকলে দেখলেন গীতিকবিতার উৎসভূমিতে অবস্থান বিহারীলালের। সেই সূর্যকরোজ্জ্বল দিনের অতীত ব্রাহ্মমুহূর্তের ‘ভোরের পাখি’ বিহারীলাল। তিনি বাংলার প্রথম রোমান্টিক গীতিকবি। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—“রবীন্দ্রকাব্যে কবি ও সাধকের যে অপূর্ব সমন্বয়, কাব্য সৌন্দর্য ও তত্ত্বানুভূতির যে আশ্চর্য সমীকরণ, সীমা ও অসীম উভয়েরই পারস্পরিক অধিকারকে অক্ষুন্ন রেখে যে অন্তরঙ্গ মিলন সাধিত হয়েছে, বিহারীলালে তারই অসম্পূর্ণ প্রারম্ভিক প্রকাশ।” সুকুমার সেনের ভাষায় “বাল্মীকির সঙ্গে কালিদাসের যে সম্বন্ধ, বিহারীলালের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ তাহার অনুরূপ”। প্রকৃতির নিবিড় লীলাময়তার অনুভবে, সৌন্দর্যলক্ষ্মীর ধ্যানতন্ময়তায়, কল্পনার নিগূঢ়চারী সত্ত্বাময়ীর উপলব্ধিতে এবং প্রেমময়ী নারীরূপের সর্বাতিশায়ী অনুধ্যানে বিহারীলালের কাব্যসৃষ্টি অভিনবত্বপূর্ণ। সঙ্গীতশতক রচনার পর কবি ১৮৭০ এ প্রকাশ করেন বঙ্গসুন্দরী, নিসর্গসন্দর্শন, বন্ধুবিরোগ ও প্রেমপ্রবাহিনী কাব্যচতুষ্টয়। এরপর ১৮৭৯-এ সারদামঙ্গল কাব্য প্রকাশিত হয়। তার প্রায় দশবছর পর লেখা সাধের আসন কাব্য বিহারীলালের অন্তিম সৃষ্টি।

প্রশ্ন :

- ১। বিহারীলাল কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
- ২। বিহারীলালকে কে ‘ভোরের পাখি’ বলেছিলেন?

৬.২.৫.২ : বিহারীলালের কবিমানস

বিহারীলাল আত্মগতকবি হিসেবে স্বীকৃত। একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির আলোকে সমগ্র সৃষ্টি, জগৎ ও জীবনকে অভিস্রুত করে শব্দের ব্যঞ্জনা এবং ধ্বনিতরঙ্গের সংকেতে তাকে রূপাবয়ব দান করেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী স্রষ্টা। নিজের ভাবনারই এমন অকুণ্ঠ প্রকাশ বিহারীলালের কাব্যে দেখা যায়। এই আত্মগত ভাবনা মূলত কবির কল্পনাধর্মিতাকে আশ্রয় করেই প্রকাশ পেয়েছে। এক্ষেত্রে কল্পনাশক্তির সৃজনশীলতা বা সৃজনশীল কল্পনাশক্তিকে বিহারীলাল সত্তারূপিণী বলে বর্ণনা করেছেন। কল্পনার দ্বারাই সম্ভব জগৎ ও জীবনের অপর রহস্যকে উন্মোচিত করা। বৈষ্ণব পদাবলীর শাসন-নিয়ন্ত্রণ-নির্দিষ্ট ছকে-বাঁধা বিষয় ও প্রকরণে

বিহারীলাল আত্মগত কবি হিসেবে স্বীকৃত। আত্মগত ভাবনা দিয়ে জগৎ ও জীবনের অপার রহস্যকে উন্মোচিত করেছেন। সেই সঙ্গে প্রকৃতির মধ্যে আবিষ্কার করেছেন এক বিস্ময়ী সত্তাকে। সারদা কবির কাছে ‘বিশ্ববিমোহিনী মায়ী’। নারী, প্রকৃতি জগৎ, প্রেম ও সৌন্দর্যের মধুরতায় অভিযুক্ত হয়েছে কাতর কবির হৃদয়।

যা সম্ভব হয়নি, মধুসূদনের পাশ্চাত্য কাব্য থেকে আমদানী করা কল্পনা দেবীকে শুধু চয়ন ও সঞ্চয়ের মতো মধুকরবৃত্তি ছাড়া আর কিছু যেখানে করতে দেখা যায়নি, সেই প্রেক্ষিতে বিহারীলালের কল্পনা দেখা দিলেন ‘কবির ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে’ হয়ে। এই কন্যা প্রেরণাময়ী, জীবন্ত—যা স্রষ্টাকে চমকিত করে তাঁর হৃদয়াকাশ উদ্ভাসিত করে তোলেন। সৃজনীশক্তির দৈব স্পর্শ, কবির ভাষায় ‘জাগিল বিজলী যেন নীল নব ঘনে’।

বিহারীলালের স্বকীয় ভাবনাভঙ্গিতে আর যে বিষয়টি অভিনবত্বপূর্ণ, তা হল তাঁর প্রকৃতিচেতনা। ব্যক্তিগত আত্মভাবব্যাকুলতার রসসৃষ্টি করতে গিয়ে বিহারীলাল প্রকৃতির মধ্যে আবিষ্কার করেছেন এক চিন্ময়ী সত্তাকে। ঠাকুরবাড়ীতে কবির যাতায়াত এবং মহর্ষিদেবের উপনিষদ সম্পর্কিত দীর্ঘ বক্তৃতা ও তার ব্যাখ্যা শোনার সূত্রে হয়তো বিহারীলাল এ বিষয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু তা হলেও বলতে হবে, প্রকৃতিরূপী বা প্রকৃতিসত্তী বলে কবির সম্বোধন একান্তই স্বতোৎসারিত। উপলব্ধির গহনে কবি বহিঃপ্রকৃতিকে এমনভাবে পেয়েছেন, যাকে লীলাসঙ্গিনীরূপে সহচরীর মূল্য দান করেছেন অনায়াস আনন্দে। প্রকৃতিকে নারীসত্তায় অবৈষ্ণব যেন প্রকৃতির মধ্যে অনন্তকে পাওয়া—তারই আদর্শে প্রার্থিতাকে ধরবার আকাঙ্ক্ষা, সৌন্দর্যসম্ভোগ যার অপর দিক। সারদামঙ্গল-এ প্রাণময়ী প্রকৃতির নিঃশব্দ সংগীত ধ্বনিত হয়েছে। কবি নতুন দৃষ্টিতে অনন্তরূপ প্রকৃতির দিকে চেয়েছেন এবং প্রকৃতির মর্মলোকের দ্বার উদঘাটনের চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতো একেবারে প্রকৃতির গোপন অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে না পারলেও দূরবর্তী জগতের অদৃষ্ট সৌন্দর্য তাঁর কাব্যেই প্রথম ফুটে ওঠে। তপোবনের অন্ধকার বর্ণনায়, উষাসম্ভব অরুণোদয়ের দৃশ্যে কবি অতুলনীয় সৌন্দর্যভাবুকতার পরিচয় দিয়েছেন। গগনচুম্বী হিমালয়ের বিরাটত্ব, ধ্যানগন্তীর গিরিশিখরের মহিমা, কালজয়ী অক্ষয় অরণ্য থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র-খণ্ড কোমলকান্ত মাধুর্যের বিস্ময় তাঁর কাব্যে রূপে-ভাবে সার্থক হয়েছে।

আধুনিক গীতিকবিতার জনক হিসেবে বিহারীলালের কাব্যসাধনার অন্যতম একটি দিক—প্রেম ও সৌন্দর্যবোধ সম্পর্কে বিশিষ্ট দার্শনিক মনোভঙ্গি। এতে দেখা যায় প্রেমের অসীম বিস্তারের মধ্যে সৌন্দর্যের অনির্বচনীয় উৎসার। এ যেন অতি স্বাভাবিক পারস্পর্যে গাঁথা। মনের প্রীতি ভালোবাসার ভেতর থেকে উঠে কেমনে গেল খুলি; দ্বিতীয় পর্বে ক্রমাভিব্যক্তির পথে বহির্বিশ্বের সৌন্দর্য হৃদয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করে—‘জগত আসি সেথা

করিছে কোলাকুলি’। এই সৌন্দর্যচর্চা যেমন ‘ইউটিলিটি বা লোককল্যাণে’র সঙ্গে যুক্ত নয়, তেমনই ‘রসের বিলাসমাত্র’ও নয়। মোহিতলাল মজুমদার এ প্রসঙ্গে বলেন—‘...এই প্রেম হইতেই সেই মহিমায় অধিষ্ঠান করিতেছে...।’-সারদা কবির কাছে ‘বিশ্ববিমোহিনী মায়া’। তাই কোনও বিশেষ আদর্শ, ধর্মনীতি বা তত্ত্ব নয় শুধু প্রীতির চোখে জগৎ ও জীবনের দিকে তাকিয়ে তিনি যে পুলক-শিহরণ, আনন্দ-বিস্ময় সাধারণ ধর্মবিশ্বাসের সাধারণে না রেখে নিজের রসচর্চার নিভৃত এবং একান্ত সঙ্গিনীরূপে বরণ করে নিয়েছেন। অতঃপর এই দেবীর প্রকৃতি আর প্রচলিত দেবীর প্রকৃতি থাকেনি, তাকে কবি গড়ে নিয়েছেন নিজের মনের মতো করে। এই আত্মভাবসর্বস্ব রূপদৃষ্টির প্রতিফলনেই সারদামঙ্গল স্বাতন্ত্র্যে মণ্ডিত। বিশ্বসৃষ্টির অন্তর্নিহিতা, বিশ্বসৌন্দর্যের আধারভূতা দেবীই বিহারীলালের কাব্যে কবিমানসী রূপে প্রকাশিত।

বিহারীলালের কবি চেতনায় গভীর রেখায় মুদ্রিত হয়ে আছে তাঁর বিষাদবিধুরতা।

সর্বদাই হু হু করে মন

বিশ্ব যেন মরুর মতন।...

অপার সৌন্দর্য ও অনন্ত প্রেমের পিপাসায় কাতর কবিহৃদয়। তারই দীর্ঘশ্বাস রবীন্দ্রনাথের মর্মে যথাসময়ে পৌঁছেছে। এই প্রসঙ্গে বিশ্বকবির উক্তি—‘যে ভাবের উদয়ে পরিচিত গৃহকে প্রবাস মনে হয় এবং অপরিচিত বিশ্বের জন্য মন কেমন করিতে থাকে, বিহারীলালের ছন্দেই সেই ভাবের প্রথম প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছিলাম’। কল্পস্বর্গবাসিনী অতীন্দ্রিয় বাসনালোকের সঙ্গে বিরহবিচ্ছেদ যন্ত্রণা অনুভব করেন। এই যন্ত্রণার অনুভব থেকে সৃষ্টির উৎসার। পৃথিবীর তাবৎ প্রাণীর জন্মদানের ক্ষেত্রে যে যন্ত্রণা অবশ্যম্ভাবী, এ যেন তারই উপমা। সৃষ্টির ব্যাকুলতায় এই বেদনাকে পাশ্চাত্যদেশীয় আলোচক ‘বেদনাবিলাস’ নামে আখ্যাত করেছেন। আত্মভাবুক হৃদয়ের এমন বেদনাবিলাস বিহারীলালের পূর্বে বাংলাভাষায় কোনও কবিকণ্ঠে উচ্চারিত হয় নি। তবে বিহারীলালের এই বেদনার কারণ যেমন অনির্দিষ্ট বেদনার স্বরূপও তেমনি অস্পষ্ট ও অস্ফুট—

কিছুতেই যখন তোমায় না পেলেম

একেবারে আমি যেন কি হয়ে গেলেম।

‘সৌন্দর্যের সঙ্গে অজানা বিস্ময়ের যোগ রোমান্টিকতার প্রাণবস্ত’। অভাবনীয় অশ্রুতপূর্ব অভিজ্ঞতার সাক্ষাৎজনিত কারণে বিস্ময়বোধ সৃষ্টি হয়। অকস্মাৎ চিত্তাকাশ উদ্ভাসিত হয় অচেনা আলোর ঝলকানিতে। দূর দূরান্তের অপরিচিত কোন ইশারায় হৃদয়ানুভূতির সুতীর উচ্ছ্বাস প্রকাশ পায়। কবি বিহারীলালের কবিতায় সেই অধরা মাধুরীকে প্রথম বাংলার কাব্যঙ্গনে বিধৃত করবার আয়োজন দেখা গেল। মর্ত্যজগতের সৌন্দর্যসুষমাকে অবলম্বন করেই দূরাভিসারের পথে পথিক হলেন কবি। নারী ও প্রকৃতিজগৎ প্রেম ও সৌন্দর্যের মধুরতায় অভিষিক্ত করেছে তাঁর অন্তরলোকে। প্রীতির মধ্যে দিয়ে অনন্তের আভাস, বিস্ময়বোধ থেকে চিন্তের বিস্ফোর। বিহারীলাল যে ‘কুহকিনী মায়া’ শক্তির কথা বলেছেন, তারই দাক্ষিণ্যে কবিত্বশক্তির জাগরণ। বাইরের কোনো বস্তু বা ঘটনা দ্বারা কবির চিত্ত আশ্বস্ত হয় না। বহির্নিরপেক্ষ আত্মকেন্দ্রিক ভাবতন্ময়তা দিয়ে, নিজের মনের আশ্চর্য ঐশ্বর্য দিয়ে কবি তখন অতৃপ্তি ও অপূর্ণতার অভিজ্ঞতাকে ভরিয়ে তোলার সাধনা করেন। অধ্যাপক

শশিভূষণ দাশগুপ্তের ভাষায়—“রোমান্টিকের কাজ করবার তাই বাহিরের জগৎ লইয়া নহে, বাহিরের জগৎ লইয়া খুশি হইতে না পারিয়া যে ফিরিয়া আসে মনের রাজ্যে—যেখানে নিজের মনের সঞ্চিত সম্পদ ঢালিয়া সে বাহিরের জগৎকে নূতন করিয়া বাস্তবের অপূর্ণতাকে অন্তরের প্রাচুর্যে পূর্ণ করিয়া লয়। বাহির হইতে এইরূপ অন্তরে ফিরিয়া আসা এবং অন্তরে হইতে রহস্যের জাল বুনিয়া বহির্বস্তুর উপরে তাহার আরোপ ইহাই যথার্থ রোমান্টিক ধর্ম।” বস্তুতঃ রোমান্টিকতা হলো অতীন্দ্রিয় রহস্যের প্রতি অজানা বিস্ময়জনিত এক দুর্নিবার আকর্ষণ। তার সঙ্গে অপ্রাপ্তির বেদনা কবির হৃদয়মথিত দীর্ঘশ্বাস জাগিয়ে তোলে। রোমান্টিক কবিধর্মের এই সমস্ত লক্ষণ ‘সারদামঙ্গল’ কাব্যের কবি বিহারীলালের কবিচেতনায় ধরা পড়েছে। তবে একথাও অবশ্য উল্লেখ্য যে প্রথম যুগের গীতিকবি হিসাবে তাঁর ভাবানুভূতি যত প্রগাঢ়, তার বহিঃপ্রকাশ সমানভাবে সফলতা অর্জন করেনি।

৬.২.৫.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

- ১। ‘সারদামঙ্গল’ কাব্যের প্রকাশ কাল কত?
- ২। বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিমানস সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা করে।

৬.২.৫.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

- | | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| ১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | : | আধুনিক সাহিত্য |
| ২। শশিভূষণ দাশগুপ্ত | : | বাংলা সাহিত্যের নবযুগ |
| ৩। তারাপদ মুখোপাধ্যায় | : | আধুনিক বাংলা কাব্য |
| ৪। মোহিতলাল মজুমদার | : | সাহিত্যবিদ্যান |
| ৫। ভবতোষ দত্ত | : | কাব্যবাণী |

পর্যায় গ্রন্থ-২
সারদামঙ্গল : বিহারীলাল চক্রবর্তী
একক-৬
বিহারীলালের ত্রিবিধ বিরহ

বিন্যাস ক্রম :

৬.২.৬.১	:	বিহারীলালের ত্রিবিধ বিরহ
৬.২.৬.২	:	“ত্রিকালের ত্রিবিধ সরস্বতী”
৬.২.৬.৩	:	আদর্শ প্রস্ফাবলি
৬.২.৬.৪	:	সহায়ক গ্রন্থাবলি

৬.২.৬.১ : বিহারীলালের ত্রিবিধ বিরহ

সারদামঙ্গল কাব্য রচনা প্রসঙ্গে কবি বিহারীলালের একটি বিবৃতি পাওয়া যায়। একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে বন্ধু অনাথবন্ধু রায় মহাশয়কে লেখা কবির সেই একান্ত উক্তি সারদামঙ্গল-রচনার উৎস সূত্র বিষয়ে আলোকপাত করে। কবি লিখেছেন :

“মৈত্রীবিরহ, প্রীতিবিরহ, সরস্বতীবিরহ যুগপৎ ত্রিবিধ বিরহে উন্মত্তবৎ হইয়া আমি ‘সারদামঙ্গল’ রচনা করি।”

অর্থাৎ সারদামঙ্গল রচনার পেছনে কবিমনের যে বিশেষ অবস্থা ও প্রক্রিয়া কাজ করেছে—তা তাঁর বিরহচেতনা। বিহারীলালের ব্যক্তিগত অনুভবনের প্রকাশ যখন এই চিঠিতে স্থান পেয়েছে, তখন তাঁর ব্যক্তিজীবনের কেন্দ্র থেকে বিরহ সম্পর্কিত বেদনার কারণ ও তথ্য অনুসন্ধান করা অসম্ভব হবে না।

চিঠিতে ব্যবহৃত প্রথম শব্দ ‘মৈত্রীবিরহ’ প্রসঙ্গের বিস্তৃত পরিচয় রয়েছে কবির পূর্বতন একটি কাব্য ‘বন্ধুবিয়োগ’-এ। নাম থেকেই অনুমিত হয় কবির জীবনে মিত্রবিচ্ছেদে তিনি নিজের শোক-তাপজনিত অনুভূতির রূপায়ণ ঘটিয়েছেন তাঁর এই কাব্যে। বিহারীলালের যৌবনসমাগম হবার মধ্যেই বেশ কয়েকজন প্রিয় বন্ধু, ছোটোবেলার খেলার সাথীকে হারান তিনি। এঁদের নামও বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া যায়—পূর্ণচন্দ্র, বিজয়, রামচন্দ্র, কৈলাস, প্রভৃতি। শৈশব ও বাল্যবস্থার বন্ধুত্ব, যা কিনা ‘রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে থাকে,’ তাকে কবি বিরহবেদনার হতাশ্বাসের রঙে ধূসর ও ব্যাকুল চিন্তের দীর্ঘশ্বাসে মুখর করে তুলেছেন। ‘বন্ধুবিয়োগ’ কাব্যে বিরহবেদনার বিবৃতিমুখ্যতা আছে, কিন্তু

কবি লিখেছেন—“মৈত্রীবিরহ, প্রীতিবিরহ, সরস্বতীবিরহ যুগপৎ ত্রিবিধ বিরহে উন্মত্তবৎ হইয়া আমি ‘সারদামঙ্গল’ রচনা করি।” ‘মৈত্রীবিরহে’ কবির জীবনে মিত্র বিচ্ছেদে নিজের শোক-তাপজনিত অনুভূতির রূপায়ণ ঘটিয়েছেন তাঁর এই কাব্যে। ‘প্রীতিবিরহে’ কবির প্রথমা স্ত্রীর জন্য শোক ও বিরহযাতনা হৃদয়ের গভীর কক্ষে চিরস্থায়ী সংবেদনরূপে থেকে গিয়েছিল। ‘সরস্বতীবিরহে’ লক্ষ করা যায় বন্ধুদের অকালপ্রয়াণ, প্রিয়তমা পত্নীর আকস্মিক মৃত্যু—এইসব বেদনার কথা, যাঁর আনুকূল্য ও সহায়তা পেলে ভাষায় ফুটে উঠতে পারে তাকে অর্থাৎ বাগ্‌দেবী সরস্বতীকে ও ধ্যানাসনে না পাওয়ার জন্য তীব্র বেদনাবোধে কবির হৃদয় জর্জরিত।

কবিত্ব বা কলাকৌশল কিছুই নেই। তবে যে বিশেষ গুণে সেই বিবরণ আমাদের অন্তর স্পর্শ করে, তা হলো আন্তরিকতা। বিহারীলালের কবিপ্রাণের এই বিশেষ দিকটি বন্ধুবিরোগ কাব্যে প্রথম এমন অকৃত্রিম প্রবাদে পাঠকের কাছে প্রত্যক্ষ হয়েছে। কিন্তু সাধারণ বেদনা সামান্য ও নৈর্ব্যক্তিক স্তরে অভিব্যক্ত হবার জন্য কবির মর্মলোক আলোড়ন সৃষ্টি করবে—এই স্বাভাবিক। বিশেষত বিহারীলালের মতো একজন উৎকৃষ্ট কবির মনোলোকে সম্বৃত আবেগ ও বেদনার বিশেষ কল্পনাশক্তিকে যথাযথভাবে সংকেতিত না করা পর্যন্ত তিনি যে আশ্বস্ত হতে পারেন না—এও আমরা অনুমান করতে পারি। কবির ‘মৈত্রীবিরহ’ সেজন্যই ‘বন্ধুবিরোগ’ কাব্য রচনার পরেও কোনও প্রকৃত আধারে রূপ পাবার অপেক্ষায় দীর্ঘদিন অতিবাহিত করেছে। ‘সারদামঙ্গলে’ হয়তো বা তার সারাৎসার প্রস্তুত প্রতিপাদ্যরূপে কবির চরিতার্থতার পথ করে নিয়েছে।

‘প্ৰীতিবিরহ’ সারদামঙ্গলে কাব্যপ্রয়াসের অন্যতম সূত্রস্বরূপ। প্ৰীতি শব্দটির বহু অর্থ ও ব্যঞ্জনা থাকলেও এখানে প্রেমসম্পর্ক বোঝাতেই এর ব্যবহার হয়েছে। কেননা বাল্যকালে বন্ধুবিরোগের মতো বিহারীলালের জীবনে স্ত্রী-বিরোগের শোকও ঘনিয়ে এসেছিল নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশে। উনিশ বছর বয়সে কালিদাস মুখোপাধ্যায়ের কন্যা অভয়ার সঙ্গে কবির বিবাহ হয়। বিবাহের আগে থেকেই অভয়া দেবী কবির পরিচিতা ছিলেন। গভীর প্ৰীতিবন্ধনে আবদ্ধ হলেন তাঁরা। কিন্তু এই সুখাবেশ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। প্রথম সন্তানের জন্মদান করতে গিয়ে কবিপত্নী কবির জীবন তথা মর্ত্যসংসার থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করলেন। পরবর্তীকালে বিহারীলাল পুনরায় বিবাহ করেন, স্ত্রী পুত্রপরিবারসহ জীবননির্বাহ তাঁর যথাযথভাবেই হয়েছিল। কিন্তু প্রথমা স্ত্রীর জন্য শোক ও বিরহযাতনা হৃদয়ের গভীর কক্ষে চিরস্থায়ী সংবেদনরূপে থেকে গিয়েছিল। কবির ভাষায় এই হলো ‘প্ৰীতিবিরহ’। তবে একে কিছুটা নির্বন্ধকভাবে দেখলে মনে হয়—প্রেমের কল্পনায়নের ক্ষেত্র যিনি আলোকোদ্ভাসনে উদ্দীপিত করেছেন, তাঁকে, অর্থাৎ সেই আদর্শ প্রেমিকাকে না পাওয়ার বেদনাই প্ৰীতিবিরহ।

তৃতীয় যে বিরহবোধের উল্লেখ কবির পত্রে পাওয়া যায় তা ‘সরস্বতীবিরহ’। বিহারীলালের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতায় পাওয়া শোক-তাপ-অশ্রু-কান্না যখন কালের পরিশ্রুতিকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে নৈর্ব্যক্তিক উপলব্ধিতে পৌঁছেছে, তখন সেই ভাব নিজের মধ্যে থেকে সর্বব্যাপ্ত আবেদনে অভিব্যক্ত হবার জন্য ভাষা খুঁজেছে, আধারের অন্বেষণে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাকে যথাযথ অবয়ব দান করতে গিয়ে যে বেদনার, অসহায়তা ও অতৃপ্তির অনুভব তাঁকে পীড়িত করেছে, তাকেই কবি বলেছেন ‘সরস্বতীবিরহ’। বস্তুত সরস্বতী ও সারদা একই দেবীর ভিন্ন নাম। কিন্তু আমরা জানি যে বিহারীলালের সৃজনে ‘সারদা’ এক অভিনব সৃষ্টি। তিনি প্রেম-আকৃতি-সৌন্দর্যের সারাৎসারসম্ভূতা কবিচিন্তলোকবিহারী অনির্বচনীয় সত্তা। সেই ‘সারদা’র অধরা সৌন্দর্যের জন্য চিরন্তন কবিচিন্তের চিরকালের যে রোমান্টিক হাহাকার ঠিক তা যেন ‘সরস্বতীবিরহের’ মধ্যে উচ্চারিত হয়নি। তাহলে কবি ‘সারদাবিরহ’ বলেই তাকে আখ্যাত করতে পারতেন। বরং ‘সারদামঙ্গল’ রচনার প্রেরণারূপে মৈত্রী ও প্ৰীতি বিরহবোধ থেকে এক অধরা অনির্দেশ্য বেদনার সূচনা। এমন নির্বন্ধক ভাবকে রূপদান করতে গিয়ে কবির অশাস্ত ও অতৃপ্ত হৃদয়ের আশঙ্কাজনিত বেদনাই ‘সরস্বতীবিরহ’।

বন্ধুদের অকালপ্রয়াণ, প্রিয়তমা পত্নীর আকস্মিক মৃত্যু—এইসব বেদনার কথা যাঁর আনুকূল্য ও সহায়তা পেলে ভাষায় ফুটে উঠতে পারে তাঁকে অর্থাৎ বাগ্দেরী সরস্বতীকেও ধ্যানাসনে না পাওয়ার জন্য তীব্র বেদনাবোধ—সুহৃদ-প্রেয়সী-সরস্বতী এইভাবেই বিরহডোরে বাঁধা পড়েছে কবির হৃদয়গহনে। এই হাহাকার আর নিরাশাজনিত শূন্যতাবোধ থেকে কবির মনের অবস্থা চরম আকার নেয়—যাকে স্বয়ং কবি বলেছেন ‘উন্মত্তবৎ’।

বলা বাহুল্য এই উন্মত্ততা বাতুলতা নয়। বিরহজনিত বেদনাবোধ যে নিবিড় গভীর আকাঙ্ক্ষার দ্বারা আলোড়িত হলে সৃষ্টির সূচনা হয় কবিহৃদয়ের তদবস্থাকেই বিহারীলাল বলেছেন “উন্মত্তবৎ”।

৬.২.৬.২ : “ত্রিকালের ত্রিবিধ সরস্বতী”

পূর্বোক্ত পত্রে বন্ধু অনাথবন্ধু দাসকে কবি বিহারীলাল সারদামঙ্গল কাব্য পরিকল্পনার আরও কিছু সূত্র দিয়েছেন : ‘সহসা বাল্মীকি মুনির পূর্ববর্তীকাল মনে উদয় হইল, তৎপরে বাল্মীকির কাল, তৎপরে কালিদাসের কাল। এই ত্রিকালের ত্রিবিধ সরস্বতী মূর্তি রচনাসূত্র আমার চির আনন্দময়ী বিষাদিনী সারদা কখন স্পষ্ট, কখন অস্পষ্ট, কখন বা তিরোহিতভাবে বিরাজ করিতে লাগলেন। বলাবাহুল্য যে এই বিষাদময়ী মূর্তির সহিত বিরহিত মৈত্রী প্রীতির ম্লান করুণামূর্তি মিশ্রিত হইয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।’

আসলে সরস্বতীর সর্বময় আসনটিকে কবি নিজ হৃদয়ে একান্ত নিজস্ব ভাব ও রূপদান করে পেতে নিয়েছেন। কবির আপন প্রিয়র রূপ, সৌন্দর্যরস সবই তিনি ঢেলে দিয়েছেন সারদার ভাবমূর্তিতে। বাল্মীকির পরবর্তী কাল বা কালিদাসের কালের সরস্বতী চিত্রণ সারদা-মঙ্গল কাব্যের বিশিষ্ট অংশ।

কবির উক্তি থেকে বোঝা যায় সর্বকালের দেবী সরস্বতী আর কবির সারদা এক হয়েও এক নয়। আসলে সরস্বতীর সর্বময় আসনটিকে কবি নিজ হৃদয়ে একান্ত নিজস্ব ভাব ও রূপ দান করে পেতে নিয়েছেন। কবির আপন প্রিয়র রূপ, সৌন্দর্যরস সবই তিনি ঢেলে দিয়েছেন সারদার ভাবমূর্তিতে। এখন তিনকাল আর তার দর্পণে বিস্তৃত সরস্বতীর রসমূর্তির পরিচয় নেওয়া যেতে পারে।

বাল্মীকির পূর্ববর্তীকালের সরস্বতীর রূপসৃষ্টি সারদামঙ্গল কাব্যের প্রথম সর্গের আদি দৃশ্য। এ যেন বৈদিক যুগের উন্মেষ লগ্ন। মানুষের অজ্ঞানতার অন্ধতামস যখন ঘটেনি তখন জ্ঞানরূপা, প্রজ্জালোকবিকাশিনী দেবীর আবির্ভাব। অরুণসম্ভবা উষারূপিনী দেবী। অচিরেই অন্ধকার দিক্চক্রবালকে গোলাপী আভায় অভিষিক্ত করে, সীমন্তে শুকতারার ধারণ করে সর্ববোধ ও বিদ্যা, জ্ঞান ও শিক্ষাদাত্রী দেবী আবির্ভূত হলেন। এই দেবীকে জ্ঞানময়ী বলে আমরা সম্বোধিত করতে পারি।

পরবর্তী পর্যায়ে যে কালের প্রেক্ষিতটি গ্রহণ করা হয়েছে সেটি বহু পরিচিত বাল্মীকির কাল। হিমালয় পর্বতপ্রদেশে তমসা নদীর তটভূমিতে বাল্মীকির তপোবন। ভাবাবেশে বিহ্বল ঋষিবর সহসা একটি শোকদৃশ্য দেখতে পেলেন। নিভৃত আলাপনরত একজোড়া ক্রৌঞ্চকে গাছের শাখায় উপবিষ্ট দেখতে পেয়ে এক নিষাদ পুরুষ পাখিটিকে নিপুণ শরচালনায় বিদ্ধ করল। ক্রৌঞ্চ প্রাণত্যাগ করে ভূপতিত হলো এবং তার সঙ্গিনী ক্রৌঞ্চী আর্ত ক্রন্দনে অরণ্যস্থলকে মর্মাহত করে শোক প্রকাশ করতে লাগল। এই দৃশ্য দেখে বাল্মীকির হৃদয় শোকে পরিপ্লুত হয়ে গেল। তাঁর ললাট-কেন্দ্রবিন্দুতে জেগে উঠলেন প্রতিভা তথা সৃষ্টিশক্তির উন্মেষকারিণী সরস্বতী। বাল্মীকির কণ্ঠে শ্লোকাধিষ্ঠাত্রী দেবী পদ্মাসনা এভাবেই তাঁকে কবিত্বশক্তিতে উদ্বোধিত করলেন। শোকের দৃশ্য থেকে শোকের ভাব এবং শোকের ভাব থেকে আবার কীভাবে সৃষ্টির শক্তি জাগ্রত হলো বাল্মীকির কালের সরস্বতীর মধ্যে তারই অনুভূতিময় চিত্রণ—

চন্দ্র নয়, সূর্য নয়

সমুজ্জ্বল শান্তিময়

ঋষির ললাটে আজি না জানি কি জ্বলে!

“বাহিরের জগতে যিনি ছিলেন উষারূপিণী, তিনিই এখন করুণারূপিণী কন্যা হয়ে শোক সঙ্গীতে মুনি-হৃদয়ে করুণাসিঙ্কু উদ্বেল করে তুললেন। যোগাসনে বসে যোগেন্দ্র অর্ধনিমীলিত নেত্রে এই করুণারূপিণী কাব্যার্থিষ্ঠাত্রী দেবীর ধ্যান করেন,” সে দিক থেকে কবিও যোগীন্দ্র। কমলার ঐশ্বর্য বা পার্থিব সম্পদে তাঁর আগ্রহ নেই। করুণা বা সংবেদনশীল অনুভূতিপ্রাণতার জন্যই তাঁর সাধনা। বাল্মীকির কালের সরস্বতী তাই করুণাময়ী রূপে অভিষিক্ত।

বাল্মীকির পরবর্তীকালে বা কালিদাসের কালের সরস্বতীচিত্রণ সারদা-মঙ্গল কাব্যের বিশিষ্ট অংশ। বহির্লোক বা প্রকৃতিলোক থেকে যে-জ্ঞানময়ী কবির হৃদপদ্মাসনে করুণারূপে আশ্রয় নেন, তাঁকে কালিদাসের কালে রূপময়ী হয়ে ব্রহ্মার মানস সরোবরে ক্রীড়া করতে দেখি। ইনি সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীস্বরূপা। সূর্যের আলোয় যেমন জগৎ আলোময় হয়, তেমনি দেবীর সৌন্দর্যচ্ছুটায় প্রাণে ও প্রকৃতিতে সৌন্দর্যের নিষেক।

এই তিন কালের ত্রিবিধ সরস্বতীর সারসভা কবিমনের রাসায়নিক ক্রিয়াবলে হয়ে ওঠেন সারদা—যিনি সার দান করেন।

৬.২.৬.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

- ১। ‘মৈত্রীবিরহ’ প্রসঙ্গে কবির মনোভাব কি?
- ২। ‘প্ৰীতিবিরহ’ কী?
- ৩। ‘সরস্বতী বিরহ’ কিসের ইঙ্গিত?

৬.২.৬.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

- | | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| ১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | : | আধুনিক সাহিত্য |
| ২। শশিভূষণ দাশগুপ্ত | : | বাংলা সাহিত্যের নবযুগ |
| ৩। তারাপদ মুখোপাধ্যায় | : | আধুনিক বাংলা কাব্য |
| ৪। মোহিতলাল মজুমদার | : | সাহিত্যবিদ্যান |
| ৫। ভবতোষ দত্ত | : | কাব্যবাণী |

পর্যায় গ্রন্থ-২

সারদামঙ্গল : বিহারীলাল চক্রবর্তী

একক-৭

নিসর্গপ্রীতি ও সৌন্দর্য চেতনা

বিন্যাস ক্রম :

- | | | |
|---------|---|---|
| ৬.২.৭.১ | : | ‘সারদামঙ্গল’-এ নিসর্গচেতনা/প্রকৃতিপ্রীতি |
| ৬.২.৭.২ | : | ‘সারদামঙ্গল’ কাব্যে বিহারীলালের সৌন্দর্যচেতনা |
| ৬.২.৭.৩ | : | আদর্শ প্রশ্নাবলি |
| ৬.২.৭.৪ | : | সহায়ক গ্রন্থাবলি |

৬.২.৭.১ : ‘সারদামঙ্গল’-এ নিসর্গচেতনা/প্রকৃতিপ্রীতি

রোমান্টিক কবিধর্মের অধিকারী যাঁরা, তাঁদের চেতনায় প্রকৃতির বিশেষ স্থান। প্রকৃতির মধ্যে শুধু একটি সত্তারই সন্ধান করে তাঁরা ক্ষান্ত হননি; জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ, সুগভীর শান্তি ও অনির্বচনীয় সুখের আশ্রয় রূপেও এই প্রকৃতিরই দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা। বিহারীলাল মনোধর্মের দিক থেকে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, কীটস প্রমুখের মতো প্রকৃতিবিলাসী কবি। তিনি প্রার্থিতা সৌন্দর্যলক্ষ্মী সারদাকে খুঁজেছেন এবং পেয়েছেন প্রকৃতির কোলে। বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি গভীর মমত্ববোধ, একটা রোমান্টিক ব্যাকুলতা ও রোমান্টিক বিষাদ, অগাধ সৌন্দর্যপিপাসা, আপনার মর্মলোকে ও নিসর্গসুন্দরীর অন্তর্লোকে সেই সুন্দরের স্বরূপসন্ধানই বিহারীলালের কবিতার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

রোমান্টিক কবি ধর্মের অধিকারী যাঁরা, তাদের চেতনায় প্রকৃতির বিশেষ স্থান। সজীব প্রকৃতির সঙ্গে কবি অন্তরঙ্গ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। বিহারীলালের প্রকৃতি চিত্রণ কেবল মনোরম নয়, পাঠকের হৃদয়কে তা নিবিড়ভাবে স্পর্শ করে। বিহারীলাল নতুন দৃষ্টিতে, রোমান্টিক মন নিয়ে নিসর্গ সুন্দরীর দ্বার উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছেন।

‘নিসর্গসন্দর্শন’ কাব্যগ্রন্থে ইতোপূর্বে প্রকৃতিপাঠের প্রস্তাবনা হয়েছিল, ‘সারদামঙ্গল’ কাব্যে তার পূর্ণতর প্রতিষ্ঠা। সজীব প্রকৃতির সঙ্গে কবি অন্তরঙ্গ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁর আগে কোনো কোনো বাঙালী কবির কাব্যে প্রকৃতিচিত্রণ থাকলেও এদের কারও রচনায় প্রকৃতি তার মোহময় রহস্যময় জীবন্ত স্বরূপে চিত্রিত হয়নি। বিহারীলালের প্রকৃতিচিত্রণ কেবল মনোরম নয়, পাঠকের হৃদয়কে তা নিবিড়ভাবে স্পর্শ করে। প্রকৃতির গোপন অন্তঃপুরে যে সীমাহীন রহস্যময়তা আছে, কবি তা কিয়দংশে প্রমাণ করেছিলেন। তাই তাঁর কাব্যপটে বিশ্বের অন্তর্নিহিত আনন্দস্বরূপ পাঠকের সামনে ভেসে ওঠে। প্রকৃতি নিজের এক স্বতন্ত্র সত্তা মোহময় মাধুর্য ও আনন্দস্বরূপতা নিয়ে এমন করে অন্য কোনো কবির কাছে ধরা দেয়নি। প্রাণময় প্রকৃতির আহ্বান রবীন্দ্রনাথ প্রথম শোনে বিহারীলালের কাব্যে—“যে ভাবের উদয়ে পরিচিত গৃহকে প্রবাস মনে হয় এবং অপরিচিত বিশ্বের জন্য মন কেমন করিতে থাকে, বিহারীলালের ছন্দেই সেই ভাবের প্রথম প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছিলাম”। এই কথাগুলির

লক্ষ্য কবির নিসর্গপ্রীতি। বিহারীলালের সমস্ত অপূর্ণতা রবীন্দ্রনাথে এসে পূর্ণতা লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক মনোধর্ম তাই অজ্ঞাতসারেই বিহারীলালের রচনার দিকে সাধর্ম্যসূত্রে আকৃষ্ট হয়েছিল। বিহারীলাল নতুন দৃষ্টিতে অনন্তরূপা প্রকৃতির দিকে চেয়েছেন—প্রকৃতির মর্মলোকের দ্বার উদঘাটনের চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতো একেবারে প্রকৃতির গোপন অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে না পারলেও দূরবর্তী জগতের অদৃশ্য সৌন্দর্য তাঁর কাব্যেই প্রথম ফুটে ওঠে। সারদামঙ্গল কাব্যে তপোবনের অন্ধকার প্রেক্ষিত, দিগন্তে উষা ও অরুণোদয়-দৃশ্যে কবি অতুলনীয় সৌন্দর্যভাবুকতার পরিচয় রেখেছেন। গগনচুম্বী হিমালয়ের বিরাটত্বের বিস্ময়, ধ্যানগন্তীর গিরিশিখরের মহিমায় বিস্ময়, কালজয়ী অক্ষয় অরণ্যের বিস্ময়, প্রকৃতিলোকে ক্ষুদ্র, খন্ড কোমলকান্ত মাধুর্যের নিত্য বিস্ময় তাঁর কাব্যে রূপে-বর্ণে-মাধুর্যে ফুটে উঠেছে।

ত্র্যাবারক্রম্বে সব দেশের কাব্যেই প্রকৃতিবর্ণনার অল্পবিস্তর তিনটি ধারা লক্ষ্য করেছেন। চিত্রময় বর্ণনা, মানবীয় ভাবের আরোপপূর্বক বর্ণনা এবং প্রকৃতি ও মানবমনের অস্বীয়ভূত বা অবিদ্যমান বর্ণনা। বিহারীলালের সারদামঙ্গলকাব্যে এই তিন রীতিরই প্রকৃতিবর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়। ব্যবহারিকতা ও বাস্তবিকতার দিক থেকে যেমন প্রকৃতিকে দেখা হয়েছে, তেমনি প্রকৃতির বস্তুরূপ বিহারীলালের কবিকল্পনাস্পর্শে ভাবরূপে পরিণত হয়েছে। আবার প্রকৃতির সঙ্গে অনবচ্ছিন্ন সম্পর্ক স্থাপন করার ফলেই প্রকৃতিকে সম্বোধন করে বলতে পেরেছেন—

কোথা গো প্রকৃতি সতী সে রূপ তোমার!

৬.২.৭.২ : সারদামঙ্গল কাব্যে বিহারীলালের সৌন্দর্যচেতনা

মানুষের মনে সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ চিরন্তন। উনিশ শতকীয় কাব্যচর্চায় সৌন্দর্যের যে বিশিষ্ট ও অভিনব তাৎপর্য রূপ পরিগ্রহ করেছে, তার রূপকার বিহারীলাল চক্রবর্তী। যে যুগে হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের কাব্য, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পাঠক মহৎ প্রবৃত্তির নাটকীয় রূপায়ণ স্ফীতবক্ষে আত্মদান করছিল, তখন ‘ভোরের পাখি’ বিহারীলাল একান্তভাবেই আত্মমগ্ন ভাবব্যাকুলতা দিয়ে ব্যক্তিমনের আবেগ অনুভূতির স্বতোৎসারিত প্রকাশ ঘটালেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় কবি বিহারীলালের কবিপ্রাণের যথাযথ নির্দেশ পাওয়া যায়—“বিহারীলাল তখনকার ইংরেজি ভাষায় নব্য শিক্ষিত কবিদিগের ন্যায় যুদ্ধবর্ণনাসঙ্কুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না এবং পুরাতন কবিদিগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না—তিনি নিভূতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন। তাঁহার সেই স্বগত উক্তিভিত্তি বিশ্বহিত, দেশহিত অথবা সভামনোরঞ্জনের কোন উদ্দেশ্য দেখা গেল না।’

মানুষের মনে সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ চিরন্তন।
বিহারীলাল সৌন্দর্যকে আত্মকেন্দ্রিক অভিভবে যেমন
করে পেয়েছেন, তা হল অনুপ্রেরণা। সেই সঙ্গে
আবার যুক্ত হয়ে আছে মঙ্গল ও কল্যাণের বোধ।
কবির প্রীতি মুগ্ধ সৌন্দর্য রসিকের দৃষ্টি বিশ্ববস্তুর
সঙ্গে সেতুবন্ধন রচনা করেছে।

উদ্ধৃতিটি অনুধাবন করতে পারলেই বিহারীলালের সৌন্দর্যপ্রেরণার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হয়।

বিহারীলালের সারদা সৌন্দর্যের দেবী। কবির অন্তরের প্রেম-প্রীতির শতদলে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁর কল্পস্বর্গের ইন্দ্রাণীকে। ‘তন্ত্রের সর্ববস্তুর মূলধাররূপিণী মহাদেবীকে কবি গড়ে নিয়েছেন নিজের আকাঙ্ক্ষা

ও সৌন্দর্যধ্যানের আলোয়। বিশ্বব্যাপ্ত সৌন্দর্যতরঙ্গ কবির হৃদয়ানুভূতিতে তথা নিরাসক্ত প্রেমদৃষ্টিস্পর্শে সমস্ত প্রয়োজনের অতীত এক অনির্বচনীয় মাধুরীলতার সৃষ্টি করেছে। সারদাকে কবি ‘করুণা’ নামেও অভিহিত করেছেন। এই করুণাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ‘প্রকৃতির অপর নাম প্রেম’। তার সর্বদাই চেষ্টা থাকে সামঞ্জস্য স্থাপনের। সামঞ্জস্যস্থাপনা সৌন্দর্যের অন্যতম ধর্ম। তাই সারদা একদিকে প্রেম-প্ৰীতির উৎসরূপিণী আবার অন্যদিকে ‘মানবমনের উদার সুষমা’র মধ্যে দিয়েই জগৎচরাচরের সৌন্দর্যপ্রভা। বিহারীলালের সৌন্দর্যচেতনার এই মূল কথা। এ ছাড়া বিহারীলালের সৌন্দর্যসাধনায় অনেকে ইংরেজী রোমান্টিক কবিদের ভাবনার মিল খুঁজে পেয়েছেন। অবশ্য বায়রণ ছাড়া আর কোনও পাশ্চাত্য দেশীয় কবির কাব্যের সঙ্গে বিহারীলালের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল এমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তথাপি সাদৃশ্যের কথা যখন আসে, তখন মহৎ প্রতিভার চিন্তার সদৃশতা হিসেবে তাকে গ্রহণ করা যেতে পারে।

বিহারীলাল সৌন্দর্যকে আত্মকেন্দ্রিক অভিভবে যেমন করে পেয়েছেন, তাকে বলা যেতে পারে অনুপ্রেরণা। এই অনুপ্রেরণা ব্যাখ্যাতে বলে রহস্যময়ও বটে। তার সঙ্গে গোড়া থেকেই আবার যুক্ত হয়ে আছে মঙ্গল ও কল্যাণের বোধ। প্রীতিকল্যাণশুদ্ধ ভাবতন্ময়তার মধ্যে সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে বরণ করেছেন বিহারীলাল। তিনি যে ‘কায়াহীন মহাছায়া’র কথা বলেছেন, তাতে মনে হয় বস্তুকে অস্বীকার করেছেন তিনি। অথচ তাঁরই উক্তি থেকে পাই ‘বিশ্ব গেছে কান্তি আছে অনুভবে আসে না’—এ থেকে বোঝা যায় তাঁর প্রীতিমুগ্ধ সৌন্দর্যরসিকের দৃষ্টি বিশ্ববস্তুর সঙ্গে সেতুবন্ধন রচনা করেই সার্থক শিল্পীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

৬.২.৭.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

- ১। প্রকৃতি প্রীতি কি?
- ২। রোমান্টিক ব্যাকুলতা ‘সারদামঙ্গল’ কাব্যে লক্ষ করা যায় কি?
- ৩। ‘সারদামঙ্গল’ কাব্যের সৌন্দর্য ভাবনা উল্লেখ কর?

৬.২.৭.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

- | | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| ১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | : | আধুনিক সাহিত্য |
| ২। শশিভূষণ দাশগুপ্ত | : | বাংলা সাহিত্যের নবযুগ |
| ৩। তারাপদ মুখোপাধ্যায় | : | আধুনিক বাংলা কাব্য |
| ৪। মোহিতলাল মজুমদার | : | সাহিত্যবিদ্যান |
| ৫। ভবতোষ দত্ত | : | কাব্যবাণী |

পর্যায় গ্রন্থ-২

সারদামঙ্গল : বিহারীলাল চক্রবর্তী

একক-৮

সারদা সাধনার ত্রিস্তর : জাগর স্বপ্ন-সুষুপ্তি

বিন্যাস ক্রম :

৬.২.৮.১	:	সারদা স্বরূপ
৬.২.৮.২	:	সারদা-সাধনার ত্রিস্তর : জাগর স্বপ্ন সুষুপ্তি
৬.২.৮.৩	:	আদর্শ প্রস্থাবলি
৬.২.৮.৪	:	সহায়ক গ্রন্থাবলি

৬.২.৮.১ : সারদা স্বরূপ

‘সারদামঙ্গল’ কাব্যে কবির উদ্দিষ্টা কবির কল্পলক্ষ্মী মানসসুন্দরী। বিশ্বসৃষ্টিতে ছড়িয়ে আছে যে অনন্ত সৌন্দর্য-মাধুর্য তাকেই আহরণ করে সৃষ্টি করেছেন সারদার রূপ প্রতিমা। সেই সারদার স্বরূপ এবং তার সম্পর্কে কবিমনের বিচিত্র ভাবও প্রতিক্রিয়ার সমন্বিত প্রকাশ সারদামঙ্গল কাব্যের বিষয়বস্তু। সারদার সঙ্গে কবির মিলনবিরহলীলা এবং সারদাকে অবলম্বন করে কবিহৃদয়ের সীমাহীন ব্যাকুলতার আত্মলীন ভাবোচ্ছ্বাস বাংলা কাব্যসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য ও অভিনব সম্পদস্বরূপ।

সারদামঙ্গলের সারদা-কল্পনার মূলে কবিচিন্তের বিরহলোক কীভাবে পশ্চাৎপট রচনা করেছে, তা কবির

বিরহ ও মিলনের মধ্যে বিরহই বিহারীলালের অভিপ্রেত। সারদাচেতনা কবির জীবনে ঈশ্বর ভক্তির তুলনায় অন্যতর এক চেতনা। দেবী কখনও জননী, কখনও নন্দিনী আবার কখনও বা প্রেমময়ী। কবির ‘বীণাপানি চন্দ্রাননাই’ হয়ে উঠেছেন তাঁর ‘নয়ন অমৃত রাশি প্রেয়সী।’

একটি পত্র থেকে জানা যায় --- ‘মৈত্রীবিরহ প্রীতিবিরহ সরস্বতীবিরহ, যুগপৎ এই ত্রিবিধ বিরহে এই কাব্যের স্থায়ী ভাব বললে অত্যুক্তি হয় না। কাব্যের সূচনায় কবি একটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃতি করেছেন, তার সার কথা হল বিরহ ও মিলনের মধ্যে বিরহই কবির অভিপ্রেত। কেননা মিলনে যে প্রেয়সী একতমারূপে প্রাপ্ত, বিরহে তিনি ত্রিভুবনে পরিব্যাপ্তরূপে উপলব্ধ

হন। বিরহচেতনার মধ্যে দিয়ে পাওয়া বলেই বিশ্বসৌন্দর্য ও বিশ্বরহস্যের মূলাধাররূপে এক অখণ্ড সত্তা তাঁর আনন্দলক্ষ্মী সারদারূপে প্রতিভাত।

সারদার রূপমূর্তি সৃষ্টি করতে গিয়ে প্রথম সর্গের শুরুতেই কবি বাঙ্গালীর পূর্ববর্তী কালের প্রেক্ষিত গ্রহণ করেছেন। সেখানে সুস্বপ্নরূপিণী উষার পবিত্রসুন্দর পটভূমিতে কবির অন্তরবাসিনীর আহ্বান ও উষারই সৌন্দর্যবিকাশের সঙ্গে একাকার হয়ে তাঁর আর্বিভাব। তারপর বাঙ্গালীক মুনির কালে ক্রৌঞ্চ বধ এবং ক্রৌঞ্চ বধুর শোকের অভিঘাতে দেবীর যে রূপটি ধরা হলো, তিনি করুণারূপিণী। সংবেদনশীল অনুভবী চিন্তের কোমল

কারুণ্যে সম্ভব হলো সৃষ্টির প্রথম উন্মেষ। এরপর কালিদাসের কালে দেবী সৌন্দর্য ও আনন্দের প্রতিমূর্তিরূপে প্রতিভাত। জ্ঞানময়ী-করণাময়ী ও সৌন্দর্যময়ী এই ত্রিবিধ রূপ নিয়ে বিহারীলালের সারদা বিশ্ববিমোহিনীরূপে কবির অন্তরে অধিষ্ঠিত হলেন—‘মানসমরালী মম আনন্দরূপিণী’।

সারদামঙ্গল নামটি মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের অনুরূপ হওয়ার এবং মঙ্গলগীতের সঙ্গে এক পৌরাণিক দেবী সরস্বতীর নাম যুক্ত হয়ে থাকায় একে অভিনব মঙ্গলকাব্য বলে ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু উনিশ শতকে বিরচিত এই কাব্যে তথাকথিতভাবে দৈব মাহাত্ম্য প্রচার করে দেবতার কাছ থেকে ঐহিক শ্রীসম্পদ অর্জন করার কথা নেই। বিহারীলালের আরাধ্যা দেবী পুরাণ থেকে আহত হলেও পৌরাণিক অনুষ্ণ তাঁর কিছুই নেই, তিনি একান্তই কবিসত্তার লীলাসঙ্গিনী। সারদাচেতনা তাই কবিজীবনে ঈশ্বরভক্তি চেতনার তুলনায় অন্যতর, অতিরিক্ত এক চেতনা। তাঁকে সত্তার অভিন্নতায় প্রত্যক্ষ করেন কবি—

জাগরণে জাগ হেসে

ঘুমালে ঘুমাও শেষে

স্বপনে মন্দারমালা পরাইয়া দাও গলে!

এই দেবীকে প্রত্যক্ষভাবে ধরার উপায় নেই। অর্ধেক আলো ও অর্ধেক ছায়া তিনি—নানা আকারে ও ভাবে জগতে বিরাজিত। এই জগত একান্ত কবির সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিপুরুষের জগৎ। তাঁরই সাধনার তরতম অবস্থায় কখনও তিনি রোমান্টিক দূরাভিসারী প্রেমিক, কখনও মিস্টিক ভাবনিমজ্জিত ভক্ত। দেবী কখনও জননী, কখনও নন্দিনী আবার কখনও বা প্রেমময়ী। বিশ্বপ্রেম ও সৌন্দর্যকে এইভাবে নারীমূর্তিতে অভিযুক্ত করেছেন কবি। কখনও আবার পার্থিব প্রেমেরই উৎসার থেকে তাঁর সৌন্দর্যকল্পনা আকাশগঙ্গায় অবগাহন করেছে। অনুরাগ-বিহ্বল প্রেমিকের মতো কবি তাঁর অনন্দ ভালবাসা সেই প্রেমময়ীর চরণে উৎসর্গ করেছেন। ইংরেজ কবি শেলীর Spirit of Beauty-র সঙ্গে সারদার সাদৃশ্য আছে। এ আদর্শ সুন্দর বর্ণনাতীত। আপনার অনন্ত লীলায় আপনি পূর্ণবিকশিত ও অপরিমেয়। কিন্তু কাল্পনিক প্রতিমার আরাধনায় দেহমনের আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা আসে না। এই দ্বন্দ্বের অস্থিরতা ও নিরাশার হাহাকার সমস্ত রোমান্টিক কবির কবিতার নিশ্চয় লক্ষণ। এমন অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যের সাধনা যাকে আশ্রয় করে, সেই দেবী শুধু মাধুর্যময়ী নন, তিনি রহস্যময়ী ও ছলনাময়ী। রবীন্দ্রনাথের অভিব্যক্তিতে যিনি

চিরদিন মোরে হাসাল কাঁদাল

চিরদিন দিল ফাঁকি।

বিহারীলালের ভাষায়—

ফের একি আল এল!

কই কই কোথা গেল,

কেন এল দেখা দিল, লুকাল আবার?

কে আমারে অবিরত

খেপায় খেপার মত?

জীবন-কুসুম-লতা কোথারে আমার!

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন—‘তিনি যে বিশ্বের রহস্যজালকে ভেদ করিতে পারেন না তাহা নহে,—তিনি তাহা চানই না। একটা ঘন রহস্যের আবরণে বিশ্বের অন্তর্নিহিত দেবীকে অবগুপ্তি রাখিয়া একটু দূর হইতে অন্তরের ক্ষীণ দীপশিখা এবং ধূপের ধোঁয়ার আরতিতে শুধু তাহাকে অসীম মহিমময়ী করিয়া মুগ্ধ হইবার চেষ্টা—ইহাই তাঁহার সাধনা। তাই কবি বলিতেছেন—

‘রহস্য ভেদিতে তব আর আমি চাব না

না বুঝিয়া থাকা ভাল,

বুঝিলেই নেবে আলো,

সে মহাপ্রলয়পথে ভুলে কভু ধাব না।’

দার্শনিক পরিভাষায় বিহারীলালের সারদা ‘মায়া’। আবার বিরহমিলনের দোলায় কান্তি প্রেম ও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সঙ্গে কবির অশ্রুভারকরণ সম্পর্ক। কবির চিত্তসংকটের চিত্রও তাই সারদামঙ্গলে অপ্রতুল নয়—

দারুণ আগুন শুধু ধু ধু ধু ধু ধায়।

তবে নিরবয়ব সৌন্দর্যসত্তার মতো সারদা শুধু আকাশবিহারিণী নন—তিনি স্বর্গে মর্ত্যে, আবেগে ও বুদ্ধিতে, প্রজ্ঞায় ও হৃদয়ানুভূতিতে বিচরণ করেছেন। ব্যক্তিক সীমায় ও নৈর্ব্যক্তিক অসীমে তাঁর নিয়ত আনাগোনা! বিহারীলাল কাব্যপরিণামে যখন বলেন—

তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী

আমি ব্রহ্মান্ডের পতি

হোক গে এ বসুমতী যার খুশি তার।

তখন মনে হয় অনন্ত ও শাস্বত সৌন্দর্যসত্তার সঙ্গে কবিপুরুষের এই মিলন বা সমর্পণ কি সঙ্গত বা মূল সুরেরই অনুবর্তী হয়েছে?

কবির ‘বীণাপানি চন্দ্রনাই’ হয়ে উঠেছেন তাঁর ‘নয়ন অমৃতরাশি প্রেয়সী’। কখনও দেবীর ‘দীপ্ত সূর্য্য ছতশন/ধব্ ধব্ দুনয়ন’ তো আবার কখনও ‘কে তুমি লাবণ্যলতা মূর্তি মধুরিমা’ রূপে প্রকাশিত। এর থেকে মনে হয়—“একদিকে রইল সমন্বয়ধর্মিতার প্রকাশ, অন্যদিকে রইল মহাচৈত্যান্যের স্বীকৃতি, ‘সারদা’ এ বিচারে সম্পূর্ণ নবাগতা।”

৬.২.৮.২ : সারদা-সাধনার ত্রিস্তর : জাগর-স্বপ্ন-সুষুপ্তি

সারদামঙ্গল কাব্যে যোগ, যোগানন্দময়ী, যোগেশ্বরী, যোগেন্দ্র, যোগাসন ইত্যাদি শব্দ বারেবারে এসেছে। তন্মোক্ত যোগসাধনায় সাধকের অভীষ্ট জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন। এর জন্য চাই কঠোর ও ঐকান্তিক সাধনা।

কবিকে যদি আমরা সারদার অনুধ্যানকালে সাধক হিসেবে দেখি (উল্লেখ্য ‘তুমি সাধনার ধন, জান সাধকের মন’—সারদামঙ্গল), তাহলে তাঁর সেই সাধনার ধারাটি অনুধাবন করতে পারলে তাঁর কবিমানস, তথা সাধ্যবিষয়টিও স্পষ্টতা পেতে পারে। এই বিষয় নিয়ে অনেক আলোচক তাঁদের মতামত দিয়েছেন। কিন্তু সবচেয়ে তদ্বিষ্ট আলোচনা ও বিশ্লেষণ পাওয়া যায় মোহিতলাল মজুমদারের ‘বিহারীলাল চক্রবর্তী’ প্রবন্ধে।

সাধনার প্রথম স্তর জাগ্রত অবস্থা। প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে প্রীতিরসসিক্ত মন নিয়ে বাইরের প্রকৃতিলোক এবং অন্তরের অনুভূতিলোক—দুদিক থেকেই কবি তৃপ্ত। এই অবস্থায় সীমাবদ্ধ জগৎসংসার হলেও, সেখানকার সংকীর্ণ প্রতীকের সাহায্যেই কবি সারদাকে উপলব্ধি করতে চাইছেন। এই পর্যায়ে কবি সংসারের মধ্যে, প্রেমময়ী জায়ার প্রেমমাধুর্যে সারদাকে অনুভব করেছেন—

তুমি মনের তৃপ্তি

তুমিই মনের দীপ্তি

তোমাহারা হলে আমি প্রাণহারা হই।

দ্বিতীয় স্তর কবির স্বপ্নাবস্থা। কবির জাগ্রত জীবনের প্রেম এই পর্যায়ে এসে স্বপ্নদৃষ্ট সৌন্দর্যের হাত ধরেছে। কবি তাঁর সারদাকে বিস্তৃত, প্রসারিত করে দিয়েছেন অনন্ত সৌন্দর্যলোকের আঙিনায়। এই স্তরে এসে যেন অনন্তকে আশ্বাদন সম্ভাবিত হয়। প্রত্যক্ষের অপ্রত্যক্ষ মহিমায় মুগ্ধ হয় কবির মনপ্রাণ। এই অভিনব পদ্ধতিতে real and ideal-এর সমন্বয় সম্ভব হয় যেন। একের মধ্যে এই যে অনন্তের উপলব্ধি এখানে কোনও বিরোধ সম্ভাবনা নেই। কবিচেতনার এই স্তরটি চমৎকার ধরা যায় নিম্নোক্ত পংক্তিগুলিতে—

প্রত্যক্ষ বিরাজমান

সর্বভূতে অধিষ্ঠান

তুমি বিশ্বময়ী কান্তি দীপ্তি অনুপমা

কবির যোগীর ধ্যান

ভোলা প্রেমিকের প্রাণ

মানবমনের তুমি উদার সুষমা।।

মূর্তি থেকে ভাবমূর্তির লক্ষে কবিচিন্তের অভিসার স্বপ্ন পর্যায়ে প্রত্যক্ষ হয়।

তৃতীয় স্তরের সাধনা সুযুপ্তির সোপানে পৌঁছে দেয় কবিচিন্তকে। জাগর ও স্বপ্ন স্তর অতিক্রম করে এসে কবি তাঁর সারদাকে বৈদেহী চৈতন্যের মধ্যে উপস্থাপিত করেছেন। এই অবস্থায় দেবীর ধ্যানতন্ময়তা সম্ভব হয়েছে কবিচিত্ত রূপহীন আকারহীন অতীন্দ্রিয় ভাবরহস্যের মধ্যে মগ্ন হবার ফলে। অনির্বচনীয় ও অপূর্ব অনুভূতিতে কবি মুগ্ধ, রহস্যময়তার স্নিগ্ধ-মধুর বাতাবরণ তাঁকে সব আক্ষেপ সংশয় অতৃপ্তি থেকে সরিয়ে এনে উদার জ্যোতির্লোকে প্রতিষ্ঠা দেয়। তখন তাঁর পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের ধ্যান সার্থক হয়ে ওঠে। চিত্ত নিবৃত্তির এই অবস্থা কবিত্বের তুলনায় দার্শনিকতার চরিতার্থতা হিসেবেই গণ্য হবার যোগ্য—

রহস্য ভেদিতে তব আর আমি চাব না
 না বুঝিয়া থাকা ভালো
 বুঝিলেই নেবে আলো
 সে মহাপ্রলয়পথে ভুলে কভু ধাব না
 সারদামঙ্গলের তৃতীয় সর্গে কবিস্বরূপটি উন্মোচিত হয়েছে বিহারীলালের আশ্চর্য কবিত্বশক্তি নৈপুণ্যে—
 বিচিত্র এ মত্তদশা
 ভাব-ভরে যোগে বসা
 হৃদয়ে উদার জ্যোতি কি বিচিত্র জ্বলে!

কবি সাধনায় এভাবেই স্তর থেকে স্তরান্তরে সারদার জন্য কবির অনুভূতির আনাগোনা। বাস্তব থেকে অতীন্দ্রিয় অভিসার এবং তারপর অনুসন্ধান ও ব্যাকুলতা শেষে চিত্তলোকে সুগভীর রহস্যরসে নিমজ্জনের মধ্যে প্রাপ্তি ও সুপ্তি। এ যেন পাশ্চাত্য কবিদের Realism-Romanticism-Mysticism-এরই দেশীয় সোঁদা মাটির গন্ধমাখানো স্বতোৎসারিত ভাবানুভূতির প্রাণময় পরম্পরা।

৬.২.৮.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

- ১। বিহারীলালের কবিপরিচয়/কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করো।
- ২। সারদামঙ্গল কাব্যে ‘ত্রিবিধ বিরহ’-এর অনুপ্রেরণার স্বরূপ নির্ণয় করো।
- ৩। সারদামঙ্গল কাব্যে ত্রিকালের ত্রিবিধ সরস্বতীর পরিচয় দান করো এবং কবির স্বকীয় ভাবনার ক্ষেত্রটি বুঝিয়ে দাও।
- ৪। সারদার স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে সারদাসাধনার ত্রিস্তর সম্পর্কে আলোচনা করো।
- ৫। সারদামঙ্গল কাব্য মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যধর্মী নয়, আধুনিকতার লক্ষণযুক্ত—মন্তব্যটি বিশদ করো।
- ৬। সারদামঙ্গল কাব্যে প্রকৃতি, কল্পনা ও সৌন্দর্যের স্থান নির্দেশ করো।
- ৭। সারদামঙ্গল কাব্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কাব্যের প্রভাব সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ মতামত দাও।
- ৮। সারদামঙ্গল কাব্যের আঙ্গিক ও প্রসাধনকলা বিষয়ে আলোচনা করো।
- ৯। বিরহ কি?
- ১০। কবির কাছে সারদার স্বরূপ কিভাবে প্রকাশিত হয়েছে।
- ১১। বিহারীলালের সাধনার তিনটি স্তরের নাম লেখ?
- ১২। ‘সারদামঙ্গল’ কাব্যে কোন শব্দ বারবার এসেছে?

৬.২.৮.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

- | | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| ১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | : | আধুনিক সাহিত্য |
| ২। শশিভূষণ দাশগুপ্ত | : | বাংলা সাহিত্যের নবযুগ |
| ৩। তারাপদ মুখোপাধ্যায় | : | আধুনিক বাংলা কাব্য |
| ৪। মোহিতলাল মজুমদার | : | সাহিত্যবিদ্যান |
| ৫। ভবতোষ দত্ত | : | কাব্যবাণী |

পর্যায় গ্রন্থ-৩
জীবনানন্দ দাশ আটটি নির্বাচিত কবিতা
একক-৯
বোধ, বনলতা সেন

বিন্যাস ক্রম :

৬.৩.৯.১	:	ভূমিকা
৬.৩.৯.২	:	কবিপরিচয়
৬.৩.৯.৩	:	কাব্যভাবনা
৬.৩.৯.৪	:	একটি জটিল অনুভূতি
৬.৩.৯.৫	:	বনলতা সেন : সবুজ ঘাসের দেশ
৬.৩.৯.৬	:	আদর্শ প্রস্ফাবলি
৬.৩.৯.৭	:	সহায়ক গ্রন্থাবলি

৬.৩.৯.১ : ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথের জীবনকালেই যে-সব কবি আবির্ভূত হয়েছেন তাঁদের প্রধানত তিন পর্যায়ে বিন্যস্ত করতে পারি। প্রথমত, নিজেদের কাব্যপ্রতিভা থাকলেও যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে নিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস রায় প্রভৃতি কবি এই শ্রেণিতে পড়তে পারেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করে রবীন্দ্রিক পরিমণ্ডল থেকে খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখেছেন। এঁরা তাঁদের স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা চিহ্নিতও হয়েছেন, যেমন দুঃখবাদী কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, দেহবাদী কবি মোহিতলাল মজুমদার, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম প্রভৃতি। তৃতীয় পর্যায়ের কবিরা রবীন্দ্রযুগ অতিক্রম করার সচেতন অভিপ্রায় নিয়েই একটি রবীন্দ্রোত্তর কবিতার যুগ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এঁদের মনের কথা সংহত হয়েছে কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত (কার্তিক, ১৩৬৬ সংখ্যা) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর ‘আবিষ্কার’ কবিতার এই কটি পংক্তিতে :

‘পশ্চাতে শত্রুরা শর অগণন হানুক ধারালো,
সন্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর,
আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীর তীক্ষ্ণ আলো
যুগ-সূর্য লান তার কাছে।’

এই পর্যায়ের কবিরা হলেন অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বর্ষীয়ান কবি ছিলেন জীবনানন্দ দাশ।

৬.৩.৯.২ : কাব্যপরিচয়

শুধু বর্ষীয়ান কবি বললে অবশ্য জীবনানন্দ সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না, রবীন্দ্রোত্তর কবিতা বা সাধারণভাবে যাকে ‘আধুনিক কবিতা’ আখ্যায় ভূষিত করা হয়, সেই পর্যায়ের সবচেয়ে আলোচিত কবিও তিনিই। স্বয়ং

রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ সবচেয়ে আলোচিত এবং অনুভবী কবি। আধুনিক জীবনে অভ্যস্ত, নাগরিক জটিলতায় আক্রান্ত, মানসিকতাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, যা অনেকটা মনের উপর নির্ভরশীল। ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. পাশ করে কর্মজীবন শুরু করেন কলকাতার সিটি কলেজে। ছোটবেলায় কবিতা রচনার হাতে খড়ি হলেও প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘ঝরা পালক’ প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে। উল্লেখযোগ্য কাব্য গ্রন্থগুলি হল— ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ (১৯৩৬), ‘বনলতা সেন’ (১৯৪২), ‘মহাপৃথিবী’ (১৯৪৪) এবং ‘সাতটি তারার তিমির’ (১৯৪৮) এবং মৃত্যুর পর প্রকাশিত দুটি কাব্যগ্রন্থ ‘রূপসীবাংলা’ (১৯৫৭) এবং ‘বেলা অবেলা কালবেলা’ (১৯৬১)। জীবনানন্দের কবিতায় জীবন, প্রেম এবং যাবতীয় সমস্যাকে ভূগোল বা সময়ের প্রায় এক অখণ্ডতাতেই ধরতে চেয়েছেন, তাকে বিশেষ করে গণ্ডিবদ্ধ করেননি।

অনেক রকম অভিপ্রায় ভূষিত করেছেন তাঁর কবিতাকে। কবি সে সব জানতেন বলেই তাঁর ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা-র’ ভূমিকায় তিনি বলেছেন—‘আমার কবিতাকে বা এ-কাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম আখ্যা দেওয়া হয়েছে; কেউ বলেছেন, এ-কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজ-চেতনার, অন্য মতে নিশেচতনার, কারো মীমাংসায় এ-কাব্য একান্তই প্রতীকী; সম্পূর্ণ অবচেতনার; সুররিয়ালিস্ট। আরো নানারকম আখ্যা চোখে পড়েছে।’

জীবনানন্দের কবিতায় এই রকমের সব অভিধা প্রযোজ্য কিনা সেটা কবিতাভিত্তিক স্বতন্ত্র আলোচনায় লক্ষ করার চেষ্টা করা যাবে, কিন্তু যে কথাটা নিঃসন্দেহে এবং বিনা দ্বিধায় বলা যায় সেটা হল এই পর্যায়ের সব চেয়ে অনুভবী কবি জীবনানন্দ। রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রতিক্রিয়াতেই এই পর্বটির আবির্ভাব এবং সম্ভবত সেই কারণেই মন অপেক্ষা মননের প্রভাব, হৃদয়বেগ অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ এই পর্যায়ের কবিদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল বেশি। বুদ্ধদেব বসু রোমান্টিকতার মূল উৎপাটন করার

জন্য, যতটা শৈল্পিক কারণে তার চেয়ে বেশি প্রতিবাদী প্রমাণ করার চেষ্টায়, কঙ্কাবতীর ‘নতুন নীর মতো তনু’-র পেছনে দেখতে পেয়েছেন ‘কুৎসিত কঙ্কাল’, সুধীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন ক্ল্যাসিকাল কাব্যরুচির যেখানে শব্দকে ব্যবহার করা হয় তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থে, বিষ্ণুদের কবিতা বুঝতে গেলে ভারতীয় ও গ্রিক পুরাণ প্রায় সমান ভাবে জানতে হয়, একথা সমকালেই শোনা গিয়েছিল। তুলনামূলক ভাবে জীবনানন্দ অনেক বেশি অনুভূতি নির্ভর, তাই তাঁর ভাষায় চাকচিক্য দেখতে পাইনা আমার- তাঁর অসংলগ্ন শ্লথ চিন্তার মতোই ভাষাতেও যেন একটা অসংলগ্নতা আছে। দীর্ঘ এলায়িত পংক্তি, অধিকাংশ সময়েই তান প্রধান বা মিশ্রবৃত্ত ছন্দের শ্লথ ভঙ্গি, ক্রিয়াপদে সাধু ও চলিতের মিশ্রণ—অথচ তা সত্ত্বেও ভাষা নিয়ে যাঁরা চিন্তা করেন তাঁরা জানেন এটাও একটা স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত ভাষা এবং কবিভাষা।

৬.৩.১.৩ : কাব্যভাবনা

জীবনানন্দের কবিতা অনুভূতি প্রধান, এ কথা বলতে আমরা কিন্তু কখনোই বলতে চাইনি মনন সেখানে উপেক্ষিত। আসলে আধুনিক জীবনে অভ্যস্ত, নাগরিক জটিলতায় আক্রান্ত মানুষ বুদ্ধির অভিশাপ থেকে মুক্তি

পাননা। তাঁর মানসিকতা তৈরিই হয় বিবিধ চিন্তার উত্তেজক আক্রমণে। সেই জটিল মানসিকতাই তিনি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু নির্ভর করেছেন অনেকটাই মনের ওপর। তাই অন্যান্যদের ক্ষেত্রে যেমন বুদ্ধির প্রদীপ জ্বলে অগ্রসর হতে হয়, এখানে তার চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন হয় বোধের উচ্চতায় নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার, তাঁর অনুভূতির সঙ্গে সংলগ্ন হতে চেষ্টা করার। সমালোচকের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে তিনি যে বিখ্যাত কবিতাটি লিখেছিলেন, সেখানে চোখে ‘অক্ষম পিচুটি’-ওয়ালা সমালোচকদের ‘কবিদের মাংসক্রিমি’ না খুঁটে কবির ভাবনার উচ্চতায় আরুঢ় হতে বলেছেন এবং এই সমারুঢ় হওয়াকেই প্রকৃত সমালোচকের কর্তব্য মনে করেছেন।

আদিনিবাস ঢাকার বিক্রমপুর হলেও জীবনানন্দ দাশগুপ্তের জন্ম (পরে পদবির শেষাংশ বর্জন করে ‘দাশ’ হয়েছেন) বরিশাল শহরে, ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি। পিতা সর্বানন্দ দাসগুপ্ত ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন, মা কুসুমকুমারীও ছিলেন কবি, তাঁর এই দুটি পংক্তি এখন প্রবাদে পরিণত হয়েছে :

“আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে

কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।”,

বরিশাল স্কুল এবং কলেজে শিক্ষাজীবন শুরু করে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে আসন সাম্মানিক ইংরেজি নিয়ে পড়তে। ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. পাশ করে কর্মজীবন শুরু করেন কলকাতার সিটি কলেজে। বিভিন্ন কারণে অনেক কলেজ পরিবর্তন করতে হয় জীবনানন্দকে। দিল্লির একটি কলেজে কিছুদিন কাজ করার পর দেশে অর্থাৎ বরিশাল ফিরে যান। দেশবিভাগের পরে চলে আসেন কলকাতায়। একটি পথদুর্ঘটনায় ১৯৫৪ সালে যখন তাঁর মৃত্যু ঘটে তখন তিনি ছিলেন হাওড়া গার্লস কলেজের অধ্যাপক।

অত্যন্ত ছোটবেলায় কবিতা রচনার হাতে খড়ি হলেও তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রথম আত্মপ্রকাশ ‘কল্লোল’ পত্রিকার ফাল্গুন ১৩৩২ সংখ্যায়, কবিতার নাম ছিল ‘নীলিমা’। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘ঝরা পালক’ প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলি প্রকাশকাল অনুযায়ী এই রকম-‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ (১৯৩৬), ‘বনলতা সেন’ (১৯৪২), ‘মহাপৃথিবী’ (১৯৪৪) এবং ‘সাতটি তারার তিমির’ (১৯৪৮)। মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছে তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থ-‘রূপসী বাংলা’ (১৯৫৭) এবং ‘বেলা অবেলা কালবেলা’ (১৯৬১)।

জীবৎকালে জীবনানন্দের কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও-উপন্যাস তো নয়ই, গল্পও সম্ভবত প্রকাশিত হয় নি। অথচ মৃত্যুর কুড়ি বছর পরে ‘দেশ’ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় তাঁর দীর্ঘ উপন্যাস ‘সুতীর্থ’। সরাসরি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ‘মাল্যবান’ এবং সাময়িকপত্রে সতেরো কিস্তিতে প্রকাশিত হয় ‘জলপাইহাটি’। এই তিনটি উপন্যাসই একই বছরে লেখা (১৯৪৮ সাল)। এরপর ‘প্রতিক্ষণ’ প্রকাশনা বিভাগ থেকে দেবেশ রায়ের সম্পাদনায় তাঁর অপ্রকাশিত রচনাবলী যখন প্রকাশিত হতে থাকে তখন আমাদের বিস্ময়ে অভিভূত হওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না। আমরা বুঝতে পারি কবিতার তুলনায় তাঁর গল্প উপন্যাসের সংখ্যা অনেক বেশি। তাঁর অপ্রকাশিত রচনাবলীর প্রথম বারোটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর নটি উপন্যাস, তিরানব্বইটি ছোটগল্প এবং দুটি বড়ো গল্প।

‘ঝরাপালক’ কাব্যগ্রন্থকে জীবনানন্দের কাব্যসাধনার প্রস্তুতি পর্ব বলা যায়। কবির নিজস্বতা সেখানে খুব ভালোভাবে প্রকাশিত হয়নি, চিন্তাতেও না, কবি-ভাষাতেও না। অন্ত্যমিলযুক্ত কবিতা অনেক ক্ষেত্রেই কবির দুর্বল চিন্তা ও প্রকাশভঙ্গির সাক্ষ্য বহন করছে, যেমন—‘ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল,—

ডালিম ফুলের মতো ঠোঁট যার,—রাঙা আপেলের মতো লাল যার গাল’,

কবিকে সার্বিক ভাবে খুঁজে পাওয়া যায় দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থে। প্রথম দিকের কিছু কবিতায় অত্যন্ত, মিল আছে, যেমন—

‘রয়েছি সবুজ মাঠে-ঘাসে-

আকাশ ছড়িয়ে আছে নীল হয়ে আকাশে-আকাশে।’

কিন্তু এই মিল বর্জন করেছেন, এমন কবিতার সংখ্যাই বেশি, যেমন—

‘চারিপাশে বনের বিস্ময়

চৈত্রের বাতাস,

জ্যোৎস্নার শরীরের স্বাদ যেন;’ (ক্যাম্পে)

‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ মূলত প্রেমেরই কবিতা, যদিও সে প্রেমে ব্যক্তিগত প্রেমের সংরাগ ততটাই, যতটা আছে প্রেমের বিস্ময় এবং ব্যাপ্তি। অবাক লাগে ভাবতে, প্রেমের মূল তাৎপর্য কবি এর মধ্যেই ধরতে পেরেছেন। প্রেমে যে অজস্র দুঃখ আছে, তা সত্ত্বেও প্রেমেই যে জীবনের সব কিছু, এই বোধ কবির জন্মেছে।

জীবৎকালে জীবনানন্দের তৃতীয় প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ‘বনলতা সেন’ হলেও প্রকাশকালের বিচারে ‘রূপসী বাংলা’ই তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ। সেই কারণে ভারবি সংস্করণ ‘জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতায়’ এই কাব্যই আগে এসেছে। ‘রূপসী বাংলা-য় বাংলার পল্লীপ্রকৃতি চিত্রিত হয়েছে বললে কিছুই বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এক ‘চৈত্ররূপময়’ বললে কিছুটা বোঝা যাবে, আরো স্পষ্ট হবে বুদ্ধদেব বসু ‘কালের পুতুল’ গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছেন তা উদ্ধার করলে :

‘প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে অনুভব করেন না এমন কোনো কবি নেই; কিন্তু সমগ্র জীবনকে প্রকৃতির ভিতর দিয়েই গ্রহণ ও প্রকাশ করেন এমন কবির সংখ্যা অল্প। তাঁরাই বিশেষভাবে প্রকৃতির কবি। আমার মনে হয়, আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে একজনকে এই বিশেষ অর্থে প্রকৃতির কবি বলা যায়; তিনি জীবনানন্দ দাশ।’ এই মন্তব্য একেবারে ঠিক বলেই মনে হয় আমাদের, কারণ জীবনানন্দের প্রকৃতি-প্রীতি রোমান্টিক প্রকৃতি-বিলাস নয়, একেবারেই জীবনের সঙ্গে অন্বিত। কয়েকটি পংক্তি মনে ধরা যাক :

‘পৃথিবীর কোনো পথে নরম ধানের গন্ধ-কল্মীর ঘ্রাণ,

হাঁসের পালক, শর, পুকুরের জল, চাঁদা সরপুঁটিদের,

মৃদু ঘ্রাণ, কিশোরীর চাল-ধোয়া ভিজে হাত-শীত হাতখান,

(আকাশে সাতটি তারা)

‘বনলতা সেন’ জীবনানন্দ দাশের প্রতিভার পূর্ণ নিদর্শন বলে অনেকেই মনে করেন। বনলতার মতো এক-একটি বিশেষ নামের নায়িকা অনেকগুলি আছে—‘চোখে যার শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার’ সেই শঙ্খমালা আছে, পৃথিবীর ভালো পরিচিত রোদের মতন যার শরীর সেই সুদর্শনা আছে, ‘পৃথিবীর বয়সিনী এক মেয়ের মতন’ সুরঞ্জনাও আছে। শেষ অভিধাই প্রমাণ করে দেবে, বিশেষ হয়েও এরা কেউ বিশেষ নারী নয়। উপলক্ষ বা সূত্র বিশেষ নারী থাকতে পারে, কবিতায় তাকে কবি বিশ্বময় ছড়িয়েই দিয়েছেন। এই কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতাই প্রেমের কবিতা, কিন্তু সেই একই কথা আবার বলতে হবে, ঠিক ব্যক্তিবিশেষের গণ্ডি বা প্রথাবদ্ধ প্রেমের কবিতাও এগুলি নয়। এই কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতা আলোচনার সুযোগ আমরা পাবো, তখনই প্রসঙ্গটি বিশদ করা যাবে।

‘মহাপৃথিবী’ কাব্যগ্রন্থে জীবনানন্দের কিছু অসাধারণ কবিতা আছে। যে শঙ্খমালা নায়িকার নাম আমরা উল্লেখ করেছি সেই শঙ্খমালা আছে—সেই সঙ্গে আছে আরো তিনটি এমন কবিতা যা আমাদের পৃথকভাবে পড়তে হবে। এই কাব্যগ্রন্থে জীবনানন্দের সেই মানসিকতার পূর্ণ প্রতিফলন আমরা পাই যে মানসিকতার জন্য তিনি বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র। ১৯৪৮ সালের একেবারে শেষের দিকে এই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তার অর্থ, যে তিনটি উপন্যাসের উল্লেখ আমরা করেছি সেগুলি এখন লেখা হয়ে গিয়েছে। কাজেই জীবনানন্দের ‘কবিজীবনের একটি যুগান্তর’ বলে এই কাব্যগ্রন্থকে যদি সমালোচক চিহ্নিত করেন তাতে আমাদের আপত্তি করার কথা নয়।

সূতরাং মেনে নিতে হয় ‘সাতটি তারার তিমির’ এবং ‘বেলা অবেলা কালবেলা’-র মধ্যে ভিন্ন গোত্রের বা ভিন্ন ভূমিকার জীবনানন্দকে খুঁজে পাওয়া যাবে। তা যে পাওয়া যাবে, এ কথাও মিথ্যা নয়। জীবনানন্দের কবিতায় আমরা সাধারণভাবে নির্বিশেষে ভৌগোলিক প্রেক্ষিত, পরিব্যাপ্ত ইতিহাস এবং প্রায় অখণ্ড একটি সময়কেই পাই। কবির এই ইতিহাস-চেতনা এবং কালচেতনা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, বিভিন্ন ভাবেই অনেকে একে দেখতে চেয়েছেন, কিন্তু সহজ কথাটা এই যে, জীবনানন্দ জীবন, প্রেম এবং যাবতীয় সমস্যাকে ভূগোল বা সময়ের প্রায় এক অখণ্ডতাকেই ধরতে চেয়েছেন, তাকে বিশেষ করে গণ্ডিবদ্ধ করেন নি। ‘কবিতার অস্তি-র ভিতরে থাকবে ইতিহাস-চেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন—কালজ্ঞান—এ কথা তিনি বলেছিলেন ‘উত্তর-রৈবিক বাংলা কাব্য’ প্রবন্ধে। শেষ দুটি কাব্যগ্রন্থে আমাদের মাঝে-মাঝেই মনে হয় একটি বিশেষ ঘটনা বা বিশেষ সময়ের প্রতিক্রিয়ায় কবি কবিতাগুলি রচনা করেছেন। ফলে ওই প্রবন্ধে কবির যে স্বীকারোক্তি, ‘সময় ও সীমা প্রকৃতির ভিতর সাহিত্যের পটভূমি নিযুক্ত দেখতে আমি ভালোবাসি’, পরবর্তী কাব্যগ্রন্থে মাঝে মাঝেই লঙ্ঘিত হয়েছে। এই দুটি কাব্যগ্রন্থ থেকে একটি মাত্র কবিতাই আমাদের পাঠ্য হিসাবে নির্বাচিত, সেই জন্য কথাটি উল্লেখ করে নিতে হল।

৬.৩.৯.৪ : বোধ : একটি জটিল অনুভূতি

‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ‘বোধ’ কবিতাটি কেবল সেদিন যে অত্যন্ত দুর্বোধ কবিতা ছিল তা নয়, আজ পর্যন্ত তা রীতিমত জটিল হয়েই আছে। তার কারণ, কবি এমন এক অনুভূতির কথা বলেছেন যে অনুভূতিকে তিনি নিজেই বিশেষ কিছু বুঝতে পারেন নি। যদি এটি বিশুদ্ধ অনুভূতির কথা না হয়ে বুদ্ধিমার্গের কোনো কথা হত আমরা হয়তো ভালো বুঝতে পারতাম, কারণ বুদ্ধি দিয়ে যে কথা চিন্তা করা হয় তা বুদ্ধির

বিশ্লেষণী ব্যাখ্যায় ধরাও পড়ে। কবি নিজে যদি ঐ বোধের স্বরূপ বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করতেন, এর প্রকৃতি খানিকটা বিশদ করতেন বা কাহিনী মূলক ভাবে কিছু ঘটনার কথা বলতেন তাহলেও আমরা এর প্রকৃতি অনুধাবনের

‘বোধ’ কবিতাটি’ ধূসর পাণ্ডুলিপি’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। কবি বলেছেন ব্যাখ্যার অতীত এক বোধের কথা, সেই বোধ আলো-অন্ধকারে কবির মাথার ভিতরে কাজ করে। তা স্বপ্নও নয়, শান্তি নয়, ভালোবাসা নয়। অথচ সেই বোধ হৃদয়ে জন্ম নিলে অন্য সবকাজ তুচ্ছ বলে মনে হয়, সব কিছু শূন্য মনে হয়। কবি বলতে চেয়েছেন, বাস্তবজীবন ঘর-সংসার ইত্যাদি তিনিও করেছেন, কিন্তু একসময় সেটাকে অর্থহীন মনে হয়েছে। কবির ‘কারবাসনা’ উপন্যাসের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে একথা স্পষ্ট হবে, বুদ্ধি দিয়ে একে বোঝা যাবে না, বোধিকে আশ্রয় করতে হবে।

একটা পথ পেতাম। সেসব কিছু এই কবিতায় নেই। অথচ এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে এটি জীবনানন্দের অন্যতম প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতা এবং যে বিশিষ্ট মানসিকতার জন্য রবীন্দ্রোত্তর কাব্য ধারায় তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে স্বীকৃত, এখানে সেই মানসিকতাই ধরা পড়েছে। সুতরাং কবিতাটিকে আমাদের বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

কবিতাটিতে আপাতদৃষ্টিতে যেটুকু বক্তব্য প্রকাশিত, সেটাই এখানে বলা যেতে পারে। দীর্ঘ এই কবিতায় কবি প্রথমেই বলেছেন ব্যাখ্যার অতীত এক বোধের কথা, সেই বোধ আলো-অন্ধকারে, কবির মাথার ভিতরে কাজ করে। তা স্বপ্নও নয়, শান্তিও নয়, ভালোবাসাও নয়, অথচ সেই বোধ হৃদয়ে জন্ম নিলে অন্য সব

কাজ তুচ্ছ বলে মনে হয়, সব কিছু শূন্য মনে হয়। অর্থাৎ সব কিছুর চেয়েই বোধকে মূল্যবান ও তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়।

এর পর এই বোধ হৃদয়ে এলে সব কিছু যে সত্যিই শূন্য মনে হয় সেটা কবি ব্যাখ্যা করেছেন এবং যার মধ্যে তা আসে সে যে একেবারেই সহজ স্বাভাবিক মানুষের মতো থাকতে পারে না, সাধারণ মানুষ যাতে আনন্দ পায় তাতে যে মোটেই আনন্দ পায় না, এই কথাটি বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন কবি। বলেছেন, সহজ লোকের মতো সে চলাফেরা করতে পারে না, তাদের মতো ‘শরীরের স্বাদ’ পেতে চায় না, তাদের মতো ‘প্রাণের আহ্লাদ’ পাবার ক্ষমতাও তাদের থাকে না; ‘শরীরে মাটির গন্ধ মেখে’ অর্থাৎ বাস্তব জীবনচরণ করে আর কোনো আনন্দ সে পায় না।

বোধ হয় সেই কারণেই কবিতার পরের অংশে দেখি এই বোধ নিয়ে কবি খুবই বিরক্ত। এতই বিরক্ত যে তিনি একে উপেক্ষা করতে চান, ‘মড়ার খুলির মতো’ ধরে আছাড় মারতে চান, কিন্তু তবু তার হাত থেকে তিনি পরিত্রাণ পাননা। এবার কবির মনে দুশ্চিন্তা হয় তবে কি এটা তাঁর নিজেরই মুদ্রাদোষ? তা না হলে তাঁর একার চোখেই এই ধাঁধা কেন, তাঁর একার মনেই এই বাধা কেন? সাধারণ মানুষ যারা ঘর-সংসার করে, সংসারে সন্তান উৎপাদন করে, আজও তারা নিরুপদ্রবে এই সব কাজ করে চলেছে, কবি কেন তাদের মতো হতে পারছেন না? কেন তিনি এমন একা কষ্ট ভোগ করেন?

এরপরে কবি নিজের অতীত জীবনের কথা বলেছেন। স্বপ্নের জীবন, শক্তির জীবন এবং ভালোবাসার জীবন তিনি নিজেও কাটিয়ে এসেছেন। চাষার লাঙল তিনি হাতে তুলে নিয়েছেন, বালতিতে জল টেনেছেন, কাস্তে নিয়ে মাঠে গিয়েছেন, মেছুরেদের মতো মাছও ধরেছেন। জীবনে মেয়েমানুষও তিনি অনেক পেয়েছেন—তাদের ভালোবেসেছেন, অবহেলা করেছেন, ঘৃণাও করেছেন। মেয়েদের কাছ থেকেও তিনি সবই পেয়েছেন—

তারা ভালোবেসে কাছে এসেছে, উপেক্ষা করেছে, ঘৃণা করেছে। সঠিক ভালোবাসা কখনো ঘটেনি, প্রেমের পথে বার বার বাধা এসেছে, এটা অবশ্য কবি স্বীকার করেন।

এই অতীতচারণের পর কবি আবার তাঁর এই অস্বস্তিকর বোধের প্রসঙ্গে চলে এসেছেন এবং একে তাড়ানো যায় কী করে, সেই কথাই ভেবেছেন। এই ভাবে আলাদা থেকেই কি দিন কাটবে? মানুষের মুখ দেখে, মেয়েদের মুখ দেখে, শিশুর মুখ দেখে কোনোদিন আর আহ্লাদ পাবেন না! কবিতার শেষ স্তবকটি গুরুত্বপূর্ণ। কবির মনে প্রশ্ন জেগেছে এই বোধকে তাড়িয়ে তিনি যে সে মানুষের মুখ দেখতে চেয়েছেন, সেই মানুষের মুখ দেখেই তো বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি বোধের জগতে চলে এসেছেন। ফলে মানুষের মুখ দেখা বলতে আদর্শগত ভাবে যে সুখের কথা ভাবেন, বাস্তবে তো মানুষের হৃদয়ে আর তা নেই! সেখানে হৃদয় তো ‘পচা চাল কুমড়ার ছাঁচে নষ্ট শশা’-র মতো। এই অসুন্দর জগতে ফিরে গিয়েই বা লাভ কী!

তাহলে সমস্ত কবিতা থেকে কবির বোধের স্বরূপ ঠিকঠাক খুঁজে না পেলেও কবিতার একটা মানে আমরা বোধ হয় খুঁজে পাই। আমরা এটা বুঝি যে একটা কল্পিত ভয়ে বাস্তব পৃথিবী থেকে পালিয়ে আসতে চেয়েছেন বলে কবির মনে এই বোধের জন্ম হয়নি, তিনি বস্তুতই সাধারণ মানুষের জীবন যাপন করেছেন এবং তাঁর অভিজ্ঞতাই তাঁকে ঠেলে দিয়েছে ওই জটিল বোধের দিকে। তিনি নিজে একই সঙ্গে চাষা, শ্রমিক, মেছুরে নিশ্চয়ই হন নি, যখন বলেন—

‘মেছোদের মতো আমি কতো নদী ঘাটে

ঘুরিয়াছি;

পুকুরের পানা শ্যালা-অ্যাশ্টে গায়ের ঘ্রাণ গায়ে

গিয়েছে জড়িয়ে;’

তখন সেটাকে রূপক অর্থেই ধরতে পারি আমরা। কবি বলতে চেয়েছেন, বাস্তবজীবন ঘর সংসার-ইত্যাদি তিনিও করেছেন, কিন্তু একসময় সেটাকে অর্থহীন মনে হয়েছে।

জীবনানন্দের কবিতা পড়তে গেলে তাঁর কিছু কিছু উপন্যাস, বিশেষত ‘কারুবাসনা’ অবশ্যই মিলিয়ে পড়া দরকার বলে আমার মনে হয়। কারণ আত্মপ্রক্ষেপে ভরা এই উপন্যাসে কবিকে জানবার সূত্র অনেক স্পষ্টভাবে পাওয়া যেতে পারে বলেই আমার বিশ্বাস। ‘কারুবাসনা’ উপন্যাসে পাই :

‘বিয়ের আগে দু-তিনটে কলেজে অস্থায়ী কাজ করেছি-অনেক অনেক কাজ করেছি। কিন্তু সংসার ও সমাজের প্রতিষ্ঠিত মানুষের জীবনের পদ্ধতির সঙ্গে কোথাও না কোথাও সম্পূর্ণ (ভিন্নতা) ও জটিলতা নিয়ে এ পৃথিবীতে এসেছি আমি। কাজেই এম. এ. ডিগ্রি ও স্ত্রী সন্তান সত্ত্বেও এই চৌত্রিশ বছর বয়সে আজও আমি সংসারী হয়ে উঠতে পারলাম না....জীবনতো শুধু স্ত্রী-সন্তান নিয়ে নয়।’ ভালোবাসা নিয়েও সে নয়, এ কথাটা ‘কারুবাসনা’ উপন্যাসে নেই। কিন্তু কিসের অভাবে কবি নিজের মুদ্রাদোষে আলাদা হচ্ছেন, যেটা যেন এখানে আমরা একটু আলাদা করে বুঝে ফেলতে পারি। কবি আলো-অন্ধকারে গিয়ে যে বোধের সম্মুখীন হন, সেই আলো-অন্ধকারে যেতে হয় কেন, কবিতায় তা উল্লেখ করেননি, কিন্তু যখনই কবি উচ্চারণ করেন ‘স্বপ্ন নয়—শান্তি

নয়—ভালোবাসা নয়’, তখনই যেন কেউ আমাদের বলে দেয় স্বপ্ন সফল হয়নি, শান্তি খুঁজে পাননি, এবং পাননি ভালোবাসা, সেই জন্যই বোধের অবলম্বন তাঁকে খুঁজতে যেতে হয়। এর মধ্যে বিশেষ করে, ধরবো আমরা ‘ভালোবাসা’কেই, তার প্রথম কারণ ভালোবাসাই এদের মধ্যে সেই মূল অবলম্বন যা স্বপ্ন দেখতে পারে, শান্তি বিধান করতে পারে। ভালোবাসা ছাড়া স্বপ্ন বা শান্তির কল্পনা অনেকটা নিরালম্ব মনে হয়। দ্বিতীয় কারণ, স্বপ্ন বা শান্তি নিয়ে বিশেষ কোনো কথা কবি বলেননি, কিন্তু ভালোবাসা নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। মেয়েদের ভালোবাসা প্রসঙ্গে তাঁর ব্যবহৃত, এবং বারংবার ব্যবহৃত ‘মেয়েমানুষ’ শব্দটিই অপ্রাসঙ্গিক, তিনি ভালোবাসায় দগ্ধ হয়েই, ভ্রষ্ট প্রেমের যন্ত্রণায় বিক্ষিত হয়েই বোধের আশ্রয় খুঁজে নিতে চেয়েছেন। ভালোবাসার প্রসঙ্গে পর পর তিনটি ক্রিয়াপদ আছে, যার মধ্যে অনিবার্য পারস্পর্যও আছে বলে আমাদের মনে হয়।—‘ভালোবাসা’, ‘উপেক্ষা’ এবং ‘ঘৃণা’। নারীকে ভালোবাসতে চেয়ে কবি কী পেয়েছেন সে কথা কবিতায় অত্যন্ত স্পষ্ট করে আছে :

‘উপেক্ষা সে করেছে আমারে,
ঘৃণা করে চলে গেছে—যখন ডেকেছি বারে বারে
ভালোবেসে তারে;

নারীর কাছ থেকে যখন ভালোবাসার এই প্রতিদান পাওয়া যায় তখন তাকে অবহেলা করা ছাড়া উপায় কি থাকতে পারে :

‘আমি তার উপেক্ষার ভাষা
আমি তার ঘৃণার আক্কেশ
অবহেলা ক’রে গেছি;’

বলেছেন, কিন্তু সত্যিই কি অবহেলা করা যায়। যায় না যে তার অস্পষ্ট প্রমাণ এই অস্বস্তি—

‘আমি তা ভুলিয়া গেছি
তবু এই ভালোবাসা—ধুলো আর কাদা—।’

আরও স্পষ্ট প্রমাণ—‘তবুও সাধনা ছিলো একদিন—এই ভালোবাসা;’

স্পষ্টই প্রমাণ সংগ্রহ করতে গেলে এই কাব্যগ্রন্থেরই ‘প্রেম’ নামক কবিতার তিনটি পংক্তি আমাদের ভালোবেসে তুলে আনতে হবে :

‘জীবন হয়েছে এক প্রার্থনার গানের মতন
তুমি আছ ব’লে প্রেম,—গানের ছন্দের মতো মন
আলো আর অন্ধকারে দুলে ওঠে তুমি আছ বলে!’

একটু মিলিয়ে দেখে নিই আমাদের কবিতা—

‘সব চিন্তা-প্রার্থনার সকল সময়
শূন্য মনে হয়,’

দু-দুবার ওই একই কথা বলার পরও আমরা বুঝতে পারবো না, কবি এই ভালোবাসাকে অবহেলা করতে পারেন না! প্রেমের সঙ্গে সন্নিহিত ‘প্রার্থনা’ শব্দটি দেখেও বুঝতে পারবো না কবির বোধ কিসের প্রতিক্রিয়া! ‘ভুলিয়া গেছি’ বললেও যে কবি ভুলতে পারেন না! গানের ছন্দের মতে মন যে ‘আলো আর অন্ধকারে’ দু’লে ওঠে, সেই ‘আলো-অন্ধকারে’-ই তো কবি যান এবং কবির যে বোধ সে তো ভালোবাসার সীমাহীন তপ্ত অঙ্গার দিয়েই লেখা।

কিন্তু বোধের স্বরূপটা কী, সেটা তো এখনও বোঝা গেল না। একটা কথা আমাদের জেনে নিতেই হবে, বুদ্ধি দিয়ে একে বোঝা যাবে না, বোধিকে আশ্রয় করতে হবে। কবির ‘কারুণ্যবাসনা’ উপন্যাসকে আশ্রয় করে এর কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় কিনা সেটা একটু সন্ধান করে দেখা যেতে পারে।

একটা লাভ আমাদের হবেই, সেটা হ’ল এই যে, কবি এই বোধের সন্ধান করেছেন তাঁর নষ্ট প্রেমের বেদনা তুলবার জন্যে, সে কথা উপন্যাসে স্পষ্ট বলা আছে :

‘সংসারে সঙ্গে সম্পর্কহীন—জীবনের এই আর-এক রূপ। এই রূপের পথে চলতে-চলতে কিশোর বেলায় নষ্ট প্রেমের বেদনা ও লাঞ্জনাকে ভুলতে চেয়েছিলাম।’

সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক যদি কবির অসহ্য মনে হয় প্রেমহীনতার জন্য, তবে সংসারের সম্পর্কহীন একটা বোধে তিনি উপনীত হতে চাইবেন, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু জীবনের এই এক রূপ আসলে কোন্ রূপ! সেটা আন্দাজ করার জন্য আর—একবার শরণাপন্ন হই ‘কারুণ্যবাসনা’-র, সেখানে একটা ইঙ্গিত পাই :

‘বটের নীচে উপকথার পথিক গিয়ে দাঁড়ায়—এক মুহূর্তের ভিতরেই সমস্ত অতীত ও ভবিষ্যতের প্রেম, স্বপ্ন ও সফলতার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক খুঁজে পাই আমি, এই সৃষ্টির রহস্যের ভিতর নিজের রহস্যময় হৃদয়ের সঙ্গে আলো-অন্ধকারের পথে অবিরাম চলতে ইচ্ছা করে।’

কবির বোধের স্বরূপ ধরা পড়ল এমন বলবো না, কিন্তু কবির প্রথম পর্বের সমস্ত কাব্যরচনায় চাবিকাঠি খুঁজে পাওয়া গেল বলতেই হবে। একটি বিশেষ প্রেমকে পৃথিবীর অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ত সফল প্রেমের অনুষঙ্গে উপস্থাপিত করার যে স্বকীয়তা কবিকে বিশিষ্ট করেছে, যে কারণে কবি ‘এশিরীয়, মিশরীয়, বেবিলনীয়’ পটভূমিতে যে-কোনো সময়ে এগিয়ে-পিছিয়ে যেতে পারেন, যাকে সমালোচকগণ কালচেতনা এবং ইতিহাসচেতনা বলে চিহ্নিত করে দিতে চেয়েছে, তার বীজ যে এই বোধের মধ্যে আছে, এটুকু বুঝতে পারলেই এর বিশাল তাৎপর্য আমরা অনুভব করতে পারবো। প্রেমহীনতার গ্লানি কাউকে কাউকে পলাতক (Escapist) করে। কবিকে তা কাল ও ইতিহাসের বৃত্তে সম্পূর্ণ করেছে। পৃথিবীর সমস্ত সময়ের এবং সমস্ত ভূমির প্রেমিকের সঙ্গে কবির অস্তিত্ব এক হয়ে উঠেছে কবির অনুভবে। সেই বোধ আয়ত্ত করার কালটুকু অবশ্যই কষ্টের। ‘বোধ’ কবিতায় কবির মহৎ উত্তরণের সেই যন্ত্রণার স্বাদ আমরা পাই।

৬.৩.৯.৫ : বনলতা সেন : সবুজ ঘাসের দেশ

একটি বিশেষ নাম বা বিশেষ কবিতা কোনো কোনো কবির প্রায় ট্রেড মার্কে পরিণত হয়, এই সময়েও হয়, যেমন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতায় রবীন্দ্রোত্তর কাব্য-আন্দোলনের অগ্রপথিকদেরও হয়েছিল। বুদ্ধদেব

বসুর ছিল কঙ্কাবতী, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের শাস্ত্রী, আর জীবনানন্দ দাশের বনলতা-শুধু বনলতা নয়, একেবারে পদবী এবং সাকিন শুদ্ধ, ‘নাটোরের বনলতা সেন’ আরো অনেক নারীর নামে কবিতা লিখেছেন তিনি, সবকটি

জীবনানন্দ সারা জীবনের যে কটি অবিস্মরণীয় কবিতা লিখেছেন, তার মধ্যে ‘বনলতা সেন’ কবিতাটি অন্যতম। অনেক নারীর নামেই কবিতা লিখেছেন, কিন্তু বনলতা অসাধারণ হয়েছে। এটি আসলে একটি প্রেমের কবিতা। সাধারণ ভাবে মানুষের কথাই কবি বলেছেন; মানুষের নিরন্তর সংগ্রাম, সভ্যতার অগ্রগতি মানুষের হৃদয়কে ক্লান্ত করে তোলে। তখন মানুষ শান্তি পাবার জন্য চাইতেই পারে বনলতা সেনকে। আসলে বনলতা সেন একটি নারীর নাম, মানবীর নাম।

প্রবাদে পরিণত হয়নি, বনলতা হয়েছে। সেই সঙ্গে আলোচনাও হয়েছে অনেক, জল্পনা-কল্পনাও হয়েছে—ব্যাখ্যাও হয়েছে প্রচুর। ব্যাখ্যার মূল প্রশ্ন একটাই, একে আমরা প্রেমের কবিতা বলবো অথবা বলব না। সন্নিহিত প্রশ্ন এই নারী কাল্পনিক অথবা এর কোনো বাস্তব অস্তিত্ব ছিল। এ সব প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই আমরা দেব, কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও বলবো যে এর চেয়ে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ কবিতাটির মর্মকথা বোঝা, কারণ জীবনানন্দ সারা জীবনে যে-কটি অবিস্মরণীয় কবিতা লিখেছেন, এই আঠারো পংক্তির কবিতাটি তার একটি।

কবিতাটির প্রকাশ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য এই যে, বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত ‘কবিতা’ পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাতেই, অর্থাৎ ১৩৪১ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই কবিতাটি যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তার একটা কারণ তো অবশ্যই এই যে কবিতা হিসাবে এটি অসাধারণ, কিন্তু এর অন্য কারণ এই যে এরকম পদবিসহ গোটা নাম বাংলা কবিতায় খুব বেশি পাওয়া যায় নি। এ সম্বন্ধে যাবতীয় জিজ্ঞাসার উত্তর তখন পাওয়া যায় নি, পাওয়া গিয়েছিল তাঁর মৃত্যুর অনেক দিন পর দেবেশ রায় সম্পাদিত জীবনানন্দ সমগ্রের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলে এবং ভূপেন্দ্র গুহ সম্পাদিত জীবনানন্দের দিনলিপি বা Literary Notes প্রকাশিত হবার পর। রাম না জন্মাতে রামায়ণের মতো, ‘বনলতা সেন’ কবিতার এক বছর আগে লেখা প্রায় আত্মজৈবনিক উপন্যাসে জীবনানন্দ এই নামের মেয়েটিকে নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। উপন্যাসের কোনো নামকরণ করেন নি কবি, সম্পাদকই এর নামকরণ করেন ‘কারুণ্যসনা’। সেই উপন্যাসে আমরা পাই :

ক) ‘কিশোর বেলায় সে কালো মেয়েটিকে ভালোবেসেছিলাম কোনো এক বসন্তের ভোরে, বিশ বছর আগে যে আমাদেরই আঙিনার নিকটবর্তিনী ছিল’, (আমাদের মনে পড়বেই ‘মহাপৃথিবী’ কাব্যগ্রন্থের ‘কুড়ি বছর আগে’ কবিতার সেই পংক্তি—‘আবার বছর কুড়ি পরে তার সাথে দেখা হয় যদি!’)

খ) ‘সেই বনলতা—আমাদের পাশের বাড়িতে থাকত সে। কুড়ি-বাইশ বছর আগের সে এক পৃথিবীতে; বাবার (কেদার বাবু) তার লম্বা, চেহারা, মাঝ গড়নের মানুষ—সাদা দাড়ি, স্নিগ্ধ মুসলমান ফকিরের মত দেখতে; বছরদিন হয় তিনিও এই পৃথিবীতে নেই আর; কত শীতের ভোরের কুয়াশা ও রোদের সঙ্গে জড়িত সেই খড়ের ঘরখানাও নেই তাদের আজ।’

দিনলিপিতে বনলতা সেনের নাম নেই, কিন্তু Y নামে চিহ্নিত এক নারীর কথা আছে যে Y সম্ভবত তাঁর অপ্রকাশিত উপন্যাস ‘শচী’র নায়িকা, ব্যক্তিগত জীবনে যে কবির খুঁড়তুতো বোন বুলুর বান্ধবী। দিনলিপিতে আছে Y কে দেখে ‘সেই মেয়ের’ কথা মনে পড়েছে তাঁর—‘A rural girl beloved who might flavour my life with love : Y wakes that but Y is far from that.’

এই ‘প্রিয়তমা গ্রাম্য বালিকা কি বনলতা? হতেই পারে। হতে যে পারে জীবনানন্দের আরো বেশ কিছু কবিতা থেকে তা বোঝা যায়। তবে উপলক্ষ যাই হোক, ‘বনলতা সেন’ কবিতাটি সেই উপলক্ষ বা কবির উল্লিখিত সেই গ্রাম্য নারীকে অতিক্রম করে অনেক দূর চলে গেছে, এতটাই দূরে যে সত্যিই সেই নারী যদি এর প্রাথমিক অবলম্বন হন, তিনিও ধন্য হতে পারতেন এমন একটি কবিতার উৎসমুখ খুলে দেবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিশুকন্যার একটি আবদার শুনে ‘যেতে নাহি দিব’ নামে যে কবিতা লেখেন, শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন তাকে আখ্যা দিয়েছেন ‘ক্ষুদ্রতম মহাকাব্য’, আমরা মনে করি এটিও মানুষের সভ্যতার মহাকাব্য। তাহলে এই কবিতার বিষয় কী? প্রেম নয় কি? এই প্রশ্নের উত্তরেও আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করতে পারি, বনলতা সেন প্রেমের কবিতা এবং একশো ভাগ প্রেমের কবিতা, কিন্তু প্রেমকে যে সংকীর্ণ ভাবে গ্রহণ করতে আমরা অভ্যস্ত, সেই অর্থে নয়; প্রেম যেখানে জীবনের পরমার্থ, প্রেম যেখানে মৃত সঞ্জীবনী আশ্রয়, সেই প্রেমই এই কবিতার বিষয়।

কথাটা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ, সেই ব্যাখ্যা অবশ্যই করা হবে। কিন্তু তার আগে একটা কথা বলে রাখাও উচিত, কবিতার ব্যাখ্যা কবিতাপাঠকের নিজের। পাঠকের রুচিভেদ অনুযায়ী ব্যাখ্যার তারতম্য হতেই পারে, তা ভিন্ন মাত্রাও লাভ করতে পারে, কিন্তু তাতে কবিতার মূল্য কমে না, সেটি সম্বন্ধে বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি হয় না। বস্তুত, কবিতা যখন কবিতা হয়ে ওঠে তখন কবির কল্পনা পাঠকের অন্তরেও সংক্রমিত হয় এবং পাঠক নিজের মতো হয় তার রসগ্রহণ করেন। কাজেই এই ব্যাখ্যা সকলের মনঃপূত না হতে পারে, সকলে গ্রহণ নাই করতে পারেন, কিন্তু একজন পাঠকের রসগ্রহিতা হিসাবে তার মূল্য কিছুতেই কমবে না।

মাত্র তিনটি স্তবকের কবিতা, প্রত্যেক স্তবক পংক্তির সংখ্যা ছয়। প্রত্যেক স্তবকে ভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে এবং তিনটি প্রসঙ্গ মিলিত ভাবে এক মহাকাব্যিক ধারণা পরিস্ফুট করেছে।

প্রথম স্তবকের শুরুতেই যখন কবি বলেন ‘হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি’, তখনই স্পষ্ট হয়ে যায়, বাস্তব অর্থে এই পদচারণার কথা বলা হচ্ছে না, এবং ব্যক্তিবিশেষের সর্বনাম হিসাবেও ‘আমি’ ব্যবহার করা হয়নি। ধরে নেওয়াই যেতে পারে, সাধারণ ভাবে মানুষের কথাই কবি বলেছেন, কারণ ‘পৃথিবীর পথে’ মানুষ হাজার বছরও নয়, হাজার হাজার বছর ধরে হাঁটে। আমাদের এই ধারণা সমর্থিত হয় পরের পংক্তিতেই, যেখানে কবি বলেন তিনি সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগর পর্যন্ত ঘুরেছেন। দ্বিতীয় পংক্তিতে যদি ব্যাপ্ত ভৌগোলিক সীমার কথা বলে থাকেন, তৃতীয় পংক্তিতে তবে এসেছে কালগত বিস্তৃতির কথা, কারণ ‘বিশ্বিসার অশোকের ধূসর জগতে’ যদি অবস্থানের কথা বলেন এবং তা আরো পিছিয়ে ভারতবর্ষের পৌরাণিক নামে চিহ্নিত ‘বিদর্ভ নগর’ পর্যন্ত পৌঁছে যায় তবে বুঝতে হবে যুগ যুগ ধরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষের যে পথ পরিক্রমা তার কথাই কবি বলতে চান। ‘আমি ক্লান্ত প্রাণ এক’, এই কারণে হতে পারে যে কবি দীর্ঘদিনের পথপরিক্রমার কথা বলেছেন, কিন্তু তারপরই ‘জীবনের সমুদ্র সফেন’ ইঙ্গিত দেয় মানুষের সভ্যতার অগ্রগতি—‘সুচেতনা’ কবিতায় যাকে বলেন ‘পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা’, তার কথাই এখানে বলতে চেয়েছেন। এগিয়ে মানুষকে যেতে হবেই, কিন্তু কেবলই পার্থিব উপকরণের বাহুল্যের জন্য মানুষের নিরন্তর সংগ্রাম, সভ্যতার অগ্রগতি মানুষের হৃদয়কে ক্লান্ত করে তোলেই। তখন মানুষ শান্তি পাবার জন্য চাইতেই পারে বনলতা সেনকে।

প্রথম স্তবকে যদি মানুষের material prosperity-র জন্য নিরন্তর জীবনসংগ্রামকে বোঝাবার চেষ্টা কবি করে থাকেন, তাহলে দ্বিতীয়, স্তবকে কবি ব্যক্তিগত পরিচয়ের এই নাটোরের বনলতা সেনের’ প্রকৃতি পরিস্ফুট করার চেষ্টা করেছেন। কবি যখন বলেন—

‘চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য;’

—তখন এ কথা আমাদের মনে না হয়েই পারে না যে বিশেষ নারী, বিশেষ সময়ের নারী এমন কী বিশেষ স্থানের নারীকেও তিনি বোঝাতে চাইছেন না, তিনি বলতে চাইছেন না, তিনি বলতে চাইছেন নারীর কথা। রবীন্দ্রনাথ ‘রক্তকরবী’ নাটকে নন্দিনীর কথা ভূমিকায় বলতে গিয়ে বলেছেন—নারী এল, নন্দিনী এল; অর্থাৎ নারী ও নন্দিনী সেখানে সমার্থক। অন্যত্র বলেছেন ‘শুধু মনে রাখুন এটি নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি।’ আমরাও তাই জানি, বনলতা সেন একটি নারীর নাম, মানবীর নাম। এই নারী কী করে, কী তার সত্যিকারের ভূমিকা, সেটা বোঝা যায় কবিতার পরের অংশ পাঠ করলে। অতি দূর সমুদ্রে হাল ভেঙে দিশা হারিয়েছে যে বিপর্যস্ত নাবিক, তার কাছে বনলতা সেনের সাক্ষাৎ কীরকম, একটি অসাধারণ উপমায় ফুটিয়েছেন কবি—‘সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর’ দারুচিনি মানে রসকবহীন শুকনো বঙ্কল মাত্র, যে দ্বীপ সেই রকম নীরস কাঠিন্যে ভরা, সেখানে বনলতা সেন এক সবুজ ঘাসের দেশ। বিপর্যস্ত নাবিকের কাছে নারী যে কত বড়ো আশ্রয় তা স্পষ্টতর হয় তার ‘পাখির নীড়ের মতো’ গূঢ় আশ্রয়ী চোখের উপমায়।

কোনো কোনো সমালোচক ‘বনলতা সেন’ কবিতাটির সঙ্গে আমেরিকান কবি Edgar Allan Poe এর ‘To Helen’ কবিতাটির, বিশেষ করে এই দ্বিতীয় স্তবকের সঙ্গে Poe-এর কবিতার দ্বিতীয় স্তবকের ঘনিষ্ঠতা আবিষ্কার করেছেন। সেটি এইরকম :-

‘On desperate seas long want to roam,
Thy hyacinth hair, thy classic face,
Thy Naiad airs have bought me home
To the glory that was Greece,
And the grandeur that was Rome.’

মিল নিশ্চয়ই কিছু আছে, শব্দ ব্যবহারের মিলই বেশি, জীবনানন্দ যা বলতে চেয়েছেন তার ব্যাপ্তি আরো বেশি। সভ্যতা এগিয়ে চলবেই, জীবনের সফল সমুদ্রে মানুষকে আন্দোলিত হতে হবেই, এবং সেই কারণে মাঝে মাঝে ক্লান্তিও তার আসবেই। সেই ক্লান্তির অপনোদন করতে পারে নারীর সুগভীর আশ্রয়, নারীর লালিত আশ্রয় ছেড়ে মানুষ কিসের লোভে দিনরাত্রি এত ছুটে বেড়াচ্ছে, এ প্রশ্ন সেই ‘hyacinth hair’ এবং ‘classic face’ এর অধিকারিণী নারীর—‘এত দিন কোথায় ছিলেন?’ ক্লান্ত মানুষকে নতুন করে যাত্রার শক্তি সঞ্চয়ের জন্য, মানুষ যে আসলে মানুষ সে কথা বুঝবার জন্য তাকে আসতেই হবে তার নারীর কাছে, নইলে মানুষ নতুন করে সভ্যতার অগ্রগতিতে কাঁধ মেলাবে কেমন করে। সভ্যতার এই অমানবিক অগ্রগতি এবং মাঝে মাঝে নারীর আশ্রয়ের এই গূঢ় মর্যাদা যদি ‘বনলতা সেন’ কবিতায় এখনো অস্পষ্ট থাকে তবে ‘বনলতা সেন’ কাব্যগ্রন্থেরই ‘মিতভাষণ’ কবিতার কয়েকটি পংক্তি স্মরণ করে নেওয়া যেতে পারে :

‘মানুষের সভ্যতার মর্মে ক্লান্তি আসে;
বড়ো বড়ো নগরীর বুঝরা ব্যথা;

.....

তবুও নদীর মানে স্নিগ্ধ শুশ্রূষার জল, সূর্য মানে আলো:

এখনো নারীর মানে তুমি, কত রাধিকা ফুরালো।’

এই ‘তুমি’ যে বনলতাই তার প্রমাণ আর-একবার পাই ‘মহাপৃথিবী’ কাব্যগ্রন্থের ‘হাজার বছর শুধু খেলা করে’ কবিতার শেষ দুই পংক্তিতে :

“শরীরে মমির ঘ্রাণ আমাদের—ঘুচে গেছে জীবনের সব লেনদেন;

‘মনে আছে? শুধালো সে—শুধালাম আমি শুধু, ‘বনলতা সেন।’

কবিতায় তৃতীয় স্তবকে কোনো কোনো সমালোচক সমগ্র কবিতার অনিবার্য অঙ্গ মনে করতে পারেননি; প্রেমকে যে উচ্চতায় কবি অনুভব করেছেন সেই স্বর্গ থেকে পতন ঘটে ব্যাপ্ত নৈরাশ্য কবিতাকে ঘিরে ধরেছে, এমনটাও মনে হয়েছে কারো। আমরা এই ধারণার সঙ্গে একমত নই, আমাদের মনে হয় সমস্ত কবিতায় একেবারে উপযুক্ত ও অনিবার্য উপসংহার এটাই। ‘অন্ধকার’ শব্দটি বার বার আছে বলেই তাকে নৈরাশ্যের অন্ধকার ধরে নেওয়ার কোনো কারণ নেই। অন্ধকার জীবনানন্দের কবিতায় অনেক অনুষ্ণে এসেছে। ‘রূপসী বাংলা’-য় সন্ধ্যার অন্ধকারই সবচেয়ে রোমান্টিক। ‘অন্ধকার’ কবিতার মতো কীর্তিনাশা ‘অনন্ত মৃত্যুর মতো’ অন্ধকার সর্বত্র নেই, কখনো তা ‘অরব’ অন্ধকার, কখনো বা নিঃসৃত অন্ধকার যাকে তাঁর মনে হয় ‘রাত্রির মায়ের মতো।’ অন্ধকারের প্রসঙ্গ আপাতত সরিয়ে রেখে আমরা রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার কথা স্মরণ করবো, ‘বনলতা সেনের’ তৃতীয় স্তবকটি বুঝে নেওয়ার জন্য।

কবিতার নাম ‘ঝড়ের খেয়া’, ‘বলাকা’ কাব্যগ্রন্থে ৩৭-সংখ্যক কবিতা হিসেবে যেটি স্থান পেয়েছে। মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে মাঝে মাঝে এমন এক-একটি সময় আসে যখন স্থিরকরা কিছু মূল্যবোধ, সংস্কার ইত্যাদি ভেঙেচুরে যায়। তখন এইসব মূল্যবোধের দ্বারা গড়ে তোলা বন্দর ত্যাগ করে নতুন বন্দর খুঁজে নিতে হয়—নিতেই হয়, কারণ মানুষের অগ্রগতি তো বন্ধ থাকে না।

‘বন্দরের বন্ধনকাল এবারের মতো হল শেষ,

পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা

আর চলিবে না।

বঞ্চনা বাড়িয়ে ওঠে, ফুরায় সত্যের যত পুঁজি,

কাণ্ডারী হাঁকিছে তাই বুঝি—

নূতন সমুদ্রতীর পানে

দিতে হবে পাড়ি।”

একটু লক্ষ করা দরকার ‘বেচাকেনা’ শব্দটি, কারণ এর সঙ্গে বেশ মিল আছে জীবনানন্দ দাশের কবিতার ‘জীবনের সব লেনদেন’-এর। শুধু এইটুকু মিল নয়, আমি মনে করি মানব সভ্যতার অগ্রগতির কথা জীবনানন্দও বলেছেন, মূল্যবোধের অবক্ষয়ে মানুষের ক্লাস্তির কথাও বলেছেন, কিন্তু কাণ্ডারীর পরিবর্তে তিনি বলেছেন নারীর কথা, প্রেমের কথা। সভ্যতার একটি পর্বান্তরে পুরনো সঞ্চয় শেষ হয়—‘সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী’—মানুষকেও

নতুন করে সঞ্জীবনী শক্তি সংগ্রহের জন্য তার নারীর কাছে ফিরে যেতে, কোমলতা সঞ্চয় করতে হয়। যে অন্ধকারে ‘মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন’ থাকে সে অন্ধকার ‘রাত্রির মায়ের মতো’, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তা, ‘রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?’ তপস্যার চেয়ে প্রেম অনেক কার্যকর, কারণ মানুষকে তা মানুষ করে তোলে। মনে রাখতে হবে মানুষের যাত্রা কখনোই শেষ হয় না, তার পর্বান্তর হয় মাত্র, তাই ‘পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে’ ও—

‘পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন

তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিল মিল;’

কাজেই দেখা যায় ‘বনলতা সেন’ কবিতাটি অসংবদ্ধ নয়, তার তৃতীয় স্তবক বিচ্ছিন্ন বা ভিন্ন অনুভূতিলব্ধ নয়—গোটা কবিতায় একই সুর শুনিয়েছেন কবি: মানুষের যান্ত্রিক সভ্যতার যাত্রার মাঝে মাঝে ক্লান্তি, স্থবিরতা তাকে দূর করার জন্য নীরব লালিত আশ্রয়, প্রেমের প্রশ্রয় প্রয়োজন, তারপর নতুন করে পাণ্ডুলিপি লেখা হয়, সব সঞ্জীবনী শক্তিতে মানুষ নতুন করে সভ্যতার যাত্রাপথে অগ্রসর হয়।

৬.৩.৯.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

- ১। জীবনানন্দ দাশের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কি?
- ২। ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ কত খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত?
- ৩। জীবনানন্দের মৃত্যুর পর প্রকাশিত দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম বল?
- ৪। ‘বোধ’ কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?
- ৫। ‘বোধ’ কবিতায় কবি কি বলতে চেয়েছেন?
- ৬। ‘কারুণ্যাসনা’ কি ধরনের রচনা?
- ৭। ‘বনলতা সেন’ কবিতায় কবি কি বলতে চেয়েছেন?
- ৮। ‘বনলতা সেন’ কবিতাটি কোন পত্রিকায়, কত বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল?

৬.৩.৯.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

- ১। জীবনানন্দ দাশ : বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত : দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত)।
- ২। আমার জীবনানন্দ : হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ৩। জীবনানন্দ : অমলেন্দু বসু।
- ৪। জীবনানন্দ : অলোক রঞ্জন দাশগুপ্ত।

পর্যায় গ্রন্থ-৩
জীবনানন্দ দাশ আটটি নির্বাচিত কবিতা
একক-১০
নগ্ন নির্জন হাত, আট বছর আগের একদিন

বিন্যাস ক্রম :

৬.৩.১০.১	:	ভূমিকা
৬.৩.১০.২	:	আট বছর আগের এক দিন : অস্তিত্বের সংকট
৬.৩.১০.৩	:	আদর্শ প্রস্ফাবলি
৬.৩.১০.৪	:	সহায়ক গ্রন্থাবলি

৬.৩.১০.১ : নগ্ন নির্জন হাত : স্মৃতির মধু

‘মহাপৃথিবী’ কাব্যগ্রন্থের ‘নির্জন হাত’ কবিতাটি পড়ার আগে দুটি উক্তি সম্বন্ধে আমাদের সচেতন হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। সেগুলি আগে উদ্ধার করি :

১) ‘The expressed aim of Surrealism was a revolution against all restraints on the free creativity, including logical reason, standard morality, social and artistic conventions and norms, and all control over the artistic process by forethought and intention. To ensure the unhampered operation of the deep mind which they regarded as the only source of valid knowledge as well as art, surrealist turned to ‘automatic writing’ (writing delivered over to the prompting of the unconscious mind) and to exploiting the material of dreams, of states of mind between sleep and waking, and of natural or artificially induced hallucinations.”—A Glossary of literary Terms : M.H. Abrams.

[অর্থাৎ কিনা, সুররিয়ালিজম হ’ল স্বাধীন সৃষ্টিক্ষমতার ওপর সমস্ত রকমের বিধি নিষেধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-যুক্তিগ্রাহ্যতা, নৈতিকতা, সামাজিক ও শৈল্পিক রীতিনীতি, এমন কী শিল্পসৃষ্টির ব্যাপারেও শিল্পীর পূর্ব পরিকল্পনা এবং অভিপ্রায়, সমস্ত বাদ। সঠিক জ্ঞান আর শিল্পকলার একমাত্র উৎস হচ্ছে এক গভীর মন, তার ক্রিয়ায় যাতে কোনো রকম বাধা না পড়ে সেজন্য সুররিয়ালিস্টরা পক্ষপাতী ছিলেন ‘স্বতঃস্ফূর্ত রচনার’, মানে সচেতন মন চিন্তাভাবনা না করেই যা লিখে যেতে পারে; সেই সঙ্গে তাঁরা ব্যবহার করতে চেয়েছেন উপাদান, আর জাগরণের মধ্যবর্তী অবস্থা, স্বাভাবিক বা শৈল্পিক অভ্যাস।]

২) “স্মৃতির মধু যাকে স্পর্শ করলে সেই রূপটি জলে স্থলে আকাশে অসীম রূপের সঙ্গে কালের অতীত জিনিষ হয়ে দুলতে থাকল। জগতের যে কেউ এবং যা কিছু মন বিঁধলে তারই স্মৃতি রইল মনে, স্মৃতি যখন রূপ

পেতে চলল, তখন মনোহর পথ ধরে প্রকাশ করতে চলল আপনাকে।’—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : স্মৃতি ও শক্তি/ বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী।

প্রথম উদ্ধৃতিটি উল্লেখ করার কারণ ‘নগ্ন নির্জন হাত’ কবিতাটি যে শিল্পে ও সাহিত্যে সুররিয়ালিজম আন্দোলনের ফসল, এমন কথা কেউ কেউ বলেন। সেই জন্যেই এই আন্দোলনের মূল কথাটি কী, তা আমাদের জেনে রাখা ভালো বলে আমাদের মনে হয়েছে। দ্বিতীয় মন্তব্যটি উদ্ধারের কারণ, শৈল্পিক অনুভবে একজন প্রকৃত শিল্পী শিল্পসৃষ্টির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তার সাহায্যেই কবিতাটি সবচেয়ে ভালো ভাবে বোঝা যাবে মনে করেছি। আসল কথাটি আমরা কোনো বিশেষ তত্ত্বে, ভিতরে প্রবেশ না করেও বুঝে নিতে পারি।

কবিতা, বিশেষ করে আধুনিক কবিতাকে কোনো মানুষের ব্যবহারিক ভাষায় অভ্যস্ত চোখে অনেক সময়ই দুর্বোধ্য মনে হয় এই জন্য যে, কবিতার ভাষা প্রতিদিনের আটপৌরে ভাষা নয়, তার একটা নিজস্ব ভাষা আছে— না, ভুল বললাম ভাষা আসলে নেই, কবিদের তা তৈরি করে নিতে হয়, সেই জন্যেই আমাদের প্রাত্যহিক ভাষার সঙ্গে তার এত অমিল। কবিরা অনুভূতিকে বেশি মূল্য দেন বলেই বাইরের যাবতীয় কৃত্রিম ব্যাপার—নৈতিকতা, সামাজিকতা, যুক্তি-অনুশাসিত জীবন তাঁদের সহ্য হয় না, তার খাঁচায় ঢুকে তাঁরা অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। এমন কী শিল্পসৃষ্টিরও যে-সব বাঁধা গৎ আছে তার মধ্যে তাঁরা বদ্ধ থাকতে চান না। একদিকে শিল্পীদের এই বন্ধনমুক্তির চেষ্টা, অন্যদিকে নিজস্ব চিন্তার জন্য এক নিজস্ব ভাষা তৈরি করে নেবার আকুলতা—এটাই যখন একটা শৈল্পিক মতবাদে পরিণত হয় তাকে আমরা বলি সুররিয়ালিজম। জীবনানন্দ এই আন্দোলনের শরিক ছিলেন এমন কথা বলা শক্ত, কিন্তু তার কিছু কিছু কবিতায়, যেমন এই কবিতাতে তার আমেজ ফুটেছে আর ভাষার যে ব্যাপারটা আরো লক্ষণীয় ভাবে ফুটে উঠেছে সেটা বোঝবার জন্যেই আমরা অবনীন্দ্রনাথের বক্তব্যটা তুলে ধরেছি—স্মৃতির মধু। বলতে পারি এক স্মৃতির কিংবা নির্যাস, শুধুই একটা বস্তুর প্রতীক। খুব স্কুল ভাবে যদি বলি, একটা বেত দেখে কড়া মাস্টার মশাইয়ের শাসনের ছবি ভেসে উঠতে পারে, যেখানে মাস্টার মশাই নেই, তাঁর অস্তিত্বের নির্যাসটুকু আছে। ‘জীবনস্মৃতি’তে রবীন্দ্রনাথ ‘মৃত্যুশোক’ অংশে বলেছেন ছোট বেলায় মাকে হারানোটা অত ভালো বোঝেন নি, বুঝেছেন বড়ো হয়ে। বলেছেন, চাদরের প্রান্তে যে বেলফুলের অনতিস্ফুট কুঁড়িগুলি থাকতো, সেই চিকুণ কুঁড়িগুলির ওপর হাত বুলিয়ে তিনি মায়ের হাতের স্পর্শ পেতেন। এখানেও মানুষটা নেই, আছে তাঁর নির্যাস, স্মৃতির মধু। এই কথাগুলো বুঝতে পারলেই বুঝতে হবে আমরা ‘নগ্ন নির্জন হাত’ কবিতা পড়বার জন্য তৈরি হয়ে গিয়েছি, কারণ কবি এখানে কোনো মানুষের কথা বলেন নি, শুধু স্মৃতির মধুগুলি ছড়িয়ে দিয়েছে অসাধারণ ব্যঞ্জনা—সমস্ত যুক্তিগ্রাহ্যতা, নৈতিকতা, সামাজিক ও শৈল্পিক প্রথা বদ্ধতার ধার না ধরেই।

‘নগ্ন নির্জন হাত’ কবিতাটি ‘মহাপৃথিবী’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। কবিতাটি যে শিল্পে ও সাহিত্যে সুররিয়ালিজম আন্দোলনের ফসল এমন কথা কেউ কেউ বলেন। একদিকে শিল্পীদের বন্ধনমুক্তির চেষ্টা, অন্যদিকে নিজস্ব চিন্তার জন্য এক নিজস্ব ভাষা তৈরি করে নেবার আকুলতা—এটাই যখন একটা শৈল্পিক মতবাদে পরিণত হয় তাকে আমরা বলি সুররিয়ালিজম। কবি এখানে মানুষের কথা বলেননি, শুধু স্মৃতির মধুগুলি ছড়িয়ে দিয়েছে অসাধারণ ব্যঞ্জনা—সমস্ত যুক্তিগ্রাহ্যতা, নৈতিকতা, সামাজিক ও শৈল্পিক প্রথা বদ্ধতার ধার না ধরেই।

তবে উপলক্ষ তো একটা থাকেই, এবং থাকে সেই বাস্তব যা কবিতার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা সুরভি ছড়াতে থাকে। কবি যে তাঁর বাস্তব প্রেমকে সমগ্র দেশে কালে পরিব্যাপ্ত করার ক্ষমতা রাখতেন যে আমরা জানি, কিন্তু বাস্তবের

সেই ভূমিকা কী। এটা জানবার জন্য আবার শরণাপন্ন হতে হবে তাঁর ‘কারুবাসনা’ উপন্যাসে। একটু মনে করি ‘চারিদিকে ছায়া জমে গেছে; বিকেলের ছায়ার সঙ্গে মিশেছে মেঘের অন্ধকার।...কিশোর বেলায় যে কালো মেয়েটিকে ভালো বেসেছিলাম কোনো এক বসন্তের ভোরে, বিশ বছর আগে যে আমাদেরই আঙ্গিনার নিকটবর্তিনী ছিল, বহুদিন যাকে হারিয়েছি—আজ সেই যেন পূর্ণযৌবনে উত্তর আকাশে দিগঙ্গ না সেজে এসেছে।...মিষ্টি ক্লান্ত অশ্রুধারা চোখ, নগ্ন শীতল নিরাবরণ দুখানা হাত, স্নান, ঠোঁট, পৃথিবীর নবীন জীবন ও নবলোকের হাতে প্রেম বিচ্ছেদ ও বেদনার সেই পুরোন পল্লির দিনগুলো সমর্পণ করে কোন দূর নিঃস্বাদ নিঃসূর্য অভিমানহীন মৃত্যুর উদ্দেশ্যে তার যাত্রা।’

কবিতায় প্রথমেই সেই প্রেক্ষিত যা ‘কারুবাসনায়’ আমরা পেয়েছি। আগেই বলা হয়েছে অন্ধকার কবির কাছে বঙ্গভাবে প্রতীকায়িত, এখানে তা কবির মনে এই অন্ধকার অনেক দেখা ও না-দেখা ধারণার বাস্তবায়িত ছবি স্পষ্ট করে দিচ্ছে, তাই এই অন্ধকারের বিশেষণ ‘আলোর রহস্যময়ী সহোদরা।’ এখনকার অবস্থাটা রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেও বলতে পারি আমরা—

‘আজ যা দেখিছ তাকে ঘিরেছে নিবিড়

যাহা দেখিছ যা তারি ভিড়।’

খুব কাছ থেকে ক্রমশ দূরে যাচ্ছেন কবি, আর এই ভাবেই সৌন্দর্য, মাদক অনুভূতি এবং প্রেম চেতনা ছেড়ে অচেতন, সীমা ছেড়ে অসীমের ব্যঞ্জনার দিকে চলে যাচ্ছে। ‘যে আমাকে চিরদিন ভালোবেসেছে’—কবি নিশ্চিতভাবেই জানেন যে বেসেছে এবং আমরাও অনেকটা নির্দিষ্টভাবেই জানি সেই ‘কালো মেয়েটি’-র কথাই বলা হয়েছে। (বনলতা নামটা উল্লেখ করলেই বা ক্ষতি কী)। কবি তার মুখ দেখেননি, মানে তেমন করে দেখেন নি যাকে তিনি বলেন ‘ছুঁয়ে ছেনে’ দেখার কথা। অন্ধকার ও সেই নারী এক হয় কী করে! আমরা যারা কবিতা পড়ি তারা জানি এমনটা হতে পারে, নইলে রবীন্দ্রনাথের গানে ‘তুমি যে চেয়ে আছো আকাশ ভরে’—, এটা হয় কেমন করে।

এখান থেকেই কবির মনে হয় ‘বিলুপ্ত নগরীর কথা।’ কেন? কারণ এই যে সুপ্ত প্রেম সেও তো এক বিশাল নগরী যে নগরে প্রেমের প্রাসাদ ছিল একটা! এইবার শুধুই ধারণার মূর্তিময় প্রকাশ, শুধুই ব্যঞ্জনা, শুধুই পৃথিবীর যত কিছু মূল্যবান সামগ্রী—এই মূল্যবান প্রেমের মতোই যারা হারিয়ে গিয়ে শুধু ধারণার রয়ে গিয়েছে। কী নেই সেখানে :

‘মূল্যবান আসবাবে ভরা এক প্রাসাদ :

পারস্য গালিচা, কাশ্মীরী শাল, বেরিন তরঙ্গের নিটোল মুক্তা, প্রবাল,

শুধু কি তাই, তার চেয়ে আরো মূল্যবান :

‘আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোখ, আমার বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা,

আর তুমি নারী’—

কোথায় পাবো তারে, কোথায় পাওয়া যায় সেসব! কবি রবিনসন ক্রুশো নন, অতো নিখুঁত করে জানবার কোনো প্রয়োজন নেই, তিনি শুধু জানেন তারা আছে—

‘ভারতসমুদ্রের তীরে
কিংবা ভূমধ্যসাগরের কিনারে
অথবা টায়ার সিন্ধুর পারে’।

ভূমধ্যসাগর কিম্বা টায়ার সিন্ধুর পার থেকে কবি চলে যান প্রকৃতির মূল্যবান মুক্তাগানে, যে প্রকৃতি তাঁকে তাঁর প্রেমের অনুষ্ণ দেয়। তাঁর মনে পড়ে অনেক কমলা রঙের বাকমকে রোদের কথা, মনে পড়ে কাকাতুয়া পায়রার কথা, মনে পড়ে মেহগনি গাছের ছায়াঘন পল্লবের কথা। কিন্তু সমস্ত স্মৃতি-গন্ধবহ প্রকৃতির বর্ণনা একটিই উদ্দেশ্যে—‘আর তুমি ছিল;/তোমার মুখের রূপ কতো শত শতাব্দী আমি দেখি না।’

কবি যা বলতে চান তা যেন আমরা এইবার বুঝি। পৃথিবীর যত অভিজাত অনুষ্ণ, তাঁর জীবনের নারীও সেই অভিজাতের মূল্যেই মূল্যবান, এবং সবচেয়ে মূল্যবান। কী সেই অভিজাত ও মাদকতাময় ব্যাপারগুলি! এই রকম?

‘অপরূপ খিলান ও গম্বুজের বেদনাময় রেখা,
লুপ্ত নাসপাতির গন্ধ,
অজস্র হরিণ ও সিংহের ছালের ধূসর পাণ্ডুলিপি,
রামধনু রঙের কাচের জানালা,
ময়ূরের পেখমের মতো রঙিন পর্দায়-পর্দায়
কক্ষ ও কক্ষান্তর থেকে আরো দূর কক্ষ ও কক্ষান্তরের
ক্ষণিক আভাস’—

এইবার যে তিনটি ব্যঞ্জনার স্ফটিক খণ্ড কবি আমাদের উপহার দেন সেগুলি যথাক্রমে সৌন্দর্য, মাদকতা এবং প্রেমের প্রতীক—

‘পর্দায়, গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ,
রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ!
তোমার নগ্ন নির্জন হাত;’

শেষ পংক্তিতে ঝলসে উঠেছে প্রেমই, কিন্তু রক্তাভ রৌদ্র আর তরমুজ মদের সঙ্গে একসঙ্গে উচ্চারিত হয়ে তাতে যে মাদকতাময় কামনার লাস্য ফুটেছে, কবি কিছু ব্যবধানে তা আরো একবার ব্যবহার করায় নিঃসঙ্গ এই পংক্তিটি পবিত্র প্রেমের ব্যঞ্জনার স্বাদ হয়ে উঠেছে।

৬.৩.১০.২ : আট বছর আগের একদিন : অস্তিত্বের সংকট

জীবনানন্দ দাশের সবচেয়ে জটিল কবিতা, বোধগম্যতার বিচারে, ঠিক কোনটা হয়ত বলা যাবে না, কিন্তু সবচেয়ে বিতর্কিত কবিতা যে ‘মহাপৃথিবী’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ‘আট বছর আগের একদিন’, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কবিতাকে সচেতনভাবে দুর্বোধ করে তোলার অভিযোগে ‘শনিবারের চিঠি’-র ডাক সাইটে সম্পাদক সজনীকান্ত দাস তাঁকে বিধ্বস্ত করতে চেয়েছিলেন, সে ইতিহাস প্রায় প্রবাদ হয়ে আছে, কিন্তু অনুবর্ত কবিরাও যে অনেকে এই কবিতার বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন—যাঁদের মধ্যে আছেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, এমনকী আরো অনুজ মণীন্দ্র রায়, সে সংবাদ আমরা পাই দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘জীবনানন্দ দাশ : বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত’ গ্রন্থে। কবিতার এই বিরূপ সমালোচনায় বিধ্বস্ত জীবনানন্দ যে ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যা ‘পূর্বশা’ পত্রিকায় একটি আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক প্রবন্ধ রচনা করেন, সে সংবাদও আমরা এই গ্রন্থেই পাই। সেখানে তিনি বলেছিলেন যে বর্তমান যুগের ক্লাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ‘আশাবাদী মনোভাব’কে শুধু আজকের মতো দিনে এনে ফেললেই তো হবে না, তাহলে তো তা একটা কৃত্রিম ব্যাপার হয়ে যাবে। সমালোচকের বিরুদ্ধেও একটু মন্তব্য ছিল—‘আধুনিক অনেক সমালোচকই কতগুলো শব্দ, বাক্য ও শ্লোগানের দাস মাত্র, যুক্তিবিচার ও অন্তর্দৃষ্টির ধার ধারেন না।’ এতেও রেহাই না পেয়ে তিনি বলেছিলেন, ‘লাসকাটা ঘরের কবিতাটিকে তো আমার সমগ্র কাব্যের একটি শ্রেষ্ঠ representative হিসাবে গ্রহণ করা যায় না।’

‘মহাপৃথিবী’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ‘আট বছর আগের একদিন’ কবিতাটি সবচেয়ে বিতর্কিত কবিতা। এই কবিতায় যার কথা বলা হচ্ছে তিনি কবি নন, তিনি একজন অন্য মানুষ। জীবনে মানুষ সাধারণত যা-যা চায় সেসব জিনিস পাওয়া সত্ত্বেও তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন এবং লাসকাটা ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখা হয়েছিল তাকে। তার আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং অদ্ভুত অনুভূতি তাড়িত আত্মহত্যার গল্প বিশদভাবে আমাদের শোনাবার পর। কবিতার শেষ স্তবকে কবি তাঁর নিজের কথা শুনিয়েছেন। সমস্ত কিছু পাওয়া হয়ে গেলেও কি মানুষের আত্মহত্যা করার মতো কোনো দুঃখ থাকতে পারে? পারে যে, সেটাই কবি বলেছেন। মনের এই অবস্থাটাকেই বলা হয় অস্তিত্বের সংকট। তখন সংসারে পারিপার্শ্বিককে এমন কী নিজের অস্তিত্বকেও শূন্য মনে হয়।

সোচ্চারে আমরা অন্তত এই শেষ কথাটার প্রতিবাদ করতে পারি, কারণ দীর্ঘ কালের ব্যবধান প্রমাণ করেছে এটি জীবনানন্দের সৃষ্ট কবিতাজগতের মধ্যে একটি উজ্জ্বল হীরকখণ্ড-দীর্ঘদিনে এর মূল্য ও উজ্জ্বল্য কমে তো নেই একটুও, বরং এর শাণিত দীপ্তি অনেক বেড়েছে, বুদ্ধদেব বসুর মতো কবিতার জুহুরি এটি সম্পূর্ণ ফুটে উঠতে না পারলেও।

কবিতাটি নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে, তাই এ নিয়ে বেশি কথা আমরা বলব না, কেবল মূল ব্যাপারগুলি একটু ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করব। প্রথমে আমাদের একটি কথা বুঝতে নিতে হবে, এই কবিতায় যার কথা বলা হচ্ছে তিনি কবি নন, তিনি একজন অন্য মানুষ। জীবনে মানুষ সাধারণত যা-যা চায় সেসব জিনিস পাওয়া সত্ত্বেও তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন এবং লাসকাটা ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখা হয়েছিল তাকে। তার আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং অদ্ভুত অনুভূতি-তাড়িত আত্মহত্যার গল্প বিশদভাবে আমাদের শোনাবার পর, কবিতার শেষ স্তবকে কবি তাঁর নিজের কথা শুনিয়েছেন। এটা মনে রেখেই আমাদের কবির কাছে একটি মৃতের গল্প শুনতে হবে। কবি তার

মৃত্যুর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেই ব্যাখ্যা গ্রহণ করার আগে আমরা যা বুঝি তার একটা আভাস দিয়ে রাখলে কবিতার—রস গ্রহণ আমাদের পক্ষে সহজতম হতে পারে।

মানুষ প্রাথমিক ভাবে চায় তার একেবারে মৌল প্রয়োজনগুলি মেটাতে। সে ক্ষুধায় খাদ্য চায়, মাথা গোঁজবার একটা ঠাঁই চায়, একটু সচ্ছল ভাবে বাঁচবার জন্য ভালো অর্থ রোজগার করা যায় এমন চাকরি চায়। এরপর মানুষ চাইতে পারে একটি মনের মতো স্ত্রী-মনের মতো বলতে দেখতে শুনতে ভালো তো বটেই, সেই সঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত, যার সঙ্গে বিভিন্ন প্রসঙ্গে কথা বলা যায়, এরপর চায় সে তার ভালোবাসার সন্তান। যেসব মানুষ এর পরেও কিছু চাইতে পারে সে চায় নিজের খানিকটা নামযশ হোক, তার কীর্তি অনেকে মুখে মুখে উচ্চারিত হোক। কিন্তু এ সমস্ত কিছু পাওয়া হয়ে গেলেও কি মানুষের আত্মহত্যা করার মতো কোনো দুঃখ থাকতে পারে? পারে যে, সেটাই কবি বলেছেন। কবিতাটিকে একটু দূর থেকে ধরলে আমরা দেখি কবি তার আত্মহত্যার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বলেছেন, কোনো নারীর প্রণয়ে তার জীবন ব্যর্থ মনে হয়নি, সে বিবাহিত এবং বিবাহিত জীবনে তার কোনো খাদ ছিল না, কারণ সে স্ত্রীর হৃদয়ের মধুও পেয়েছে, ‘মননের মধু’-ও লাভ করেছে। অসচ্ছলতার বিন্দুমাত্র তার জীবনে ছিল না—‘হাড়হাভাতের গ্লানি বেদনার শীতে’ তার জীবন কোনোদিনই কেঁপে ওঠে নি।

তা সত্ত্বেও সে আত্মহত্যা করেছিল, তার বর্ণনা কবি দিয়েছেন। চাঁদ ডুবে যাবার পর ফাল্গুনের রাতের অন্ধকারে ‘উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা’য় বসে সে গলায় দড়ি দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং তা কার্যকর করেছিল। এরকম একটি ব্যাপার যেন সংঘটিতে হয়েছিল, কবি তার ব্যাখ্যা একটা দিয়েছেন, বলেছেন :

‘জানি—তবু জানি
নারীর হৃদয়-প্রেম-শিশু-গৃহ-নয় সবখানি;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, স্বচ্ছলতা নয়—
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে;
আমাদের ক্লান্ত করে,’

এই বিপন্ন বিস্ময়কে আমরা সহসা হয়তো চিনে উঠতে না পারি, তাই বলে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মতো একে ‘আত্মঘাতী ক্লান্তি’ বলে ব্যঙ্গও করা উচিত নয়, আবার যে গভীর সমস্যা জীবনানন্দকে প্রথম একটি কালজয়ী কবিতা রচনার ব্যাপারে উদ্দীপ্ত করেছে তাকে Thanatomania মানুষের মৃত্যুবিলাস বলে মনে করাও ঠিক নয়। বিশেষণ আমরা যখন ইয়েটসের কবিতায় আধুনিক মননের এই জটিলতার চিহ্ন স্বরূপ ‘প্লেটোর ভূত’কে পাই তার ‘What then’ কবিতায়। প্রায় জীবনানন্দের কবিতার ওপরের উদ্ধৃতির মতোই ডার্লিউ বি ইয়েটস বলেছিলেন—

“All his happier dreams came true

A small house, wife, daughter, son.....

‘What then?’ sang platos’ ghost ‘what then?’”

এই রহস্যকেই বলা যায় বিপন্ন বিস্ময় এবং একেই আমরা পোশাকি পরিচয়েও বলতে পারি ‘অস্তিত্বের সংকট’। সেই ব্যাপারটি সুতরাং একটু বোঝাবার চেষ্টা করা যাক।

আধুনিক কালের জটিল মানসিকতায় আক্রান্ত মানুষের এ প্রশ্ন হঠাৎ একদিন মনে জাগতেও পারে, এত দিন পর্যন্ত যে জীবন সে যাপন করে এসেছে তাকে কি মানুষের মতো বাঁচা বলে! অবশ্য জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলো মিটে গেলেই এ প্রশ্ন দেখা দিতে পারে—সাধারণভাবে গৃহ, সংসার, সম্পন্নতা, মনের মতো স্ত্রী, শিশু সমস্ত পাওয়ার পর হঠাৎ মধ্যযৌবনের মানুষটির যদি মনে হয়, এতদিন সে যে জীবন যাপন করে এসেছে তাকে মানবিক জীবন-যাপন বলে না। কারণ মানুষের সংজ্ঞায় তাকে বলা হয়েছে rational animal, তার প্রত্যেকটি আচরণ rational হওয়া উচিত। অথচ সাধারণ মানুষ বাঁচে কেবল অভ্যাসে, গড্ডলিকা প্রবাহের মতো আরো সকলের মতো করে, যুক্তি দিয়ে আচরণকে সে ঠিক করে নেয় না। তাহলে জৈবিক বাঁচার চেয়ে মানুষের বাঁচা আলাদা কোথায়? যদি এতদিন শুধু অভ্যাসেই বেঁচে থাকে তাহলে আজ তার অস্তিত্বকে মানবিক অস্তিত্ব বলার সার্থকতা কোথায়, সে তো কেবল জৈবিক অস্তিত্ব! এই অস্বস্তিকর চিন্তা মাথায় ঢুকলেই এতদিনকার এই অস্তিত্বটাকে যেমন অর্থহীন মনে হয়, বাঁচার আর কোনো মানে খুঁজে পাওয়া যায় না। মনের এই অবস্থাটাকেই বলতে পারি অস্তিত্বের সংকট। তখন সংসারের পারিপার্শ্বিককে এমন কী নিজের অস্তিত্বকেও শূন্য মনে হয়। এই সংকটের অনুভব যে কবির ছিল, ‘কারুবাসনা’ নামক প্রায় আত্মজৈবনিক উপন্যাস থেকে তার সমর্থন সংগ্রহ করছি :

কারুবাসনা আমাকে নষ্ট করে দিয়েছে।....কারুকর্মীর এই জন্মগত অভিশাপ আমার সমস্ত সামাজিক সফলতা নষ্ট করে দিয়েছে। আমার সংসারকে ভরে দিয়েছে ছাই-কালি-ধূলের শূন্যতায়। যে উদ্যম ও আকাঙ্ক্ষার নিঃসংকোচ সাংসারিকতা ও স্বাভাবিকতা...একজন অক্লান্তময়ী চেয়ারম্যানকে তৈরি করতে পারে, অসীম অধ্যাবসায়ী উকিলকে, চিন্তা সচ্চরিত্র হেডমাষ্টারকে, মুচিকে, মিস্ত্রিকে, (সেই) আকাঙ্ক্ষার উদ্যম আমার নেই।’

‘আটবছর আগের একদিন’ কবিতায় যে মৃতের গল্প শোনানো হয়েছে, তার কারুবাসনা ছিল কিনা জানা যায় নি, কিন্তু বিপন্ন বিস্ময় তার অস্তিত্বকে সংকটাপন্ন করে তুলেছিল, এবং মূল প্রশ্ন ছিল ওটাই—পাশব ও জৈবিক অস্তিত্বের সঙ্গে তার নিজের বেঁচে থাকাটা একরকমের হয়ে যায়নি তো এতকাল? সেইজন্যেই মানবতার প্রাণীর জৈবিক বাঁচাকে বার বার তুলনায় নিয়ে এসেছে মানুষটি :

‘তবুও তো পেঁচা জাগে;

গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে

আরেকটি প্রভাতের ইশারায়—অনুমেয় উষ্ম অনুরাগে।

.....

মশা তার অন্ধকার সঙ্ঘারামে জেগে থেকে জীবনের স্রোত ভালোবাসে।

রক্ত ক্লেদ বসা থেকে রৌদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি;

.....

দুরন্ত শিশুর হাতে ফড়িঙের ঘন শিহরন

মরণের সাথে লড়িয়াছে;’

বাঁচতে হবে, শুধু এই জন্যেই মনুষ্যতর এই প্রাণীরা সব বাঁচে। থুরথুরে অন্ধ পেঁচাও বেঁচে থাকার দুর্জয় বাসনায় বলে :

‘বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনো জলে ভেসে?

চমৎকার!

ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার।’

সুতরাং খুবই স্বাভাবিক, লোকটি গলায় দড়ি দেবার সময় অশ্বথের শাখা প্রতিবাদ করেছে, জোনাকির ভিড় দেখা গেছে, বাঁচতে চাই, অন্ধপেচা এই ‘গাঢ় সমাচার’ জানাতে চেয়েছে, কিন্তু লোকটি এই অসহায়তায় আত্মহত্যা করেছে যে, ‘যে জীবন ফড়িঙের দোয়েলের-মানুষের সাথে তার হয়না কো দেখা।’

এবার আমরা উপনীত হই কবিতার শেষ স্তবকে, কবির জিজ্ঞাসায়। সেখানে মৃতের গল্প শোনার পর কবি পেঁচাকে ‘প্রগাঢ় পিতামহী’ সম্বোধন করে বলেছেন-

‘আমিও তোমার মতো বুড়ো হবো—বুড়ি চাঁদটারে আমি করে দেবো

কালীদহে বেনোজলে পার;

আমরা দু-জনে মিলে শূন্য করে চলে যাবো জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার।’

জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার শূন্য করবো, এই পংক্তিগুলির ব্যাখ্যা করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু এইভাবে—‘ঠিক শেষের ক’লাইনে। আবার আমরা অন্য একটি স্বর শুনলাম...এই প্রগাঢ় পিতামহীর দৃষ্টান্তেই কবি উদ্বুদ্ধ হলেন—‘আমরা দুজনে মিলে শূন্য করে চলে যাবো জীবনে প্রচুর ভাঁড়ার—মৃত্যুর পার হয়ে বেজে উঠলো জীবনের জয়ধ্বনি।’

দুঃখের বিষয়, এই মন্তব্য সঠিক হতে পারে না। এই জন্যেই পারে না যে, শেষ ক’লাইনের গুরুটাই ছিল ব্যঙ্গের—‘হে প্রগাঢ় পিতামহী, আজো চমৎকার?’ তার চেয়েও বড়ো কথা, এই রকম জটিল মানসিকতার একটা কবিতা, এবং বলতে হবে অতি দীর্ঘ কবিতা, কবি লিখলেন তাকে একেবারে অগ্রাহ্য করবার জন্য? তাই কখনো হতে পারে! এই বিষয় তাঁকে উদ্দীপ্ত করবে কেন তবে।

তাহলে কবিতা এই ভাবে শেষ হল কেন, তার উত্তর পাবার জন্য আর একটি প্রশ্নই আমাদের করতে হবে, এই কবিতার নাম ‘আট বছর আগের একদিন’ কেন? যেমন ভাবে শুরু হয়েছিল, তাতে মনে হয়েছিল ‘কাল রাতে’ ব্যাপারটা হয়েছে এবং আজ তাকে লাসকাটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাহলে আট বছর কোথা থেকে এল? আট বছর আগেই কি এ ব্যাপারটা হয়েছিল? ছয়, নয়, ষোল নয়, আটই কেন বা তবে?

উত্তর সন্ধানের জন্যে আবার ‘কারুবাসনা’-র দ্বারস্থ হই। সেখানে আমরা দেখি ‘বছর আষ্টেক আগে বনলতা একবার এসেছিল।...অনেক দিন পরে আজ আবার সে এল।’ এবার একটা সম্ভাবনা মাথার মধ্যে ঝলসে ওঠে—যে মানুষটা মারা গিয়েছিল এবং এই যে কবি তার গল্প বলছেন, দু-জনেই এক লোক নয়তো! ‘যে-জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের—মানুষের সাথে তার হয়নাকো দেখা এই জেনে’ আত্মহত্যা করতে যেতে পারে তো তীব্র কারুবাসনায় ভোগা একজন মানুষ, যে মানুষটি বলেছে কারুবাসনা তাকে নষ্ট করে দিয়েছে। নষ্ট করে দিয়েছে, এই তীব্র বোধটা সেদিন জেগেছিল—আট বছর আগে বনলতা যখন একবার এসেছিল। হতে পারে, তখনও মনটা ওরকম সতেজ ছিল, সংরক্ত ছিল, এত কথা ভাবার মতো। আট বছর পরে বনলতার সঙ্গে দেখা হবার পর কি একথা মনে হতে পারে না যে মনের এই সংরক্ত সজীবতা কতদিন থাকবে? সংসারের জাঁতাকল অনুভূতিকে পিষ্ট করে দেবে না? আমিও পেঁচার মতো যখন বুড়ো হবো তখন বুড়ি চাঁদকে বেনোজলে পার করে দিয়ে ঠিক ওই জৈবিক বাঁচটাকেই আমিও গ্রহণ করে ফেলবো না তো! তাই হয়তো হবে, কতদিন আর মনের ওই তীব্র অনুভূতিকে বাঁচিয়ে রাখবো! অর্থাৎ কবি আট বছর আগে একদিন যখন বেঁচেছিলেন, মানবিক বাঁচার জন্য লালায়িত হয়েছিলেন, তখনই ভাবতে পারতেন দৈবিক জীবন অপেক্ষা মৃত্যুকে বরণ করে নেবার কথা; আজ যখন মনে হচ্ছে, মানবিকভাবে বাঁচার ইচ্ছাটার মৃত্যু হতে পারে, দৈবিক বাঁচটাকে আঁকড়ে ধরে ভেতরকার মানুষটা মরে যাবে, তখনই তিনি ভাঁড়ার শূন্য করে বাঁচার কথা জোর গলায় ঘোষণা করেছেন। কবিতায় নামকরণ অন্তত সে দিকেই আমাদের ইঙ্গিত করে।

৬.৩.১০.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

- ১। সুররিয়ালিজিম কি?
- ২। জীবনানন্দ দাশের অন্যদুটি কবিতার নাম কর যেখানে সুররিয়ালিজিমের প্রভাব আছে?
- ৩। ‘আট বছর আগের একদিন’ কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?
- ৪। ‘আট বছর আগের একদিন’ কবিতাটির মূল বিষয়বস্তু কি?

৬.৩.১০.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

- ১। কবিতায় অন্তরঙ্গ পাঠ : জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে : সুমিতা চক্রবর্তী।
- ২। আমার কালের কয়েকজন কবি : জগদীশ ভট্টাচার্য।
- ৩। আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয় : দীপ্তি ত্রিপাঠি।
- ৪। একটি নক্ষত্র আসে : অম্বুজ বসু।

পর্যায় গ্রন্থ-৩

জীবনানন্দ দাশ আটটি নির্বাচিত কবিতা

একক-১১

আবার আসিব ফিরে, তিমির হননের গান

বিন্যাস ক্রম :

- ৬.৩.১১.১ : আবার আসিব ফিরে : ঘনিষ্ঠ প্রকৃতি-প্রেম
৬.৩.১১.২ : তিমির হননের গান : তবুও মানব থেকে যায়
৬.৩.১১.৩ : আদর্শ প্রস্ফাবলি
৬.৩.১১.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৬.৩.১১.১ : আবার আসিব ফিরে : ঘনিষ্ঠ প্রকৃতি-প্রেম

‘আবার আসিব ফিরে’ কবিতাটি ‘রূপসী বাংলা’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। কবির মৃত্যুর পরে এটি প্রকাশিত হলেও সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থের ভূমিকায় জীবনানন্দের অনুজ আশোকানন্দ দাস জানিয়েছেন, সম্ভবত ১৯৩৪ সাল নাগাদ একটা ‘বিশেষ’ ভাবেবেগে আক্ৰান্ত হয়ে কবি এই কবিতাগুলি লেখেন। প্রকাশিত গ্রন্থে মোট একষট্টিটি কবিতা আছে। কবি নিজে এর নামকরণ করেছেন ‘বাংলার ব্রহ্ম নীলিমা’, কিন্তু সিগনেট প্রেসের কর্ণধার দিলীপকুমার গুপ্ত যে ‘রূপসী বাংলা’ নামকরণটি করেন তাও জানা যায় কবির অনুজা সুচরিতা দাশের স্মৃতিচারণ থেকে। একটি বাদে সবকটি কবিতাই সনেট, প্রথম ছেচল্লিশটি কবিতা ২২ অক্ষরের চরণ দিয়ে গড়া, বাকিগুলি ২৬ অক্ষরের চরণ। ‘আবার আসিব ফিরে’ একটি ২২ অক্ষরের সনেট।

‘আবার আসিব ফিরে’ কবিতাটি ‘রূপসী বাংলা’ কাব্য গ্রন্থের অন্তর্গত। জটিল মানসিকতার কবি জীবনানন্দকে এই কবিতায় আমরা পাইনা। এখানে তিনি ভীষণভাবে বাঙালি; বাংলাদেশের রূপমুগ্ধ বাংলার ঐতিহ্য তৃপ্ত। তাই বার বার তাঁর কবিতায় আসে মধুকর ডিঙ্গা, বল্লাল সেনের ঘোড়া, হিজল, বট, তমালের ছায়া, কালীদহ, রায় গুণাকর, চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ প্রমুখ। ভালোবাসা কতখানি আন্তরিক হলে এমন কবিতা লেখা যায় সেটা প্রকৃতিকে ঠিক এতখানি ভালো না বাসলে পুরোপুরি বোঝা সম্ভব নয়। কবিতাটি আকারে প্রকারে চোদ্দ পংক্তিতে সম্পূর্ণ। প্রথম আট পংক্তি ও পরে ছয় পংক্তি।

জটিল মানসিকতার কবি হিসাবে যে-জীবনানন্দকে আমরা জানি, ‘আবার আসিব ফিরে’ কবিতায় সেই মানুষটিকে যেন খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। সেই জন্যই কি এই কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশে কবির অস্বস্তি ছিল! এই কারণেই কি তিনি এটি প্রকাশ করতে চাননি! এ সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া আজ অসম্ভব। কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে যে-কবিকে আমরা খুঁজে পাই এখানে, তিনি ইতিহাস-চেনায় সমগ্র বিশ্বকে নিজের লীলাভূমি মনে করেন না, তিনি বলেন, ‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ/খুঁজিতে চাইনা আর।’ এখানে তিনি ভীষণভাবে বাঙালি, বাংলাদেশের রূপমুগ্ধ বাংলার ঐতিহ্যে তৃপ্ত। তাই বার বার

তাঁর কবিতায় আসে মধুকর ডিম্বা, বল্লাল সেনের ঘোড়া, হিজল, বট, তমালের ছায়া’, কালীদহ, রায়গুণাকর, চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ। বরিশালের পল্লী-প্রকৃতিকে জীবনানন্দ ভালোবেসেছিলেন সে কথা কবির ছোটবোন সূচরিতা দাশ ‘ময়ূখ’ পত্রিকার জীবনানন্দ স্মৃতি-সংখ্যায় (শীত-গ্রীষ্ম, ১৩৬১) জানিয়েছিলেন: ‘আকাশে অনাদি অনন্ত ইন্দ্রনীল আর ধরণীর দিগন্ত ছুঁয়ে অসীম শ্যামলতা নয়ন-মন মগ্ন করে রেখেছে, চেতনায় জ্বালিয়ে দিয়েছে সলজ্জ শিখায় ভালো লাগার দীপ, যাই দেখো না—কেন দু চোখ ভরে দেখো, বিস্ময় বিদীর্ণ হয়ে যাও, সব কিছুকে ভালোলাগা ভালোবাসার আনন্দে থরথর করে কাঁপে এমনি মোহমেদুরতা যে দীপের আলোয়। অস্ফুট শৈশব থেকে প্রাণময় কৈশোর ও যৌবনের দীর্ঘদিন কেটেছে বরিশালে-এমনি করে।’

বর্ণনার মধ্যে তবু অনেকটা উচ্ছ্বাস আছে, কিন্তু কবির রচনার মধ্যে একশোভাগ আন্তরিকতা; এবং পল্লীপ্রকৃতির শুধু অভিজ্ঞতা থাকলেও এমনটি হয় না, ভালোবাসা কতখানি আন্তরিক হলে এমন কবিতা লেখা যায় সেটা প্রকৃতিকে ঠিক এতখানি ভালো না বাসলে পুরোপুরি বোঝা সম্ভব নয়। একটাই আশ্বস্ত হবার মতো কথা, এ কবিতা বুঝতে হলে কোনো সমালোচনা বা তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। কবিতার অনুভূতি ও আন্তরিকতাকে অনুসরণ করলেই তা বোঝা যায়।

লক্ষ করার বিষয়, কবি আবার তাঁর প্রিয় স্বভূমিতে ফিরে আসতে চেয়েছেন জন্মান্তরে, কিন্তু তিনি মানুষ হয়ে যে নাও আসতে পারেন, এ কথা তাঁর জানা আছে। তিনি তাই ভেবেছেন তিনি হয়তো আসবেন পাখি হয়ে। কী পাখি হয়ে আসবেন সে ব্যাপারে তাঁর সংশয় আছে, তাই ‘হয়তো’ শব্দটি তিনি বার বার ব্যবহার করেছেন, কিন্তু এই এতগুলি হয়তোর মধ্যে পাখি ছাড়া অন্য কিছু হবার সম্ভাবনা তাঁর কাছ থেকে একবারও পাওয়া যায় নি। তাই এরকম মনে হওয়াটাও অস্বাভাবিক নয় যে তিনি হয়তো পাখি হিসাবে ফিরে আসাটাই বেশি পছন্দ করছেন। মানুষের আচরণ এবং মানুষের সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতাই এর কারণ কিনা সেটা অবশ্য অনুমান করা একটু শক্ত। পাখিদের জগতে কোনোরকম কৌলীন্য বিচার কবি করেন নি। তিনি শঙ্খচিল হয়ে আসতে চেয়েছেন, শালিখ হয়ে আসতেও তাঁর কোনো আপত্তি নেই। এমন কী তিনি ভোরের কাক হয়ে আসতেও রাজি। কবির রোমান্টিক মন কখনো আবার হাঁস হতে চায় যদি সে হাঁস হয় কিশোরীর পোষা, সে নিজে যদি তার লাল পায়ে ঘুঙুর বেঁধে দেয়। সন্ধ্যার বাতাসে ওরা সুদর্শন, শিমুলের ডালে বসা লক্ষ্মী পেঁচা, কিংবা সন্ধ্যার অন্ধকার পটভূমিতে উড়ে আসা সাদা বক-এর যে-কোনো কিছু হয়ে এই বাংলায় কবি ফিরে আসতে চান।

রবীন্দ্রনাথ যে জীবনানন্দের কবিতাকে বলেছিলেন চিত্ররূপময়, রূপসী বাংলা-র অন্যসব কিছু কবিতার মতো এই কবিতাতেও তার কিছু নিদর্শন আছে। এই কবিতায় কয়েক রকমের পাখির কথা তো আছেই, কিন্তু তাদের অনুষঙ্গগুলি তাকে সুন্দর করে তুলেছে এবং সেই কারণেই ছবিগুলি ভালো ফুটে উঠেছে। কবি তাঁর প্রিয় নদী ধানসিড়ির কথা উল্লেখ করেছেন, আর নদী প্রসঙ্গেই এসেছে শঙ্খচিলের কথা। অবশ্য ধানসিড়ি নদী এবং শঙ্খচিল এখন প্রায় এমনভাবে বন্ধনীভুক্ত হয়ে গিয়েছে যে জীবনানন্দের কবিতায় এ দুটিকে যে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখা যাবে না, কবির যে-কোনো প্রিয় পাঠক তা জানেন।

কাক এমন কিছু সুদৃশ্য প্রাণী নয়, তার কর্কশ কণ্ঠ এবং বর্ণের কৃষ্ণতার জন্য বরং পক্ষীসমাজে তার স্থান বেশ কিছুটা নীচের দিকেই, কিন্তু ভোরের কাক বলতে একটা সুন্দর অনুষঙ্গ ভেসে ওঠে—অন্যান্য পাখির ডাকেও ভোর হয়, কিন্তু কাকের ডাকই প্রথম শোনা যায় এবং সেই স্বর তখন অসুন্দর লাগে না। কার্তিকের শেষে ভোরে

বেশ কুয়াশা শুরু হয়ে যায়—‘কার্তিক মাসেতে হইল হিমের জনম’, কবির কাব্যে আমরা পাই। কুয়াশার চারদিক বাপসা হয়ে গিয়েছে এবং হালকা আলোয় কাকের ওড়াউড়ি দেখা যাচ্ছে, গ্রামে এই ছবি এখনও দেখা যায়। কবি এই ছবিটিই তুলে এনেছেন তাঁর কবিতায়।

ছবির সঙ্গে নিজ অভিজ্ঞতা মিলে গেলে যে অপরাধপতার সৃষ্টি হয়, তার পরিচয় পাই হাঁসের চিত্র রচনায়। পুকুরে হাঁস চলে বেড়ায়, পল্লিগ্রাম সম্বন্ধে খুব বেশি অভিজ্ঞতা না থাকলেও এ কথা জানা যায়। কিন্তু পল্লিগ্রামে হাঁস যে গৃহপালিত পাখির মতো থাকে, বাড়ির ছেলেমেয়েরা যে তাদের পরিচর্চা করে—সকালে পুকুরে ছেড়ে দেয় এবং ‘চই চই’ করে ডেকে তাদের খাবার দেয়, মেয়েরা শখ করে তাদের সাজায়, এসব কথা পল্লিগ্রামে বাস না করলে জানা যায় না। পুকুর বলতেই রোমান্টিক দৃষ্টিতে পদ্ম ও শালুকের কথা মনে হয়। কিন্তু পুকুরের ধারে ধারে গ্রামে যে অজস্র কলমিলতা গজায় এবং তার একটা নিজস্ব গন্ধ আছে—তুচ্ছ এই প্রকৃতির প্রতি নিবিড় ভালোবাসা না থাকলে তা জানা যায় না।

সন্ধ্যার আকাশ যখন রাঙা, অন্ধকারের দু-একটা তুলির পৌঁচ পড়েছে আকাশের গায়, তখন দুধসাদা বক মদু শব্দে কীভাবে উড়ে আসে এবং সেই উড়ে আসার দৃশ্য যে কত সুন্দর লাগে, কবি সেটা লক্ষ করেছেন, উপভোগও করেছেন সেই কারণেই বক হয়ে ফিরে আসার প্রসঙ্গে এই ছবিটি তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন।

পাখিদের চিত্র ছাড়াও একটি অসাধারণ পল্লীচিত্র এই কবিতায় আছে। সন্ধ্যায় চাঁদের আলো থাকলে দূরের মাঠ ঘাট যেমন সুন্দর হয়ে ওঠে, তেমনি সুন্দর লাগে গ্রামের বাড়িতে ঘাসের উঠোনে চাঁদের আলোর প্রতিফলন। উঠোনের ঘাস আলোয় চক চক করে। কবি তার উল্লেখমাত্র না করে অসাধারণ এক উপমা-চিত্র সৃষ্টি করেছেন (অলংকারের ভাষায় যাকে বলতে হবে অতিশয়োক্তি) : ‘হয়তো খইয়ের ধান ছড়াইতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে।’

কবিতাটির আকার এবং প্রকা নিয়েও, অর্থাৎ এর আঙ্গিক বিষয়েও একটু মন্তব্য করতে হবে। এটি যে সনেট সে কথা আগেই বলা হয়েছে, অর্থাৎ চোদ্দ পংক্তিতে এই কবিতাটি সম্পূর্ণ। এই চোদ্দ পংক্তি দু’ভাগে বিভক্ত—আট পংক্তি ও ছয় পংক্তি। পেরাকীয় সনেট বা ইতালিয় সনেট এই রকম বিভাগই নির্দেশ করেছে, এদের বলা হয় যথাক্রমে অষ্টক ও ষট্‌ক। শেকসপিরীয় সনেটে অন্যরকম বিভাগও দেখা যায়, কিন্তু জীবনানন্দ তাঁর সনেটে অন্য কোনো রকম বিভাগ করেন নি। পেরাকীয় সনেটে দুটি বিভাগের মধ্যে একটা আবর্তন সন্ধি থাকে, যাতে দুটি স্তবকের ভাবের ঐক্য বজায় থাকে। এখানে গোটা কবিতাই কবি সৃষ্টি করতে চেয়েছেন যে গোটা কবিতায় একটিও পূর্ণচ্ছেদ চিহ্ন (দাঁড়ি) তিনি ব্যবহার করেন নি, কবিতাটি শেষ হয়েছে একটি ড্যাশচিহ্ন (—) দিয়ে।

সনেটটিতে যে অন্ত্যমিল ব্যবহার করা হয়েছে তাও পেরাকীয় রীতি অনুসরণ করেই। এখানে এই অন্ত্যমিল এইরকম :

ক খ খ ক ক খ খ ক

গ ঘ গ ঘ ঙ ঙ

[অর্থাৎ, আয় - এশে - এশে - আয় আয় - এশে - এশে - আয়

আসে - আলে - আসে - আলে ইড়ে - ইড়ে]

৬.৩.১১.২ : তিমির হননের গান : তবুও মানব থেকে যায়

‘তিমির হননের গান’ কবিতাটি ‘সাতটি তারার তিমির’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। এই কবিতা ‘রচনার’ উপলক্ষ্য জানলেই কবিতাটি আমাদের কাছে সুবোধ্য হয়ে আসবে।

কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল ‘কবিতা’ পত্রিকার ১৩৫০ সালের পৌষ সংখ্যায়। তেরোশো পঞ্চাশ বাংলার বুক্রে এই দগদগে ক্ষতচিহ্ন, এই সময়েই ঘটেছিল বীভৎস সেই পঞ্চাশের মন্বন্তর। সেই মন্বন্তরকে নিয়ে কবিতা, গল্প, নাটক অনেক লেখা হয়েছে, কিন্তু প্রায় যেটা অসম্ভব ছিল—সেদিনের সেই নির্মম অপচয়ের আঁচ লুকিয়ে রেখে কিছু লেখা, লিখতে গিয়ে প্রচারধর্মী না হয়ে ওঠা অথচ সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার স্পষ্ট প্রমাণ দেওয়া— সেই কাজই সম্ভব করেছে জীবনানন্দের এই কবিতা। আমায় বলেছিলেন তিনি নির্বিশেষ কালচেতনা ও ভৌগোলিক চেতনার কবি-নিজেকে যিনি সর্বকালের ও সর্বভূমির বলে মনে করতে পারেন, তিনি কেমন করে একটি বিশেষ প্রসঙ্গ নিয়ে কবিতা লিখতে নিজেকে রাজি করালেন, কেমন করে তিনি সামাজিক দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করে নিলেন, সেটাই বিস্ময়।

‘তিমির হননের গান’ কবিতাটি ‘সাতটি তারার তিমির’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। তেরোশো পঞ্চাশ বাংলার বুক্রে এই দগদগে ক্ষতচিহ্ন জীবনানন্দের এই কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে। মন্বন্তরে কত মানুষের জীবন গিয়েছিল, কত মানুষ, মানুষের সেই ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়েছিলেন অথনীতিবিদরা, সমাজতান্ত্রিকেরা তার হিসাব করেছেন। আজ ভালোবাসাহীন জীবনে শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি। সমস্ত জীবনজুড়ে এখন কৃত্রিম প্রবঞ্চনা, নিজেকেই ঠকাবার আয়োজন।

ব্যাপ্তি এই কবিতারও অবশ্য স্বভাবধর্ম। কবি শুরু করেছেন একেবারে পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব থেকে—

‘কোনো হুদে

কোথাও নদীর ঢেউয়ে

কোনো এক সমুদ্রের মনে

পরস্পরের সাথে দু-দণ্ড জলের মতো মিশে

সেই এক ভোরবেলা শতাব্দীর সূর্যের নিকট

আমাদের জীবনের আলোড়ন’।

সেই এককোষী জীব অ্যামিবার মধ্যে প্রাণের উৎপত্তি ঘটেছিল জলে, শতাব্দীর সূর্য সাক্ষী ছিল তার। তারপর প্রাণের বিবর্তন ঘটে চলল। ‘স্মরণীয় উত্তরাধিকারে কোনো গ্লানি নেই ভেবে’ জীবনকে ভালোবেসেই প্রাণীর জীবনের বিবর্তন ঘটেছে—জল থেকে স্থলে, উদ্ভিদ থেকে জীবে, এককোষী থেকে বহুকোষী জীবে, পতঙ্গ থেকে সরীসৃপ, সরীসৃপ থেকে পাখি। এই ভাবে বিবর্তনের পথে আজ আমরা এসেছি শেষ পর্বে—হোমো

স্যাপিয়েন্স। কিন্তু গুহাবাসী মানুষ যখন সভ্য হল, মারণ অস্ত্র আবিষ্কার করতে শিখল তখন সে যে একদিন ভালোবেসে জীবনকে আঁকড়ে ধরেছিল, সব ভুলতে শুরু করল :

‘সেই সব রীতি আজ মৃতের চোখে মতো তবু—

তারার আলোর দিকে চেয়ে নিরালোক।

আজ ভালোবাসাহীন জীবনে শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি। সমস্ত জীবনজুড়ে এখন কৃত্রিম বঞ্চনা, নিজেকেই ঠকবার আয়োজন :

‘সূর্যালোক নেই — তবু —

সূর্যালোক মনোরম মনে হলে হাসি।

দেশের বিপর্যস্ত অর্থনীতি, শাসক ইংরেজের প্রথম লোভ এবং দেশীয় মানুষের হৃদয়হীন কালোবাজারির ফলেই তৈরি হয়েছিল পঞ্চাশের মন্বন্তর। কত মানুষের জীবন গিয়েছিল, কত মানুষ মানুষের সেই ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়েছিলেন অর্থনীতিবিদ্রা, সমাজতাত্ত্বিকেরা তার হিসাব করেছেন। কবি শুধু যেসব ‘কালো কালো ছায়া লঙ্গরখানার অন্ন খেয়ে’, বাঁচার চেষ্টা করেছিল, তাদের কথা বলেছেন, বাঁচে নি তো আরো অনেক। তাদের দেখে আমাদের কী প্রতিক্রিয়া? আমাদের মতো মধ্যবিত্ত মানুষের :

‘এরা সব এই পথে ;

ওরা সব ওই পথে — তবু

মধ্যবিত্তমন্দির জগতে

আমরা বেদনাহীন — অন্তহীন বেদনার পথে।’

আশ্চর্য লাগে কীভাবে সেদিনও আমরা বেদনাহীন ছিলাম, সমব্যথী হতে পারি নি কেন? আমরা নিতান্ত উদাসীন ছিলাম এই ভেবে যে এসব নিরন্ন গ্রামবাসীদের দুর্ভোগ, আমাদের এখন স্পর্শ করবে না। আমাদের এই হৃদয়হীন নির্মম মনোভাবকে ব্যঙ্গ করে কবি বলেছেন :

‘সূর্যালোক প্রজ্জ্বলয় মনে হলে হাসি...

মহানগরীর মৃগনাভি ভালোবাসি।’

অর্থাৎ আত্মরতিতে অভ্যস্ত মধ্যবিত্ত তখনও সব কিছু ঠিক আছে ভেবে তৃপ্ত থাকতে চেয়েছে।

লক্ষ করবার মতো, কবিতার শেষে কিন্তু কবি বিশ্বাস বিসর্জন দেননি। ‘বেলা অবেলা কালবেলা’ কাব্যগ্রন্থের ‘মানুষের মৃত্যু হ’লে’ কবিতায় কবি বলেছেন ‘মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব/থেকে যায়’, এখানেও বলেছেন তিমিরবিলাসী আমরা নই, আমরা তিমির বিনাশী। শেষ পর্যন্ত তিমির বিনাশ করতেই চাই, এ বিশ্বাস কবি রেখেছেন—এই কবিতায় তো বটেই, ‘সাতটি তারার তিমির’ কাব্যগ্রন্থের, ‘বিভিন্ন কোরাস’, ‘প্রতীতি’ প্রভৃতি কবিতাতেও।

৬.৩.১১.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

- ১। প্রকৃতির প্রতি নিবিড় ভালোবাসার যে ছবি ‘আবার আসিব ফিরে’ কবিতাটিতে আছে তার দুটি প্রমাণ দাও?
 - ২। সনেট কাকে বলে?
 - ৩। বাংলার বুকে কোন সময় মঘন্তর দেখা দিয়েছিল?
 - ৪। ‘তিমির হননের গান’ কবিতাটির মূল বিষয়বস্তু কি?
-

৬.৩.১১.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

- ১। আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয় : অশ্রুকুমার শিকদার।
- ২। আমার জীবনানন্দ : হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ৩। একটি নক্ষত্র আসে : অম্বুজ বসু।
- ৪। জীবনানন্দ : অমলেন্দু বসু।

ষষ্ঠ পত্র

পর্যায় গ্রন্থ-৩

জীবনানন্দ দাশ আটটি নির্বাচিত কবিতা

একক-১২

সুচেতনা, শিকার

বিন্যাস ক্রম :

- | | | |
|----------|---|--------------------------------|
| ৬.৩.১২.১ | : | সুচেতনা : পৃথিবীর ক্রমমুক্তি |
| ৬.৩.১২.২ | : | শিকার : পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম ঘাতক |
| ৬.৩.১২.৩ | : | আদর্শ প্রস্ফাবলি |
| ৬.৩.১২.৪ | : | সহায়ক গ্রন্থাবলি |

৬.৩.১২.১ : সুচেতনা : পৃথিবীর ক্রমমুক্তি

‘বনলতা সেন’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতার সুচেতনা। বিষয়বস্তুতে অনেকটাই মিল আছে ‘বনলতা সেন’-এর সঙ্গে, তার সঠিক ভাবে প্রেমের কবিতা একে বলা যাবে কিনা সন্দেহ আছে। প্রেম বলতে যদি আমরা মানবপ্রেম বুঝি, ব্যাপ্ত এক ভালোবাসা বুঝি, সমস্ত মানবজাতির প্রতি শুভৈষণা বুঝি, তাহলে একে ভালোবাসার কবিতা বলতেও কোনো বাধা নেই। বস্তুত, কবিতার নামকরণে এক নায়িকার ইঙ্গিত থাকলেও একে ‘শ্যামলী’, ‘সুরঞ্জনা’, ‘শঙ্খমালা’-র সঙ্গে তাকে অঙ্কিত করে ফেলার কোন সম্ভাবনা নেই, বরং নামের আভিধানিক অর্থ মনে রাখলেই কবিতার নিহিতার্থের কাছাকাছি পৌঁছনো যাবে বলে আমাদের মনে হয়। যেটা লক্ষণীয় সেটা হল এই যে, এখানেও কবি মানব সভ্যতা সম্বন্ধে কথা বলেছেন। এখানেও কবির অনুভূতির মূলে আছে ‘মিতভাষণ’ এর সেই কথা ‘মানুষের সভ্যতার মূলে ক্লান্তি আসে’। প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানের দিকে মানুষ অনেক এগিয়েছে সত্য, কিন্তু মানুষের মূল্যবোধ এখন তলানিতে এসে ঠেকেছে যে মানুষের শুভচেতনা, মানুষের মনুষ্যত্ব, মানুষের অন্তর্লীন সুচেতনা না জাগলে এসব কিছুই অর্থহীন হয়ে যাবে।

কথাটা জীবনানন্দই যে প্রথম ভাবলেন এমন অবশ্যই নয়। উনিশ শতকের মহত্তম পুরুষ হিসাবে কথিত বঙ্কিমচন্দ্র কথাটা কমলাকান্তের দপ্তর গ্রন্থের ‘আমার মন’ প্রবন্ধে অনেক আগেই বলেছিলেন—‘তোমরা এত কাল করিতেছ, মনুষ্যে মনুষ্যে প্রণয়

‘বনলতা সেন’ কাব্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতা সুচেতনা। মানুষ অনেক বিদ্যা অর্জন করেছে, বিজ্ঞানের দিকে মানুষ অনেক এগিয়েছে সত্য, কিন্তু বর্জন করতে হয়েছে অনেক মানবিক গুণ। তাই কবি মনে করেন মানুষের শুভচেতনা ও মানুষের অন্তর্লীন সুচেতনা না জাগলে সবকিছুই অর্থহীন হয়ে যাবে। ‘সুচেতনা’ কবিতায় কবি বলেন— ভালোবাসাহীনতার অন্ধকার রাত্রিকে শাস্ত মনে হতে পারে, কিন্তু মানবিক অনুভূতি এবং সুচেতনার অনন্ত সূর্যোদয়-সম্ভাবনা ঠিকই জেগে থাকবে মানুষের মনে। মানুষ যে, মানুষের হৃদয়ের সান্নিধ্য চায়, সেটাই যে মানুষের এখনও পর্যন্ত চায়, সেটাই যে মানুষের এখনও পর্যন্ত রণ-রক্ত-সফলতার চেয়ে বেশি আপনার, এটা কবি সত্য বলে জানেন।

বুদ্ধির জন্য কি একটা কিছু হয় না? একটা বুদ্ধি খাটাইয়া দেখ, নহিলে সকল কেবল হইয়া যাইবে।’ সমস্ত ‘কেবল’ যে হয়ে যাবার সত্যিই আশঙ্কা ছিল, আজকের প্রজন্মকে দেখলে সেকথা বোঝা যায়। মানুষ অনেক বিদ্যা অর্জন করেছে, সভ্যতা অনেক অগ্রসর হয়েছে কিন্তু বর্জন করতে হয়েছে অনেক মানবিক গুণ। কবি তাতেই ব্যথিত হয়ে এই কবিতা লিখেছেন, এই বেদনার মানচিত্র তুলে ধরেছেন, কিন্তু ভেঙে পড়েন নি— এখনো আশা করার মতো কিছু আছে, সেই প্রত্যয়ী আশ্বাসও শুনিয়েছেন।

ভালোবাসাহীন ও বিবেকহীন সভ্যতার থেকে সুচেতনা বা মহৎ চেতনা অনেক অনেক দূরের দূরতর দ্বীপ/বিকেলের নক্ষত্রের কাছে। বিকেলের নক্ষত্র, কথা দুটি লক্ষ করার মতো। নক্ষত্র অমিত শক্তির বটে, কিন্তু বিকেলের আকাশে নক্ষত্র প্রায় অদৃশ্য। সেই প্রায় অদৃশ্য মানব সভ্যতার কাছে সুচেতনা শুধু দূরের একটি দ্বীপ নয়, ‘দূরতর দ্বীপ’, অনেক অনেক দূরের দ্বীপ। ‘দারুচিনি’-র ব্যঞ্জনা ‘বনলতা সেন’ কবিতায় আমরা পেয়েছি, কবি বলতে চান সেই বিশুদ্ধ হৃদয়হীন মানুষের অগণন সমারোহের মধ্যে এখনও একটু অবকাশ আছে, এখনও সুচেতনার আশা করাটা অলীক কল্পনা নয়। আশা যে করা যেতে পারে, তাকে আরো বেশি স্পষ্টতার প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন, সভ্যতা বলতে পৃথিবীর যে রক্তাক্ত সাম্রাজ্যবাদ, কলোনি স্থাপন, দুর্বল মানুষের শোষণ এবং তাদের নিষ্পেষিত করে নিজেদের বৈভব বৃদ্ধি বোঝায়, সভ্যতার ইতিহাসে এখন তো সেই ‘জোর যার অধিকারও তার’ এই নীতিই সত্য বয়ে উঠেছে—তা সত্ত্বেও এটাই ‘শেষ সত্য নয়।’ শেষ সত্য যে কী, তাও তিনি বলেছেন, ‘তবুও তোমার কাছে আমার হৃদয়।’ মানুষে যে মানুষের হৃদয়ের সান্নিধ্য চায়, সেটাই যে মানুষের এখনও পর্যন্ত রণ-রক্ত-সফলতার চেয়ে বেশি আপনার, এটা কবি সত্য বলে জানেন।

কবিতার দ্বিতীয় স্তবকেও পৃথিবীর ইতিহাসের যে ছবি কবির মনে উঠে এসেছে তা বিচার করে তিনি পৃথিবীর যুদ্ধোন্মাদনা, ভাইয়ের হাতে ভাইয়ের হত্যা, আত্মীয়ের হাতে আত্মীয়ের হত্যা, প্রভৃতির একটি ধারাবাহিক ইতিহাস পেয়েছেন। মহাভারতের কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত কোনো সময়ই এর ব্যতিক্রম নয়; বরং আধুনিক কালে এই মানবতাহীন পরাক্রমের লোভ এত বেড়ে উঠতে দেখেছেন, যে কবিকে বলতেই হয়েছে, ‘পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন।’

সামান্য আশার সূত্র ধরে রাখলেও, তৃতীয় স্তবকে আধুনিক সভ্যতার চিত্র কবির কলমে বীভৎস হয়ে উঠেছে। যুদ্ধ এবং প্রেমে নাকি অশোভন বা অনৈতিক বলে কিছু নেই—এ প্রবাদ সত্য হয়ে উঠেছে আজকের দিনে। যাকে আমরা পুরাকালের যুদ্ধ বলি সেখানে কিন্তু যুদ্ধের কিছু নিয়ম মেনে চলা হত। যেদিন থেকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি উপনিবেশ স্থাপনের খেলায় মেতেছে সেদিন থেকে ছলে বলে কৌশলে সে শুধু নিজের বিভ্রাট বাড়ানোর লালসায় সমস্ত নীতি বিসর্জন দিয়েছে। দুর্বল মানুষের ওপর নিঃসীম অত্যাচার চালিয়েছে, তাদের সম্পদ লুণ্ঠ করেছে, মানুষের রক্ত শুষে নিয়েছে। তাকেই প্রতীকায়িত করে কবি লিখেছেন :

‘কেবলি জাহাজ এসে আমাদের বন্দরের রোদে

দেখেছি ফসল নিয়ে উপনীত হয়;

সেই শস্য আগণন মানুষের শব;’

দুই প্রাচ্য মনীষীকে স্মরণ করেছেন কবি এই প্রসঙ্গে—একজন বুদ্ধদেব যাঁর অহিংসার বাণী পৃথিবীতে ছড়াবার চেষ্টা করেছেন তাঁর শিষ্যরা; অন্যজন প্রাচ্যের বিজ্ঞতম সুধী কনফুসিয়াস।’ তাদের বোধির দীপ্তিতে ‘স্বর্ণের বিস্ময়’ ধরা পড়েছিল। তাতে হয়তো এই ‘হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী’-র কথা ভাবা অসম্ভব ছিল, কিন্তু তবু আজ হানাহানি বেড়েই চলেছে ক্রমশ।

চতুর্থ স্তবকে আবার সূচনাকালে স্মরণ করেছেন কবি এবং বিশ্বাস করেছেন, একদিন গৌতম বুদ্ধ এবং কনফুসিয়াস চৈতন্যের যে আলো জ্বলেছেন, পৃথিবীর মুক্তি ক্রমে ক্রমে সেই পথেই হবে। তবে সেই সঙ্গে কবি এটাও বুঝতে পারেন, একদিনে সে কাজ সম্ভব হবে না, অনেক শতাব্দীর অনেক মনীষী বার বার এসে আমাদের চৈতন্য আঘাত করলে একদিন তা সম্ভব হবে।

লক্ষ করা যেতে পারে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যেখানে আশাহত হয়ে বলেছেন :

‘ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠিয়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে।....
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাঁদের ব্যর্থ নমস্কারে।’

সেখানে আধুনিক কবি কিন্তু আশা হারান না। তিনি বিশ্বাস করেন এরকম দিন একসময় ফিরে আসবে, যখন বোঝা যাবে :

‘এ বাতাস কি পরম সূর্য করোজ্জ্বল;
প্রায় এতদূর ভালো মানব-সমাজ’।

কিন্তু সেই সঙ্গে কবি এ কথাও বলেন যে, সে দিন আসতে এখনও অনেক দেরি আছে, কবে তা আসবে ‘ঢের দূর অন্তিম প্রভাতে।’

কবি যে আশা এবং আশাভঙ্গের বেদনায় দোলায়িত হয়েছেন, মানুষের জীবনে কোনটা সত্য, এই মানসিকতার মৃত্যু অথবা মানবিকতার অবিনশ্বরতা, এই সব দ্বন্দ্ব যে তিনি বিক্ষত, সে কথা বোঝা যায় শেষ স্তবক পাঠ করলে। ‘মাটি-পৃথিবীর টানে মানবজন্মের ঘরে কখন এসেছি’—কবি যখন এ কথা বলেন তখন তার সত্যতা আমরা বুঝতে পারি, কারণ ‘রূপসী বাংলার’ কবিকে আমরা চিনি, মাটির প্রতি টান তাঁর কত খাঁটি সে কথাও আমরা জানি। ‘না এলেই ভালো হতো’—এ কথা তাঁকে বলতে হয় অনেক দুঃখে, আজকের পৃথিবীর চেহারা দেখে। যেখানে ভালোবাসাহীনতায় সমস্ত মানবসমাজ এক সর্বনাশা অবক্ষয়ের পথে ছুটে চলেছে সেখানে জন্মগ্রহণ করাটা ঠিক হয়নি, এ কথা কবির একদিন মনে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর আজকের অনুভব, ‘এসে যে গভীরতর লাভ হ’লো সে-সব বুঝেছি।’ কবিতার শেষে দুটি পংক্তি স্পষ্টতর ও ব্যঞ্জনাৎমক অনেক কথা বলে :

‘দেখেছি যা হ’লো হবে মানুষের যা হবার নয়—
শাস্ত্রত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।’

মানব সভ্যতার প্রথম পর্বে যা হল, কবি দেখেছেন; মানুষের আজ যে — অবস্থা ঘটেছে তা দেখেই অনুমান করা যায় তার এই সভ্যতার প্রতাপ একদিন কী হবে; কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষের অন্তহীন চৈতন্য যে

কোনোদিন নিঃশেষ হবে না, এও কবি বুঝতে পারেন। তাই একটি ব্যঞ্জনায় তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, ভালোবাসাহীনতার এই অন্ধকার রাত্রিকে শাস্ত মনে হতে পারে, কিন্তু মানবিক অনুভূতি এবং সূচনতার অনন্ত সূর্যোদয়—সম্ভাবনাও জেগে থাকবে মানুষের মনে কবির মনে।

৬.৩.১২.২ : পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম ঘাতক

‘কবিতা’ পত্রিকায় ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত এই কবিতার সঙ্গে কী গভীর সাদৃশ্য অনেকদিন আগে লেখা ‘পরিচয়’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘ক্যাম্পে’ কবিতাটির। শুধু যে উপাদানের মিল তা নয়—যদিও উপাদানের মিলও আমাদের বার বার সচকিত করে—সেই হরিণ, অরণ্য, শিকার, নদী, বন্দুকের শব্দ;

‘শিকার’ কবিতাটি জীবনানন্দ দাশের বিশিষ্ট মানসিকতায় লালিত এক অনুভূতি। ‘শিকার’ কবিতাটি আখ্যানধর্মী, কিন্তু আখ্যান অংশ খুবই সংক্ষিপ্ত। যদিও সেটি ইমেজিস্ট কবিতা এবং কাব্যআঙ্গিকের প্রাণ যে চিত্রকল্পের অনুপম ব্যবহার এই কবিতা হতে পারে তার আদর্শ দৃষ্টান্ত। কবিতাটির প্রধান সৌন্দর্য দুভাবে বিচার্য, তা হল পরিবেশ চিত্রণে এর বর্ণবৈভব এবং সংঘর্মের ঐশ্বর্য। সৃষ্টির নিয়ত শিকারে বিপন্ন কবির অন্তরে আসলে কী গভীর জীবনতৃষ্ণা, একথা যেমন বোঝা যাবে এই চিত্রকল্প থেকে, তেমনি এই অসহ্য রোমান্টিক পংক্তি আমাদের বুঝিয়ে দেবে রোমান্টিকতার প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গিতে আছে কী সূত্রী জীবনবাদ। জীবনানন্দ যাদের আনন্দ দেন, জীবনানন্দ যাদের বিষণ্ণ করেন, এ কবিতা তাঁদের নতুন করে ভাবাবেই।

আমরা বিস্মিত হই অনুভূতিরও অভিন্ন সংবেদন লক্ষ্য করে। ‘শিকার’ কবিতা পড়তে গেলে যে অনিবার্য বিষণ্ণতা ও নিরাশ্রয়তার দ্বারা আমরা আক্রান্ত হই, সেটাই যে ‘ক্যাম্পে’ কবিতারও বিশিষ্ট অনুভূতি সে সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হই কবির নিজেরই দেওয়া ব্যাখ্যা স্মরণ করলে। এই ব্যাখ্যা অবশ্য প্রকাশিত হয়েছে অনেক পরবর্তী কালে, ১৯৭৪ সালে, ‘শতভিষা’ পত্রিকার একচল্লিশতম সংকলনে, সেখানে কবি বলেছিলেন, ‘যদি কোনো একমাত্র স্থির নিষ্কম্প সুর এ কবিতাটিতে থেকে থাকে তবে তা জীবনের-মানুষের-কীট-ফড়িঙের সবার জীবনেরই নিঃসহায়তার সুর। সৃষ্টির হাতে আমরা ঢের নিঃসহায়...স্থূল শিকারীই শুধু প্রলোভনে ভুলিয়ে হিংসার আড়ম্বর জাঁকাচ্ছে না, সৃষ্টিই যেন তেমন এক শিকারী, আমাদের সকলের জীবন নিয়েই যেন তার সকল শিকার চলেছে।’

ভাবতে অবাক লাগে, এটি ‘শিকার’ কবিতার ব্যাখ্যা নয়, এবং সেই সঙ্গেই অনিবার্য প্রশ্ন জাগে এটি কি ‘শিকার’ কবিতারও

ব্যাখ্যা নয়। আসলে এটা অনেক কবিতারই ব্যাখ্যা, এটি জীবনানন্দ দাশের বিশিষ্ট মানসিকতায় লালিত এক অনুভূতি। সৃষ্টি এগিয়ে চলে, সভ্যতা এগিয়ে চলে, সমস্ত পৃথিবীতে—যেমন বলা হয়েছে ‘বনলতা সেন’ কবিতায়, হাজার বছর ধরে অবিরাম সক্রিয় সাফল্যের সঙ্গে যুক্ত ক্লাস্তির পরিক্রমা চলবেই। কিন্তু ‘এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা/সত্য; তবু শেষ সত্য নয়।’ সভ্যতার এই প্রখর সূর্যালোকের ক্লাস্তি সহনীয় করার জন্য থাকে প্রেম। সভ্যতার উত্তাল তরঙ্গ থেকে যে মানুষকে নিয়ে আসতে পারে এমন এক ‘নিঃসৃত অন্ধকার’, যা ‘রাত্রির মায়ের মতো’, যেখানে সমস্ত সত্তা জানে, পাখির নীড়ের মতো এক সুনিশ্চিত আশ্রয়ের দৃষ্টিপ্রলেপ রয়েছে। কাজেই সৃষ্টির বিশাল কর্মযজ্ঞে মানুষের মৃত্যু হলেও মানব থেকে যায়, যে মানব মনুষ্যত্বের জীবের মতোই, নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও শিকারী সৃষ্টির ফাঁদে পা দেয়। হয়তো কারণটা এই যে, এই প্রেম মৃত্যুর চেয়ে বড়ো, মৃত্যুভয়কে সে অনায়াসে উত্তীর্ণ হতে পারে। ‘ক্যাম্পে’ কবিতায় হরিণ ছুটেছিল এক ঘাইহরিণীর ডাক শুনে, ‘শিকার’ কবিতাতেও

কি হরিণ শুধু নিজের প্রয়োজনে নদীর জলে নেমেছে নাকি আরো এক প্রচ্ছন্ন আবেগ সেখানে কাজ করেছে, যার উল্লেখ কবি এই ভাবে করেছেন—

‘এই নীল আকাশের নিচে সূর্যের সোনার বর্ষার মতো জেগে উঠে

সাহসে সাধে সৌন্দর্যে হরিণীর পর হরিণীকে চমক লাগিয়ে দেবার জন্য।’

‘শিকার’ কবিতার ব্যাখ্যা এরপরও কিছু বাকি আছে বলে আমার মনে হয় না, অন্তত কবিতার ব্যাখ্যা যাকে বলে। তবু নিজের কাছে নিজেকে স্পষ্টতর করে নেওয়ার জন্য অপ্রয়োজনীয় কথাও কিছু বলবো।

‘শিকার’ কবিতাটি আখ্যানধর্মী, কিন্তু আখ্যান-অংশ খুবই সংক্ষিপ্ত। অরণ্যের একটি ভোরের দৃশ্যে কবিতার সূত্রপাত, যখন সূর্যোদয়ের আভাস দেখা যাচ্ছে অথচ রাতের একটি তারাও জ্বলজ্বল করছে। সারা রাত দেশজ মানুষের শরীর উষ্ণ রাখবার জন্য আগুন জ্বলে তাপ নিয়েছে আর সুন্দর বাদামী হরিণ চিতাবাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচবার জন্য ঘুরে বেড়িয়েছে সুন্দরীর বন থেকে অর্জুনের বনে বনে। ভোরের আলোয় তার সাবধানতার অবসান হয়েছে ভেবে যে মুহূর্তে সে নদীর জলে স্নান করতে নেমেছে সেই মুহূর্তেই বোঝা গিয়েছে চিতাবাঘিনীর চেয়েও সাংঘাতিক কোন আততায়ী আত্মগোপন করেছিল এই অরণ্যেই। নাগরিক সেই শিকারীর আচমকা গুলিতে প্রাণ হারিয়ে হরিণ তাদের ভোজ্যে পরিণত হয়েছে।

‘শিকার’ কবিতাটি এক কথায় অসাধারণ, কিন্তু এর অসাধারণত্বের কারণগুলি যতোখানি অনুভবগম্য, ততোটা ব্যাখ্যায় নয়। কবিতা বিচারের যে বিশিষ্ট তাত্ত্বিক খুপরি আমরা বানিয়ে রেখেছি, আমাদের সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য, কবিতাটি তার চেয়ে মাপে অনেক বড়ো—কেটে ছেঁটে কোনও একটা খোপে তাকে ঢোকাবার চেষ্টা করতে পারি, এরকম চেষ্টা আগেও অনেক হয়েছে; কিন্তু তাতে কবি, কবিতা এবং কাব্যপাঠক কারো প্রতিই সুবিচার করা হবে না। আমরা বলতে পারি এটি একটি ইমেজিস্ট কবিতা, বস্তুত অনেকেই সে কথা বলেছেন। ফবিস্টদের কবিতায় যে চড়া রঙের ব্যবহার থাকে, এখানে তাও আছে। কেউ যদি ইম্প্রেশনিস্ট কবিতার আশ্বাদ এখানে পেতে চান, নিঃসন্দেহে তাও তিনি পেয়ে যাবেন। একটি সংবেদনের মধ্যে একাধিক ইন্দ্রিয়-সংবেদনের অবস্থান, এক কথায় যাকে আমরা বলি সাইনেস্থিসিয়া, আর উদাহরণও এই কবিতায় নির্ভুলভাবে পাওয়া যাবে। এবং কাব্যআঙ্গিকের প্রাণ যে চিত্রকল্পের অনুপম ব্যবহার, এই কবিতা হতে পারে তার আদর্শ দৃষ্টান্ত। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে একে ঠিক কোনও একরকমের কবিতা হিসাবে চিহ্নিত করতে গেলে আমাদের লাভের চেয়ে ক্ষতির আশঙ্কাই সমূহ।

সূত্রাং সমস্ত তত্ত্ব কথা ছেড়ে বলা যাক, কবিতাটির প্রধান সৌন্দর্য দুভাবে বিচার্য-এক।। পরিবেশ চিত্রণে এর বর্ণবৈভব, দুই।। এর সংযমের ঐশ্বর্য। প্রথম ব্যাপারটিকে আমরা চিত্রকল্পের অনুরূপ কোন প্রক্রিয়া মনে করতে পারি, রবীন্দ্রনাথ যে ব্যাপারে জীবনানন্দের প্রতিভাকে স্বীকার করে নিয়ে তাঁর কবিতাকে বলেছেন ‘চিত্ররূপময়’। দ্বিতীয় ব্যাপারটি কতো গুরুত্বপূর্ণ তা জীবনানন্দের ‘ক্যাম্পে’ কবিতার সঙ্গে এ কবিতার তুলনা করলেই বোঝা যাবে। একই রাগিণীর বিস্তৃত আলাপ যদি হয় ‘ক্যাম্পে’ কবিতা, তবে তার দ্রুত লয়ের কিছু তান বলা যায় ‘শিকার’ কবিতাকে। কবিতা যে ‘সবচেয়ে ভালো শব্দগুলির সবচেয়ে ভালো সজ্জা, তারও সুনিশ্চিত দৃষ্টান্ত এই কবিতাতেই পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

শিকারের এক টান টান উত্তেজনা ছড়িয়ে আছে সমগ্র কবিতায়। অবশ্য এই শিকারযজ্ঞে যে অরণ্যে বহিরাগত নাগরিক মানুষও আছে, সে কথা আমরা জেনেছি কবিতার একেবারে শেষ পর্বে—এমনকি শিকারের যে একটি আয়োজন আছে, হরিণীকে চিতাবাঘিনীর ভয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছে, সে কথাও আমরা জানতে পারি কবিতার মধ্য পর্বে। এর আগে শুধুই প্রভাত ও রাত্রির সন্ধিক্ষণে মায়াবী এক আরণ্য ভোরবেলার পটভূমি চিত্রণ।

কী অসাধারণ নৈপুণ্যে, এবং বর্ণসচেতনতায়, এবং অনুভূতির গাঢ়তায় এ চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে, কবিতাটি বার কয়েক পড়লেই সে কথা সবচেয়ে ভালোভাবে বুঝতে পারা যাবে। ‘কাদম্বরীচিত্র’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বাণভট্টের বর্ণসচেতনতার নৈপুণ্য বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করেছিলেন, লাল রঙের ব্যবহারে তাঁর বৈচিত্র্যসৃষ্টির বৈশিষ্ট্য দেখে। ঠিক সেই ব্যাপারটির দিকেই আমরা অঙ্গুলিসঙ্কেত করতে পারি, তবে অতিরিক্ত শুধু এই কথাটি স্মরণ রাখতে বলবো যে, এই রক্তিম বর্ণবৈচিত্র্য কেবল ইন্দ্রিয়জ বর্ণবৈভব নয়, একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর হৃদয়ও সেখানে সদা সক্রিয় রয়েছে।

যে আগুন গভীর রাতে জ্বলেছিল দোয়াশালী মানুষ, সে আগুন ছিল, ‘মোরগফুলের মতো’ লাল। অন্ধকারের পটভূমিকায় ওইরকমই লেগেছিল তাকে। কিন্তু ভোর বেলায় যখন আসন্ন সূর্যালোকের আভাস পাওয়া যাচ্ছে, তখন অশ্বখপাতা পোড়ানো সেই আগুনই অনেক ফিকে মনে হয়। কবি বলেন তার রং এখন আর কুঙ্কুমের মতো নেই, তা এখন হয়েছে ‘রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো’। কী বলা যাবে এ অলংকারকে তা নিয়ে পণ্ডিতেরা বর্ষব্যাপী বিতর্কে রত হতে পারেন, কিন্তু একমাত্র কবিই জানেন নিতান্ত রুগ্ন শালিখেরও হৃদয় থাকে, তার বিবর্ণ ইচ্ছাকে কবিই ছুঁতে পারেন এবং শুধু তিনিই জানেন, সেই ইচ্ছারও একটা পাণ্ডুর রং থাকে।

শুধু লাল রং নয়, রঙের প্রায় শোভাযাত্রা এই কবিতায় আমরা দেখি—অথবা অত্যন্ত সাদামাটা ভাষায়, উপমাচিত্রের মধ্যে। আকাশের রঙে এখন কবি খুঁজে পান ঘাসফড়িঙের দেহের নীল, চারদিকের পেয়ারা ও নোনা গাছে টিয়াপাখির পালকের সবুজ, অন্ধকার তাঁর হাতে মহার্ঘ্য হয়ে ওঠে ‘মেহগনির’ সঙ্গে তুলনায়, হরিণকে তিনি বলেন বাদামী, আকাশে জেগে থাকা একটি মাত্র তারাকে একবার বাসরঘরের সবচেয়ে গোখুলিমদির মেয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে কবির মন পড়ে গিয়েছে তিনি হাজার বছরের অবিচ্ছিন্ন পদচারণায় ক্লান্ত মানুষ। তাই এবার আকাশের সেই তারাকে দেখে তার মনে পড়ে যায় ‘মানুষীকে’, মিশরদেশের মানুষী, তাঁরই মানুষী এবং নীল আকাশের মধ্যে একটিমাত্র তারাকে এবার, তাঁর মনে হয়, তাঁর নীল মদের গেলাসে রাখা মিশরের সেই মানুষের বুকের থেকে বার করা মুন্ডো। সৃষ্টির নিয়ত শিকারে বিপন্ন কবির অন্তরে আসলে কী গভীর জীবনতৃষ্ণা, এ কথা যেমন বোঝা যাবে এই চিত্রকল্প থেকে, তেমনি এই অসহ্য রোমান্টিক পংক্তি আমাদের বুঝিয়ে দেবে রোমান্টিকতার প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গিতে আছে কী সুতীর জীবনবাদ!

লাল রঙের ব্যবহারের আর একটি দৃষ্টান্তের কথা এখনও বলা হয়নি, ইচ্ছা করেই। বড় নির্মম সে পংক্তি, কবিতার একেবারে শেষ স্তবকে আছে। কবির ঈর্ষণীয় সংযমের ভালো দৃষ্টান্ত আছে এই শেষ স্তবকেই। পৃথিবীর একটি নির্মমতম ঘটনা ঘটে গিয়েছে এই স্তবকে, যাকে সবিস্তারে লিখবার প্রলোভন সংবরণ করাই শক্ত। যে হরিণ, হরিণরা বরাবরই বোধহয় একচক্ষু হয়, বাঘিনীর হাত থেকে বাঁচাটাকেই সবচেয়ে কঠিন মনে করে অন্ধকারের

মোড়কে নিজেকে লুকিয়ে বেড়িয়েছে, বাঘিনীর চেয়েও হিংস্র জন্তু যে দিনের আলোয় অসঙ্কোচে দূর থেকে প্রাণঘাতী আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে পারে, তা বোধহয় তার জানা ছিল না। অরণ্যে কারোরই বোধহয় তা জানা থাকে না, সেই জন্যই শেষ স্তবকের প্রথম পংক্তি ‘একটি অদ্ভুত শব্দ’। তারপরই বিক্ষত সেই পংক্তি—‘নদীর জল মচকাফুলরে পাপড়ির মতো লাল।’ আমরা যারা মচকা ফুল কখনো দেখিনি, তাদের চোখের সামনে এখন ফুলের পাপড়িতে ছিটকে লাগে হরিণের রক্ত। মৃত্যুর আয়োজনে একটুও সময় অপব্যয় না করে ‘উষা লাল’ হরিণের মাংসের ভোজে আমাদের উপস্থিত করেন কবি। ঘাতকদের পরিচয় তিনি দিয়েছেন কয়েকটা মাত্র বাক্যাংশে—‘সিগারেটের ধোঁয়া/টেরিকাটা কয়েকটা মানুষের মাথা;/এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক’।

অব্যর্থ এবং অপরিহার্য শব্দ ব্যবহারের এমন নিপুণ দৃষ্টান্ত মহৎ কবিদের রচনাতেও খুব বেশি পাওয়া যায় না।

জীবনানন্দ যাঁদের আনন্দ দেন, জীবনানন্দ যাঁদের বিষণ্ণ করেন, এ কবিতা তাঁদের নতুন করে ভাবাবেই। কারণ জীবনানন্দে আমরা যে রমণীয় স্ববিরোধিতা দেখি—‘গভীর অন্ধকারের ঘূমের আশ্বাদে আমার আত্মা লালিত’ এ কথা বলার পরও যিনি বিশ্বাস করেন ‘শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়’—তাঁর সেই স্ববিরোধী সত্তার এক কাব্যিক সমীকরণ আমরা ‘শিকার’ কবিতাটিতে পাই, এটিই কবিতাটির সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

৬.৩.১২.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

- ১। ‘সুচেতনা’ কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?
- ২। ‘সুচেতনা’ কবিতায় কবি কি বলতে চেয়েছেন?
- ৩। ‘শিকার’ কবিতায় জীবনানন্দ কি বলতে চেয়েছেন?
- ৪। ‘শিকার’ কবিতাটি কোন পত্রিকায় কত বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল?
- ৫। রবীন্দ্রোত্তর কবিগোষ্ঠীর মধ্যে জীবনানন্দ দাশের স্বাতন্ত্র্য কোথায় বুঝিয়ে দাও।
- ৬। ‘জীবনানন্দ জীবনের কবি’।—আলোচনা করো।
- ৭। জীবনানন্দের কবিতায় প্রতিফলিত কবির মৃত্যুচেতনার পরিচয় দাও।
- ৮। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন জীবনানন্দের কবিতা ‘চিত্ররূপময়।’ তোমার পঠিত কবিতা অবলম্বনে মন্তব্যটির সারবত্তা নির্ণয় কর।
- ৯। ‘বোধ’ কবিতাটির রসগ্রাহী বিশ্লেষণ করো।
- ১০। ‘বনলতা সেন’-কে প্রেমের কবিতা বলা সংগত কিনা বিচার করো।
- ১১। ‘আটবছর আগের একদিন’ কবিতাটি আধুনিক মানুষের অস্তিত্বের সংকটকেই তুলে ধরেছে।—আলোচনা করো।

- ১২। ‘সুচেতনা’ কবিতার ভাববস্তু বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে পৃথিবীর ক্রমমুক্তি সম্পর্কে কবির শুভৈষণার পরিচয় দাও।
- ১৩। ‘শিকার’ কবিতার কাব্যসৌন্দর্য বিশ্লেষণ করো।
- ১৪। ‘নগ্ননির্জন হাত অথবা তিমির হনের গান’ কবিতাটি সম্পর্কে একটি রসগ্রাহী আলোচনা লিপিবদ্ধ করো।
- ১৫। জীবনানন্দের কবিতায় ভিড় করে এসেছে অনেক নারীর নাম, কিন্তু প্রকৃত বিচারে মনে হয় তাঁরা সকলেই একই নারী।—ব্যাখ্যা করো।
- ১৬। জীবনানন্দের ‘বনলতা সেন’ কবিতায় বনলতা প্রেম, প্রকৃতি, না মৃত্যুর প্রতীক, ব্যাখ্যা করো।
- ১৭। জীবনানন্দের বহু কবিতায় মানবেতর প্রাণীদের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা দেখা যায়। পঠিক কবিতা অবলম্বনে এই ভূমিকা পরিস্ফুট করো।

৬.৩.১২.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

- ১। একটি নক্ষত্র আসে : অম্মুজ বসু।
- ২। জীবনানন্দ দাশ : বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত : দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত)।
- ৩। জীবনানন্দ দাশ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত।
- ৪। আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয় : দীপ্তি ত্রিপাঠী।
- ৫। আমার কালের কয়েকজন কবি : জগদীশ ভট্টাচার্য।
- ৬। আমার জীবনানন্দ : হিমবস্তু বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ৭। জীবনানন্দ : অমলেন্দু বসু।
- ৮। কবিতায় অন্তরঙ্গ পাঠ : জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে : সুমিতা চক্রবর্তী।
- ৯। আধুনিক কবিতার দিগ্বলয় : অশ্রুকুমার সিকদার।

পর্যায় গ্রন্থ-৪

আধুনিক বাংলা কবিতা (বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত)

একক-১৩

বুদ্ধদেব বসু : ব্যাং, প্রত্যাহের ভার, শীতরাত্রির প্রার্থনা

বিন্যাস ক্রম :

৬.৪.১৩.১	:	ভূমিকা : আধুনিকতার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য
৬.৪.১৩.২	:	প্রাক-রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রোত্তর আধুনিকতা
৬.৪.১৩.৩	:	বুদ্ধদেব বসু
৬.৪.১৩.৪	:	ব্যাং
৬.৪.১৩.৫	:	প্রত্যাহের ভার
৬.৪.১৩.৬	:	শীতরাত্রির প্রার্থনা
৬.৪.১৩.৭	:	আদর্শ প্রশ্নাবলি
৬.৪.১৩.৮	:	সহায়ক গ্রন্থাবলি

৬.৪.১৩.১ : ভূমিকা : আধুনিকতার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

আধুনিকতা অন্তহীন। তবু আধুনিকতার সংজ্ঞা নিয়ে বিতর্ক আর মতান্তর শেষ হয়নি। স্থূলভাবে আদিযুগ, মধ্যযুগ, আধুনিক যুগ-এই কালবিভাজন আমরা করতেই পারি। তার দ্বারা ‘আধুনিক সাহিত্য’র স্বরূপ ধরা পড়ে না। যাঁরা আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র লক্ষণ নিয়ে ভেবেছেন, তাঁদের কিছু মন্তব্য প্রাসঙ্গিক বলে উদ্ধৃত করছি।

১। এই আধুনিকতা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে। (রবীন্দ্রনাথ/সাহিত্যের পথে)

২। মানুষের মনের চিরপদার্থ কবিতার বা সাহিত্যে মহৎ লেখকদের হাতে যে বিশিষ্টতায় প্রকাশিত হয়ে ওঠে তাকেই আধুনিক সাহিত্য বা আধুনিক কবিতা বলা যেতে পারে—(জীবনানন্দ দাশ/কবিতার কথা।)

৩। কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত অন্তত মুক্তিপ্রয়াসী কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করেছি। (আবু সয়ীদ আইয়ুব/আধুনিক বাংলা কবিতা)

৪। অতঃপর আধুনিক কবিতা বলতে আর সেই শিল্প ঘটনা বুঝবো যা ইতিমধ্যেই চিরায়ত কবিতার অন্তর্গত হয়ে গিয়েছে। (আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত/স্থির বিষয়ের দিকে)

যদি এভাবে আধুনিক সাহিত্যকে আমরা দেখি, তবে কবিতার সেকাল ও একাল নিয়ে দ্বন্দ্ব বিরোধ থাকে না।

অবশ্য পণ্ডিতি ব্যাখ্যায় ও গবেষণায় শুধু চিরত্বই (eternal) আধুনিক, মানা হয় নি। কিছু বাহ্যলক্ষণ তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন যেমন, আধুনিক সাহিত্যে বা কাব্যে থাকবে—

- ১। অমঙ্গল বোধ ও অনিশ্চর ভাবনা।
- ২। নাগরিক বা শহুরে সভ্যতা, যান্ত্রিকতা।
- ৩। বর্তমান জীবনের ক্লান্তি, নিঃসঙ্গতা, বিষাদ, হতাশ ও বিচ্ছিন্নতা বোধ।
- ৪। মূল্যবোধ সংশয়; অসুন্দরে প্রীতি।
- ৫। মনোবিকলনে ও মার্কসীয় সমাজতত্ত্বে আগ্রহ।
- ৬। বিশ্বইতিহাস, পুরাণ ও বিজ্ঞানের উপাদান সংগ্রহ এবং প্রয়োগ।
- ৭। বাকরীতিতে সারল্য ও গদ্যভঙ্গি, লৌকিক শব্দ প্রয়োগ; ব্রাত্য জীবনচিত্রণে উৎসাহ।
- ৮। গদ্যছন্দ ও চিত্রকল্প, উপমার নতুন ব্যবহার।

মোটামুটি এই অষ্টাঙ্গিক মার্গে আধুনিক কবিতাকে খুঁজে পাওয়া যায়।

উনিশ শতকের কবিতা আলোচনায় আমরা দেখেছিলাম, গীতিকাব্যের প্রাবল্য ক্রমে বাংলা কবিতার প্রধান সুর হয়ে উঠেছে। মহাকাব্য ও আখ্যানকাব্য সাময়িক বৈচিত্র্য ও প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছে মাত্র। উনিশ শতকের গীতিকাব্যে যে আন্তর্লীনতা অর্থাৎ বিষয়ীর আত্মতা ছিল, বিশ শতকে তার বদল হয়েছে। বিষয়ীর সঙ্গে বিষয় অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। Content ও form এই বিশ শতকের কবিতার অন্যতম আশ্রয়। কী বলছি ও কেমন করে বলছি, কবিরা সেদিকেই মনোযোগী। অনেক সময় অতিব্যক্তিক ভাব দুরূহতার কর্ম তৈরি করেছে। মালার্মে শব্দবাদী কবি। ভাবের প্রতি তাঁর অবজ্ঞা। তাই সাদা পাতায় কবিতা লিখে বন্ধু এরোদিয়াকে বলেন,

আধুনিকতা অন্তহীন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—
আধুনিকতা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে। উনিশ শতকের গীতিকাব্যে যে আন্তর্লীনতা ছিল, বিশ শতকে তার বদল হয়েছে। বিষয়ীর সঙ্গে বিষয় অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। কবিতা অনুভূতিলোকে বিস্তারণ ঘটায়, তারজন্য পাঠককে সহৃদয় সামাজিক হতে হয়। তবেই কবিতা মনকে দোলা দেয়, আনন্দিত করে।

I have just written a Superb poem, but I do not quite know what it means...

শব্দগত ও ভাবগত দুরূহতার জন্য আধুনিক কবিতা নিন্দিত। তবু মানতেই হবে, একালে পাঁচালি বা পয়ার কেউ লিখবেন না। কবিতা তো ব্যাখ্যাতা নয়; বোঝানোর দায় তার নেই। অনুভূতিলোকে বিস্তারণ ঘটায় কবিতা। মনকে সে দোলায়; নাড়া দেয়। আনন্দিত করে। যথার্থ কবিতা লেখা যায় না, হয়ে ওঠে, যেমন উদ্ভিদ। অর্চিবণ্ড ব্যাকলিশের, সুখ্যাত উক্তি ‘Poetry should not mean, but be’. সকলেই যেমন কবি নন, তেমনি সকলেই কবিতার পাঠকও নন। ভারতীয়, আলংকারিকেরা এজন্য হৃদয় সামাজিকের কথা ভেবেছিলেন।

৬.৪.১৩.২ : প্রাক-রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রোত্তর আধুনিকতা

আসলে রবীন্দ্রসাহিত্য আমাদের মন যেভাবে অধিকার করেছে আর কোনো কবি বা লেখক তা পারেননি। ফলে প্রতিতুলনায় আসে প্রতিবন্ধকতা। আমরা যদি রবীন্দ্রপরবর্তী সাহিত্যকে স্বতন্ত্র সাহিত্য ও ভিন্ন সংরূপ (Genre) হিসাবে দেখি তবে ক্ষোভ ও অস্বস্তি থাকে না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ উত্তর রবীন্দ্রযুগের আধুনিকতায় দেখেছিলেন ‘দারিদ্র্যের আশ্ফালন’, ‘লালসার অসংযম’ ও ‘রিয়ালিটির কারি পাউডার।’ এসব বিদূষণ ও বক্রোক্তি সরিয়ে রেখে দরদী ও কাব্য রসিকের দৃষ্টিতে আধুনিক কবিতা পড়লে বোঝা যায়, সত্যিই পালাবদল ঘটেছে। যে পালাবদলে পশ্চিমী কবি সাহিত্যিকদের অবদান অনস্বীকার্য। যাঁদের মধ্যে আছেন বোদলেয়ার, রিলকে, র্যাবো, পাউন্ড, এলিয়ট, ইয়েটস্, নেরুদা, লরেন্স এমিল জোলা, ফ্লবেরার, হপকিন্স, হুইটম্যান প্রমুখ।

রবীন্দ্রনাথ উত্তর রবীন্দ্রযুগের আধুনিকতায় দেখেছিলেন ‘দারিদ্র্যের আশ্ফালন’, ‘লালসার অসংযম’ ও ‘রিয়ালিটির কারি পাউডার।’ আধুনিক কবিতায় পালাবদল ঘটেছে। পশ্চিমী কবি সাহিত্যিকদের রচনা সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে। যাঁদের মধ্যে বোদলেয়ার, রিলকে, এলিয়ট, ইয়েটস্ হুইটম্যান প্রমুখ আছেন। আর উত্তর রবীন্দ্রযুগের বার্তা এনেছিলেন মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও কাজী নজরুল ইসলাম।

রবীন্দ্রযুগেই উত্তর রবীন্দ্রযুগের বার্তা বহন করে এনেছিলেন মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আর কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁদের লেখায় পাওয়া গেল বলিষ্ঠ ভোগবাদ, দেহকামনা, দুঃখবাদ, বিদ্রোহ। এরপর “কল্লোল” (১৯২৩) ও “কালিকলম” (১৯২৬) পত্রিকা ঘিরে যে তরুণতুর্কী লেখক ও কবিরা এলেন, তাঁদের কাব্যে এলো মুক্ত যৌবনের উদ্দাম রূপ, নগ্ন কামনা, প্রান্তিক ও অপজাত, অবজ্ঞাত মানুষের কথা। বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, যুবনাথ প্রমুখের নাম করা যায়, তাঁরা ছিলেন এই নব্যতন্ত্রের মশালচি। এখানে আমরা সংক্ষেপে ছয়জন আধুনিক বাঙালি কবি সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। এঁরা হলেন— অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২), সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭), সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯২০-২০০৩)। রবীন্দ্রোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দ দাশ স্বতন্ত্র প্রবন্ধ বা গ্রন্থের বিষয়। সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরিসরে তাই তাঁকে রাখা হলো না।

৬.৪.১৩.৩ : বুদ্ধদেব বসু

রবীন্দ্রোত্তর যুগের বাংলা কবিতায় পালাবদলের হাওয়া যাঁরা এনেছিলেন বুদ্ধদেব বসু তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের কৃতী ছাত্র ও অধ্যাপক বুদ্ধদেব বিশ্ব সাহিত্যে দীক্ষা নিয়েছেন। রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত হতে বিদেশি কবি-সাহিত্যিকদের দ্বারস্থ হয়েছেন। অজস্র সার্থক কবিতার অনুবাদক তিনি। তাঁরই হাতে বাঙালি পাঠক পেয়েছেন বোদলেয়ার, রিলকে, হেল্ডারলিন প্রমুখ কবিকে। “কবিতা” পত্রিকা সম্পাদনার মাধ্যমে বাংলা কবিতায় আধুনিকতার নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। বাংলা কাব্য নাট্য রচনার কৃতিত্বে পেয়েছে আকাদেমি পুরস্কার।

রবীন্দ্রোত্তর যুগের বাংলা কবিতায় পালাবদলের হাওয়া যাঁরা এনেছিলেন বুদ্ধদেব বসু তাঁদের মধ্যে অন্যতম। অজস্র সার্থক কবিতার অনুবাদক তিনি। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগুলি হলো—‘বন্দীর বন্দনা’ (১৯৩০), ‘কঙ্কাবতী’ (১৯৩৭), ‘দময়ন্তী’ (১৯৪২), ‘দ্রৌপদীর শাড়ী’ (১৯৪৮) ইত্যাদি। বুদ্ধদেব বসুর ‘ব্যাং’ কবিতায় বর্ষার আগমনী সুর ও আনন্দ ধ্বনিত হয়েছে দিক্দিগন্তে। কবি দেখেন, বৃষ্টির রাতে সবাই যখন আরামে বিছানায় ঘুমন্ত, তখন শুধু ব্যাঙই

প্রথম যৌবনে তাঁর গল্পে, কবিতায় যৌনাবেদন তীব্র হওয়ায় নিন্দা পেয়েছেন। যদিও তিনিই জানান “কী অপার পিপাসা আমার অমৃতের তরে”। বলেন, ভালোবাসার কবিতাই তাঁর সব কবিতার মূল সুর। নবীন কবিদের কাছে কাব্যকলার নতুন নির্দেশনামা তিনি দেন তাঁর “দময়ন্তী” কাব্যের পরিশিষ্টে। সাহিত্য তথা কাব্যের প্রতি এমন নিবেদিত সাহিত্যসাধক কমই মেলে।—রবীন্দ্রনাথ তাঁকে স্নেহ ও আশীর্বাদ জানিয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগুলি হলো—বন্দীর বন্দনা (১৯৩০), কঙ্কাবতী (১৯৩৭), দময়ন্তী (১৯৪২), দ্রৌপদীর শাড়ী (১৯৪৮), শীতের প্রার্থনা বসন্তের উত্তর (১৯৫৫) ইত্যাদি। কাব্যনাটকরূপে তপস্বী ও তরঙ্গিণী, প্রথম পার্থ, অনান্নী অঙ্গনা উল্লেখযোগ্য।

বিনিদ্র। কিভাবে তিনি কবিতা লেখেন, কিভাবে ভাষাকে ছন্দোবন্ধনে স্পন্দিত করেন তার প্রমাণ ‘প্রত্যহের ভার’ কবিতাটি। ‘শীতরাত্রির প্রার্থনা’ কবিতাটির প্রধান বক্তব্য হিম নিঃসঙ্গতা। সেই হিম অতীতকে কবি সত্য ভাবেন না। চান উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

৬.৪.১৩.৪ : ব্যাং

আধুনিক কাব্যে ও কবির কাছে কোনো কিছুই তুচ্ছ নয়-সবই কাব্যের উপাদান হতে পারে। জাপানি কবিতায় পুকুরে ব্যাঙের লাফ, কিংবা অ্যাপোলোর হাসির সঙ্গে ব্যাঙের তুলনা রবীন্দ্রনাথের পছন্দ হয় নি। হয়ত এ জন্য বুদ্ধদেব বসু ব্যাঙকেই কবিতার উপজীব্য করেছেন।

আঠারো পংক্তির মিত্রাক্ষর যুগ্মাক্ষর কবিতা ‘ব্যাং’। বর্ষার সঙ্গে যার নাড়ীর যোগা লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতিতে ব্যাঙের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখা যায়। বর্ষার আগামী সে গায়। কবিও শোনে ব্যাঙের গলায় আদিম উল্লাস আর ‘উদ্ধত আনন্দ গান’, গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে এবার তারা বাঁচবে। জল স্নিগ্ধ করবে দেহ। স্পর্শময় বর্ষার আগমনে মাটি পৃথিবীও উল্লসিত। কবি দেখেন, বৃষ্টির রাতে সবাই যখন আরামে বিছানায় ঘুমন্ত, তখন শুধু ব্যাঙই বিনিদ্র। ক্লান্তিহীন ভাবে সে ডেকে চলে। তার ক্লদময় উচ্চারণে বর্ষার আগমনী সুর ও আনন্দ ধ্বনিত হয় দিক্দিগন্তে।

প্রচলিত মিশ্রকলাবৃত্তে মহাপয়ারে, লেখা ‘ব্যাং’। বর্ণনায় চিত্রধর্মিতা চোখে পড়ে। সেইসঙ্গে আছে ইন্দ্রিয়ানুভূতি—

স্পর্শময় বর্ষা এলো; কী মসৃণ তরুণ কর্দম।

স্ব্ফীতকণ্ঠ, বীতস্কন্ধ-সংগীতের শরীরী সপ্তম।

গ্রীষ্মতাপ বোঝাতে সমাসোক্তি অলঙ্কারের চমৎকার প্রয়োগ—‘দিন মরে ধুঁকে’। ডি. এইচ. লরেন্সের, ব্যাঙই ‘Snake’ কবিতার অনুপ্রেরণা ‘ব্যাং’ কবিতায় আছে, এমন অনুমান অসঙ্গত হবে না।

৬.৪.১৩.৫ : প্রত্যহের ভার

এটি একটি সনেট। যদিও প্রচলিত শেক্সপীয়রীয়, পেত্রর্কীয় বা ফরাসি রীতি কবি মানেন নি। বরং রাবীন্দ্রিক সনেটের অনুসরণ আছে।

এখানে কবির বাণীসাধনার কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিভাবে তিনি কবিতা লেখেন, কিভাবে ভাষাকে

ছন্দোবন্ধনে স্পন্দিত করেন, তা' বলেছেন। ভীষণ যাপনে অনেক সময় ক্লান্তি আসে; দুঃখ-হতাশা বা মৃত্যুভয় আসে। কিন্তু যথার্থ কবি এজন্য ভীত বা হতাশ হন না। তিনি বাণীশিল্পেই খুঁজে পান মুক্তি, আনন্দ। বলেন,

যে-মুহূর্তে বাণীর আত্মারে জেনেছি আপন

সত্তা বলে, স্তব্ধ মেনেছি কালেরে।

‘অবশ্য বাঁচার’ ভীষণ ভার থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন কাব্যচর্চায় উপভোগ। ‘ছন্দের নীড়ে’ পেয়েছেন ‘বাণীবিশ্ব-কে।’

৬.৪.১৩.৬ : শীতরাত্রির প্রার্থনা

প্রথম যৌবনেই বুদ্ধদেব বসু সুন্দরকে, প্রেমকে অভ্যর্থনা করেছেন। প্রৌঢ়ত্বেও চেয়েছেন ঘোর শীতে বসন্ত-কে। শীতরাত্রি তাঁর কাছে বার্ষিক্য, জড়তা, মৃত্যু ইত্যাদির প্রতীক। যার থেকে তিনি পরিত্রাণ চান। একুশটি স্তবকে বিন্যস্ত দীর্ঘ কবিতা ‘শীতরাত্রির প্রার্থনা’। যার প্রধান বক্তব্য হিম নিঃসঙ্গতা। সেই হিম অতীতকে কবি সত্য ভাবেন না। চান উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। আত্মপ্রবোধ আর আত্মবিশ্বাসে বলেন—

‘তুমি ভরে তুলবে, তাই শূন্যতা। তুমি আনবে উষ্ণতা, তাই শীত।

মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। কিন্তু কেন?

‘ডুবতে হবে মৃত্যুর তিমিরে, নয়তো কেমন করে ফিরে আসবে আলোয়?

‘যেমন ফিরে আসে বীজ মাটির তলা থেকে রাশি রাশি ফসলের ঐশ্বর্যে। প্রাত্যহিকতার গ্লানি মুছে ফেলে প্রস্তুত হতে বলেন ভবিষ্যতের জন্য। নবজন্মের জন্য। বলেন—

তোমার শূন্যতার অজ্ঞাত গহ্বর থেকে নবজন্মের জন্য

প্রার্থনা করো, প্রতীক্ষা করো, প্রস্তুত হও।

আগাগোড়া নিপাট গদ্যছন্দে লেখা একটি সার্থক গদ্য কবিতা। ছোট ছোট ইমেজ বা চিত্রকল্পে উজ্জ্বল কবিতাটি।

১। বাইরে বরফের রাত্রি। ডাইনি হাওয়ার কনকনে চাবুক।

২। চাঁদটাকে কাগজের মতো টুকরো করে ছিটিয়ে দেয় কুয়াশার মধ্যে।

৩। নিবিড় হলো রাত্রি, পাংলা চাঁদ ছিঁড়ে গেলো।

৪। বরফের কবর ফেটে ফুলে জ্বলে ওঠে সবুজের উল্লাসে।

৬.৪.১৩.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। আধুনিকতা কাকে বলে?

২। আধুনিক কবিতার চারটি বৈশিষ্ট্য লেখ?

- ৩। দুজন পশ্চিমী কবির নাম কর?
- ৪। উত্তর রবীন্দ্রযুগের তিনজন উল্লেখযোগ্য কবি কারা ছিলেন?
- ৫। বুদ্ধদেব বসুর দুটি কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ কাল সহ নাম লেখ?
- ৬। ‘ব্যাং’ কবিতায় তিনি কি বলতে চেয়েছেন?
- ৭। ‘প্রত্যহের ভার’ কবিতাটির ভাববস্তু বিশ্লেষণ করো।
- ৮। ‘শীতরাত্রির প্রার্থনা’ কবিতাটি কার লেখা? কবিতাটির কাব্যসৌন্দর্য বিশ্লেষণ করো।

৬.৪.১৩.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

- ১। কবিতার কালান্তর—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ২। একালের কবিতা : পাঠকের দর্পন—তরুণ মুখোপাধ্যায়।
- ৩। কালের পুতুল—বুদ্ধদেব বসু।
- ৪। আধুনিক বাংলা সাহিত্য—মোহিতলাল মজুমদার।

পর্যায় গ্রন্থ-৪

আধুনিক বাংলা কবিতা (বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত)

একক-১৪

বিষ্ণু দে : ক্রেসিডা, ঘোড়সওয়ার, ভিলানেল

বিন্যাস ক্রম :

৬.৪.১৪.১	:	বিষ্ণু দে
৬.৪.১৪.২	:	ক্রেসিডা
৬.৪.১৪.৩	:	ঘোড়সওয়ার
৬.৪.১৪.৪	:	ভিলানেল
৬.৪.১৪.৫	:	আদর্শ প্রস্ফাবলি
৬.৪.১৪.৬	:	সহায়ক গ্রন্থাবলি

৬.৪.১৪.১ : বিষ্ণু দে

বিশ শতকের প্রধান কবিকুলের অন্যতম বিষ্ণু দে। প্রকরণ ও শব্দ চয়নে তাঁকে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ভাবশিষ্য বলা হলেও, এলিয়টের সঙ্গেই তাঁর মানস সমীপ্য অধিক। এছাড়া আরাগাঁ, এলুয়ার, লোরকাও তাঁর কাব্য প্রেরণা। তাঁর অন্তর্জগৎ একই সঙ্গে অভিজাত ও লোকায়ত। সমকালীন কবি বন্ধুদের লিবিডো তাঁর কবিতায় ঈষৎ ছায়া ফেললেও মাক্সীয় চিন্তাচেতনায় ঋদ্ধ এই কবি সমাজবাদে বিশ্বাসী। বুদ্ধিবাদী কবি। মনন তাঁর প্রধান অবলম্বন। দেশ বিদেশের পুরাণ ইতিহাস, তাঁর কবিতায় অচলিত শব্দের প্রয়োগ ও বুদ্ধিরসের প্রাবল্য রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করেন নি। তাঁর মনে হয়েছে ‘দুর্ভেদ্য কেব্লা’। পাশ্চাত্য শিল্প আন্দোলনও তাঁর কবিতায় মিশেছে। তবু কবিতার ভিতরে এক রোমান্টিক স্বপ্নচারী কবিকে খুঁজে নিতে অসুবিধা হয় না। বাংলা কবিতায় তিনি জীবনানন্দের পর সত্যিই এক নতুন সুর ও ভাষা সংযোজন করেছেন। বিষ্ণু দে-র উল্লেখযোগ্য কাব্যগুলি হলো—উর্বশী ও আর্টেমিস—(১৯৩২), চোরাবালি (১৯৩৭), সাতভাই চম্পা (১৯৪৪), সন্দীপের চর (১৯৪৭), নাম রেখেছি কোমল গান্ধার (১৯৫৩), স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ (১৯৬৫), সেই অন্ধকার চাই (১৯৬৭) ইত্যাদি।

বিশ শতকের প্রধান কবিকুলের অন্যতম বিষ্ণু দে। সমকালীন কবি বন্ধুদের লিবিডো তাঁর কবিতায় ঈষৎ ছায়া ফেললেও এই কবি সমাজবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। বিষ্ণুদের উল্লেখযোগ্য কাব্যগুলি হলো—‘উর্বশী ও আর্টেমিস’ (১৯৩২), ‘চোরাবালি’ (১৯৩৭), ‘সাত ভাই চম্পা’ (১৯৪৪), ‘নাম রেখেছি কোমল গান্ধার’ (১৯৫৩) ইত্যাদি। ‘ক্রেসিডা’ কবিতাটি শেক্সপীয়রের নাটক থেকে আহরিত চরিত্র ক্রেসিডা কবির চোখে বিজয়ী প্রেমের প্রতীক ও যন্ত্রণারও। বিষ্ণুদের ‘ঘোড়সওয়ার’ কবিতাটি একটি ‘স্বপ্ন-কবিতা’। যদিও নানাজন নানা অর্থ খুঁজেছেন এই কবিতায়। আর ‘ভিলানেল’ কবিতাটি একটি প্রেমের কবিতা। গ্রাম্য ফরাসী কবি ভিলানেল এর ছাঁদে কবিতাটি গঠিত। ‘ভিলানেল’ পাঠকের কান ও মন তৃপ্ত করে।

৬.৪.১৪.২ : ক্রেসিডা

শেক্সপীয়রের নাটক থেকে আহরিত চরিত্র এই ক্রেসিডা কবির চোখে বিজয়ী প্রেমের প্রতীক এবং যন্ত্রণাও। ক্রেসিডাকে উদ্দেশ্য করে কবি তাঁর প্রেমের আকুতি প্রকাশ করেছেন। বলেছেন ‘তোমাতেই করি মত্ত মরণে জয়।’ অন্যদিকে জানেন, আত্মদানের উৎস আছে ‘উজ্জীবনের আশা’। হেলেনের রূপমোহে নয়, কবি চান শুধু ‘জীবনের আরাধনা।’ কোনো কামনা-মারীচ কবিকে উদ্ভ্রান্ত করে না। তিনি প্রেমে বিশ্বাসী। তাই সমাজে, সংসারে ও জীবনে যত জটিলতা ও কুটিলতা থাক না কেন, কবি তদগত হয়ে বলেন, ‘স্মরণ-তোমার হানে আজো তরবারি’। যে স্মৃতি সব কলুষতা দূর করে দেয়।

দীর্ঘ এই কবিতাটি ছয়মাত্রার কলাবৃত্তে লেখা। কিন্তু স্তবকবিন্যাসে ও পংক্তিনির্মাণে অভিনবত্ব আছে। রবীন্দ্রপংক্তির ব্যবহারও চমকপ্রদ (‘কাল রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে রজনীগন্ধাবনে’)। রূপক ও উপমার ব্যবহার করেছেন মিথ কথনে-‘মুখের হৃদয় তালীবনদীঘি’, ‘ঝঞ্ঝার করতাল’, ‘স্বপ্নগোধূলি’, ‘বিস্মৃতিকীট’, ‘প্রাণকুরঙ্গ’ ইত্যাদি। আছে দেশি বিদেশি পুরাণ অনুষঙ্গ—কঙ্কির দিন, প্যাণ্ডার, বৈতরণীরপার, মরণমারীচ, পরীক্ষিৎ, মাতরিশ্বা ইত্যাদি। শব্দব্যবহারে বিষু দে-র নিজস্বতা এখানে বিশেষভাবে চোখে পড়ে। যেমন, ক্রুতকৃতম, বালালোল, জেবলি, ঘটাকাশ, অলাতচক্রে, জিজীবিষু, উদ্বায়ু, কুকলাস ইত্যাদি।

৬.৪.১৪.৩ : ঘোড়সওয়ার

বিষু দে-র অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় কবিতা। নানাজন নানা অর্থ খুঁজেছেন এই কবিতায়। প্রেম-যৌনতা-বিপ্লব এর মধ্যে আছে অনেকে বলেন। ড. বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে, “রূপকথা, নৃতত্ত্ব, ফ্রয়েড, মার্কস, যৌনতত্ত্ব একটি সূক্ষ্ম সূত্রে চোরাবালির ও সমুদ্রের চিত্রকল্পে রূপায়িত।” স্বয়ং কবি বলেন, ঘোড়সওয়ার ‘স্বপ্ন-কবিতা’। কেননা জ্বরের ঘোরে স্বপ্নাবেশে এই কবিতাটি তিনি লিখেছেন। ঘোড়সওয়ার বিশ্ববিজয়ী বীর, যে বন্দিনী রাজকন্যাকে উদ্ধার করবে। এই চিত্রে পাই রূপকথা। এরপর কবি সমাজবোধে উদ্দীপ্ত হয়েছেন। বিচ্ছিন্ন, একা চোরাবালি যেমন জনতার প্রতীক। যাদের জনসমুদ্রে মিশিয়ে দিতে চায় সেই বীর। ড. দীপ্তি ত্রিপাঠীর মতে, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা চোরাবালিতুল্য। সেখানে ‘টেউয়ের ঘোড়ায় চড়ে বিপ্লবরূপী রাজপুত্র আসছে বক্ষ্যাত্মের শৃঙ্খলে বন্দিনী চোরাবালিকে উদ্ধার করতে।”

ছয়মাত্রার কলাবৃত্তে লেখা দশটি স্তবকের কবিতা। প্রতি স্তবকে ঘোড়ার পা ফেলা ও তোলার ছন্দ পাই। কবিতাটি ড্রামাটিক মনোলোগ ধরনের সমাসোক্তি অলঙ্কারের প্রয়োগে কবিতাটি হার্দ্য হয়েছে—‘চোরাবালি আমি দূর দিগন্তে ডাকি’।

৬.৪.১৪.৪ : ভিলানেল

ফরাসি কবিতার একটি আঙ্গিক ভিলানেল, যা পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ফরাসি গাথা কবিতায় ব্যবহৃত হতো, গ্রাম্য ফরাসি কবি ভিলানেল-এর হাঁদে কবিতা লিখতেন। তিনপংক্তির স্তবকে একটি বিন্যস্ত। বিষু দে বাংলায় সম্ভবত এর প্রথম ব্যবহার করেন।

প্রেমের কবিতা এটি। প্রেমিকাকে উদ্দেশ্য করে কবি স্মৃতিমেদুর পরিবেশ রচনা করেছেন। রাঙা কামনা ও প্রেম দুয়ের অপরূপত্ব কবি দেখেছেন। শেষ চার পংক্তিতে রবীন্দ্রগানের পংক্তি (একদা তুমি প্রিয়ে...) ব্যবহার করেছেন সুন্দর ভাবে। যে ছিল, এখন সে নেই; প্রকৃতির সান্নিধ্যে কবি আহত প্রেমের গুণ্ধা খুঁজেছেন।

উনিশ পংক্তির কবিতা ‘ভিলানেল’ এটাই এর বৈশিষ্ট্য। পাঁচটি তিন পংক্তির স্তবক; শেষ স্তবকটি চার পংক্তির। প্রতিটি স্তবকে দ্বিতীয় পংক্তির অন্ত্যাক্ষর পরবর্তী পংক্তির দ্বিতীয় পংক্তিতেও মিত্রাক্ষর হয়ে থাকে। বাকি দু’পংক্তির অন্ত্যমিল বারবার থেকে যায় অন্যান্য স্তবকেও। কবিতাটির চিত্ররূপময়তা এই রকম—

আলোর ঝিকিমিকি তোমার কালোচুলে,

উষার ভিজে মুখে দিনের স্মিত আশা,

দিনের পাপড়িতে রাত্রে রাঙা ফুলে

বিষ্ণু দেব কবিতায় দুর্বোধ্যতা নিয়ে যে অভিযোগ পাওয়া যায়, এই কবিতা তার থেকে মুক্ত। পড়তে পড়তে এক সাংগীতিক মূর্ছনা টের পাওয়া যায়। বিশেষত ‘দিনের পাপড়িতে রাত্রে রাঙা ফুলে’ এই কবিতার ধ্রুবপদের মতো ব্যবহৃত হয়েছে। রূপকের মৃদু আভাষ (দিনের পাপড়ি, সে তরু এ হৃদয়) ‘ভিলানেল’ পাঠকের কান ও মন তৃপ্ত করে।

৬.৪.১৪.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

- ১। ‘বিষ্ণু দে কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
- ২। ‘চোরাবালি’ কাব্যটি কার লেখা? কত সালে প্রকাশিত?
- ৩। বিষ্ণু দেব দুটি প্রেমের কবিতার নাম বল?
- ৪। ‘ক্রেসিডা’ কবিতাটির বিষয়বস্তু বর্ণনা করো।
- ৫। ‘ঘোড়সওয়ার’ কবিতাটির মর্মবস্তু বিশ্লেষণ করো।
- ৬। ‘ভিলানেল’ কবিতায় প্রকাশিত কবির স্মৃতিমেদুর সত্তার বিবরণ দাও।

৬.৪.১৪.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

- ১। বাংলা কবিতা : অনেক আকাশ—তরুণ মুখোপাধ্যায়।
- ২। আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়—দীপ্তি ত্রিপাঠী।
- ৩। কালের পুতুল—বুদ্ধদেব বসু।
- ৪। কবিতার কালান্তর—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পর্যায় গ্রন্থ-৪

আধুনিক বাংলা কবিতা (বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত)

একক-১৫

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : আমার কাজ, যত দূরেই যাই, একটি কবিতার জন্য

বিন্যাস ক্রম :

৬.৫.১৫.১	:	সুভাষ মুখোপাধ্যায়
৬.৫.১৫.২	:	আমার কাজ
৬.৫.১৫.৩	:	যত দূরেই যাই
৬.৫.১৫.৪	:	একটি কবিতার জন্য
৬.৫.১৫.৫	:	আদর্শ প্রস্ফাবলি
৬.৫.১৫.৬	:	সহায়ক গ্রন্থাবলি

৬.৪.১৪.১ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়

একই সঙ্গে কবি ও কর্মী হওয়ার বিরল কৃতিত্ব অর্জন করেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর কবিতায় জনগণের কবি হওয়ার সমস্ত উপাদান খুঁজে পেয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু। তবু তিনি মনে করেন সুভাষের মধ্যে প্রকৃত কবিত্বই আছে। ছন্দে অপূর্ব কারুকার্যে, চিত্ররচনায়, কৌশলে, নাটকীয়তায় তাঁর কবিতা অতুলনীয়। বিশেষ দল ও মত তাঁকে প্রভাবিত করলেও তাঁর কবিতা বিশেষ রঙের নয়। সুপণ্ডিত অমলেন্দু বসু বলেন, “তাঁদের রাজনীতির রং আদৌ বড় কথা নয়...এঁদের কবিসত্তায় রাজনীতি নিছক নীতি নয়, আসলে জীবনবোধের বিশিষ্ট ভঙ্গি”। (চল্লিশ দশকের কবিতা/উত্তরসূরি, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭৮)। তীক্ষ্ণ সমাজবোধ, মানবিকতা, শ্রমজীবী মানুষের প্রতি ভালোবাসা তাঁর কবিতার প্রধান বিষয়। তথাকথিত কবি তিনি হতে চান না একথা ‘আমার কাজ’ কবিতায় বলেছেন। গদ্যে লিখেছেন, “কবিরা হলেন সমাজের একজন—জীবনের সঙ্গে তাঁরা যুক্ত, জীবনের সংগঠক”। কবির প্রকাশিত কাব্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য —পদাতিক (১৯৪০), অগ্নিকোণ, (১৯৪৮), চিরকূট (১৯৪৯), যত দূরেই যাই (১৯৬২), কাল মধুমাস (১৯৬৬), ছেলে গেছে বনে (১৯৭২) ইত্যাদি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় একই সঙ্গে কবি ও কর্মী হওয়ার বিরল কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। তীক্ষ্ণ সমাজ বোধ, মানবিকতা, শ্রমজীবী মানুষের প্রতি ভালোবাসা তাঁর কবিতার প্রধান বিষয়। কবির প্রকাশিত কাব্যগুলির মধ্যে ‘পদাতিক’ (১৯৪০), ‘অগ্নিকোণ’ (১৯৪৮), ‘চিরকূট’ (১৯৪৯) ‘যত দূরেই যাই’ (১৯৬২) ইত্যাদি। ‘আমার কাজ’ কবিতায় কবি বলেন— তাঁর কবিতার প্রতিটি অক্ষর মানুষের জন্য নিবেদিত। মানুষের সুখে দুঃখে পাশাপাশি তিনি থাকতে চান। ‘যত দূরেই যাই’ কবিতায় লক্ষ করা যায়—তিনি যত দূরে যান তাঁর সঙ্গে যায় নদীর ঢেউ। তাঁর চোখের পাতায় লেগে থাকে সারি সারি লক্ষ্মীর পায়ের আলপনা। ‘একটি কবিতার-জন্য’ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা প্রতিবাদের কবিতা। কালোদিন সরিয়ে আলোদিনের ঘোষণা আছে সেখানে। কবিরূপে তাই তিনি আশাবাদী।

৬.৪.১৫.২ : আমার কাজ

কবির কাজ কি? এ নিয়ে নানা মূনির নানা মত। তবে কবিরা যে জগৎ ও জীবনকে সুন্দর করেন, করতে চান এটা সত্য। কিন্তু সামাজিক দায়বদ্ধতার বিশ্বাসী কবি মনে করেন, শিল্প শুধু শিল্পের জন্য নয়; তা মানুষের জন্য। তাঁর কবিতার প্রতিটি অক্ষর মানুষের জন্য নিবেদিত। যেজন্য তিনি বলেন, তাঁর কথাগুলোকে তিনি পায়ের উপর দাঁড় করাতে চান। ছায়াকে সজীব করতে চান। ছবিকে করতে চান সচল। ভাবমগ্ন হয়ে উদাসপ্রাণ কবি হতেও তিনি চান না, মানুষের সুখেদুঃখে পাশাপাশি তিনি থাকতে চান। হাঁটতে চান। কল্পনাবিলাসী নয়, কর্মী হতে চান। ট্র্যাক্টরের পাশে কলম নামিয়ে রেখে ছুটি চান। বলেন একটু ‘আগুন দাও’—যে আগুন কর্মের প্রেরণা।

নিখুঁত গদ্যকবিতা। উৎপ্রেক্ষার মৃদু আমেজ আছে। শব্দচয়নে সরল ও পরিচিত শব্দ ব্যবহার চোখে পড়ে। শব্দ দিয়ে ছবি আঁকেন এভাবে—‘যেন চোখ ফোটে/প্রত্যেকটি ছায়ার।’

৬.৪.১৫.৩ : যত দূরেই যাই

প্রায় মস্তোপম কবিতা। কবি জানান, তিনি যত দূরে যান তাঁর সঙ্গে যায় নদীর ঢেউ। তাঁর চোখের পাতায় লেগে থাকে সারি সারি লক্ষ্মীর পায়ের আলপনা। দেশ ও ঐতিহ্যকে এভাবেই কবি আত্মস্থ করেন।

ছোট দুটি স্তবকে বিভক্ত দশ পংক্তির কবিতা। কোনো অলঙ্কার নেই। শুধু ছবি—

নিকানো উঠোনে

সারি সারি

লক্ষ্মী পা

‘যত দূরেই যাই’ বাক্য বা পংক্তি তিনবার ব্যবহৃত হয়ে গানের ধ্রুবপদের মতো বেজে চলে।

৬.৪.১৫.৪ : একটি কবিতার জন্য

কবিতা লেখার জন্য কি বিশেষ আবহ, উপাদান, পরিমণ্ডল দরকার? নিশ্চয়। কবিতা স্বয়মগতা হলেও ‘আজন্ম সাধনধন’ সে। কবি কে? সংবাদ প্রভাকর” পত্রিকায় কলেজ ছাত্রদের প্রতিভার বিকাশে ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এমনি ‘কৈশোরে কবিতাযুদ্ধ’ কবিতার দ্বারকানাথ অধিকারী লেখেন—

যে-জন মিলায় শব্দ, সুকোমল ভাবে।

সেই ত সুকবি বলি, আপনা প্রকাশে।।

(দ্র. প্রবন্ধ রত্নাবলী/রবীন্দ্রনাথ সামন্ত)

আর মধুসূদনের মতে, সেই যথার্থ কবি—কল্পনাসুন্দরী যার মনঃকমলেতে পাতেন আসন।

রবীন্দ্রনাথ কবিকে ‘ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী’ রূপে দেখেন—বিধাতার কারুশালা হতে চুরি করে আমি রূপ, রঙ, রস আমি তারি যাদুর পরশা...(নবজাতক কাব্য)

‘Best words in best order’-কে কবিতা বলেন কোলরিজ। গদ্যভাষ্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায় জানান “মনের মধ্যে থাকে মন। শব্দ স্পর্ধা রূপ রস গন্ধ দিয়ে তুলে বেছে সামনে সে তার ঝুলি ভর্তি করে।” লেখা হয় কবিতা।

একটি কবিতার জন্য ‘কবিতাপাঠ এসব তথ্য প্রাসঙ্গিক। মেহনতী মানুষের কবি, সাম্যবাদী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় পদ্মভূক্ হতে চান না। তাঁর কবিতা যখন লেখা হয় তখন আকাশ আগুনের নীল শিখায় জ্বলে ওঠে; দুরন্ত বড় জাগে;—হুঙ্কারে অরণ্যে সাড়া পড়ে যায়। ‘রক্তের লাল দর্পণে’ মুখ দেখে ভস্মলোচন—শাসক, শোষক, অত্যাচারী। কবিতা হয়ে ওঠে অস্ত্র (Penis mightier than sword)। দ্বিতীয় স্তবকে কবি দেখেন কবিতা লেখা হবে বলে দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার এঁটে দেওয়া হয়। কালোদিন সরিয়ে আলোদিনের ঘোষণা থাকে সেখানে। নিপীড়িত জনগণ অত্যাচারীর রক্তচক্ষু অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চলে মিছিলে। আকাশ বাতাস মুখরিত হয় প্রতিবাদে। সেই প্রতিবাদে, প্রতিরোধে দুঃসময় মুছে গিয়ে আসে সুসময়। ভাবী পৃথিবী দেখে নতুন পৃথিবীর জন্ম। যেখানে আছে ‘অজস্র সুখ, সীমাহীন ভালোবাসা।’

দুটি স্তবকে বিন্যস্ত এটি গদ্যকবিতা। কিন্তু অলঙ্কৃত নয়। প্রথম স্তবকে প্রকৃতির পটভূমি, দ্বিতীয় স্তবকে জনতার ভূমিকা সমান্তরাল ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত। উপমা ব্যবহারে অভিনবত্ব আছে—

‘আগুনের নীল শিখার মতন আকাশ’

সমাসোক্তির অজস্র ব্যবহার কবিতাটিকে প্রাণবন্ত করেছে—

- ১। সমুদ্রে ডানা ঝড়ে দুরন্ত ঝড়
- ২। বজ্রের হাঁকডাক অরণ্যের সাড়া
- ৩। বিদ্যুৎ ফিরে তাকায়

শিবের চিত্রকল্প ‘মেঘের ধূস জটা’-য় যথাযথ হয়েছে। ধ্বংস ও সৃষ্টি দুই এর মধ্যে ব্যঞ্জিত। কবিরূপে তিনি আশাবাদী। তাই নতুন পৃথিবী, সুখ ও ভালোবাসার কল্পনা করে—যেমন পাই স্প্যানিশ কবি লোরকার ‘নতুন গান’ কবিতায়।

বিশ শতকের বাংলা কবিতা ভাবে, ভাষায় ও ভঙ্গিতে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে এতে সন্দেহ নেই। তিরিশ ও চল্লিশের কবিরা বাংলা কবিতায় যে মেজাজ (Mood) তৈরি করেছিলেন—যার একদিকে আছে ব্যক্তিকতা, নৈর্ব্যক্তিকতা ও অন্যদিকে সমাজদীক্ষা, সামাজিক দায়বোধ, তার প্রভাব আজও বহমান। প্রকরণে নিত্যনূতন পরীক্ষানিরীক্ষাও এই সময়ের দান। তাই উত্তর রবীন্দ্রযুগের বাংলা কবিতা যে ঐশ্বর্যবান ও সম্ভাবনাময় এ নিয়ে কারোর সংশয়ের অবকাশ নেই।

৬.৪.১৫.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

- ১। সুভাষ মুখোপাধ্যায় কত সালে জন্ম গ্রহণ করেন?
- ২। ‘পদাতিক’ কত সালে প্রকাশিত হয়?
- ৩। ‘আমার কাজ’ কবিতায় কবি কি বলতে চেয়েছেন?
- ৪। আধুনিক কবিতার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করো।
- ৫। প্রাক্ রবীন্দ্র সমকালীন ও রবীন্দ্রোত্তর আধুনিকতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করো।
- ৬। পাঠিত কবিতা অবলম্বনে কবি অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যস্বরূপের পরিচয় দাও।

- ৭। আধুনিক বাংলা কবিতায় কবি সুধীন্দ্রনাথের স্থান নির্দেশ করো।
- ৮। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা কাব্যে কবি বুদ্ধদেব বসুর স্বতন্ত্রতা, পঠিত কবিতানুসরণে ব্যাখ্যা করো।
- ৯। ‘আধুনিক বাংলা কাব্যে বিষ্ণু দে একটি ব্যতিক্রমী কবি-ব্যক্তিত্ব’—পঠিত কবিতা-অবলম্বনে আলোচনা করো।
- ১০। ‘বর্তমান সময়ের সংশয়াচ্ছন্ন অন্ধকার যে তরুণ চিত্তকে আবিষ্ট করেছে, সমর সেন তারই প্রতিনিধি।’—আলোচনা করো।
- ১১। ‘তীক্ষ্ণ মানবিকতা, সমাজবোধ ও শ্রমজীবী মানুষের প্রতি ভালোবাসা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার প্রধান বিষয়।’—পঠিত কবিতানুসরণে আলোচনা করো।
- ১২। পঠিত কবিতার আলোকে গদ্যকবিতা রচনায় কবিদের নৈপুণ্যের পরিচয় দাও।
- ১৩। যে-কোনো একটি কবিতার কাব্যসৌন্দর্য বিশ্লেষণ করো—চেতন স্যাকরা/উটপাখি/শ্বাস্বতী/ব্যাং/শীত-রাত্রির প্রার্থনা/ক্রেসিডা/ঘোড়সওয়ার/মেঘদূত/রোমন্থন/যতদূরেই যাই/একটি কবিতার জন্য।

৬.৪.১৫.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

- ১। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত/অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ২। উনিশ বিশ/ঐ।
- ৩। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের প্রথমার্ধ/ঐ।
- ৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা/ভূদেব চৌধুরী।
- ৫। বাঙ্গালি সাহিত্যের বিকাশের ধারা/শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ৬। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস/ক্ষেত্রগুপ্ত।
- ৭। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৫ম খণ্ড)/সুকুমার সেন।
- ৮। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা/গোপাল হালদার।
- ৯। বাংলা কবিতার নবজন্ম/সুরেশচন্দ্র মৈত্রী।
- ১০। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকবিতা/তরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।
- ১১। আধুনিক বাংলা সাহিত্য/মোহিতলাল মজুমদার।
- ১২। আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়/দীপ্তি ত্রিপাঠী।
- ১৩। আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা/বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়।
- ১৪। কালের পুতুল/বুদ্ধদেব বসু।
- ১৫। বাংলা কবিতা : অনেক আকাশ/তরুণ মুখোপাধ্যায়।
- ১৬। একালের কবিতা : পাঠকের দর্পণে/ঐ।
- ১৭। আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়/সুমিতা চক্রবর্তী।
- ১৮। কবিতার কালান্তর/সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পর্যায় গ্রন্থ-৪

আধুনিক বাংলা কবিতা (বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত)

একক-১৬

সমর সেন : মেঘদূত, মুক্তি, রোমন্থন

বিন্যাস ক্রম :

৬.৪.১৬.১	:	সমর সেন
৬.৪.১৬.২	:	মেঘদূত
৬.৪.১৬.৩	:	মুক্তি
৬.৪.১৬.৪	:	রোমন্থন
৬.৪.১৬.৫	:	আদর্শ প্রশ্নাবলি
৬.৪.১৬.৬	:	সহায়ক গ্রন্থাবলি

৬.৪.১৬.১ : সমর সেন

“বর্তমান সময়ের, সংশয়াচ্ছন্ন অন্ধকার যে তরণচিহ্নকে আবিষ্ট করেছে, সমর সেন তারই প্রতিনিধি।” (কালের পুতুল) বুদ্ধদেব বসুর এই প্রাজ্ঞোক্তি মেনে নিতে আপত্তির হেতু নেই। বিশ শতকের চতুর্থ দশকে আবির্ভূত কবিরূপে আমরা তাঁর মধ্যে পেয়েছি নাগরিকতা, ব্যঙ্গপ্রাণতা, হতাশা ও বিষাদ, প্রেম সম্পর্কে কটাক্ষ ও কামনার জ্বালা। সামগ্রিক ভাবে তিনি সমাজসচেতন কবি। অসাম্য, আবিষ্কার ও শোষণ পীড়নের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ পরায়ণ। নারীরা তাঁর চোখে শুধু উর্বরা—মাতৃসদনে আসে। বণিকসভ্যতার রক্ষতা টের পান রক্তে। আর প্রার্থনা করেন—

মৃত্যুহীন প্রেম থেকে মুক্তি দাও,
পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী আনো
হানো ইম্পাতের মতো উদ্যত দিন।

তাঁর সব কবিতাই গদ্যে লেখা যা রাবীন্দ্রিক গদ্যছন্দের প্রভাবমুক্ত। তবে রবীন্দ্রকাব্যের বা গানের পংক্তির সূচতুর ব্যবহার তাঁর কবিতায় ভিন্ন স্বাদ এনেছে। কাব্যরচনার পাশাপাশি অধ্যাপনা (ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে), সাংবাদিকতা করেছেন। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগুলি হলো—কয়েকটি কবিতা (১৯৩৭), গ্রহণ (১৯৪০), সমর সেনের কবিতা (১৯৫৪) ইত্যাদি।

সমর সেন সমাজসচেতন কবি। তাঁর মধ্যে পেয়েছি নাগরিকতাকা, ব্যঙ্গপ্রাণতা, হতাশা ও বিষাদ, প্রেম সম্পর্কে কটাক্ষ ও কামনার জ্বালা। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগুলি—‘কয়েকটি কবিতা’ (১৯৩৭), ‘গ্রহণ’ (১৯৪০), ‘সমর সেনের কবিতা’ (১৯৫৪) ইত্যাদি। ‘মেঘদূত’ কবিতাটি এক শাস্ত্রত প্রেম-বিরহ গাথা। এ কালের কবি সমর সেন কালিদাসের সেই মায়াবী আড়াল ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছেন। তাই মেঘদূতের রোমান্টিক জগৎ একালে ধূসর, কঠিন, বাস্তব। ‘মুক্তি’ কবিতায় কবি কোনো কিছুই পররতি আকর্ষণ বোধ করেন না। সমর সেন ‘রোমন্থন’ কবিতাটি ১৯৪০-৪২ সালের মধ্যে রচনা করেন। কোন কিছুতে কবি স্পষ্ট আশ্বাদ পান না। নগর ও যন্ত্রসভ্যতায় প্রাণস্পন্দন না পেয়ে কবির মনে হয় সব লুপ্ত হয়ে গেছে, মুছে গেছে শব্দ, গন্ধ স্পর্শ।

৬.৪.১৬.২ : মেঘদূত

কবি কালিদাসের অসাধারণ কাব্য “মেঘদূত” এক শাস্ত্রত প্রেম-বিরহগাথা। এর রোমান্টিক আবেদন কবি রবীন্দ্রনাথেও বিকশিত হতে দেখি। একালের কবি সমর সে সেই মায়াবী আড়াল ছিঁড়েছেন। মেঘদূতের রোমান্টিক জগৎ একালের ধূসর, কঠিন, বাস্তব। তাই দুটি স্তবকে বিন্যস্ত কবিতাটিতে দেখি যক্ষপ্রিয়া নয়, মা হওয়া এক ক্লান্ত নারী ছেলে ভুলানো ছাড়া গায়। আর যে বার্তায় মেঘ দূত হয়ে রামগিরি পর্বত থেকে অলকাপুরীতে গিয়েছিল, আজ সেই বর্ষার আসে বন্যা। ঘরবাড়ি ডোবে, ভাঙে। মরে পশু ও মানুষ। শুরু হয় দুর্ভিক্ষ। এই পটভূমিতে যদি বিবাহিত প্রেমিকের কাছে নারী যায়, তা প্রেম নয়, পায় সন্তান ধারণের ব্যথা ও আনন্দ। আগাগোড়া তির্যক দৃষ্টি কবিতায় লক্ষ্য করা যায়।

প্রায় নিরাভরণ গদ্যছন্দের গদ্য কবিতা। কোনো ছবি কয়েকটা আঁচড়ে এঁকেছেন। শুধু একটি সার্থক উপমা আছে সর্বধারণক্লান্ত মায়ের ছড়া বলার সুর ও ক্লান্তি বোঝাতে ‘ঝরে যাওয়া পাতার মতো হাওয়ায় ভাসছে’।

৬.৪.১৬.৩ : মুক্তি

নাগরিক জীবন ও পরিবেশ কবির কাছে আদৌ প্রীতিকর নয়। তিনি দেখেন অন্ধকার আসে হিংস্র পশুর মতো। আকাশ রক্তকরবীর মতো লাল। আর এমন অন্ধকারে কুমারীর দেহে জাগে কামানর শিখা। কিন্তু কবি কোনো কিছুই প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন না। ধূসর পাহাড়ের মতো, নির্জন দ্বীপের মতো নিজেকে নিঃসঙ্গ, স্তব্ধ ভাবেন। এক অদ্ভুত নিরাসক্তি তাঁকে ঘিরে ধরে।

টানা গদ্যছন্দে লেখা দু’স্তবকের কবিতা। কিন্তু উপমা ও রূপকের একাধিক ব্যবহার চোখে পড়ার মতো। অথচ কোথাও তা ভার বা বাহুল্য মনে হয় না।

১। হিংস্র পশুর মতো অন্ধকার এলো

২। আকাশ রক্তকরবীর মতো লাল

৩। আমি নির্জন দ্বীপের মতো সুদূর নিঃসঙ্গ

‘কামনার কম্পিত শিখা’ একটি সুন্দর রূপক অলংকার।

৬.৪.১৬.৪ : রোমন্থন

দুটি পর্যায়ে বিভক্ত রোমন্থন কবিতাটির রচনাকাল ১৯৪০-৪২। প্রথম পর্যায়ে আছে অতীত জীবন নিয়ে স্মৃতিচারণা। দ্বিতীয় পর্যায়ে পাই বর্তমান জীবনযাত্রার ছবি। এই সেই সময় যখন মহাত্মা গান্ধীর লবণ আইন ভঙ্গ ঘটেছে; শুরু হয়েছে বিয়াল্লিসের অহিংস আন্দোলন। পাশাপাশি সশস্ত্র আন্দোলন চালিয়েছেন বীর শহীদেরা। কবি দেখেন স্তব্ধ দিন ও শূন্য মাঠ। সাধারণ জীবন চলে মন্তুর গতিতে। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে কবির নিজেকে বৃদ্ধ মনে হয়। কোন কিছুতে স্পষ্ট আশ্বাদপা না। এলিয়টের ওয়েস্টল্যান্ডের মতো ভীষণ ও জগৎ মনে হয় শূন্য,

ধূসর। তাই কলের বাঁশিতে শোনেন ‘নাভিচ্যুত শূন্য যেন কাঁদে’। নগর ও যন্ত্রসভ্যতায় প্রাণস্পন্দন না পেয়ে কবির মনে হয় সব লুপ্ত হয়ে গেছে; মুছে গেছে শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ।

এটিও গদ্যকবিতা। মৃদু অলঙ্কারের আভা কবিতাটিকে চিত্তাকর্ষক করেছে।

১। লৌহরেখা প্রসারিত নির্বিকার অদৃষ্টরেখায় (উপমা)

২। করলি শূন্যের বৃত্তে নাভিচ্যুত শূন্য যেন কাঁদে (উৎপ্রেক্ষা)

এলিয়েটের প্রফ্রকের মতো কবিরও ‘জিভে স্বাদ নেই’, শরীর পাপের ঘূর্ণ। যুগপ্রভাবে এসেছে অকাল বার্ধক্যবোধ।

৬.৪.১৬.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। সমর সেনের দুটি কাব্যগ্রন্থের প্রকাশকাল সহ নাম লেখ।

২। ‘রোমন্থন’ কবিতাটি কখন লেখা হয়েছিল?

৩। ‘মেঘদূত’ কবিতাটির কাব্যসৌন্দর্য বিশ্লেষণ করো।

৪। ‘মুক্তি’ কবিতাটি কবি যথার্থ অর্থে কিসের মুক্তি কামনা করেছেন।

৬.৪.১৬.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। বাংলা কবিতার নবজন্ম—সুরেশচন্দ্র মৈত্র।

২। সমর সেন (১৯১৬—১৯৮৭) : শ্রেষ্ঠ কবিতা—অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর (সম্পাদিত)।

৩। সমর সেন : কবির জীবন ও কবিতায় জীবন—বৃন্দাবন কর্মকার।

৪। প্রেমেন্দ্র মিত্র—সমর প্রসঙ্গ কয়েকটি কথা’, অনুষ্ঠাপ সমর সেন শতবর্ষ বিশেষ সংখ্যা (কলকাতা : অনুষ্ঠাপ, ২০১৬)।

বাংলা
স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম
এম.এ
দ্বিতীয় সেমেস্টার

সপ্তম পত্র

পাঠ-সহায়ক উপাদান



মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ
ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যান্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫
পশ্চিমবঙ্গ

পাঠ-প্রণেতা

অধ্যাপক ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপিকা ড. কেকা ঘটক — প্রাক্তন অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম — বাংলা বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

ড. রাজশেখর নন্দী — সহকারী অধ্যাপক (চুক্তিভিত্তিক) বাংলা বিভাগ, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

জুন ২০১৯

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও

প্রিন্টটেক্, ১৫এ, অম্বিকা মুখার্জী রোড, কলকাতা-৭০০০৫৬ দ্বারা মুদ্রিত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ-সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোন অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইনানুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের লেখক/পাঠপ্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Message

Satisfying the varied needs of distance learners, overcoming the obstacle of distance and reaching the unreached students are the threefold functions catered by Open and Distance Learning (ODL) systems. The onus lies on writers, editors, production professionals and other personnel involved in the process to overcome the challenges inherent to curriculum design and production of relevant Self Learning Materials (SLMs). At the University of Kalyani a dedicated team under the able guidance of the Hon'ble Vice-Chancellor has invested its best efforts, professionally and in keeping with the demands of Post Graduate CBCS Programmes in Distance Mode to devise a self-sufficient curriculum for each course offered by the Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Development of printed SLMs for students admitted to the DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2017 had been our endeavour. We are happy to have achieved our goal.

Utmost care and precision have been ensured in the development of the SLMs, making them useful to the learners, besides avoiding errors as far as practicable. Further suggestions from the stakeholders in this would be welcome.

During the production-process of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) Sankar Kumar Ghosh, Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Sincere gratitude is due to the respective chairpersons as well as each and every member of PGBOS (DODL), University of Kalyani. Heartfelt thanks is also due to the Course Writers-faculty members at the DODL, subject-experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have enriched the SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would especially like to convey gratitude to all other University dignitaries and personnel involved either at the conceptual or operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their persistent and co-ordinated efforts have resulted in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any form without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Director
Directorate of Open and Distance Learning
University of Kalyani

পাঠক্রম
সপ্তম পত্র
রবীন্দ্রসাহিত্য

পর্যায় গ্রন্থ : ১ সূর্য্যবর্ত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দশটি নির্বাচিত কবিতা) (সময় : ৩ ঘণ্টা)

(অহল্যার প্রতি, উর্বশী, দুঃসময়, কৃপণ, সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে, ঝড়ের খেয়া, সাধারণ মেয়ে, বাঁশি, আমি, আফ্রিকা)

একক ১. অহল্যার প্রতি, উর্বশী

একক ২. দুঃসময়, কৃপণ, সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে, ঝড়ের খেয়া

একক ৩. সাধারণ মেয়ে, বাঁশি, আমি, আফ্রিকা

পর্যায় গ্রন্থ : ২ রক্তকরবী (সময় : ৪ ঘণ্টা)

একক ৪. শিরোনামের তাৎপর্য

একক ৫. চরিত্র নির্মাণে নাট্যকারের দায়বদ্ধতা

একক ৬. রূপক-সাংকেতিক নাটক

একক ৭. নাট্যপরিণতি

পর্যায় গ্রন্থ : ৩ গল্পগুচ্ছ (নির্বাচিত ১০টি গল্প) (সময় : ৫ ঘণ্টা)

দেনাপাওনা, পোস্টমাস্টার, ছুটি, মেঘ ও রৌদ্র, ক্ষুধিতপাষণ, স্ত্রীরপত্র, হালদারগোষ্ঠী, তিনসঙ্গী (রবিবার, শেষকথা, ল্যাবরেটরি)

একক ৮. ‘গল্পগুচ্ছ’ : বর্গীকরণ—সাধারণ পরিচিতি

একক ৯. হিতবাদী পর্ব

একক ১০. সাধনা ও ভারতী পর্ব

একক ১১. সবুজ পত্রের গল্প

একক ১২. শেষ পর্যায়ের গল্প

পর্যায় গ্রন্থ : ৪ গোরা (সময় : ৪ ঘণ্টা)

একক ১৩. উপন্যাসের প্রেক্ষাপট

একক ১৪. চরিত্রসৃজনে অসাধারণত্ব

একক ১৫. গোরার জন্মবৃত্তান্ত : উপন্যাসে তার গুরুত্ব

একক ১৬. বিনয়-ললিতা উপকাহিনির তাৎপর্য

সূচিপত্র

সপ্তম পত্র

সপ্তম পত্র	একক	শিরোনাম	পাঠপ্রণেতা	পৃষ্ঠা
পর্যায় গ্রন্থ ১	১.	অহল্যার প্রতি, উর্বশী	ড. রাজশেখর নন্দী	১-১০
	২.	দুঃসময়, কৃপণ, সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে, ঝড়ের খেয়া	ড. রাজশেখর নন্দী	১১-২২
	৩.	সাধারণ মেয়ে, বাঁশি, আমি, আফ্রিকা	ড. রাজশেখর নন্দী	২৩-৩৪
পর্যায় গ্রন্থ ২	৪.	রক্তকরবী শিরোনামের তাৎপর্য	অধ্যাপক ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৫-৩৬
	৫.	চরিত্র নির্মাণে নাট্যকারের দায়বদ্ধতা	অধ্যাপক ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৭-৪০
	৬.	রূপক-সাংকেতিক নাটক	অধ্যাপক ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪১-৪৩
	৭.	নাট্যপরিণতি	অধ্যাপক ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৪-৪৬
পর্যায় গ্রন্থ ৩	৮.	গল্পগুচ্ছ : বর্গীকরণ—সাধারণ পরিচিতি	অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম	৪৭-৫০
	৯.	হিতবাদী পর্ব	অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম	৫১-৫৫
	১০.	সাধনা ও ভারতী পর্ব	অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম	৫৬-৬৩
	১১.	সবুজ পত্রের গল্প	অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম	৬৪-৬৭
	১২.	শেষ পর্যায়ের গল্প	অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম	৬৮-৭৪
পর্যায় গ্রন্থ ৪	১৩.	গোরা উপন্যাসের প্রেক্ষাপট	অধ্যাপিকা ড. কেকা ঘটক	৭৫-৮০
	১৪.	চরিত্রসৃজনে অসাধারণত্ব	অধ্যাপিকা ড. কেকা ঘটক	৮১-৮৫
	১৫.	গোরার জন্মবৃত্তান্ত : উপন্যাসে তার গুরুত্ব	অধ্যাপিকা ড. কেকা ঘটক	৮৬-৮৮
	১৬.	বিনয়-ললিতা উপকাহিনির তাৎপর্য	অধ্যাপিকা ড. কেকা ঘটক	৮৯-৯২

পর্যায় গ্রন্থ-১

সূর্য্যাবর্ত

নির্বাচিত ১০টি কবিতা (অহল্যার প্রতি, উর্বশী, সাধারণ মেয়ে, আফ্রিকা, দুঃসময়, কৃপণ,
সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে, ঝড়ের খেয়া, আমি, বাঁশি)

একক ১

অহল্যার প্রতি, উর্বশী

বিন্যাসক্রম

- ৭.১.১.১ : ভূমিকা
- ৭.১.১.২ : ‘মানসী’-কাব্য পরিচিতি।
- ৭.১.১.৩ : কবিতা পরিচয়—অহল্যার প্রতি
- ৭.১.১.৪ : ‘চিত্রা’—কাব্য পরিচিতি
- ৭.১.১.৫ : কবিতা পরিচয়—উর্বশী
- ৭.১.১.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী
- ৭.১.১.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৭.১.১.১ : ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজী ১৮৬১ খ্রি: ৭ই মে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্দশ সন্তান ছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাব্য, গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, নৃত্যনাট্য, উপন্যাস, ছোটগল্প, পত্রসাহিত্য, আত্মচরিত, সঙ্গীত প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে লেখনী চালনায় বাংলাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের স্মরণে মননে -শোণিত স্রোতে রয়েছেন। আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতিতে, দৈনন্দিন জীবনে তিনি আমাদের অন্যতম আশ্রয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য-প্রতিভার প্রধান ধর্ম এর মানবমুখীনতা। তাঁর প্রথম কাব্য ‘কবিকাহিনী’ ১৮৭৮ খ্রি: প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের শেষ কাব্য ‘শেষলেখা’ (১৯৪১) মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতার গৌরব প্রতিটি পাঠককে সমৃদ্ধ করেছে। রবীন্দ্রনাথকে শুধু দেবতার আসনে বসিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেই চলবে না। প্রতিটি রবীন্দ্র অনুরাগী পাঠককে চেষ্টা করতে হবে তাঁর রচনাবলীর মধ্যে যে জীবনের সঠিক দিশা রয়েছে তা উপলব্ধি করার। যদিও প্রতিটি পাঠকের রুচি ও মানসিকতা আলাদা। তাই যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে ব্যক্তির জীবনধারণ পদ্ধতির পরিবর্তন লক্ষ্যণীয় বিষয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা সংকলন ‘সঞ্চয়িতা’ এর বহু বছর ব্যাপী জনপ্রিয়তার পর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৯ খ্রি: শঙ্খ ঘোষের

সংকলনে ও সম্পাদনায় রবীন্দ্র কবিতা সংকলন ‘সূর্য্যবর্ত’ প্রকাশ করলেন। ‘সূর্য্যবর্ত’ সংকলনের সূচনায় শঙ্খ ঘোষ বলেছেন—“বইয়ের নামটির জন্য সুধীন্দ্রনাথ দত্তের একটি প্রবন্ধের কাছে আমার ঋণ। সুধীন্দ্র-অনুসরণে রবীন্দ্র শতবর্ষের একটি প্রবন্ধ সংকলনও যে ছাপা হয়েছিল এই নামে, সে কথাও এখানে স্মরণযোগ্য।” এই গ্রন্থটিতে ছোট-বড় নানা কবিতা স্থান পেয়েছে। আবার ‘সঞ্চয়িতা’ গ্রন্থে যে সব কবিতা আছে, ‘সূর্য্যবর্ত’ গ্রন্থে সেই সব কবিতার পুনরাবৃত্তিও হয়েছে। সর্বোপরি বলা যায় ২৭২ টি কবিতা এই সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে। তার থেকে নির্বাচিত ১০টি কবিতা আমাদের নির্দিষ্ট পাঠ্য সূচীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রবীন্দ্র কাব্যধারায় আমাদের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলি কিছুটা ব্যতিক্রমী অবশ্যই। ঐ কবিতাগুলি পাঠ করে আমরা বিশ্বকবিকে নতুনরূপে আবিষ্কার করতে সমর্থ হই। আলোচ্য কবিতাগুলির মধ্যে কবির জীবনচেতনার স্বরূপ যেমন জানা যাবে, তেমনি কবির জীবনের সমগ্রতার ও সৌন্দর্য্যবোধের সন্ধান মিলবে। এখন আমরা আমাদের পাঠ্য কবিতাগুলিকে তিনটি এককে ভাগ করে আলোচনায় অগ্রসর হবো। একক-১ এর মধ্যে ‘অহল্যার প্রতি’ (মানসী ১৮৯০), ‘উর্বশী’ (চিত্রা ১৮৯৬) কবিতা দুটি। একক-২ এর মধ্যে ‘দুঃসময়’ (কল্পনা ১৯০০), কৃপণ (খেয়া ১৯০৬), ‘সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে’ (গীতাঞ্জলি ১৯১০), ‘বাড়ের খেয়া’ (বলাকা ১৯১৬) কবিতাগুলি আলোচনায় স্থান পাবে। আর একক-৩ এর মধ্যে ‘সাধারণ মেয়ে’ (পুনশ্চ ১৯৩২), ‘বাঁশি’ (পুনশ্চ ১৯৩২), ‘আফ্রিকা’ (শ্যামলী ১৯৩৬), ‘আমি’ (শ্যামলী ১৯৩৬), এই চারটি কবিতার আলোচনায় অগ্রসর হবো।

৭.১.১.২ : মানসী কাব্য পরিচিতি

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী কবি। কবি নিজের জীবনধারণ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে সেই সময়ের পরিস্থিতিতে লক্ষ্য করেছেন। সমাজ জীবনে বিভিন্ন সমস্যা যেমন দেখেছেন, তেমনি—নিজের জীবনদর্শনের মধ্য দিয়ে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্যের সন্ধান ও করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খুব অল্প বয়সে (৭-৮) কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ের কাব্যগুলির পরে তাঁর ‘মানসী’ (১৮৯০), সোনারতরী (১৮৯৪), ‘চিত্রা’ (১৮৯৬) কাব্যগুলিতে বিশ্বকবির সৌন্দর্য্যতত্ত্ব লক্ষণীয় বিষয়। ‘কড়ি ও কোমল’ (১৮৯৬) রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের প্রবেশ দ্বার হলেও ‘মানসী’ (১৮৯০) কাব্য থেকেই কবি কাব্য সফলতা অর্জন করেছেন। ‘মানসী’ কাব্য লেখার সময় কবি ‘গাজিপুরে’ বসবাস করতেন। ফলে সেখানকার পরিবেশ—পরিস্থিতি কবির কল্পনাকে কাব্য রচনায় প্রভাবিত করেছিল। এমনকী তখন থেকেই কবির জীবনে পরিবর্তন আসতে শুরু করেছিল। ‘মানসী’ কাব্যে যেমন প্রেমের কবিতা লক্ষণীয়, তেমনি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ কবিতা ও গুরুত্বপূর্ণ। এই কাব্য থেকেই অনুভব করা যায় “কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিলেন।”

৭.১.১.৩ : কবিতা পরিচয়—অহল্যার প্রতি

আমরা জানি ভারতীয় পুরাণে বিশেষত ‘রামায়ণ’ মহাকাব্যে অহল্যা ছিলেন ঋষি গৌতমের পত্নী। দেবরাজ ইন্দ্র, গৌতম মুনির অনুপস্থিতিতে অহল্যার প্রতি আসক্ত হলেন। একদিন গৌতম মুনি কুটির থেকে স্নান করতে গেলে তার অনুপস্থিতিতে দেবরাজ ইন্দ্র অহল্যার কুটিরে প্রবেশ করেন। সেখানে কিছুক্ষণ থাকার পর দেবরাজ ইন্দ্র যখন কুটির থেকে বেরিয়ে আসছেন, তখন গৌতম মুনির সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। সেই পরিস্থিতিতে গৌতম

মুনি রুষ্ট হয়ে অহল্যাকে অভিশাপ দিলেন। অহল্যা সেই অভিশাপের দ্বারা পাষাণী হয়ে গেলেন। কিছুদিন পর রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে অহল্যার শাপমোচন হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘রামায়ণ’ মহাকাব্য থেকে কাহিনী সংগ্রহ করে ‘অহল্যার প্রতি’ কবিতাটিকে তাঁর মৌলিক কল্পনার দ্বারা নতুনভাবে অঙ্কন করেছেন। সর্বোপরি বলা যায় ‘অহল্যার প্রতি’ কবিতায় অদ্যাবধি লাঙল দেওয়া হয়নি এমন জমিকে তিনি কর্ষণযোগ্য করে তুলতে চেয়েছেন। কবিতাটির প্রথমেই বিশ্বকবি বলতে চেয়েছেন—

“কী স্বপ্নে কাটালে তুমি দীর্ঘ দিবানিশি,
অহল্যা, পাষণরূপে ধরাতলে মিশি,
নির্বাপিত—হোম-অগ্নি তাপস বিহীন
শূন্য তপোবনচ্ছায়ে? আছিলে বিলীন
বৃহৎ পৃথ্বীর সাথে হয়ে একদেহ—
তখন কি জেনেছিলে তার মহাস্নেহ?”

পাষাণী অহল্যাকে কবি হলচালনার অযোগ্য অনুর্বর জমির প্রতীক রূপে কল্পনা করেছেন। ভারতবর্ষের কৃষকেরা অনুর্বর জমিতে শত পরিশ্রম করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও ফসল ফলাতে পারে না। এমনকী সেই অনুর্বর জমিতে প্রচুর রাসায়নিক সার ও জল প্রয়োগ করলেও কাজের কাজ কিছু হয় না। সব পরিশ্রম বৃথা হয়ে যায়। কেননা সেই মাটি যে রক্ষ-শুষ্ক ও কৃষিকাজের উপযুক্ত নয়। কবি এই কবিতার মধ্য দিয়ে যে বার্তা দিতে চেয়েছেন, তা হল পরিবেশ-পরিস্থিতিতে শত সংকট থাকলেও একদিন সেই ঘোর সংকট দূরীভূত হয়ে যাবে। তারজন্য অবশ্যই প্রতিটি মানুষের যেমন সদ ইচ্ছা থাকতে হবে তেমনি কর্মের মধ্য দিয়ে সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে নিতে হবে। ‘অহল্যার প্রতি’ কবিতাটিতে ঐ অনুর্বর জমিকে চাষযোগ্য পরিণত করার জন্য রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে অহল্যার প্রাণ সঞ্চারের কথা বলা হয়েছে। রামচন্দ্রের ইচ্ছেতেই সেই অনুর্বর জমি আবার শস্য-শ্যামলা হয়ে উঠেছে। কবিতায় দেখা যায়, কবি বলেছেন—

“যামিনী আসিত যবে মানবের গেহে
ধরণী লইত টানি শ্রান্ত তনুগুলি।
আপনার বক্ষ-‘পরে, দুঃখশ্রম ভুলি
ঘুমাত অসংখ্য জীব- জাগিত আকাশ-
তাদের শিথিল অঙ্গ, সুষুপ্ত নিশ্বাস
বিভোর করিয়া দিত ধরণীর বুক।
মাতৃ-অঙ্গে সেই কোটি জীব স্পর্শ সুখ—
কিছু তার পেয়েছিলে আপনার মাঝে?”

আমরা জানি, আমাদের এই গ্রহে তিনভাগ জল, আর একভাগ স্থল। তাই প্রকৃতি প্রেমিকদের তো মুখ ফিরিয়ে থাকা অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো প্রকৃতি প্রেমিক কবির যে প্রকৃতির সঙ্গে প্রাণের একাত্মতা থাকবে তা আমরা ‘অহল্যার প্রতি’ কবিতা পাঠ করলেই বুঝতে পারি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রকৃতি প্রেম এক কথায়

বিশ্বানুভূতি। আর ঐ অনুভূতির ঠিক পরিচয় না পেলে এ জাতীয় কবিতা বোঝা বেশ মুশকিল। কবি এখানে অহল্যাকে বসুন্ধরা বা পৃথিবীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ গ্রন্থে, প্রমথনাথ বিশী আমাদের আলোচ্য কবিতাটি সম্পর্কে বলেছেন— “অহল্যা বসুন্ধরা, আর কেহ নহে। বসুন্ধরা জীব মাত্রেরই জননী, কিন্তু এক সময়ে সে লালনশীলা, স্নেহময়ী, অন্নদায়িনী ছিল না; সে অহল্যার মতোই অভিশপ্ত ও বন্ধ্যা ছিল— মেরুতে মেরুতে ও নির্বান্ধব আদিম অরণ্যে শ্বাপদ সংকুল দুর্গম ভীষণতায়। কিন্তু এই অভিশাপ কাটাইয়া এখন বসুন্ধরা জননী হইয়া প্রসন্ন দাক্ষিণ্যে জীব মাত্রকেই আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।” এই প্রসঙ্গে কবি ‘অহল্যার প্রতি’ কবিতায় তুলে ধরেছেন—

“যে গোপন অন্তঃপুরে জননী বিরাজে-
বিচিত্রিত যবনিকা পত্রপুষ্পজালে
বিবিধ বর্ণের লেখা—তারি অন্তরালে
রহিয়া অসূর্যম্পশ্য নিত্য চুপে চুপে
ভরিছে সন্তানগৃহ ধনধান্য রূপে
জীবনে যৌবনে, সেই গুঢ় মাতৃকক্ষে।”

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ছিন্নপত্রের’ ভাষায় মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির জন্মান্তরের সম্বন্ধটি নির্জন নিসর্গে মুখোমুখি হলেই বোঝা যায়। এখানেও তেমনি বসুন্ধরার সঙ্গে কবির সম্পর্কটি ‘অহল্যার প্রতি’ কবিতায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কবি বলেছেন—

“যেদিন বহিত নব বসন্তসমীর,
ধরণীর সর্বাস্থের পুলক প্রবাহ
স্পর্শ কি করিত তোরে? জীবন উৎসাহ
ছুটিত সহস্র পথে মরু দিগ্বিজয়ে।”

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় অহল্যার অভিশাপ এখনো শেষ হয়নি, সে কেবলমাত্র রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে সমর্পণ করেছেন। এরপর সুদিন আসবে, তিনি অভিশাপ জীবন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পাবেন। মুক্ত হওয়ার পর নতুন জীবনাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে নব জন্মলাভ করবেন। কবি রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপ এই প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে, এতদিন ধরে পাষাণী অহল্যা কিভাবে দিন গুজরান করলেন। এই প্রশ্নের সম্মুখীন আমরাও। সমসাময়িক কালের প্রেক্ষিত থেকে বিষয়টি দেখলে পরাধীন ভারতবর্ষে সাধারণ মানুষদের দুর্বিষহ যন্ত্রণা কবি নিজের চোখে দেখেছিলেন। সমাজের সর্বত্রই হাহাকার তখনকার দিনের সাধারণ মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছিল। রাজনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে, ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে সাধারণ মানুষের অবস্থান কোথায়? বা এই সংকট থেকে ভারতবাসী কবে মুক্তি পাবে! তা কেউই বলতে পারে না। তবে ভারতবাসীর বহুবিধ সমস্যা থেকে একদিন যে পরিত্রাণ মিলবে, তাতে সকলেই আশাবাদী। এমনকী ব্রিটিশ সূর্য একদিন পশ্চিম দিগন্তে অন্তগামী হবে তার অপেক্ষায় সমস্ত ভারতবাসী দিন গুনেছে। এই কবিতায় কবি বলেছেন—

“চেয়ে আছ প্রভাতের জগতের পানে
 যে শিশির পড়েছিল তোমার পাশাণে
 রাত্রিবেলা, এখন সে কাঁপিছে উল্লাসে
 আজানুচুম্বিত মুক্ত কৃষ্ণ কেশপাশে।
 যে শৈবাল রেখেছিল ঢাকিয়া তোমায়
 ধরণীর শ্যামশোভা অঞ্চলের প্রায়
 বহু বর্ষ হতে, পেয়ে বহু বর্ষাধারা
 সতেজ সরল ঘন, এখনো তাহারা
 লগ্ন হয়ে আছে তব নগ্ন গৌর দেহে
 মাতৃদত্ত বস্ত্রখানি সুকোমল স্নেহে।”

আসলে বিশ্বানুভূতি যে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি প্রেমের আসল রহস্য তা জোর দিয়েই বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কবিতায় পৃথিবীর সঙ্গে একাত্মতার কথা বলেছেন। পৃথিবীতে সবুজ ঘাসে, শরতের আলোতে, সুদূর বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গে নিশ্চুপ ও নিরিবিলি ভাবে পড়ে থাকার কথা বলেছেন। ‘বসু’ শব্দটির অর্থ হল প্রাণের ঐশ্বর্য বা প্রাচুর্য। আর তাকে যিনি ধরে আছেন, তিনিই বসুন্ধরা। ‘অহল্যার প্রতি’ কবিতায় এই প্রাণের সম্যক প্রকাশ প্রকৃতি জগতে। তাই প্রকৃতি প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেকে ঐ বসুন্ধরার সঙ্গে নিঃশেষে মিশিয়ে দিতে চেয়েছেন। ‘অহল্যার প্রতি’ কবিতায় কবি বলেছেন—

“এক বৃন্তে। বিস্মৃতি সাগর-নীলনীরে
 প্রথম উষার মতো উঠিয়াছে ধীরে
 তুমি বিশ্বপানে চেয়ে মানিছ বিস্ময়,
 বিশ্ব তোমাপানে চেয়ে কথা নাহি কয়;
 দৌঁছে মুখোমুখি। অপার রহস্যতীরে
 চির পরিচয়—মাঝে নব পরিচয়।”

রোমাণ্টিক কবি ধর্মের সব লক্ষণ কবিতাটির মধ্যে প্রতিভাত হয়েছে। সর্বোপরি বলা যায় সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা কবি চিন্তে বারবার ধরা পড়েছে। আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে, কবির মনে মানসীকে পাওয়ার লক্ষ্যে তিনি বেরিয়ে পড়েছেন। ‘রবীন্দ্র-পরিক্রমা’ গ্রন্থে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন— “‘মানসী’ তে (১৮৯০) এই রহস্যচ্ছায়া আপতিত হয়েছে, প্রকৃতি সৌন্দর্যের প্রতিমারূপে দেখা দিয়েছে। একদিকে প্রকৃতি সম্পর্কে সুদূর রহস্যময়তার উপলব্ধি, অপরদিকে প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয় সম্পর্ক যাপন -দুয়ে মিলে মানসী কাব্য এই নবতর সৌন্দর্যচেতনায় উন্নীত।” (পৃ. ২১১) আর ঐ কাব্যেরই ‘অহল্যার প্রতি’ কবিতায় কবি প্রকৃতির সার্বিক লীলাময় রূপটি অঙ্কন করেছেন। তিনি নিজের আত্মার মধ্যে মন-প্রাণের মধ্যে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে আত্মসাৎ করে নিতে চাইলেন। রাত্রির অবসানে পূর্বদিগন্তে সূর্যোদয় হবে, এই আশাতে অনূর্বর জমিতে চাষের উপযোগী করে তোলা হয়েছে। অনেক দিন ধরে যে জমি পড়ে থাকে, সেখানে নানা পশু-পক্ষীর চলার আঘাতে

ও মানুষের পায়ের আঘাতে জমির উর্বরতা নষ্ট হয়ে যায়। তারফলে শক্ত জমিকে চাষের উপযোগী করে তোলার জন্য অনেকবার সেই শক্ত জমিতে লাঙল দিতে হয়। তারফলে উর্বর সার ও জল প্রয়োগ করে ফসল উৎপন্ন করতে হয়। তেমনি পড়ে থাকা জমিকে চাষের কাজে লাগানোর মধ্য দিয়ে সমাজ-সভ্যতার বিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। তাও এই কবিতার উল্লেখযোগ্য বিষয় প্রকৃতি চেতন কবি সেই শাস্ত্র জীবন প্রবাহের সত্যতায় আস্থাশীল। যে প্রকৃতি কবির অনুভবের মধ্য দিয়ে এক আনন্দ ধারা বর্ষণ করেছে। তাই কবি অনুভব করেছেন-তার সঙ্গে মা ধরিত্রীর সম্পর্ক বহুদিনের। ‘অহল্যার প্রতি’ কবিতাটিকে রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ প্রমথনাথ বিশী ‘সোনারতরী’ কাব্যের ‘বসুন্ধরা’ কবিতার প্রথম খসড়া বলে মনে করেন।

৭.১.১.৪ : চিত্রা—কাব্য পরিচিতি

‘চিত্রা’ (১৮৯৬) কাব্যের মধ্যে বিশ্বকবির মানস প্রেরণাদাত্রীর পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়াও কবির ব্যক্তিগত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা লক্ষণীয় বিষয়। এমনকী ‘চিত্রা’ কাব্যের কবিতাগুলিতে সুখ-দুঃখ, প্রেম ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার লীলা লক্ষ্য করা যায়। সর্বোপরি বলা যায় ‘চিত্রা’ কাব্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভা ও ব্যক্তিগত জীবন দুইই সমান তালে চলেছে। ‘রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ গ্রন্থে’- প্রমথনাথ বিশী বলেছেন—“সোনারতরীতে কবি প্রতিভার যে দ্বন্দ্ব ও যে পরিণামের দিকে প্রাণসর গতি দেখিলাম, চিত্রাতে তাহা পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুত কবির প্রতিভা সোনারতরী, চিত্রা, চৈতালি, ক্ষণিকা পর্যন্ত এই পরিণামের দিকেই ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়াছে।” কবি তাঁর প্রতিভার যাদুতে সমস্ত শৃঙ্খল যেমন উন্মোচন করেছেন তেমনি বিশ্বজগৎকে নিজের জীবন দর্শনের মধ্য দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করতে চেয়েছেন। তিনি উপনিষদ থেকে আনন্দের মূলতত্ত্ব গ্রহণ করতে পেরেছিলেন বলেই প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে পেরেছিলেন। আবার এই কাব্যে জীবনদেবতা তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই কবির মানসিকতায় জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নতুন দিক লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কবি আপন জীবনের মর্মবাণীকে প্রকাশ করতে গিয়ে ‘চিত্রা’ কাব্যের প্রথম কবিতা ‘চিত্রা’-য় জীবনধর্মের দুটি দিককে প্রকাশ করেছেন—প্রথমটি হল

‘জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে,
তুমি বিচিত্ররূপিনী।’

আর দ্বিতীয়টি হল— “অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী।”

৭.১.১.৫ : কবিতা পরিচয়—উর্বশী

‘চিত্রা’ (১৮৯৬) কাব্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কবিতা হল ‘উর্বশী’। কবিতাটি পাঠ করে আমরা জানতে পারি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি রোমান্টিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। কবি মনে করেন একদিকে রূপলোক, অপরদিকে অরূপলোকে উর্বশীর অবস্থান। আসলে উর্বশী যে কে, সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই। এই উর্বশী ইন্দ্রের ইন্দ্রানী নয়, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীও নয়। তার কি স্বরূপ, তার কি উদ্দেশ্য সে সম্পর্কে রবীন্দ্র পাঠকেরা দ্বিধাগ্রস্ত। অনেকেই

মনে করেন উর্বশী কী স্বর্গের নর্তকী না দেবলোকের অমৃত পান সভার সখী, তাও স্পষ্ট নয়। আবার কেউ মনে করেন নারীর মধ্যে সৌন্দর্যের যে প্রকাশ ‘উর্বশী’ তারই প্রতীক। এই প্রসঙ্গে ‘চিত্রা’ নামক কবিতাটির উপলব্ধি একাধারে অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী হয়ে ধরা পড়েছে। ‘আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থে, আবু সয়ীদ আইয়ুব বলেছেন— “জগতের মধ্যে দেখা যাচ্ছে বিচিত্ররূপিনী মানসসুন্দরীকে, অন্তরের মধ্যে জীবনদেবতাকে। এই যুগলমূর্তির ধ্যানে বসেও রবীন্দ্রনাথের মনে সন্দেহ জাগে, হয়তো তাঁর জীবনে সত্য দেবতার আবির্ভাব ঘটেনি, এঁরা তাঁরই আপন, মনের বাসনা ও কল্পনা দিয়ে গড়া মূর্তি।” (পৃ. ৪৭)

‘উর্বশী’ কবিতায় কবি বলেছেন—

“নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধু, সুন্দরী রূপসী,
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী।
গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি
তুমি কোনো গৃহ প্রাপ্তে নাহি জ্বাল সন্ধ্যাদীপখানি
দ্বিধায় জড়িত পদে কম্পবক্ষে নম্রনেত্র পাতে
স্মিতহাস্যে নাহি চল সলজ্জিত বাসর শয্যাতে স্তব্ধ অর্ধরাতে।”

কেননা আমাদের কাছে উর্বশী মাতা, কন্যা, বধু নয়। সে কেবল সুন্দরী রূপসী। মর্ত্যে সে বাস করে না, তার বাসস্থান স্বর্গ উদ্যানে। উর্বশী আমাদের পরিবারের বধূদের মতো শ্রান্ত দেহে, নত মস্তকে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালায় না। এমনকী সন্ধ্যা প্রদীপ হাতে নিয়েও পরিবারটির প্রতি কোনরকম মঙ্গলারতি করতে সে অভ্যস্ত নয়। সর্বোপরি বলা যায় পরিবার -পরিজনদের প্রতি উর্বশীর কোন দায়বদ্ধতা নেই, কোনদিন ছিলও না। আমাদের পরিবারের নব বধূদের মতো দ্বিধায় জড়িত নয় উর্বশীর পদযুগল। শুধুমাত্র প্রভাতের প্রথম আলোকের মতো উর্বশী অনবগুণ্ঠিতা এবং অকুণ্ঠিতা।

কবিতার ভাব ও রূপের প্রতি রবীন্দ্রনাথ কতো গভীরভাবে সচেতন ছিলেন, তা আমরা কবিতাটি পাঠ করলেই অনুভব করতে পারি। কবির ধারণায় উর্বশীর রূপ কবিতাটিতে যে ভাবে প্রকাশিত হয়েছে, তা হল—

“বৃন্তহীন পুষ্প-সম আপনাতে আপনি বিকশি
কবে তুমি ফুটিলে উর্বশী।
আদিম বসন্ত প্রাতে উঠেছিল মস্থিত সাগরে,
ডান হাতে সুধা পাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে,
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশাস্ত্র ভুজঙ্গের মতো
পড়েছিল পদপ্রাপ্তে উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষ শত
করি অবনত।
কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্র বন্দিতা
তুমি অনিন্দিতা।”

তাহলে কী উর্বশী বেঁটা ছাড়া ফুলের মতো পিতৃপরিচয়হীন ভাবে প্রকৃতি জগতে ফুটে উঠেছিল! কাব্যের সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে নিপুণতা ও সচেতনতা দেখিয়েছেন তা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবুও আমাদের মনে হয় পুরাণে আমরা পাই সমুদ্র মন্ত্ৰণকালে ডানহাতে সুধাপাত্র এবং বামহাতে গরলের পাত্র নিয়ে তিনি আবির্ভূত। সেই পরিস্থিতিতে মহাসিন্ধু অনন্ত সৌন্দর্যময়ী উর্বশীর পদপ্রান্তে মন্ত্ৰশাস্ত্র ভূজঙ্গের মতো শান্ত হয়ে পড়েছিল। কুন্দফুলের ন্যায় সুন্দর ও শ্বেতাঙ্গী উর্বশী দেবরাজের বন্দনার যোগ্য। আবার প্রকৃতি প্রেমিক রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় উর্বশী প্রকৃতির মধ্য থেকেই আবির্ভূত। রবীন্দ্রনাথ কবিতায় প্রকৃতির কথা যেমন তুলে ধরেছেন। তেমনি উর্বশীর রূপ বর্ণনায় তাঁর সকল পরিচয় ও মুদ্রিত হয়েছে। তাই কবি চিরযৌবনা, উর্বশীর বালিকা বয়সের খোঁজ খবর নিতে কৌতুহলী হয়েছেন। উর্বশী সমুদ্রের তলদেশে কিভাবে ছিলেন, কার সঙ্গে খেলা করতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেননা উর্বশী শাস্ত্রত যৌবন ও সৌন্দর্যের প্রতীক। কবিতাটির ভাবের প্রতিধ্বনি দেখা যায় এইভাবে—

“কোনোকালে ছিলে না কি মুকুলিকা বালিকা বয়সী,

হে অনন্তযৌবনা উর্বশী!

আঁধার পাথারতলে কার ঘরে বসিয়া একেলা

মানিক মুকুতা লয়ে করেছিলে শৈশবের খেলা!

মণিদীপদীপ্ত কক্ষে সমুদ্রের কল্লোল সংগীতে

অকলঙ্ক হাস্যমুখে প্রবাল পালঙ্কে ঘুমাইতে

কার অঙ্কটিতে!

যখনি জাগিলে বিশ্বে, যৌবনে-গঠিতা,

পূর্ণ প্রস্ফুটিতা।”

যুগ যুগ ধরে উর্বশী সারা বিশ্বের প্রেয়সী হয়ে বিরাজমান। কেননা তার রূপ সৌন্দর্য দেখে পুরাণের কত মূর্তির ধ্যান ভঙ্গ হয়েছে। মূনিগণ ‘আনন্দ মদিরা ধারা’ পান করে উর্বশীকে কামনা করেছেন। আর উর্বশীর সৌন্দর্য সুধা পান করে তারা মত্ত হয়ে গেছেন। সেই পরিবেশ-পরিস্থিতি লক্ষ্য করে জীবনপ্রেমিক কবির ভ্রমরের ন্যায় উর্বশীর দিকে ধাবিত হয়েছেন। এই অনন্ত সৌন্দর্যকে চিরকালের অধরা বলেই তিনি অপ্রাপনীয়। ‘চিত্রা’ কাব্যে এসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন এবং মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। আসলে প্রকৃতি চেতনার, সৌন্দর্য পিপাসার এক অতি আশ্চর্য প্রকাশ কবিতাটিতে লক্ষণীয়। উর্বশীর অনাবিল সৌন্দর্য দিয়ে গড়া মূর্তিটির পরিচয় নিতে পারি এই ছত্র কয়টি থেকে—

“সুর সভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি,

হে বিলোল হিল্লোল উর্বশী,

ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিঙ্কু মাঝে তরঙ্গের দল

শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল।”

আসলে উর্বশী হলেন মুক্তবেণী বিবসনা। বিকশিত বিশ্ববাসনারূপ পদ্মের ফুলের উপর তিনি বিরাজমান। তাঁর অনাবিল সৌন্দর্য দিয়ে গড়া মূর্তি কবি অনুভব করেছেন। উর্বশী কবিতায় কবি বলেছেন—

“স্বর্গের উদয়াচলে মূর্তিমতী তুমি হে উষসী,
 হে ভুবনমোহিনী উর্বশী।
 জগতের অশ্রুধারে যৌত তব তনুর তনিমা
 ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ শোণিমা।”

আমাদের মনে হয়, উর্বশীর যুগ আর কোনদিনই ফিরে আসবে না। তার জন্য সমস্ত বিশ্বজগৎ হাহাকার করেছে, তাঁর কান্নায় চরাচর আপ্ত হুয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও উর্বশীর প্রথম সকালের রৌদ্র করোজ্জ্বল দেহখানি আর কোনদিনই দেখতে পাওয়া যাবে না। এমনকী যে গৌরব শশী অস্ত গেছে, তাও আর ফিরে আসবে না। রোমান্টিক কবিদের কাছে পূর্ণিমা রাত্রে, জ্যোৎস্নাধারায় বিকিরণের মধ্যে কত স্মৃতি জেগে ওঠে, তবু সে প্রাণহীন প্রতিমা। কবি জানেন, এই প্রকৃতির মানুষের সুখ-দুঃখ বিষয়ে উদাসীন। এই প্রকৃতি জগতে মানুষের আবেগের কোন মূল্য নেই। অথচ রক্ত মাংসের পৃথিবীতে প্রতিটি নারীকে মনে হয় সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। তারা সুনিপুণা হয়ে পরিবার -পরিজনকে ভালোবাসা দিয়ে আবদ্ধ করে রেখেছে। তাই পৃথিবীর নারীরা আমাদের একান্ত আপনজন, ভালোবাসার ধন। আর যে প্রকৃতিতে উর্বশী নারীর আবির্ভাব, সেখানে ভালোবাসা নেই বললেই চলে। সেই প্রকৃতি বড়ই নির্মম ও নিষ্ঠুর। উর্বশী হলেন সেই প্রকৃতি জগতের অধিবাসিনী।

“প্রথম সে তনুখানি দেখা দিবে প্রথম প্রভাতে,
 সর্বাপ্স কাঁদিবে তব নিখিলের নয়ন-আঘাতে
 বারিবিদুপাতে।”

সমালোচকেরা মনে করেন উর্বশী নামে নারীর বিবর্তনের মধ্য দিয়ে উষার বর্ণনামাত্র এ কবিতার মূল লক্ষ্য নয়। সর্বোপরি বলা যায় অন্ধকার থেকে আলোকে উত্তীর্ণ হওয়াই কবির মূল লক্ষ্য। আর সেই আলোর বা তাপের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি জগতে বীজ থেকে চারাগাছ জন্মায়, তারপর সেই চারাগাছ থেকে বৃক্ষে পরিণত হওয়া। এমনকী ফুল থেকে ফল, আবার ফল মাটিতে পড়ে তারপর বীজ অঙ্কুরিত হওয়া। এই যে জীবন প্রবাহ বা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে শূন্য থেকে শুরু আবার পরিবর্তনের ফলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই কক্ষপথে আবর্তন। সবই কবির কাছে প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই প্রেরণারই এক নারীরূপ চিত্রলোকে ধারণ করে আছেন উর্বশী কবিতায়। ‘উর্বশী’ কবিতায় কবি বলেছেন—

“ফিরিবে না, ফিরিবে না-অস্ত গেছে সে গৌরবশশী,
 অস্তাচলবাসিনী উর্বশী!
 তাই আজি ধরাতলে বসন্তের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
 কার চিরবিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে বহে আসে।”

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘উর্বশী’ কবিতার মধ্যে চন্দ্র-সূর্য-আকাশ-পৃথিবী সব কিছুই নারীর সৌন্দর্যে মহিমময় করে দিয়েছিলেন। ‘উর্বশী’ আসলে সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি। মানব জীবনে সুখ যেমন চিরকালের জন্য স্থায়ী হয় না, দুঃখই হল চিরন্তন। তবু মানুষ সব কিছুকে মেনে নিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তবুও

এক অবিচ্ছেদ্য আনন্দের টানে অনুভূতিশীল মানুষ তাঁর ‘জীবনের সার্থকতা আস্বাদ পায়। প্রকৃতির সৌন্দর্যে বেঁচে থাকার জন্য রসদ পায়, আনন্দ পায় এমনকী প্রেরণা পায়। রবীন্দ্রনাথের ‘উর্বশী’ কবিতার শেষেও তিনি বলেছেন—

“কার চির বিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে বহে আসে,
পূর্ণিমা নিশীথে যবে দশ দিকে পরিপূর্ণ হাসি
দূরস্মৃতি কোথা হতে বাজায় ব্যাকুল -করা বাঁশি
ঝরে অশ্রুবাশি।
তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ত্রন্দনে
অয়ি অবন্ধনে।”

উদ্ধৃত অংশ থেকে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাবটি পুরুরবা-উর্বশী কাহিনী থেকে সংগ্রহ করেছেন। সেখানে দেখা যায় উর্বশীর মিলন বৈদিক পুরাণেও ক্ষণস্থায়ী। কেননা মিলন হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই তার মধ্যে বিরহ দেখা দিয়েছে। কবি ‘উর্বশী’ কবিতায় সৌন্দর্যের চরম প্রকাশ দেখিয়েছেন। সর্বোপরি বলা যায় নির্বিশেষ সৌন্দর্যসাধনা ‘উর্বশী’ কবিতার মূল লক্ষ্য।

৭.১.১.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

- ১। রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা—নীহাররঞ্জন রায়
- ২। রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ—প্রমথনাথ বিশী
- ৩। রবীন্দ্রজীবনী (দ্বিতীয় খণ্ড)—শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
- ৪। রবি-রশ্মি—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
- ৫। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—তৃতীয়খণ্ড—সুকুমার সেন
- ৬। রবীন্দ্রনাথ ও কাব্য পরিক্রমা—শ্রী অজিতকুমার চক্রবর্তী
- ৭। আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ—আবু সয়ীদ আইয়ুব

৭.১.১.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

- ১। অহল্যার প্রতি কবিতার প্রকৃতিচেতনা সম্পর্কে আলোচনা করো।
- ২। অহল্যার প্রতি কবিতার কাব্য সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করো।
- ৩। ‘উর্বশী’ কবিতার কাব্যসৌন্দর্য বিশ্লেষণ করো।
- ৪। ‘উর্বশী’ কবিতার সৌন্দর্যচেতনা সম্পর্কে আলোচনা করো।

একক ২

দুঃসময়, কৃপণ, সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে, ঝড়ের খেয়া

বিন্যাসক্রম

- ৭.১.২.১ : ভূমিকা
৭.১.২.২ : ‘কল্পনা’—কাব্য পরিচিতি।
৭.১.২.৩ : কবিতা পরিচয়—দুঃসময়
৭.১.২.৪ : ‘খেয়া’—কাব্য পরিচিতি
৭.১.২.৫ : কবিতা পরিচয়—কৃপণ
৭.১.২.৬ : ‘গীতাঞ্জলি’ —কাব্য পরিচিতি
৭.১.২.৭ : কবিতা পরিচয়—সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে
৭.১.২.৮ : ‘বলাকা’—কাব্য পরিচিতি
৭.১.২.৯ : কবিতা পরিচয়—ঝড়ের খেয়া
৭.১.২.১০ : সহায়ক গ্রন্থাবলী
৭.১.২.১১ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৭.১.২.১ : ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বকে এবং মানব জীবনকে নানাভাবে উপলব্ধি করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন কাব্যের মধ্যে ভাবের উপস্থাপনায় বিচিত্রতা লক্ষণীয়। এই এককের মধ্যে আমরা ১৯০০ খ্রি: থেকে ১৯১৬ খ্রি: পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করে আলোচনায় অগ্রসর হবো। ‘কল্পনা’ (১৯০০), ‘খেয়া’ (১৯০৬), ‘গীতাঞ্জলি’ (১৯১০) ‘বলাকা’ (১৯১৬) কাব্যের জনপ্রিয় ও বহুচর্চিত কবিতাগুলি আমাদের এখন আলোচ্য বিষয়। কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবি মানসিকতার প্রতিফলন নতুনরূপে আবিষ্কার করার চেষ্টা করা হয়েছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা গ্রন্থে, নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন—“রবীন্দ্রনাথ কবি, রবীন্দ্রনাথ প্রতিভাবান সুলেখক, রবীন্দ্রনাথ চিন্তাশীল দার্শনিক, রবীন্দ্রনাথ সুপণ্ডিত, রবীন্দ্রনাথ আদর্শ নৈষ্ঠিক গৃহস্থ, সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ ঋষি।” (পৃ.১) রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী, বহু বছর ধরে প্রতিভার স্বাক্ষর উপরোক্ত কবিতাগুলি পাঠ করলে জানতে পারবো।

৭.১.২.২ : কল্পনা —কাব্য পরিচিতি

‘কল্পনা’ (১৯০০) কাব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রিয়তমকে খুঁজে বেড়িয়েছেন কালিদাসের সময়ে। সেই নায়িকার সঙ্গে কবি, স্বভাবতই সাক্ষাৎ আদান-প্রদানের কোনদিনই সুযোগ পাননি। ‘কল্পনার’ এই বিষয় সুর কবির কাছে অতৃপ্তির বা নিরাশার বার্তা বহন করে এনেছে। ‘রবীন্দ্রনাথ ও কাব্যপরিচয়’ গ্রন্থে, শ্রী অজিতকুমার চক্রবর্তী বলেছেন—“‘কল্পনা’ ‘কথা’ প্রভৃতির রচনার মধ্যে বর্তমানের বন্ধন হইতে আপনাকে ছিন্ন করিয়া প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে এবং কাব্য-পুরাণের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িবার একটা চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।” (পৃ. ৫৫) ‘কল্পনা’ কাব্যে কবি অতীত সৌন্দর্যলোকে মানসপ্রমগ্ন করেছেন। বর্তমানকে বাদ দিয়ে, বাস্তব জীবন অনুভূতিকে বাদ দিয়ে কবি কল্পলোকে বিরাজমান হয়েছেন। আসলে পৃথিবীর বহুবিধ সমস্যা ও সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য কবি ‘স্বপ্নলোকে উজ্জয়িণীপুরে’ যেতে চেয়েছেন। সেখানে কবি কল্পনায় অতীতকালের স্বপ্ন সৌন্দর্যের মধ্যে পুলক বেদনা অনুভব করতে চেয়েছেন। ‘কল্পনা’ কাব্যে কোথাও পদ্যার চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় না। আবার কল্পনাকে সঙ্গিনী করে রস সন্তোগের কুঞ্জকাননে বেশী দিন থাকতেও পারলেন না। ‘রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ’ গ্রন্থে, প্রমথনাথ বিশী বলেছেন— “এখানে তাঁহার বিচিত্র জীবনের শুরু, শেষ নহে। স্বভাবতই এই বর্তমান হইতে তাঁহার দৃষ্টি অতীতের দিকে প্রসারিত হইয়া গিয়াছে। এই অতীত ভারতবর্ষকে জানিবার ইচ্ছা হইতেই কথা, কল্পনা ও নৈবেদ্যের জন্ম।” (পৃ. ৯১)

৭.১.২.৩ : কবিতা পরিচয়—দুঃসময়

‘কল্পনা’ কাব্যের ‘দুঃসময়’ কবিতায় সারা পৃথিবীর যে সংকট কবি তা অনুভব করেছেন। ঐ সময় জীবন ধারণ পদ্ধতিতে যেমন সামাজিক সংকট দেখা দিয়েছিল, তেমনি নানামুখী সমস্যা সাধারণ মানুষকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। ‘আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থে, আবু সয়ীদ আইয়ুব বলেছেন—“সমস্ত পৃথিবীর বিষয় অবসাদ যেন কবি টেনে নিয়েছেন নিজের মধ্যে, নিজের দুটি ক্লান্ত ডানার মধ্যে। নীড় কোথাও নেই, ক্ষণিকের জন্য বিশ্রাম পাওয়া যেতে পারে এমন গাছপালাও দেখা যাচ্ছে না, আছে শুধু নিবিড়-তিমির-আঁকা মহানভ—অঙ্গন যে মহানভে উষার দিশা পর্যন্ত গেছে হারিয়ে।” (পৃ. ৫০) বহুবিধ সমস্যার জন্য কবি কোথাও বিশ্রাম পাচ্ছেন না, তখন একটু শান্তির জন্য বাস্তব পৃথিবী পরিত্যাগ করে কল্পলোকে হাজির হয়েছেন—

“যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মস্তুরে,
সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাই অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা-আশঙ্কা জপিছে মৌন মস্তুরে,
দিক্-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা-
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।”

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমাজের সর্বত্রই হাহাকার দেখে স্থির থাকতে পারেননি। দুঃখ-যন্ত্রণা অনুভব করে কবির মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কবি লক্ষ্য করেছেন, উষার আলোতে প্রকৃতি জগতের সমস্ত কিছু প্রস্ফুটিত না হয়ে কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। সেইজন্য কবি ক্লান্ত বিহঙ্গকে পাখা বন্ধ করতে নিষেধ করেছেন। ‘দুঃসময়’ কবিতায় কবির মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে এইভাবে—

“এ নহে মুখর বনমর্মর গুঞ্জিত,
এ যে অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে;
এ নহে কুঞ্জ কুন্দ কুসুম রঞ্জিত,
ফেন হিল্লোল কল কল্লোলে দুলিছে।”

পার্শ্বিক জগতের সবকিছু শূন্যতায় ভরে উঠলেও কবি সাধারণ মানুষকে নিরাশ হতে নিষেধ করেছেন। কেননা কর্মময় জগতে প্রতিটি মানব-মানবীকে নিজের কাজ করে যেতে হবে। কর্মের মধ্য দিয়ে শিল্পীর সৃষ্টি প্রতিভা বেঁচে থাকবে। যারা অনেকদিন ধরে কোন কিছুর প্রতি আকৃষ্ট থেকেছেন সেই বিষয়ের উপর তাদের মোহ জন্মেছে। ‘দুঃসময়’ কবিতায় মানবাত্মার প্রতীক হিসেবে বিহঙ্গকে ‘অন্ধ’ বলা হয়েছে, কবি ও মানবাত্মা তো অন্ধত্বের মধ্যে বন্দীত্বে বাঁধা অনেকখানি। কবি তাই বলেন—

“এখনো সমুখে রয়েছে সুচির শব্দরী,
ঘুমায় অরুণ সুদূর অন্ত-অচলে;
বিশ্বজগৎ নিশ্বাসবায়ু সম্বর
স্তব্ধ আসনে প্রহর গনিছে বিরলে।”

‘দুঃসময়’ কবিতায় ঘন ঘোর অন্ধকার রাত্রি পার হবার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সেই পথ অতিক্রম করার সময় ক্লান্তি এলেও কবিকে সতর্ক থাকতে হবে। প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির টানাপোড়েন নিয়ে কবির মন সংশয়াস্থিত। ‘দুঃসময়’ কবিতায় নিম্নোক্ত ছত্রগুলি পড়লে কবির মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যাবে।

“উর্ধ্ব আকাশে তারাগুলি মেলি অঙ্গুলি
ইঙ্গিত করি তোমা-পানে আছে চাহিয়া;
নিম্নে গভীর অধীর মরণ উচ্ছলি,
শত তরঙ্গে তোমা-পানে উঠে ধাইয়া;
বহুদূর তীরে কারা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি
‘এসো এসো’ সুরে করুণ -মিনতি মাখা।”

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোমাণ্টিক মানসিকতার অধিকারী ছিলেন। তাই তিনি উজ্জয়িনীপুরে সেখানকার জীবনচিত্র অঙ্কন করতে সমর্থ হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বাস্তব জগতের প্রতি কবির মনোভাব—সময় অতিক্রম হলেই দুর্দিন পেরিয়ে সুদিন আসবে। তখনই হয়তো মানবজীবনের সব আশা পূর্ণ হবে। কবির এই জীবনবিজ্ঞাসা প্রকাশিত হয়েছে ‘দুঃসময়’ কবিতাটিতে।

আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলতে চেয়েছেন—

‘ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহ মোহ বন্ধন,
ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।
ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা বসে ক্রন্দন;
ওরে গৃহ নাই, নাই ফুলশেজ-রচনা।
আছে শুধু পাখা, আছে মহা নভ-অঙ্গন
উষা-দিশাহারা নিবিড়-তিমির-আঁকা।’

উপরোক্ত ছত্র কয়টি থেকে জানা যায় একেবারেই কোনো আশা নেই, তা নয়। কিছুক্ষণ পরেই সংকট কেটে যাবে বলে কবি দিশা দেখিয়েছেন। সর্বোপরি এই আশাবাদী মনোভাব কবির কাছে ‘মিছে ছলনা’ ছাড়া আর কিছু নয়। সবার কাছে এটা চরম বাস্তব কথা হলেও এটাই স্বীকার করে নেওয়া উচিত। কেননা প্রত্যাশা যত কম, সেখানে জীবন সুন্দর। সেই জীবনে কবি অতীতচরী হয়েছেন, পরিবেশ-পরিস্থিতিতে সংশয় থাকার দরুণ। কিন্তু জগতের প্রতি কবির আকর্ষণ খুবই তীব্র। তাঁর কাছে পৃথিবীর সমস্ত কিছুই প্রেরণা স্বরূপ। সেখানেই তিনি সীমার মাঝে অসীমকে দেখেছেন। এমনকী নূতনকে আহ্বান জানিয়েছেন। তাই বর্তমান জীবনের মধ্যে থেকে কবি বার বার কল্পনা রাজ্যে হাজির হয়ে গেছেন। সবশেষে একথা বলা যায় ‘দুঃসময়’ কবিতায় ক্লান্ত বিহঙ্গকে কোনভাবেই পাখা বন্ধ করতে দেওয়া হবে না। কেননা থেমে যাওয়া মানেই মৃত্যু। সেইজন্য পথ চলাতে আনন্দ এই রীতিতে বিশ্বাসী হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। চলার পথ কঠিন হলেও ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। তাহলেই আগামী দিনে নতুন জীবনে প্রবেশ লাভ হবে।

৭.১.২.৪ : খেয়া—কাব্য পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য প্রধান পর্বের কাব্যে প্রকৃতি প্রেমের অপরূপ সৃষ্টি যেমন দেখানো হয়েছে তেমনি ‘খেয়া’ (১৯০৬) কাব্যে মর্ত্যলোক থেকে অমর্ত্যলোকে যাত্রার বিবরণ ফুটে উঠেছে। প্রখ্যাত সমালোচক প্রমথনাথ বিশী বলেছেন—“খেয়া কাব্যখানি কবির পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে প্রকাশিত।” ‘খেয়া’ কাব্যের মধ্যে জীবনের ছবিই প্রধান হয়ে উঠেছে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে, বহুবিধ সমস্যার মধ্যে কবির জীবনে অস্তিত্বের সংকট লক্ষণীয়। তার ফলে কবির বিষাদ গ্রস্ত মনোভাবের পরিচয় যেমন ধরা পড়েছে তেমনি সমগ্র জীবনটা আদর্শের তুলনায় তুচ্ছ বলে কবির মনে হয়েছে। কবি বলেছেন, এই খেয়ার মাধ্যমে যারা ঘরে ফেরার তারা ঘরে ফিরে গেছে। আর যারা দূরে যাওয়ার তারা পৃথিবী ছেড়ে খেয়া ঘাটে হাজির হয়েছে। এই দুই বিপরীত ভাবের মধ্য দিয়ে কবি নিজেকে অপেক্ষারত ভেবে পাড়ি দিতে চেয়েছেন। ‘রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ’ গ্রন্থে প্রমথনাথ বিশী বলেছেন—“খেয়াতে এই বিদায়ের সুরই একমাত্র উপজীব্য নহে, নবতর জীবনের আভাসও তাহাতে আছে। সন্ধ্যার প্রথম অন্ধকার আমাদের চক্ষুর সমস্ত দৃষ্টি লান করিয়া দিয়া বিশ্বছবি মুছিয়া দেয়; কিন্তু কিছু পরেই আবার সেই অন্ধকারের বুকের মধ্যেই নবতর বৃহত্তর বিশ্বছবি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।” (পৃ. ১৭৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খেয়ার ভাব-উপজীব্যকে এখানে পরিষ্কার করে তুলে ধরেছেন। খেয়া কাব্যে কবি বিরহের কথা যেমন ব্যক্ত করেছেন, তেমনি নদী, নৌকা, খেয়াঘাট, মাঝি সবাইকে তিনি মৃত্যুর প্রতীক রূপে কল্পনা করেছেন। ‘খেয়া’ কাব্য রচনাকালেও কবি অধ্যাত্ম রসঘন

উপলব্ধিতে বিশ্বাসী হয়েছিলেন। এই সময় কবির ব্যক্তিজীবনে স্ত্রী ও মধ্যমা কন্যা রেণুকার মৃত্যু কবিকে অস্থির করে তুলেছিল। আবার শান্তিনিকেতনে এক কাছের বন্ধুর মৃত্যু কবিকে গভীরভাবে ব্যথিত করে তুলেছিল। তারপর থেকে কবি খুব সংকটপূর্ণ জীবন কাটাতে থাকলেন এবং প্রায়ই অসুখে ভুগতে থাকেন। তারও কিছুদিন পর কবির পিতার মৃত্যু ঘটেছে। পিতৃহারা কবির জীবনে আবারও শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এমতাবস্থায় কবি মর্ত্যজীবনের প্রতি ধৈর্য্য হারালেন ও পরে আধ্যাত্মিকতার পথকে জীবনে গুরুত্ব দিলেন। প্রকৃতিপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ তখন জীবন থেকে উত্তরণের জন্য আধ্যাত্মিকতাকে একমাত্র অবলম্বন করে মুক্তি চাইলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মতো রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিতে অহরহ ঈশ্বরপ্রেমের আবির্ভাব। রবীন্দ্রকাব্যে প্রেম-বিরহ দুই ই আছে। তবে ‘খেয়া’ কাব্যে যতটা প্রেমের, তার চেয়ে বেশি বিরহের সুর শোনা গেছে। সর্বোপরি বলা যায়, খেয়া মৃত্যুর বা বিরহের কাব্য নয়, তা হল নতুন জীবনের কাব্য। ‘খেয়া’ রবীন্দ্রনাথের অধিক আলোচিত কাব্য গ্রন্থগুলির মধ্যে একটি। সর্বোপরি ‘খেয়া’ কাব্যে কবি প্রেম ও সৌন্দর্যের জগৎ ছাড়িয়ে ভক্তি ও অধ্যাত্মসাধনার পথেও যাত্রা করেছেন।

৭.১.২.৫ : কবিতা পরিচয়—কৃপণ

সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি রবীন্দ্রনাথ যে আসক্ত ছিলেন তা তাঁর কাব্য পাঠ করলেই বোঝা যায়। কবি কখনও সৌন্দর্য লোকের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, কখনও আবার পার্থিব জগতের প্রতি। কবি প্রেম, সৌন্দর্য, মানুষের মহিমাকে প্রাণের মধ্যে ধরতে পেরেছিলেন। তবে সে সব বাদ দিয়ে কবির মনোভাব শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েছে ঈশ্বরের প্রতি। আর ঈশ্বর আরাধনা করতে গিয়ে সমস্ত কিছুই তিনি বিলিয়ে দিতে পারেননি। ফলে তাঁর মধ্যেও কৃপণতার ভাবটি স্পষ্টরূপে ধরা পড়েছে। তাই তাঁর ‘কৃপণ’ কবিতার মধ্যে ঈশ্বরেরই সাধনায় অন্যতর অনুভব আত্মোপলব্ধির সঙ্গে আত্মশোচনা উপলব্ধ হয়। কবিতাটির শুরুতেই কবি বলেছেন—

“আমি ভিক্ষা করে ফিরতে ছিলাম
গ্রামের পথে পথে,
তুমি তখন, চলেছিলে
তোমার স্বর্ণরথে।”

এক ভিক্ষুক গ্রামে-গ্রামে ভিক্ষা করে বেড়ায়। গৃহস্থের বাড়ি থেকে সে কেবল ভিক্ষা অর্জন করে, তার বিনিময়ে সে পরিবারটিকে কিছু দেয় না। কেননা তার তো দেওয়ার মতো কিছু নেই। একদিন ভিক্ষুক দেখল যে গ্রামে সে ভিক্ষা করে, সেখানে হঠাৎ এক রাজাধিরাজের প্রবেশ ঘটেছে। রাজা, ভিক্ষুকের কাছে সমস্ত খোঁজ-খবর নিলেন। তখন ভিক্ষুকের মনে হল এ কোন মহারাজ এই গ্রামে এসে পড়েছেন। এরপর মহারাজ, ভিক্ষুকের কাছে কিছু সাহায্য চাইলেন কিন্তু ভিক্ষুক বেশি কিছু দিতে পারল না। ভিক্ষার বুলি থেকে মহারাজকে এক ক্ষুদ্র কণা মাত্র দিলো।

“আমায় কিছু দাও গো বলে
বাড়িয়ে দিল হাত।”

তখন ভিক্ষুক মাথানিচু করে ভাবলো, মহারাজা আমার সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করছেন না তো! তখন ভিক্ষার বুলি থেকে একটি চালের কণা দিয়ে ভিক্ষুক বাড়ি চলে গেছে। তারপর বাড়িতে গিয়ে, ভিক্ষার সামগ্রীগুলো

মেঝেতে ঢেলে দেখলো, তার মধ্যে একটি সোনার কণা রয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে ভিক্ষুকের অনুশোচনা হতে লাগল। তখন ভিক্ষুক কেঁদে কেঁদে বললো—

“তখন কাঁদি চোখের জলে

দুটি নয়ন ভরে—

তোমায় কেন দিই নি আমার সকল শূন্য করে।”

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আরেক পরিচয় তিনি ঈশ্বর বিশ্বাসী। তাঁর বিপুল সৃষ্টি সম্ভারের মধ্যে এই আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়াও লক্ষণীয় বিষয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানুষকে যেমন বিশ্বাস করতেন, তেমনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতেন। এমনকী বাংলাদেশে জমিদারি সূত্রে অবস্থান কালে বাংলার লোক ঐতিহ্যকে গভীরভাবে অনুভব করতে পেরেছিলেন ‘কৃপণ’ কবিতায় কবি বলতে চেয়েছেন, আপনার দিকে কিছুই রাখিলে চলবে না। এই জগৎ-সংসারে সবাই আমার আমার করে মরে। আমার বাড়ি, আমার ছেলে-আমার মেয়ে, আমার টাকা, আমার নাম-যশ প্রভাব প্রতিপত্তি ইত্যাদির মধ্যে কোন আনন্দ নেই। সেইজন্য প্রতিটি মানুষের নিজের জন্য না ভেবে বা নিজের কাছে কিছু না রেখে সব বিলিয়ে দেওয়া উচিত। তাহলে ‘কৃপণ’ কবিতার ভিক্ষুকের মতো কাঁদতে হবে না। তখন সমস্ত কিছুতেই যে আনন্দ রয়েছে তা জীবনের পরম পাওয়া। তখন সেই জীবন সব দিক থেকে সার্থকতায় ও সমৃদ্ধিতে ভরে উঠবে ও ঈশ্বরের করুণা বর্ষিত হবে। ঈশ্বরের করুণা থেকে কবির মন-প্রাণ কখনই বঞ্চিত হবে না। ঈশ্বরের করুণা কবির মনে প্রাণে বিদ্র হতে ছিল বলে ‘খেয়া’ কাব্যের ‘কৃপণ’ কবিতায় তার স্বরূপটি তুলে ধরতে পেরেছেন। প্রেমিক যেমন সমস্ত কিছু বিসর্জন দিয়ে তার হৃদয়ের মধ্যে প্রিয়তমার উপস্থিতি কামনা করে। তেমনি ভক্ত যদি ভক্তি ভরে ঈশ্বরের পাদপদ্মে সবকিছু উজাড় করে দিতে পারে তাহলে তার জীবন ধন্য। সব কিছু বিলীন করে দিয়ে ঈশ্বরের মধ্যে লীন হওয়াতে পরম পাওয়া। আর সেই পথে যে অগ্রসর হবে, তারই সাফল্য আসবে। সেই ব্যক্তি তখন নবজীবনে পা দিয়ে নব আনন্দে মুক্তিলাভ করবেন। ‘কৃপণ’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই আত্মনিবেদনের ভাবটিই তুলে ধরতে চেয়েছেন।

৭.১.২.৬ : গীতাঞ্জলি—কাব্য পরিচিতি

‘গীতাঞ্জলি’ (১৯১০) কাব্যটি প্রকাশিত হয়েছিল ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯১০ খ্রিঃ। প্রকাশক ছিলেন সতীশচন্দ্র মিত্র। ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যে গান ও কবিতার মোট সংখ্যা ছিল ১৫৭। অনেক সমালোচকই মনে করেন ‘গীতাঞ্জলি’ পর্ব রবীন্দ্র প্রতিভার শ্রেষ্ঠ ফসল। ‘আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থে আবু সয়ীদ আইয়ুব বলেছেন—“গীতাঞ্জলি পর্বের রচনাতে দুঃখ ও অমঙ্গলকে রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে গ্রহণ করেছেন তা এই পর্বেরই বৈশিষ্ট্য। এদিক থেকে তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছেন বলা ভুল হবে, কিন্তু জাগতিক দুঃখ দুর্দশারূপ তমসার একেবারে পরপারে আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষকে দেখতে পাচ্ছেন, তা-ও ঠিক নয়। দুঃখের বেশেই দেবতা নেমে আসেন ভক্তের দ্বারে।” ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যে ঈশ্বরের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। এমনকী কবিও ঈশ্বরের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। ঈশ্বর মঙ্গলময়, তিনি প্রেমাস্পদ। তাই ঈশ্বরের সঙ্গেও সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে প্রেমিক-প্রেমিকার মতো। আমরা বলি—লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—প্রেম এই তিন থাকতে নয়। এই সচেতন বোধে বিশ্বকবি জাগ্রত ছিলেন। তাই গীতাঞ্জলির

গানগুলিতে ঈশ্বরের ভালোবাসা বা আশীর্বাদের প্রকাশ ঘটেছে। সর্বোপরি বলা যায় ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে একজন বিশ্বকবির অনুভূতিকে ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যে ব্যক্ত করা হয়েছে। কাব্যের প্রথম কবিতাতেই কবি বলেছেন—

“আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার

চরণ ধুলার তলে।

সকল অহংকার হে আমার

ডুবাও চোখের জলে।”

প্রায় প্রতিটি গানেই ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা ব্যক্ত হয়েছে। এ যেন ঈশ্বরের সঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিসার যাত্রা। তাই মনে হয় ‘গীতাঞ্জলি’ পর্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘কবি’ না হয়ে ‘সাধকে’ পরিণত হয়েছেন। সর্বোপরি দেখা যাচ্ছে যে, ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলন সম্পূর্ণ হয়েছে। তাই ‘গীতাঞ্জলি’ তে অনেকগুলি কবিতাকে মনে হয়—“শুদ্ধা ভক্তির কবিতা”। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বকবি হিসেবে দেশে-বিদেশে সমাদৃত হয়েছিলেন ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যের জন্য। এসময় ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যটি বিশ্বসাহিত্যে সুনাম অর্জন করেছিল। পরবর্তী কালে অন্য এক সংকলিত কাব্যগ্রন্থ ইংরাজি গীতাঞ্জলির জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ খ্রি: এ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

৭.১.২.৭ : কবিতা পরিচয়—সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে

আমাদের আলোচ্য ‘সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে’ কবিতায় দেখা যায় কবি সৌন্দর্যের পূজারি ছিলেন। কবির জীবন পর্বের সূচনায় যে সৌন্দর্য দেখা দিয়েছিল, তা যেন ‘গীতাঞ্জলি’ পর্বে সুন্দরের উপাসক হিসেবে হাজির হয়েছে। ‘সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে’ কবিতায় কবি বলেছেন—

“সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে

অরুণ বরণ পারিজাত লয়ে হাতে।

নিদ্রিত পুরী, পথিক ছিল না পথে,

একা চলি গেলে তোমার সোনার রথে—

বারেক থামিয়া মোর বাতায়ন—পানে

চেয়েছিলে তব করুণ নয়নপাতে।”

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুভূতি বিচিত্রময়, আমাদের পাঠ্য কবিতাটির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় কবির চিস্তন, মনন যত গভীর, প্রকাশের ভাষা তত সুন্দর। কবিতার ছত্রগুলিতে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে, পরমকে পাওয়ার কথা তিনি ব্যক্ত করেছেন।

“স্বপন আমার ভরেছিল কোন্ গন্ধে,

ঘরের আঁধার কেঁপেছিল কী আনন্দে,

ধুলায়-লুটানো নীরব আমার বীণা

বেজে উঠেছিল অনাহত কী আঘাতে।”

‘গীতাঞ্জলি’ জীবনের কাব্য, সেইজন্য ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যের গান ও কবিতা গুলিতে ভাবের ঐক্য বজায় রয়েছে। জীবনের শুরুতে রবীন্দ্রনাথ সুন্দরকে মর্যাদা দিয়েছেন, তেমনি জীবনের শেষ পর্যায়েও সাধক রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সুন্দরের উপাসক। সমসাময়িক প্রেক্ষাপট আলোচনায় বোঝা যায়, সাধারণ মানুষও জীবনধারণ পদ্ধতিতে আধ্যাত্মিক চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন। কেননা চলমান জীবনে সর্বত্রই সংকট ঘনীভূত। পরাধীন ভারতবর্ষে সাধারণ মানুষের জীবন অতিবাহিত করা খুবই দুঃসাধ্যের বিষয় ছিল। জাতিতে-জাতিতে, ধর্মে-ধর্মে বিভেদ মানুষকে একেবারে পঙ্গু করে দিয়েছে। এর থেকে নিস্তার পাওয়ার কোন উপায় ছিল না। সাধারণ মানুষকে কবি অভয় বাণী শোনাতে থাকেন—‘অন্ধকার যায় বুঝি কেটে ওরে আর নেই ভয়।’ কবি নিজেই সকল অহংকার ত্যাগ করে পরম স্রষ্টার কাছে হাজির হয়েছিলেন। বিশ্বের সব কিছুর সঙ্গে নিজেকে অধিত করে পরমকে বা সুন্দরকে পেতেও চেয়েছেন। তাঁর মতে ঈশ্বর ও প্রকৃতি অভিন্ন। তাই সুন্দরের স্পর্শ পেতে কবির ধারণায় ব্যক্ত হয়েছে নিম্নোক্ত চরণগুলি—

“কতবার আমি ভেবেছি উঠি-উঠি,
আলস ত্যজিয়া পথে বাহিরাই ছুটি,
উঠি যখন তখন গিয়েছ চলে—
দেখা বুঝি আর হল না তোমার সাথে।
সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে।”

কবিতাটির মধ্য দিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে কবি তুলে ধরেছেন। কেননা প্রকৃতির ভেতরই তিনি ঈশ্বরকে অনুভব করেছেন। প্রকৃতির অজস্র রূপের মধ্যে কবি তাঁর প্রিয়তমের আভাস পেয়েছেন। সেই বিশ্বাস ও ভক্তির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরের প্রতি আস্থা রেখেছেন। আসলে ঈশ্বর ডাকলে তিনি সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেন না। সেইজন্য মর্ত্যজীবনের প্রতি ঈশ্বরের করুণা বর্ষণ সর্বত্রই বিরাজমান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোনো ধর্মপ্রচারক ছিলেন না, তিনি ছিলেন বিশ্বকবি। ‘সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে’ কবিতায় জীবনের নানা স্তরে যে দ্বন্দ্ব আছে, তা কবিতাটিতে প্রতিফলিত হয়েছে। আবার কবি স্বজন হারানোর ব্যথা যেমন পেয়েছেন, তেমনি রোগ-ব্যাধির সময় মানবাত্মার অমরত্ব উপলব্ধি করেছেন। কবি এমনও মনে করতেন পরিবেশ-পরিস্থিতিতে সবই একদিন সুন্দর ছিল। তাই কবি ঈশ্বরের করুণায় বা প্রকৃতির সান্নিধ্যে বিশ্বাসী হয়ে নিজের জীবনকে সমর্পণ করে দিতে চেয়েছেন। তারফলে কবি তাঁর প্রিয়তমের স্পর্শে আনন্দে বিভোর হয়ে জীবনকে ধন্য মনে করেছেন। এই ভাবনায় অন্তরে আর্বিভূত হয় এক নবচেতন্য-যা ‘সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে’ কবিতায় লক্ষণীয়।

৭.১.২.৮ : বলাকা—কাব্য পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বলাকা’ কাব্যটি ১৯১৬ খ্রি: প্রকাশিত হয়েছিল। ‘বলাকা’ কাব্যে মোট ৪৫টি কবিতা আছে। এই কাব্য রচনার আগে কবি অনেকদিন, প্রায় সতের মাস ইউরোপ ও আমেরিকায় ভ্রমণ করেছিলেন। বিদেশে গিয়ে সেখানকার মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচিতি ঘটেছিল। তার ফলস্বরূপ আমাদের দেশের জীবন প্রবাহেও তিনি পাশ্চাত্যের বেগবান্ স্রোত বইয়ে দিতে চাইলেন। ‘রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা’ গ্রন্থে

নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন—“ ‘বলাকা’র সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে এক অফুরন্ত গতিবেগ, এই গতিবেগই অচল পাষাণের মধ্যে, আপাতদৃষ্টিতে যাহা স্থাণু, জড়, নিশ্চল তাহার মধ্যে প্রাণরসের সঞ্চর করিয়া তাহাকে জীবন্ত করিয়া তোলে, যাহার বলে তরুশ্রেণী পাখা মেলিয়া শূন্যে উড়িয়া যাইতে চায়, পর্বত বৈশাখের মেঘের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যাইতে চায়, পটে লিখা ছবি জীবনের মধ্যে ফিরিয়া আসে; এই তৃণ এই ধূলি এরা অস্থির, সচল বলিয়াই এরা সত্য হইয়া উঠে।” (পৃ.১৩৭) বিশ্বের প্রতিটি ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গতির বেগ অনুভব করেছেন। ‘বলাকা’ শব্দের অর্থ বকের শ্রেণী। যারা দল বেঁধে আকাশ পথে উড়ে যায়। এই প্রতীকই ব্যঞ্জনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গতিশীলতা বোঝাতে ব্যবহার করেছেন। ‘জগৎ নিরন্তর গতিশীল’—ফরাসী দার্শনিক অঁরি বের্গসঁ-এর গতিবাদ রবীন্দ্রজীবন দর্শনে প্রভাবিত। সেই প্রবহমান জীবনকে কবি তুলে ধরেছেন ‘বলাকা’ কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্যে।

‘বলাকা’ কাব্যে গতিবাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় উপনিষদের চরৈবেতি মন্ত্র। সর্বোপরি বলা যায় ‘বলাকা’ কাব্যে রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কবি সুলভ মনটিও লক্ষণীয়। যা রবীন্দ্রনাথের মৌলিক কাব্য ভাবনার ফসল। তারফলে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কবির ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের কথা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। তাই স্থিতিকে কেন্দ্র করে গতির যে যাত্রা তা যেন ভক্ত হয়ে ভগবানের কাছে অভিসার যাত্রার কথাকে মনে করিয়ে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিরদিনই উন্নতির উপাসক ছিলেন, তা ‘বলাকা’ কাব্যের বিভিন্ন সংখ্যক কবিতা পাঠ করলেই বুঝতে পারি। এমনকী কবিতাগুলির মধ্যে গতির মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য ঘোষিত হয়েছে। যৌবনবন্দনা ও মহাযুদ্ধ চেতনার কথা থাকলেও ‘বলাকা’-র প্রধান কথাই হল গতি।

৭.১.২.৯ : কবিতা পরিচয়—ঝড়ের খেয়া

‘বলাকা’ কাব্যের ৩৭ সংখ্যক কবিতাটির নাম ‘ঝড়ের খেয়া’। কবিতাটির সূচনায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ভয়াবহ সংকট লক্ষণীয়। যুদ্ধের এমন ঘনঘোর বর্ণনা কবিতাটির প্রথমেই দেখা যায়। যুগসংকটে বিশ্বযুদ্ধের দামামা ধ্বনিতে সাধারণ মানুষের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে উঠেছিল।

“দূর হতে কী শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন,

ওরে উদাসীন—

ওই ভ্রমের কলরোল,

লক্ষ লক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল।”

কবি নিজের কর্তব্যসাধনের জন্য বাড়ির পরিবেশ ত্যাগ করে বৃহত্তর জগতে পদার্পণ করেছেন। কবির ভাবনায় মানবধর্ম হল শ্রেষ্ঠ ধর্ম। মানুষের মনুষ্যত্বই তার সবচেয়ে বড় পরিচয়। সমস্ত মানুষ সম মর্যাদা ও সম অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকবে এটাই কবির ইচ্ছে। তাই যুদ্ধ নয়, মানবতা ও শান্তি শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে এই ধ্রুব বিশ্বাস ‘ঝড়ের খেয়া’ কবিতাটিতে লক্ষ্য করা যায়।

“বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মতো হল শেষ,

পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচা-কেনা

আর চলিবে না।”

ঝড়, সমুদ্র ও মাঝির উপমা দিয়ে কবি বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসের পরিণতি পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। আমরা জানি মানুষই সংকীর্ণ ভেদ-বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে, আবার মানুষই একে-অপরকে ধর্মের দোহাই দিয়ে আক্রমণ করে। কবি সেইজন্য সাম্প্রদায়িক বিভেদ ভুলে মানুষকে একেবারে পথ দেখিয়েছেন। কবি বলেছেন, পুরনো সব ঝেড়ে ফেলে নতুন পথে অগ্রসর হতে হবে। তাহলেই মানবজীবন নতুন চেতনায় অগ্রসর হবে।

‘বলাকা’ কাব্যের ‘ঝড়ের খেয়া’ কবিতাতে ও বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সংকট চিত্রায়িত হয়েছে। নিম্নোক্ত ছত্রকয়টি পাঠ করলেই কবির জীবনদর্শন বোঝা যাবে—

“বাহিরিয়া এল কারা? মা কাঁদছে পিছে,
 প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদ্রিছে।
 ঝড়ের গর্জনমাঝে
 বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে;
 ঘরে ঘরে শূন্য হল আরামের শয্যা তল;
 যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল
 উঠেছে আদেশ-
 বন্দরের কাল হল শেষ।”

কবি অনুভব করেছেন এই বিশ্বযুদ্ধ অনেকদিন ধরে মানুষেরই পাপের বা হিংসার প্রতিক্রিয়া। ‘ঝড়ের খেয়া’ কবিতায় লক্ষ্য করা যায়—

“অজানা সমুদ্রতীর, অজানা সে দেশ-
 সেথাকার লাগি
 উঠিয়াছে জাগি
 বাটিকার কণ্ঠে কণ্ঠে শূন্য শূন্য প্রচণ্ড আহ্বান।
 মরণের গান
 উঠেছে ধ্বনিয়া পথে নবজীবনের অভিসারে
 ঘোর অন্ধকারে।”

ইউরোপে বিশ্বযুদ্ধের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সংকট ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বিভিন্ন সমস্যায় মানুষের মৃত্যু মিছিল দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। ‘রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা’ গ্রন্থে নীহারঞ্জন রায় বলেছেন— “এই যে মরণে মরণে আলিঙ্গন ইহার মধ্যেও জীবন -সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে। জীবনের হাটে পুরানো সঞ্চয় নিয়া বেচা কেনা আর কত কাল চলিবে? দিনে দিনে সত্যের পুঁজি ফুরাইতেছে, বঞ্চনা বাড়িয়া উঠিতেছে; মরণ সমুদ্র পার হইয়া, মৃত্যু স্নানে গুচি হইয়া জীবনকে এখন নূতন করিয়া পাইতে হইবে।” (পৃ.১৪৬) কবি মানুষকে সংকটের মধ্যে দিশেহারা হতে নিষেধ করেছেন। সংকটের মধ্যেও মানুষ কিভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হবে তার দিশা দেখিয়েছেন। সমস্ত প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে মানুষ নতুন প্রভাতের ইশারায় দিন গুনেছেন। এমনকী আশা

নিয়ে নবজীবনের উদ্দেশ্যে হাজির হয়েছেন, তার জন্য সব কিছু বিসর্জন দিয়ে মানুষকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। কবি বলেছেন—

“রাখো নিন্দাবাণী রাখো আপন সাধুত্ব অভিমান-
শুধু একমনে হও পার
এ প্রলয়-পারাবার
নূতন সৃষ্টির উপকূলে
নূতন বিজয়ধ্বজা তুলে।”

এটাই কবির সান্ত্বনা বাণী। পৃথিবীতে যত দুঃখ, যত পাপ থাকুক না কেন সব কিছু অতিক্রম করে সুদিনের জন্য অগ্রসর হতে হবে। বহুবিধ সমস্যা থাকলেও আগামী দিনের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। সমস্ত বাধাকে নিভীকভাবে জয় করে নিতে হবে। সেইজন্য কাউকে নিন্দা করার যেমন দরকার নেই। তেমনি কারোর কাছে মাথা নত করাও উচিত নয়। ‘ঝড়ের খেয়া’ কবিতায় লক্ষ্য করা যায়—

“দুঃখেই দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানা ছলে;
অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে;
মৃত্যু করে লুকাচুরি
সমস্ত পৃথিবী জুড়ি।”

‘বলাকা’ কাব্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গতিময় জীবনে বিশ্বাসী। কবির মনোভাবে ধরা পড়েছে সৃষ্টির গতিকে একদিন মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হবে, তার জন্য চিন্তা করার দরকার নেই। কালের নিয়মেই সৃষ্টিও জীবন-মৃত্যুকে অতিক্রম করে নূতন গতির দিকে অগ্রসর হবে। তার ফলে নব জীবনে নব মুক্তির আনন্দে মানুষ দিশা ফিরে পাবে। নিম্নোক্ত ছত্রগুলিতে কবির সেই জীবনদর্শন প্রকাশিত—দুঃখ, মৃত্যু, অসারতা ও জড়তাকে নিঃশেষে পরাভূত করার সংকল্পে উন্মথিত হয় কবিচিন্তা :

“তোরে নাহি করি ভয়;
এ সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়।
তোরে চেয়ে আমি সত্য এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব দেখ।
শাস্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।”

কবি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে উচ্চারণ করেন—“শাস্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।” কবিতার প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাত্রীদলকে বন্দর ছেড়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিতে বলেছেন। কিন্তু কবিতার শেষের দিকে মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—মৃত্যুভেদ করেই মানুষ অমৃতকে পাবে, দুঃখকে অতিক্রম করতে পারলেই সুখের ঠিকানা পাওয়া যাবে।

আমরা জানি সুখে-দুঃখে, ভালো-মন্দে মানুষের জীবন। মানুষ পথ চলার মধ্য দিয়ে মহাজীবনে প্রবেশ করে। যার শুরুও নেই, শেষও নেই। ভারতীয় দর্শন অনুযায়ী সেই জীবনকে টিকিয়ে রাখার জন্য ঈশ্বরের শরণ নেওয়া যুক্তিযুক্ত। কেননা সর্বকালে মানুষের ধর্ম, দর্শন ও নীতির কথা দেবতার অমর মহিমাতেই পূর্ণ হয়। তবে

সে দেবতার অধিষ্ঠান অবশ্যই মানবদেহ। কেননা মনের সুস্থতার কারণে, দেহের সুস্থতা বজায় থাকে। তার ফলে মানুষের রক্ত-মাংসের শরীরে রোগ-ব্যাদি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। মানুষ তার সৃষ্টির মধ্য দিয়েই বেঁচে থাকে। তাই একজন কবির কাছে যেমন কাব্যফসল, তেমনি একজন শিল্পীর কাছে তার শিল্পসার্থকতা। সর্বোপরি বলা যায় ‘ঝড়ের খেয়া’ কবিতাটির মূল ভাবনা হল মানবতার সপক্ষে কবির ইতিবাচক মনোভাব। প্রতিটি মানুষ দেশপ্রেমে ও উদার জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করবে। তাহলে দেবতার অমর মহিমা লাভের অধিকারী হবে। প্রকৃতির পটভূমিতে সেই দেবতার আশীর্বাদে মনের সবুজতা ফিরে আসবে। তারপর ‘ঝড়ের খেয়ায়’ উদ্ভীর্ণ হয়ে বহুবিধ জীবন সমস্যা থেকে মুক্তি লাভ করবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘বলাকা’ কবিতায় মানুষের জীবনের অবস্থার পরিবর্তন দেখাতে চেয়েছেন গতিশীলতার মধ্য দিয়ে।

৭.১.২.১০ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

- ১। রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা—নীহাররঞ্জন রায়
- ২। রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ—প্রমথনাথ বিশী
- ৩। রবীন্দ্রজীবনী (দ্বিতীয় খণ্ড)—শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
- ৪। রবি-রশ্মি— চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
- ৫। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—তৃতীয়খণ্ড—সুকুমার সেন
- ৬। রবীন্দ্রনাথ ও কাব্য পরিক্রমা—শ্রী অজিতকুমার চক্রবর্তী
- ৭। আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ—আবু সয়ীদ আইয়ুব

১.২.১১ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

- ১। ‘দুঃসময়’ কবিতার কাব্য সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করো।
- ২। ‘কৃপণ’ কবিতার কাব্য সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করো।
- ৩। ‘সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে’ কবিতার সৌন্দর্য চেতনা সম্পর্কে আলোচনা করো।
- ৪। ‘ঝড়ের খেয়া’ কবিতার কাব্য সৌন্দর্য আলোচনা করো।

একক ৩

সাধারণ মেয়ে, বাঁশি, আমি, আফ্রিকা

বিন্যাসক্রম

- ৭.১.৩.১ : ভূমিকা
৭.১.৩.২ : ‘পুনশ্চ’—কাব্যপরিচিতি
৭.১.৩.৩ : কবিতা পরিচয়—সাধারণ মেয়ে
৭.১.৩.৪ : বাঁশি
৭.১.৩.৫ : ‘শ্যামলী’—কাব্য পরিচিতি
৭.১.৩.৬ : কবিতা পরিচয়—আমি
৭.১.৩.৭ : আফ্রিকা
৭.১.৩.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলী
৭.১.৩.৯ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৭.১.৩.১ : ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বকবি। কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, পত্রসাহিত্য, সঙ্গীতের জগতে সর্বত্রই তিনি প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের চিত্তের অনেকখানি জুড়ে আছে। মানুষ ও শিল্পী রবীন্দ্রনাথ একটি বিশেষ কালের সবচেয়ে পূর্ণ প্রকাশ আমাদের কাছে। বাঙালির কাছে তিনি শুধু কবি নন। তিনি হলেন সমস্ত পৃথিবী। রবীন্দ্রনাথ জানতেন একজন মানুষ কেবল ভাত কাপড় নিয়েই বেঁচে থাকতে পারে না, সেই মানুষটির মনের খোরাক পূরণ করে তার সংস্কৃতি। সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ এক সুখী সমৃদ্ধ পৃথিবীর কথা ভেবেছেন। মানুষের কর্মযজ্ঞে সামিল হওয়ার জন্য তাঁর দেখবার ইচ্ছাটি ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং গভীর। সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের মূল বিষয় ছিল মানুষ ও প্রকৃতি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই তাঁর কাব্যরচনার পর্ব থেকে পর্বান্তরের পরিক্রমায় এক সত্য থেকে আরো গূঢ় শাস্ত্র সত্যের অন্বেষণে নিরন্তর ব্যাপ্ত রেখেছেন আপনার সৃজনশীলতাকে। বর্তমান এককে আমরা ‘পুনশ্চ’ ও ‘শ্যামলী’ কাব্যের পর্বটি অবলম্বনে আলোচনা করতে প্রয়াসী হবো।

৭.১.৩.২ : পুনশ্চ—কাব্য পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘পুনশ্চ’ কাব্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৩২ খ্রি:। ‘গদ্যকবিতা’র সার্থক প্রকাশ ‘পুনশ্চ’ কাব্যগ্রন্থে লক্ষ্য করা যায়। কাব্যটিতে ভাবের দিক থেকেও পরিবর্তন লক্ষণীয়। সংকট বা সংশয়, মানসিক দ্বন্দ্ব

অপরদিকে মানবিকতাবাদের সূত্রপাত ‘পুনশ্চ’ কাব্যের প্রধান বিষয়। জীবনের শেষ পর্বের কবিতায় কবি মানবিকতার জয় ঘোষণা করেছেন। শেষ জীবনের কাব্য হওয়ায় কবি আত্মবিশ্লেষণ যেমন করেছেন, তেমনি ফিরে দেখেছেন প্রকৃতি জগৎ ও মানব জগৎকে। ‘রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা’ গ্রন্থে নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন— “পুনশ্চ-শেষসপ্তক-পত্রপুট-শ্যামলী তে তিনি যে নূতন ছন্দরীতির প্রবর্তন করিলেন তাহা অন্তঃমিল ও বৃত্তপ্রবাহধৃত মুক্তক ছন্দ নয়, অথচ সেই সার্থক পরীক্ষারই যুক্তি শৃঙ্খলাময় চরম পরিণতি, একথা বলিলে বোধ হয় খুব অন্যায় বলা হয় না।” (পৃ. ১৯৬) গদ্য কবিতা বলতে আমরা যা বুঝি, তার যথার্থ ও সার্থক প্রকাশ এই চারটি শেষ পর্বের কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। আবার ‘পুনশ্চ’ কাব্যের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন— “পদ্যের বিশেষ ভাষারীতি ত্যাগ করবার চেষ্টা করেছি। যেমন তরে, সনে, মোর প্রভৃতি যে সকল শব্দ গদ্যে ব্যবহার হয় না সেগুলিকে এই সকল কবিতায় স্থান দিইনি।” গদ্যছন্দকে কবি বলেছেন ‘ভাবের ছন্দ’। ‘পুনশ্চ’ কাব্যের অভিনবত্ব এখানেই। গদ্যের সহজ-সরল ভাষাকে কবি কল্পনার সাহায্যে নব চেতনায় রূপ দিয়েছেন। ‘পুনশ্চ’ কাব্যের অভিনব আঙ্গিক পরবর্তীকালে সকলের কাছেই সহজবোধ্য হয়ে উঠেছে। ‘পুনশ্চ’ কাব্যের ভূমিকায় কবি আরও বলেছেন— “গদ্যকাব্যে অতি নিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশ রীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি। এর মধ্যে কয়েকটি কবিতা আছে তাতে মিল নেই, পদ্যছন্দ আছে, কিন্তু পদ্যের বিশেষ ভাষারীতি ত্যাগ করবার চেষ্টা করেছি।”

৭.১.৩.৩ : কবিতা পরিচয়—সাধারণ মেয়ে

‘সাধারণ মেয়ে’ কবিতাটি গদ্যছন্দে লেখা। কবিতাটিতে বাংলার এক নিম্নবিত্ত পরিবারের সাধারণ মেয়ের আবেদন-নিবেদন ব্যক্ত করা হয়েছে। মানুষের জীবনের অন্তর্বিহীন দুঃখ সাধারণ মেয়েটির জীবনে গভীর সংকট ডেকে এনেছিল। ‘সাধারণ মেয়ে’ কবিতায় কবি বলেছেন—

“আমি অন্তঃপুরের মেয়ে,
চিনবে না আমাকে।
তোমার শেষ গল্পের বইটি পড়েছি, শরৎবাবু,
‘বাসি ফুলের মালা’।
তোমার নায়িকা এলোকেশীর মরণদশা ধরেছিল
পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে।
পঁচিশ বছর বয়সের সঙ্গে ছিল তার রেষারেষি—
দেখলেম তুমি মহদাশয় বটে, জিতিয়ে দিলে তাকে।”

সাধারণ মেয়েটি নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে চেয়েছে, লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে। কবিতায় সাধারণ মেয়েটি তার জীবনের নানা সমস্যার কথা বলতে চেয়েছে। শ্রেণী-শোষণ ও জাতীয় নির্যাতন সাধারণ

মানুষকে কিভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল তাও এই কবিতাটিতে গুরুত্বপূর্ণ। ফলে সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থার কুরূপ কবিতাটিতে লক্ষণীয়। সমাজ-সংসারে, স্নেহ-মমতা-সমবেদনা প্রভৃতি মানব মনের কোমল প্রবৃত্তিগুলি যখন সব নিঃশেষিত হয়ে যায়, তখন সাধারণ মেয়েরা অসহায় হয়ে পড়ে। কবি বলেছেন—

“নিজের কথা বলি।
বয়স আমার অল্প।
একজনের মন ছুঁয়েছিল
আমার এই কাঁচা বয়সের মায়া।
তাই জেনে পুলক লাগত আমার দেহে,
ভুলে গিয়েছিলেম অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে আমি।
আমার মতো এমন আছে হাজার হাজার মেয়ে,
অল্প বয়সের মন্ত্র তাদের যৌবনে।”

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘সাধারণ মেয়ে’র প্রতীকে আমাদের পরিবারের হাজার হাজার মেয়ের করুণ কাহিনী তুলে ধরতে চেয়েছেন। সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে সর্বত্রই সংকট দানা বেঁধেছিল। তারফলে পরিবেশ-পরিস্থিতি জনগণকে কিভাবে সংশয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সেইজন্য মানব-বিপর্যয়ের কাহিনী লিখতে হলে তো সাধারণ মেয়ের কথা উঠে আসবেই। দুটো বিশ্বযুদ্ধ আমরা পেরিয়ে এসেছি। খরা, বন্যা, মন্বন্তরের সন্মুখীন হয়েছি আমরা। তবু আমরা লক্ষ্যে অটল। হিরোশিমা বিস্ফোরণের পর সমাজে পারমাণবিক অস্ত্র উদ্যত হয়েছে। প্রযুক্তিগত দিক থেকে সমাজের অনেক উন্নতি হয়েছে। আমাদের পুরুষতান্ত্রিক পরিবারেই ‘সাধারণ মেয়ে’-রা দিন দিন নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে বহুবিধ সমস্যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘সাধারণ মেয়ে’ কবিতায় বলেছেন—

“তোমাকে দোহাই দিই,
একটি সাধারণ মেয়ের গল্প লেখো তুমি।”

বাংলা কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাদের পরিবারের নারীদের আত্মিক সংকটের কাহিনী তুলে ধরেছেন তাঁর লেখা নানা উপন্যাস ও ছোটগল্পে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যেমন সাধারণ মেয়েদের হতাশা-নিরাশাকে তুলে ধরেছেন তেমনি—তাদের দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণার কথা নিপুণ তুলিতে অঙ্কন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘সাধারণ মেয়ে’ কবিতায় বলতে চেয়েছেন সাধারণ নারীদের দুর্দশার চিত্র নিয়ে আগামী দিনে শরৎবাবু গল্প লিখবেন। সেই গল্পের নায়িকা হবেন রূপে-গুণে, বিদ্যা-বুদ্ধিতে এক দীপ্ত নায়িকা। নায়িকার নামও তিনি দিয়েছেন, যার নাম রাখা হয়েছে মালতী। আর নায়ক বিলাত-প্রবাসী ‘নরেশ’। ‘নরেশ’ কাল্পনিক নাম হলেও কবিতা পাঠে আমরা জানতে পারি—যুবকটি অল্প বয়সে ভালোবেসেছিল সাধারণ পরিবারের মালতীকে। নানা প্রলোভন দেখিয়ে, মেয়েটিকে কাছে পাওয়াই ছিল নরেশের প্রকৃত উদ্দেশ্য। অথচ সময়ের পরিবর্তনে নরেশের মনেও পরিবর্তন দেখা দিয়েছে।

নরেশ, বিলেতে পড়াশোনা করতে চলে গেলে, সেখানে ‘লিজি’ নামে এক বিদেশিনীর প্রেমে পড়েছে। তারপর নানা কাজের চাপে মালতীর কথা একেবারেই ভুলে গেছে। কবিতায় লক্ষ্য করা যায়—

“গেল মেল এর চিঠিতে লিখেছে
লিজির সঙ্গে গিয়েছিল সমুদ্রে নাইতে।”

‘সাধারণ মেয়ে’ কবিতার দ্বিতীয় পর্বে মেয়েটি শরৎবাবুকে গল্প লেখার আবেদন করেছে। কারণ তারমতো সাধারণ মহিলাদের নিয়ে গল্প লিখে মূল সমস্যাকে সকলের সামনে তুলে ধরা সাহিত্যিকদের কাজ। যে সমাজের মেয়েরা অবহেলিত, সেই সমাজে সংকট নেমে আসতে বাধ্য। আমরা জানি, একজন লেখক সামাজিক ন্যায়-অন্যায় বিষয় নিয়ে যেমন সমালোচনা করেন তেমনি বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই সমকালীন সমাজ ও সংসারের একজন হয়েও ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ। সবসময় তিনি আবার সমাজ, দেশ, কালের দ্বন্দ্বিকতা মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু তাই বলে তিনি উদাসীনও থাকেননি। আর এই কাজ করতে গিয়ে কখনো লেখককে হতে হয়েছে রোমান্টিকতায় মেদুর, কখনও বা বেদনায় বিধুর। ‘সাধারণ মেয়ে’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—

“ওই নামটা আমার।
ধরা পড়বার ভয় নেই;
এমন অনেক মালতী আছে বাংলাদেশে,
তারা সবাই সামান্য মেয়ে,
তারা ফরাসি জার্মান জানে না,
কাঁদতে জানে।”

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার চাপে সাধারণ মহিলাদের দুর্দশার চিত্র কবিতাটিতে তুলে ধরা হয়েছে। নারীদের উপর শত অত্যাচার হলেও তারা মুখ বুজে সব সহ্য করেছে। প্রতিবাদী না হয়ে তারা শুধু অন্যায় সহ্য করে গেছে। মালতীর জীবনের মতো অনেক নারীর অসহায়তার কথা কবি এখানে তুলে ধরতে চেয়েছেন। সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপে মানুষকে ভালোবাসার পরিবর্তে গভীরভাবে অবিশ্বাস ও ঘৃণা করা হয়েছে। তারফলে আমাদের সমাজে অনেকেই অসহায়ভাবে দিন কাটিয়েছে। সুদিন কবে আসবে তার প্রতীক্ষায় সাধারণ মেয়েরা দিন গুণতে থাকেন। তাই ‘সভ্যতার সংকট’ নামক ভয়ঙ্কর ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে হলে মালতীদের মতো মানবীকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে বলে অনেক সমালোচকই মনে করেন।

“সেখানে যারা জ্ঞানী, যারা বিদ্বান, যারা বীর,
যারা কবি, যারা শিল্পী, যারা রাজা,
দল বেঁধে আসুক ওর চারদিকে।
জ্যোতির্বিদের মতো আবিষ্কার করুক ওকে—
শুধু বিদুষী বলে নয়, নারী বলে।”

সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসেছে মালতীর মতন এমন অনেক নারী আমাদের সমাজে আছে। যারা পরিবার—পরিজনদের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করলেও সেই পরিবারের লোকজনের কাছ থেকে পেয়েছে লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা। তাই তারা কষ্ট করে জীবন অতিবাহিত করে। সেই মালতীরা ইংরেজ, জার্মান, ফরাসি না জানলেও তাদের সম্মানে সভাহোক, সমিতি হোক। কবিতায় লক্ষ্য করা যায় —

“সবাই বলছে ভারতবর্ষের সজল মেঘ আর উজ্জ্বল রৌদ্র
মিলেছে ওর মোহিনী দৃষ্টিতে।”

‘সাধারণ মেয়ে’ কবিতার দ্বিতীয় পর্বে মালতীর ইচ্ছাপূরণের গল্প। তাতে যদি নরেশকে আরও কিছুদিন বিদেশে থাকতে হয়, তাতে কোন ক্ষতি নেই। সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পেলে মালতীও অনেক উন্নতি করতে পারতো বলে কবির বিশ্বাস। কবিতার শেষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলতে চেয়েছেন নরেশের মতো লোকজন, আমাদের সমাজেও প্রচুর আছে। তারা সাধারণ মেয়েদের ব্যবহার করে দূরে সরে যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলতে চেয়েছেন অহংম্য নরেশ শেষ পর্যন্ত স্বদেশীয় কালো মেয়েটির কাছে পরাজিত হয়ে মনে মনে তার গুণকে স্বীকার করুক। দন্ধ হোক আত্মগ্লানি ও অনুশোচনায়।

“নরেশ এসে দাঁড়াক সেই কোণে,
আর তার সেই অসামান্য মেয়ের দল।”

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গদ্য লিরিকের মাধ্যমে মালতীর মতো সাধারণ মেয়ের স্বপ্নভঙ্গের কাহিনীকে এখানে তুলে ধরতে চেয়েছেন। কবি সেই সময়ের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সংসারের প্রতি ছিলেন কিছুটা ক্ষুব্ধ। আর সেই বীতশ্রদ্ধার বিষয়গুলিই তাঁর সাহিত্যরচনায় টুকরো টুকরো ছবির মাধ্যমে আমাদের পাঠ্য কবিতাটিতে ধরা পড়েছে। কবির সক্রিয় হৃদয়বস্তুর স্পর্শে মালতী ও তারই মতো বঙ্গললনাদের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ সংকেতিত হয়েছে।

৭.১.৩.৪ : বাঁশি

‘বাঁশি’ কবিতাটি অমিল ও অসম পয়ার জাতীয় ছন্দে রচিত। বাঁশির সঙ্গে বৈষ্ণব কবিতার সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক। ‘পাঁচশত বৎসরের পদাবলী’তে আমরা দেখি কৃষ্ণের বাঁশি শুনে রাধাকে ঘর-বার করতে হয়েছিল। আমাদের আলোচ্য ‘বাঁশি’ কবিতায় হরিপদ কেরানির মতো মানুষ, যারা মাসে পঁচিশ টাকা মাইনে পেয়ে অসহায়ভাবে দিন কাটিয়েছেন। অর্থনৈতিক হাহাকারের জন্য ধলেশ্বরী নদী তীরবর্তী গ্রামের মেয়েকে হরিপদ কেরানি বিয়ে পর্যন্ত করতে পারেনি। বাঁশি কবিতায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—

“কিনু গোয়ালার গলি।
দোতলা বাড়ির
লোহার-গরাদে-দেওয়া একতলা ঘর
পথের ধারেই।
লোনাধরা দেয়ালেতে মাঝে মাঝে ধসে গেছে, বালি,
মাঝে মাঝে সঁয়াতাপড়া দাগ।”

এ শুধু লোনাধরা দেয়ালের চিত্র নয়, পশ্চিমবঙ্গে সেইসময় আমরাও এই একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলাম। সেইসময় জীবনের বহুবিধ সংকট, ঘাত-প্রতিঘাত কবিকে যেমন ব্যথিত করে তুলেছিল তেমনি সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষকে করেছিল বিপর্যস্ত। শহর কলকাতার স্বার্থপরতা, সংকট ও অমানবিকতার বিবরণ ‘বাঁশি’ কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে। জীবনের মধ্যে ঘটে যাওয়া বাস্তব বিবরণ কবি নিজের চোখেই দেখেছিলেন।—

“বেতন পাঁচিশ টাকা,
সদাগরি আপিসের কনিষ্ঠ কেরানি।
খেতে পাই দত্তদের বাড়ি
ছেলেকে পড়িয়ে।
শেয়ালদা ইস্টিশনে যাই,
সন্কেটা কাটিয়ে আসি;
আলো জ্বালাবার দায় বাঁচে।”

নাগরিক জীবনছন্দে বিশ্বাসী মানুষেরা অনেকাংশে কুসংস্কারমুক্ত হলেও তাদের হাতে সময় খুব কম। অথচ সকলেই সাফল্যের মুখ দেখতে চায় খুব তাড়াতাড়ি। সকাল থেকে রাত্রে ঘুমোতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত তারা প্রচুর পরিশ্রম করলেও অর্থ উপার্জনের বাইরে কিছু চেনে না তারা। প্রকৃত শিল্পমনস্ক মানুষ যাঁরা, তাঁরা মনে করেন, জীবনের সব মাত্রাকে টাকার মূল্যে দিয়ে মাপা যায় না। আর তা যারা করতে চায়, তাতে জীবনের পথ তাদের কাছে জটিল হয়ে ওঠে। কিন্তু কবিতায় হরিপদর মতো মানুষদের জীবনে হাহাকার সর্বক্ষণের। তাই তাদের মতো মানুষ সুন্দরী সুললিতা নারীকে নিজের জীবনসঙ্গিনী রূপে পাবার কথা ভেবেও আবার পিছিয়ে আসে। হরিপদর মতো মানুষদের কাছে আসলে জীবন এই রকম। অর্থনৈতিক সংকটের জন্য বিয়ের লগ্ন ছেড়ে তারা চলে এসেছে, তারজন্য তাদের মনে কোন দুঃখ নেই, কেননা তা মেনে নিতে হয়। সমাজে শ্রেণি বিভাজনই এর জন্য দায়ী। এই সহজ মনে মনে নেওয়ার পশ্চাতে যে এক নিরাসক্ত শিল্পীর জীবনদৃষ্টি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাতেই রয়েছে সহজাত সিদ্ধি হয়ে।

“ধলেশ্বরী নদীতীরে পিসিদের গ্রাম।
তাঁর দেওরের মেয়ে,
অভাগার সাথে তার বিবাহের ছিল ঠিকঠাক।
লগ্ন শুভ, নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল—
সেই লগ্নে এসেছি পালিয়ে।
মেয়েটা তো রক্ষ পেলে,
আমি তথৈবচ।
ঘরেতে এল না সে তো, মনে তার নিত্য আসা-যাওয়া-
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।”

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘বাঁশি’ কবিতায় সমকালীন শোষণ-শাসন-নির্যাতনের বর্ণনা দিয়েছেন। কবি জগৎ ও জীবনকে ভালোবেসেছিলেন বলে কবিতাটিতে জীবনের অভিজ্ঞতার ঝাঁপি খুলে বসেছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ শুধু

মাত্র বহুবিধ সংকটে আবদ্ধ মানুষের কথাই বলেননি। সেই সঙ্গে তিনি হরিপদ কেরাণীর মতো মানুষদের রোমান্টিক মানসিকতা দিয়ে জীবনকে অন্যভাবে দেখার চেষ্টা করেছিলেন।—

“হঠাৎ খবর পাই মনে
আকবর বাদশার সঙ্গে
হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ নেই।
বাঁশির করুণ ডাক বেয়ে
ছেঁড়া-ছাতা রাজছত্র মিলে চলে গেছে
এক বৈকুণ্ঠের দিকে।”

হরিপদ যেন এক প্রেমিক মানুষ, যে তার প্রিয় চিরন্তন সৌন্দর্যময়ী কল্পলতা মানসীকে বলতে চেয়েছে—

“যে আছে অপেক্ষা করে, তার
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।”

এখানে হরিপদের মতো মানুষদের ভেজা চোখেরই প্রাধান্য লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাঁশির সুরে জীবনের শূন্যতা ও বিরহের মুর্ছনাকে কবিতাটিতে তুলে ধরেছেন। হরিপদও হাহাকারের মধ্যে অনন্ত কালধরে প্রেমিকার জন্য পথ চেয়ে বসে আছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হরিপদের জীবন সংকটকে ‘বাঁশি’ কবিতার মধ্যে শিল্পরূপ দিয়েছেন। নানাবিধ জীবন সমস্যায় হরিপদের যখন দিশেহারা হয়ে পড়েছিল, তখনও সে আশাবাদী। সেইজন্য বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত হয়েও জীবনকে ভালোবেসে হরিপদ এগিয়ে গেছে। আর এই ভালোবাসার নামই যে জীবন। কল্পনা সেই জীবনকে রোমান্সের রসে কখনো শুষ্ক জীর্ণ হতে দেয় না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘বাঁশি’ কবিতায় জীবনের সেই সুরটিকে ধরে রাখতে চেয়েছেন। যে সুরের মধ্য দিয়ে জীবনকে সমস্ত পরিস্থিতির মধ্যে মেনে নেওয়াতে যে মানবিক শক্তির প্রতিষ্ঠা, হরিপদের প্রিয়তমার জন্য অপেক্ষা তার নিদর্শন।

৭.১.৩.৫ : শ্যামলী—কাব্যপরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘শ্যামলী’ কাব্যটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৬ খ্রিঃ। ‘শ্যামলী’ কাব্যটি ‘গদ্য কবিতা’-র আঙ্গিকে লেখা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই এই রীতির প্রথম স্রষ্টা। তবে এর সূচনা হয়েছিল ‘লিপিকা’ (১৯২২খ্রিঃ) কাব্যগ্রন্থে। ‘রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা’ গ্রন্থে নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন— “‘শ্যামলী’র কতকগুলি কবিতায় চিত্তের একটা ক্ষণিক আবেগ, একটা হঠাৎ খুশি বা হঠাৎ খেয়াল, একটা বিশেষ ভাব-বালকিত বা অনুভূতি স্পষ্ট লঘু শিথিল মুহূর্তকে রূপে রহস্যে ধরিবার চেষ্টা আছে।” (পৃ.২০২) তাছাড়াও ‘শ্যামলী’ কাব্যের কয়েকটি কবিতায় ভাবগত কল্পনার ঐক্য ও বর্ণনাভঙ্গির প্রাচুর্য ধরা পড়েছে। তবে কাব্যটিতে প্রেমের কবিতাও লক্ষণীয় বিষয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্থির করেছিলেন, তাঁর শেষ-বেলাকার ঘরখানি তিনি তৈরি করবেন মাটি দিয়ে। তারপর সেই ঘরটির নাম রেখেছিলেন ‘শ্যামলী’। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩৫ খ্রিঃ ৭ই এপ্রিল ইন্দিরা দেবীকে একটি পত্র লিখেছিলেন শান্তিনিকেতনের উত্তরায়ণ থেকে। উক্ত পত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—“একটি মাটির ঘর বানাতে লেগেছি।

জন্মদিনের মধ্যে সেটা হবে বলে কথা আছে। সেই সময়ে ওই ঘরে প্রবেশ করব, তারপরে শেষ পর্যন্ত আর বাসা বদল করব না এই আমার অভিপ্রায়।” রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘শেষ সপ্তক’ (১৯৩৫) কাব্যগ্রন্থের ৪৪ সংখ্যক কবিতায় বলেছেন—

“আমার শেষ বেলাকার ঘরখানি
বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে
তার নাম দেব শ্যামলী।”

৭.১.৩.৬ : কবিতা পরিচয়—আমি

‘শ্যামলী’ কাব্যগ্রন্থের ‘আমি’ কবিতাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় ব্রহ্ম এক। তাই তিনি বিশ্বমানবের মিলনক্ষেত্র রূপে নিজের স্বদেশকেও দেখেছিলেন। কবিতাটিতে কবির কল্পনা বিশ্ব প্রসারী এবং তাঁর চিন্তা অত্যন্ত গভীরে প্রসারিত। ‘রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা’, গ্রন্থে নীহাররঞ্জন রায় ‘আমি’ কবিতা সম্পর্কে লিখেছেন—
“‘শ্যামলীর’ ‘আমি’ কবিতাতেও কবি ব্যক্তিত্ববিহীন অস্তিত্বের গণিততত্ত্বের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অনুভূতির অফুরন্ত রূপ গন্ধময় বর্ণস্পর্শময় ঐশ্বর্যকে দাঁড় করাইয়াছেন; এই কবিতাটিও মানবসত্তার দূরবগাহ বিস্মিত উপলব্ধিতে উদ্দীপ্ত।”(পৃ.২১১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘আমি’ কবিতায় বলেছেন—

“আমারই চेतনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে,
জ্বলে উঠল আলো
পূবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম ‘সুন্দর’,
সুন্দর হল সে।”

আবার একজন কবির আমিত্ব স্বাভাবিকভাবেই তার অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল। কবির নিজস্ব প্রকৃতি জগৎ এ বিচরণ, মর্মভেদী দৃষ্টি দ্বারা সম্ভব। প্রকৃতি সত্তা তাই কবিকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় তারই অস্তিত্বের কথাকে। মানুষ নিজের মতো করে সব কিছু তৈরি করে নিতে পারে। এমন কোন কাজ নেই, যা মানুষ পারে না। তাই নিজস্ব বিবেক দিয়ে সব কিছুর বিবর্তন করতে পারে একমাত্র মানুষই। আর মানুষের কর্মের মধ্যে দিয়ে সেই চেতনা বারবার জাগ্রত হয়েছে। কবিতায় দেখা যায়—

“মানুষের অহংকার-পটেই
বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প।”

মানুষই নিজের আমিত্বের জোরে দেশের জল, মাটি, মানুষের সঙ্গে আত্মিক বন্ধন করেছে। তাই মানবজীবন সম্পর্কে একটা বিশুদ্ধ দার্শনিক বোধ কবির উপলব্ধির নির্যাস রূপে প্রতিফলিত হয়েছে। ‘আমি’ কবিতায় কবি বলেছেন—

“ওদিকে, অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা
মানুষের সীমানায়
তাকেই বলে আমি।”

পরিবেশ-পরিস্থিতিতে ব্যাপক বেকারি এবং বহুবিধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যায় ভারতবর্ষ ছিল জর্জরিত। ফলে ভারতের জাতীয় ঐক্য ব্যাহত না হয়ে পারে না। যখনই কোন অশান্তি দেখা গেছে, তখনই রাজনৈতিক সংকটের আভাস পাওয়া গেছে। যা অনিবার্যভাবেই জনজীবনে বিপুল টালমাটাল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। তাই—

“আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হতো যে মিছে”

মানুষের চিত্তপটেই প্রতিফলিত সমগ্র বিশ্বাত্মা।

“এ বাণী ধ্বনিত হবে না কোনোখানেই—
‘তুমি সুন্দর’
আমি ভালোবাসি।”

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করেন নরের মধ্যেই নারায়ণের বাস। আর মানব-মনোমন্দিরেই দেবতার অধিষ্ঠান। তাই জীব সেবাই হল শিব সেবা। এবং মানবপ্রীতিই হল ঈশ্বরপ্রীতি। যিনি মানুষের ঈশ্বর, তাঁর পূজার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য হল এই হৃদয়ভরা প্রেম। সেইজন্য মানুষকে ভালোবাসলে, তবেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাওয়া যায়। ‘আমি’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—

“বিধাতা কি আবার বসবেন সাধনা করতে
যুগযুগান্তর ধরে?
প্রলয় সন্ধ্যায় জপ করবেন—
কথা কও, কথা কও,
বলবেন বলো, তুমি সুন্দর,
বলবেন বলো, আমি ভালোবাসি।”

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘আমি’ কবিতায় মানুষের কৃতিত্বকে বড় করে তুলে ধরতে চেয়েছেন। ঈশ্বরের পরিবর্তে মানুষের ঘরে চিরসত্য, শান্তি ও সৌন্দর্য বিরাজমান। যার মূলে রয়েছে মানুষের বোধের প্রকাশ। আমি যা কিছু ভালোবাসি, ভোগ করি—তার মধ্যে বিধৃত রয়েছে চিরন্তন বিশ্বসত্তা বা প্রকৃতিস্বরূপ।

৭.১.৩.৭ : আফ্রিকা

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্যগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন রচনা। এই পর্বে ব্যক্তি জীবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খুবই সংকটের মধ্যে দিন কাটিয়েছেন। সেইজন্য শেষ পর্বের কবিতাগুলিতে ব্যক্তিগত উন্মাদনা ও অসহায়তা বারবার প্রকাশ পেয়েছে। আবার কিছু কিছু কবিতার উপর ঘনায়মান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের করুণ ও ভয়াবহ আবহের প্রভাবও পড়েছে। আমাদের আলোচ্য সেরকমই একটি কবিতা হল ‘আফ্রিকা’। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতবর্ষের কবি

হয়েও আফ্রিকা মহাদেশের রাজনৈতিক মতাদর্শের হিংস্ররূপ দেখেছেন। সংকটময় পরিস্থিতিতে দেশ রক্ষা বা ধর্মরক্ষার তাগিদে বহু প্রাণ বলিদানের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। ১৯৩৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর একটি চিঠিতে অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সমসাময়িক আফ্রিকার মর্মান্তিক যন্ত্রণার কথা জানিয়ে লিখলেন—

“আফ্রিকা আজ অত্যাচারিত দেশের চরম বেদনা ভোগ করছে-বোধ হচ্ছে এইবার নাটসী জার্মানেরা ঐ হতভাগ্য দেশের অন্য আর এক প্রান্তে যুদ্ধ বাধাবে, হয়তো স্পেনের ব্যাপারে তাদের যোগদানের উদ্দেশ্যে মরক্কো এবং West Africa-য় পরে আক্রমণ করা। Liberia-কে তো মেরে রেখেচে—ওখানে দ্বিতীয় Abyssinia কাণ্ড যে কোনো দিন ঘটতে পারে। শত লক্ষ নির্যাতিত দুঃখী আফ্রিকাবাসী রাষ্ট্রের সম্মিলিত চক্রান্ত এবং সাংঘাতিক যন্ত্রের আঘাতে জর্জরিত।”

(‘কবির চিঠি কবিকে’, নরেশ গুহ সম্পাদিত, পৃ.১৭৮)

‘আফ্রিকা’ কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমিয় চক্রবর্তীর অনুরোধে লিখেছিলেন। আমরা সবাই জানি, আফ্রিকাকে ‘অন্ধকার মহাদেশ’ বলা হয়। নিরক্ষরেখার পূর্বে, আফ্রিকা মহাদেশে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার নানাবিধ সমস্যাকে কবি ‘আফ্রিকা’ কবিতার মধ্যে তুলে ধরেছেন—

“উদ্ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে
অস্ট্রা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে
নতুন সৃষ্টিকে বারবার করছিলেন বিধ্বস্ত,
তঁার সেই অধৈর্যে ঘন-ঘন মাথা-নাড়ার দিনে
রুদ্ধ সমুদ্রের বাহু
প্রাচী ধরিদ্রীর বুকের থেকে
ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে, আফ্রিকা।”

সেই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক অস্থিরতা কবিকে ভাবিয়ে তুলেছিল। আফ্রিকার সাধারণ মানুষদের অসহায়তা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্থির থাকতে পারেননি। ঔপনিবেশিক শক্তির লালসা-দস্ত ‘আফ্রিকা’ কবিতায় কবি তুলে ধরেছেন। যেখানে সামাজিক দুর্নীতি, ক্ষয় ও সংকটের কথা প্রকটভাবে রূপায়িত। কবিতায় লক্ষ্য করা যায়—

“এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,
এল মানুষ-ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারার অরণ্যের চেয়ে।
সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।
তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্য পথে

পঙ্কিল হল ধূলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে;

দস্যু পায়ের কাঁটা-মারা জুতোর তলায়

বীভৎস কাদার পিণ্ড

চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে।”

কেননা নৈরাজ্য আর শূন্যতার মধ্যে দিয়েই ভারতবর্ষে পায়ে পায়ে এগিয়ে এল ভয়াল দুর্ভিক্ষ ও মুদ্রাস্ফীতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িকতা, দেশভাগ আর দুর্ভিক্ষের মধ্যে দিয়ে গোটা ভারতবর্ষে ভয়াবহ সংকট ঘনীভূত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘আফ্রিকা’ কবিতার শেষদিকে আফ্রিকার জন্য আজকের তথাকথিত সভ্য জগতের পক্ষ থেকে মার্জনা চেয়েছেন আফ্রিকার কাছে—

“আজ যখন পশ্চিমদিগন্তে

প্রদোষকাল ঝঙ্কারবাতাসে রুদ্ধশ্বাস,

যখন গুপ্তগহ্বর থেকে পশুরা বেরিয়ে এল,

অশুভ ধ্বনিতে ঘোষণা করল দিনের অন্তিমকাল,

এসো যুগান্তের কবি

আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে

দাঁড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে,

বলো, ‘ক্ষমা করো’—

হিংস্র প্রলাপের মধ্যে

সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী।”

সবশেষে একথা বলা যায় ব্যক্তিজীবন তো কোনক্রমেই সমাজ-বিচ্ছিন্ন নয়। তাই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের বন্ধনকে দৃঢ় করতে হবে। তাহলেই রাজনীতি, প্রেম, ন্যায়-নীতি, সমকালীন অর্থনীতি ও বহুবিধ সংকটকে গ্রাস করে ব্যক্তি স্বাধীনতা বড় হয়ে উঠবে। আর ব্যক্তির শুভ ইচ্ছাশক্তি ও কর্মশীলতা থেকেই সমাজ, দেশ, বিদেশ অগ্রগতি লাভ করবে। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর কালে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে মানবতার কথা ভেবে আন্দোলন হলে, সকল স্তরের মানুষকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

৭.১.৩.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা—নীহাররঞ্জন রায়

২। রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ—প্রমথনাথ বিশী

৩। রবীন্দ্রজীবনী (দ্বিতীয় খণ্ড)—শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

৪। রবি-রশ্মি—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

- ৫। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—তৃতীয় খণ্ড—সুকুমার সেন
 ৬। রবীন্দ্রনাথ ও কাব্য পরিক্রমা—শ্রী অজিতকুমার চক্রবর্তী
 ৭। আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ—আবু সয়ীদ আইয়ুব

৭.১.৩.৯ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

- ১। ‘সাধারণ মেয়ে’ কবিতার কাব্যসৌন্দর্য আলোচনা করো।
- ২। ‘বাঁশি’ কবিতার কাব্যসৌন্দর্য সম্পর্কে আলোকপাত করো।
- ৩। ‘আমি’ কবিতার কবির কল্পনা বিশ্ব প্রসারী এই সম্পর্কে আলোচনা করো।
- ৪। ‘আফ্রিকা’ কবিতার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে পরিচয় ব্যাখ্যা করো।
- ৫। ‘আফ্রিকা’ কবিতার কাব্য সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করো।

—::—

পর্যায় গ্রন্থ - ২
রক্তকরবী
একক ৪
শিরোনামের তাৎপর্য

বিন্যাসক্রম

- ৭.২.৪.১ : শিরোনামের তাৎপর্য
৭.২.৪.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি
৭.২.৪.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৭.২.৪.১ : শিরোনামের তাৎপর্য

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন নাটকে বারংবার পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, ‘রক্তকরবী’ নাটকের খসড়ায় যেমন, তেমনি প্রকাশের পরেও এই নাটকের রূপান্তর বারংবার করেছেন। যেমন নামকরণের প্রশ্নে। এখানেও তিনি যে বারংবার রূপান্তর করলেন, তার কারণ নাটকটিকে সত্যমূলক করে তোলা।

নাটকটির প্রথম খসড়ায় নামকরণ ছিল ‘যক্ষপুরী’। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে ১৩৩০ বঙ্গাব্দে ১৯ ভাদ্র রবীন্দ্রনাথ একটা চিঠিতে লিখেছেন—

“যক্ষপুরী নাটকটি প্রবাসীর পূজা সংখ্যায় প্রকাশ না করিয়া ফাল্গুন বা চৈত্রমাসে প্রকাশের যদি ব্যবস্থা করেন তবে ভালো হয়। অভিনয়ের পূর্বে আমি উহা বাহির করিতে ইচ্ছা করি না। যথাসময়ে লেখাটি পাঠাইয়া দিব।...”

যক্ষপুরীর আসল পরিচয় পৃথিবীর যে কোনও স্থানে শোষকশ্রেণির শোষণের কেন্দ্রভূমি। তবু যক্ষপুরী বদলে পাণ্ডুলিপিতে তিনি নাটকটির ‘নন্দিনী’ নামকরণের কথা ভাবলেন। এই নন্দিনী নামটিও রূপান্তরিত। যেমন নাটকের প্রথম খসড়ায় রঞ্জনের সঙ্গে মিলিয়ে নন্দিনীর পূর্ব নাম ছিল খঞ্জন। প্রথম খসড়া থেকে দৃষ্টান্ত :

১. কি পাগলী!

ঐ আসচে তোমার খঞ্জন। তাহলে আজকের মত বিশুদাদাকে আর পাওয়া যাবে না। চল চন্দ্রা আমার (আমরা) যাই।

কেন, বেয়াই, খঞ্জনকে পেলে তোমার নেশায় পর্যন্ত খেয়াল থাকে না কেন?

নাটকটির প্রথম খসড়ায় নামকরণ ছিল ‘যক্ষপুরী’। পরে ‘যক্ষপুরীর বদলে পাণ্ডুলিপিতে তিনি নাটকটির ‘নন্দিনী’ নামকরণের কথা ভাবলেন। শেষ পর্যন্ত নাটকের নামকরণ ‘রক্তকরবী’ রাখলেন। ‘রক্তকরবী’ নামকরণের পিছনে দুটি সত্যমূলক ঘটনা আছে। প্রথমটি আমেরিকার হে মার্কেটে শ্রমিকদের রক্ত ঝরার মধ্যে দিয়ে মহান মে দিবসের রক্তরাঙানো পতাকা শ্রমিকদের হাতে হাতে ফিরতো। দ্বিতীয়টি ১৯১৭ এর শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে বিশ্বের প্রথম বিপ্লব, রুশবিপ্লব। আবার রক্তকরবীর লাল রঙ সৌন্দর্য, আনন্দ, প্রাণ, লাভণ্য ও প্রেমের চিহ্ন বহন করে।

দ্বিতীয় খসড়ায় খঞ্জন বা খঞ্জনী পালটে লিখলেন নন্দিন বা নন্দিনী। দ্বিতীয় খসড়া থেকে :

নেপথ্যে : নন্দিন, একথা তুমি ছাড়া আর কেউ মুখে আনতে পারত না। সবার সঙ্গে মিলে আমি ধান কাটব?

তবু কেন নাটকের নামকরণ ‘যক্ষপুরী’ ও নয় ‘নন্দিনী’ও নয়, শেষ পর্যন্ত ‘রক্তকরবী’ রাখলেন? তা ও ঐ নাটকটি সত্যমূলক করবার জন্য? এই পরিবর্তিত নামকরণের পিছনে একটি ছোট ঘটনার কথা আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন একটি পত্রে ব্যক্ত করেছেন—

“আমার ঘরের কাছে একটি লোহা-লঙ্কর জাতীয় আবর্জনার স্তুপ ছিল। তার নীচে একটা ছোট করবী গাছ চাপা পড়ে ছিল। ওটা চাপা দেবার সময় দেখতে পাইনি, পরে লোহাগুলি সরিয়ে আর চারাটুকুর খোঁজ পাওয়া গেল না। কিছুকাল পরে হঠাৎ একদিন দেখি ঐ লোহার জঞ্জাল ভেদ করে একটি সুকুমার করবী শাখা উঠেছে একটি লাল ফুল বুকে করে। নিষ্ঠুর আঘাতে যেন তার বুকের রক্ত দেখিয়ে সে মধুর হেসে প্রীতির সম্ভাষণ জানাতে এল। সে বললো, ভাই, মরিনি তো, আমাকে মারতে পারলে কই?”

‘রক্তকরবী’ নামকরণের পিছনে দুটি সত্যমূলক ঘটনা কাজ করেছে। প্রথমটি হল, আমেরিকার হে মার্কেটে শ্রমিকদের রক্তঝরার মধ্য দিয়ে যে মহান মে দিবস ও দুনিয়ার মজদুরের রক্তরাঙানো পতাকা শ্রমিকদের হাতে হাতে ফিরতো তার লাল রংটি। দ্বিতীয়টি হল ১৯১৭-এর শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে বিশ্বের প্রথম বিপ্লব, রুশবিপ্লব।

আবার সঙ্গে সঙ্গে রক্তকরবীর লাল রঙ সৌন্দর্য, আনন্দ, প্রাণ, লাভণ্য ও প্রেমের চিহ্ন বহন করে। কাজেই নাট্য নামকরণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কোনও ব্যঞ্জনা রাখতে চাননি, বরং সতর্ক করে বলেছেন—

“রক্তকরবীর পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজতে গিয়ে যদি অনর্থ ঘটে তাহলে তার দায় কবির নয়।”

৭.২.৪.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. নাটকটির প্রথমে কি নাম ছিল?
২. রুশ বিপ্লব কত সালে হয়েছিল?
৩. ‘রক্তকরবী’ নাটকের নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

৭.২.৪.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. রবীন্দ্র নাট্যধারা—ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য।
২. বাংলা নাটকের ইতিহাস—ড. অজিতকুমার ঘোষ।
৩. রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ—শ্রী প্রমথনাথ বিশী।
৪. রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা—শ্রী অশোক সেন।
৫. রক্তকরবী : গানের ভিতর দিয়ে—শ্রীনাথ চক্রবর্তী।

একক ৫

চরিত্র নির্মাণে নাট্যকারের দায়বদ্ধতা

বিন্যাসক্রম

- ৭.২.৫.১ : ভূমিকা
৭.২.৫.২ : মকররাজ
৭.২.৫.৩ : রঞ্জন
৭.২.৫.৪ : ফাগুলাল
৭.২.৫.৫ : গোসাইজী
৭.২.৫.৬ : মোড়ল
৭.২.৫.৭ : বিশু
৭.২.৫.৮ : সর্দার
৭.২.৫.৯ : চন্দ্রা
৭.২.৫.১০ : নন্দিনী
৭.২.৫.১১ : আদর্শ প্রশ্নাবলি
৭.২.৫.১২ : সহায়ক প্রশ্নাবলি

৭.২.৫.১ : ভূমিকা

ম্যাক্সিম গোর্কি, টলস্টয়, চেকভ প্রমুখরা সাহিত্যে বাস্তবতার ছবি আঁকার যে দায়বদ্ধতা তাঁদের রচনায় দেখিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথও রক্তকরবীতে সেই দায়বদ্ধতাতেই পৌঁছেছেন। এই নাটকের মধ্যে যাঁরা রূপক সংকেতের ব্যঞ্জনা খুঁজতে চান তাঁদের আমরা ভালো করে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যগুলি আর একবার পড়তে বলি। এই নাটকের চরিত্রগুলি নাট্যাঙ্গিকের সংকেত ভেঙে কিভাবে বেরিয়ে আসছে, সেটা দেখানো যাক।

৭.২.৫.২ : মকররাজ

তাল তাল সোনার সঞ্চয়ের উপর দাঁড়িয়ে আজ উপলব্ধি করে, সে যৌবনকেই হত্যা করেছে, বলে —“মরা যৌবনের অভিশাপ আমাকে লেগেছে।” রবীন্দ্রনাথ রাজার মধ্যে দুই বিপরীত মেরুর টানাপোড়েন দেখিয়েছেন। একদিকে ধনের মত্ততায় সে দানব, কৃষিজীবী মানুষদের গ্রাম থেকে নিয়ে এ যেন যক্ষপুরীর অন্ধকারে ‘দশ-পাঁচিশের

ছকে' পরিণত করে। এখানে সে যেন রাবণের মতো ভয়ঙ্কর। আবার নন্দিনীর সংস্পর্শে এসে তার শুষ্ক মরণভূমির চিত্তে প্রেমের অরুণরাগ ছড়িয়ে পড়ে। ঈর্ষায় হত্যা করে নন্দিনীর প্রেমিক রঞ্জনকে, বৃদ্ধদের মতো বিলীন করে দেয় নন্দিনীর প্রিয় কিশোরকে। আর দুখজাগানিয়া নন্দিনীর আপনজন বিশুকে করে বন্দী। এ হল তার বিভীষণ-সত্তা। নাট্যপরিচয় অংশে রবীন্দ্রনাথ রত্নাকরের উদাহরণ দিয়ে বললেন, 'ধর্ষণ বিদ্যার প্রভাব এড়িয়ে কর্ণবিদ্যায় যখন দীক্ষা নিলেন তখনই সুন্দরের আশীর্বাদে তাঁর বীণা বাজল।'

মকররাজ ধনের মত্ততায় দানব, কৃষিজীবী মানুষদের গ্রাম থেকে নিয়ে যক্ষপুরীর অন্ধকারে 'দশ-পাঁচিশের ছকে' পরিণত করে। ঈর্ষায় হত্যা করে নন্দিনীর প্রেমিক রঞ্জনকে, বিলীন করে দেয় কিশোরকে, আর দুখ জাগানিয়া নন্দিনীর আপনজন বিশুকে করে বন্দী। এ হল তার বিভীষণ-সত্তা।

মকররাজ আসলে পৃথিবীর যে কোনও পুঁজিপতির মতোই বাস্তবচরিত্র।

৭.২.৫.৩ : রঞ্জন

আদ্যন্ত প্রেমিক চরিত্র। বিপ্লবের নেতৃত্ব সেই দিয়েছে। নন্দিনীর প্রতিবাদী সত্তার মূল শক্তি সে। কাজেই তাকে বন্দী হতে হয়, নিহত হতে হয়।

৭.২.৫.৪ : ফাণ্ডলাল

গোকীর 'মাদার' উপন্যাসে মাতাল শ্রমিকের জলছবি ফাণ্ডলাল। কিন্তু সে ই একদিন প্রকৃত বিপ্লবী হয়ে উঠল। লড়াকু শ্রমিকে উত্তীর্ণ হল।

৭.২.৫.৫ : গৌসাইজী

শোষকশ্রেণি যে ধর্মকে হাতিয়ার করে শোষিতদের দুর্বল করে রাখে, তার প্রমাণ গৌসাইজী। এটি সত্যমূলক চরিত্র। তার সংলাপের মধ্যে এমন বাস্তবভাবে শ্রেণিশাসনের দৃষ্টান্ত খুব কম জায়গাতেই পাওয়া গেছে। গৌসাইজী ধর্মের কথা বলে বটে কিন্তু ফৌজ রাখারও পরামর্শ দেয়।

৭.২.৫.৬ : মোড়ল

রবীন্দ্রনাথের কালে এবং একালের মোড়লের মতো দালাল, চাটুকার, লোভী ও দুর্নীতিপরায়ণ চরিত্র অজস্র আছে। এরাও ধনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে জিইয়ে রাখতে চায়। কাজেই এই চরিত্রটি নির্ভেজাল বাস্তব।

৭.২.৫.৭ : বিশু

একটি দ্বন্দ্বমুখর চরিত্র। নন্দিনীকে ঘিরে রঞ্জনের প্রতি তার ঈর্ষা বাস্তবের নিখুঁত রূপায়ণ। যেন ধীরে ধীরে আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নাট্যশেষে সামনের সারিতে উঠে এল।

৭.২.৫.৮ : সর্দার

সর্বকালে, সর্বদেশে শাসকশ্রেণি শোষণের হাতিয়ার হিসেবে সর্দারদের ব্যবহার করে।

৭.২.৫.৯ : চন্দ্রা

ফাগুলালের স্ত্রী। আদ্যন্ত গৃহসুখপরায়ণা নারী। যক্ষপুরীর শ্রমিক জীবন ছেড়ে গ্রামে ফিরে যেতে উন্মুখ। স্বামীকে বলে—“কাজ ছেড়ে দাও না, চল না ঘরে ফিরে।” এমন আটপৌরে নারী চরিত্র রবীন্দ্রনাটকে খুব বেশি নেই।

৭.২.৫.১০ : নন্দিনী

ঈশানী পাড়ার সবাই তাকে নন্দিন বলে ডাকে। গ্রামের ছেলে কল্লু তাকে দেখার জন্য ঘাটের পাড়ে বসে থাকত। অনুপ, শঙ্কু বিশু—কে না তার রূপে মুগ্ধ ছিল। এর মধ্যে বিশু বিয়ে করে ফেলল, সোনার আশায় যক্ষপুরীতে চলে এল গুপ্তচরের কাজ নিয়ে, কিন্তু সেই যক্ষপুরীতে নন্দিনী হাজির হবার পর বিশু পালটে গেল।

ঈশানী পাড়ার সবাই তাকে নন্দিন বলে ডাকে। নন্দিনী ভয়কে জয় করেছিল। তার বাস্তব রূপের কাছে মকররাজ হেরে গেল, মুক্তি পেল বন্দীশালার সাধারণ মানুষ। নন্দিনী আসলে সত্যমূলক চরিত্র।

অর্থাৎ যক্ষপুরীতে নন্দিনী পৌঁছে আসলে শ্রমিকদের আবার তাদের পল্লীজীবন ফিরিয়ে দিতে চাইল। তার সব আচরণের মধ্যে বাস্তব নারীর উপস্থিতি।

নন্দিনী ভয়কে জয় করেছিল। তাই সে রাজাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে—“এই রইলুম দাঁড়িয়ে। কি করতে পার কর।” নারীর এই বাস্তব রূপের কাছে হেরে গেল মকররাজ, হেরে গেল বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক। মুক্তি পেল বন্দীশালার সাধারণ মানুষ।

নন্দিনী সত্যমূলক চরিত্র। তার নাম আছে, গ্রামের পরিচয় আছে, তার প্রেমের মধ্যে সততা আছে এবং বিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়ার শক্তি আছে। তাই সে সাংকেতিক নাটকের চরিত্র নয়, সমাজ-বাস্তবধর্মী নাটকের মানবী চরিত্র।

৭.২.৫.১১ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. মকররাজ কাকে বন্দী করেছিল?
২. মকররাজ ঈর্ষায় কাকে হত্যা করেছিল?
৩. নন্দিনীকে সবাই কি বলে ডাকত?
৪. ‘রক্তকরবী’ নাটকে তিনটি চরিত্রের নাম বল।

৭.২.৫.১২ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. রবীন্দ্র নাট্যধারা—ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য।
২. বাংলা নাটকের ইতিহাস—ড. অজিতকুমার ঘোষ।
৩. রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ—শ্রী প্রমথনাথ বিশী।
৪. রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা—শ্রী অশোক সেন।
৫. রক্তকরবী : গানের ভিতর দিয়ে—শ্রীনাথ চক্রবর্তী।

একক ৬

রূপক সাংকেতিক নাটক

বিন্যাসক্রম

- ৭.২.৬.১ : ভূমিকা
৭.২.৬.২ : বাস্তব নাটক
৭.২.৬.৩ : ‘একই দেহে রাবণ ও বিভীষণ’
৭.২.৬.৪ : ‘রক্তকরবী’—সত্যমূলক সৃষ্টি
৭.২.৬.৫ : ‘রক্তকরবী’ রচনার প্রেরণা
৭.২.৬.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলি
৭.২.৬.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৭.২.৬.১ : ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথের নাটক রচনায় বিষয় ভাবনার চেয়ে আঙ্গিক-চর্চার প্রতি যে বেশি আন্তরিকতা ছিল, তা গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, রূপক-সাংকেতিক নাটক, ঋতুনাট্য এবং নৃত্যনাট্য সব ক্ষেত্রেই সত্য। ‘শারদোৎসব’ থেকে ‘রক্তকরবী’ পর্যন্ত সবগুলি নাটককে রূপক অথবা সাংকেতিক নাটক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। কেউ কেউ ‘রথের রশি’ ও ‘তাসের দেশ’ পর্যন্ত এই রীতি লক্ষ করেছেন। এর মধ্যে ‘রাজা’ এবং ‘ডাকঘর’ সরাসরি সাংকেতিক নাটক। আবার ‘অচলায়তন’ ও ‘ফাল্গুনী’ রূপক নাটক। রূপকে বস্তুমুখিতা বেশি, সংক্ষেপে ব্যঞ্জনা মাত্রা যুক্ত। রবীন্দ্রনাথের আগেই বিদেশে এই ধরনের নাট্যরীতি নিয়ে নানা চর্চা হয়েছে। সিঞ্জ, শ্লেগেল এবং মেটারলিঙ্কের নাটকগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল।

‘শারদোৎসব’ থেকে ‘রক্তকরবী’ পর্যন্ত সবগুলি নাটককে রূপক অথবা সাংকেতিক নাটক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এর মধ্যে ‘রাজা’ এবং ‘ডাকঘর’ সাংকেতিক নাটক ও ‘অচলায়তন’ এবং ‘ফাল্গুনী’ রূপক নাটক।

৭.২.৬.২ : বাস্তব নাটক

‘রক্তকরবী’র ঠিক আগে লেখা ‘মুক্তধারা’ নাটকের বিষয়বস্তু, যন্ত্রের ওপর রবীন্দ্রনাথের বিতৃষ্ণা। কবি যন্ত্রসভ্যতার বিরোধী ছিলেন না ঠিকই, কিন্তু যে যন্ত্রের দ্বারা মুক্তধারার উপরে বাঁধ নির্মিত হওয়ায় শিবতরাই-এ কৃষিজীবী মানুষ চরম সংকটের মধ্যে পড়ে, সেই যন্ত্রসভ্যতা রবীন্দ্রনাথ মেনে নেননি। তাই অভিজিৎ তার প্রাণ দিয়ে মুক্তধারার বাঁধ ভেঙে দিল। কাজেই এ নাটকে এমন বাস্তব সমস্যা সরাসরি দেখানো হয়েছে, যার ফলে রূপক-সংকেতে, এর পরিচয় খোঁজা বৃথা।

৭.২.৬.৩ : ‘একই দেহে রাবণ ও বিভীষণ’

রবীন্দ্রনাথ নিজেও জানতেন ‘রক্তকরবী’ নাটকে রূপক-প্রতীক-সংকেত নিয়ে নানা আলোচনার খবর। এ জন্য তিনি নিজেই বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়েছেন। ১৯৩১ সালে একটি অভিভাষণে এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করে দর্শক-শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

“আপনারা প্রবীণ। চশমা বাগিয়ে পালাটির ভিতর থেকে একটা গুট অর্থ খুঁটিয়ে বের করবার চেষ্টা করবেন। আমার নিবেদন যেটা গুট তাকে প্রকাশ্য করলেই তার সার্থকতা চলে যায়। হৃৎপিণ্ডটা পাঁজরের আড়ালে থেকেই কাজ করে। তাকে বের করে তার কার্যপ্রণালী তদারক করতে গেলে কাজ বন্ধ হয়ে যাবে।”

এই উক্তি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রচলিত অর্থে কোনদিনই নাটক না লেখায় ‘রক্তকরবী’তে সংলাপের ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যঞ্জনার আশ্রয় নেওয়া হল। এটি খাঁটি রূপক নাটকও নয়, সাংকেতিক নাটকও নয়। বরং এটি একটি সমাজ-বাস্তবাত্মক নাটক। সেই জন্যই কবি সরাসরি বলেছেন—

‘রক্তকরবী’ খাঁটি রূপক নাটকও নয়, সাংকেতিক নাটকও নয়। বরং এটি একটি সমাজ-বাস্তবাত্মক নাটক। রাবণ ও বিভীষণ একই, তারা সহোদর ভাই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—“আমার স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ, সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে।”

“আদি কবির সাত কাণ্ডে স্থানাভাব ছিল না। এই কারণে লক্ষ্যপূরীতে তিনি রাবণ ও বিভীষণকে স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু আভাস দিয়েছিলেন যে তারা একই, তারা সহোদর ভাই। একই নীড়ে পাপ ও সেই পাপের মৃত্যুবাণ লালিত হয়েছে। আমার স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ, সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে।”

“বাল্মীকির রামায়ণকে ভক্ত পাঠকেরা সত্যমূলক বলে স্বীকার করেন। আমার পালাটিকে যাঁরা শ্রদ্ধা করে শুনবেন তাঁরা জানবেন এটিও সত্যমূলক।”

৭.২.৬.৪ : রক্তকরবী—সত্যমূলক সৃষ্টি

রামায়ণের উপমাটুকু রবীন্দ্রনাথ রেখেছেন এবং ‘রক্তকরবী’র রাজাকে রাবণের প্রতিরূপ ভেবেও তিনি তাকে রাবণের মতো দশমুণ্ড ও বিশ হাত দেননি। তা থেকেই বোঝা যায়, রূপক নয়, ‘রক্তকরবী’ নাটকটিকে তিনি সত্যমূলকই করতে চেয়েছেন।

নন্দিনীর ক্ষেত্রেও এই সত্যমূলকতা স্পষ্ট। ‘নাট্যপরিচয়’ অংশে তিনি স্পষ্ট বলেছেন—

‘এইটি মনে রাখুন, রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি। কাজেই রক্তকরবী নাটকটি রূপক নাটক নয়, সাংকেতিক নাটকও নয়, এটি সমাজ-বাস্তবাত্মক, কবির জ্ঞান-বিশ্বাস অনুযায়ী সত্যমূলক নাটক।’

৭.২.৬.৫ : ‘রক্তকরবী’ রচনা প্রেরণা

‘রক্তকরবী’ নাটকের বিষয়বস্তু সত্য ঘটনা নির্ভর। ১৯২২-এ আমেরিকা ঘুরে এসে ১৯২৩-এ গ্রীষ্মকালে

কবি শিলং গেলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা হল ড: রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের। বিশিষ্ট অর্থনীতিক রাধাকমল কিছুদিন আগে আমেদাবাদে শ্রমিক-মালিকদের সঙ্গে দেখা করে যে সব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, তা রবীন্দ্রনাথকে শোনালেন। তাঁর বর্ণনায় শ্রমজীবী মানুষদের করুণ দুঃখের যে ছবি তার সঙ্গে ‘রক্তকরবী’ রচনার ঠিক আগে মাদ্রাজ, কলকাতা, জামসেদপুর ও আসামে যে শ্রমিক ধর্মঘট হয় তার সংবাদ সামনে রেখে রবীন্দ্রনাথ ‘রক্তকরবী’ লেখেন। কাজেই এই নাটকটি অবশ্যই সাংকেতিক নাটক নয়, সত্যমূলক নাটক।

৭.২.৬.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. ‘রক্তকরবী’ নাটকটি কত সালে প্রকাশিত হয়েছিল?
২. রবীন্দ্রনাথের দুটি সাংকেতিক ও দুটি রূপক নাটকের নাম লেখ?
৩. ‘রক্তকরবী’ কি ধরনের নাটক?

৭.২.৬.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. রবীন্দ্র নাট্যধারা—ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য।
২. বাংলা নাটকের ইতিহাস—ড. অজিতকুমার ঘোষ।
৩. রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ—শ্রী প্রমথনাথ বিশী।
৪. রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা—শ্রী অশোক সেন।
৫. রক্তকরবী : গানের ভিতর দিয়ে— শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী।

একক ৭

নাট্যপরিণতি

বিন্যাসক্রম

- ৭.২.৭.১ : নাট্যপরিণতি
৭.২.৭.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি
৭.২.৭.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি
-

৭.২.৭.১ : নাট্যপরিণতি

রক্তকরবী যে সত্যমূলক নাটক তার প্রমাণ আছে এ নাটকের বিভিন্ন ঘটনায়, গানে, সংলাপে।

(ক) নাটকের যে নাচগান আছে তার মধ্যে শ্রমিক জীবনের সমস্যা হাজির। যেমন, খোদাই নৃত্য, হাতুড়ী নৃত্য, ফসল কাটার গান।

(খ) অনুপ-উপমনু-শক্লুর যোল ঘণ্টার শ্রমদান।

(গ) রঞ্জন-কিশোরের জীবন-উৎসর্গ।

রক্তকরবী নাটকের পরিণতি অংশ নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। একথা সত্য যে ধনকুবেররা কখনও স্বেচ্ছায় তাদের ধনসম্পদ বিলিয়ে দেয় না। রক্তকরবীর মকররাজ হাজার বছরের সাধনায় যে ধন সঞ্চয় করেছে নাটকের শেষে তার প্রতি মকররাজের বিতৃষ্ণা কতটা সত্যমূলক এ প্রশ্ন উঠে থাকে। যে বন্দীশালা সে নিজের হাতে গড়ে তুলেছিল, সেই বন্দীশালা সে যে ভাঙল, তা কতটা বাস্তবসম্মত— এই প্রশ্ন উঠতেই পারে।

একথা সত্য, রবীন্দ্রনাথ মার্কসবাদী ছিলেন না। কিন্তু তিনি লেনিনের মতোই বুঝেছিলেন— "Imperialism is the highest stage of Capitalism". মকররাজের বিভিন্ন সংলাপের মধ্যে ধনিক শ্রেণির সেই ভয়ঙ্কর রূপের পরিচয় আঁকতে কবি দ্বিধা করেননি। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজার দুটি সংলাপ উদ্ধার করতে পারি—

ক. নন্দিনী : তারপরে কী হল তার? বলতেই হবে, চুপ করে থেকো না।

রাজা : বুদবুদের মতো সে লুপ্ত হয়ে গেছে।

খ. ... তোমাকে আমার মুঠোর ভিতর পেতে চাচ্ছি, কিছুতেই ধরতে পারছিনে। আমি তোমাকে উলটিয়ে পালটিয়ে দেখতে চাই, না পারি তো ভেঙ্গে চুরে ফেলতে চাই।

কিন্তু নাটকের শেষে রাজাই পাল্টে গেল।

রাজা : কি হয়েছে তোমাদের? কী ধরতে বেরিয়েছ?

ফাণ্ডালাল : বন্দীশালার দরজা ভাঙতে, মরি তবু ফিরব না।

রাজা : ফিরবে কেন? ভাঙ্গার পথে আমিও চলেছি।

ঐ তার প্রথম চিহ্ন—আমার ভাঙ্গা ধজা,

আমার শেষ কীর্তি।

রাজা-নন্দিনী-শ্রমিক খোদাইকররা সর্দারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলল। ফাণ্ডালাল একা যক্ষপুত্রীর চাতালের উপর দাঁড়িয়ে। সর্দারের রাজহত তলিয়ে যাচ্ছে—বিলীন হচ্ছে রণডঙ্কার শব্দ। আর শোনা যাচ্ছে যুগাবসানে ফসল কাটার গান। মার্কসীয় বিচারে, পুঁজিপতিরা কখনও স্বেচ্ছায় শ্রমজীবী মানুষকে তার সঞ্চয়ের অংশীদার করতে পারে না। সেজন্যই শ্রেণি বিভক্ত সমাজে শ্রেণি সংগ্রাম অনিবার্য। রবীন্দ্রনাথ যে তা জানতেন না, আমরা তা মনে করি না। কিন্তু যেহেতু কবি মার্কসবাদী ছিলেন না, তাই তিনি শ্রেণিসমন্বয় সম্ভব বলে মনে করেছিলেন। কোনও সোস্যাল রিয়ালিস্ট লেখক ‘রক্তকরবী’ লিখলে এর পরিণতিটি অন্যতর হত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শোষক-শোষিতের, মালিক-শ্রমিকের মধ্যকার বিরোধের ভিন্ন পথে সমাধান চাইলেন। কাজেই কারও কারও পক্ষে মকররাজ-নন্দিনী-বিশু সমন্বিত শক্তির দ্বারা ‘সর্দারতন্ত্রের’ অবসান মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। এজন্য তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। আবার রবীন্দ্রনাথ ‘রথের রশি’তে যে প্রক্রিয়ায় উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে তুলাদণ্ডের ভারসাম্য এনেছেন, আগে লেখা নাটক ‘রক্তকরবী’তেও সেই দর্শনটি ব্যবহার করেছেন। সোস্যাল রোম্যান্টিক রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় এর বাইরে হওয়া সম্ভব ছিল না।

‘রক্তকরবী’র মকররাজ হাজার বছরের সাধনায় যে ধন সঞ্চয় করেছে, যে বন্দীশালা নিজের হাতে গড়ে তুলেছিল, সেই বন্দীশালা সে যে ভাঙল, তা কতটা বাস্তব সম্মত। মার্কসীয় বিচারে, পুঁজিপতিরা কখনও স্বেচ্ছায় শ্রমজীবী মানুষকে তার সঞ্চয়ের অংশীদার করতে পারে না। সংগ্রাম অনিবার্য। কোনও সোস্যাল রিয়ালিস্ট লিখলে ‘রক্তকরবী’ নাটকটির পরিণতিটি কিন্তু অন্যরকম হত।

৭.২.৭.১ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. ‘রক্তকরবী’ নাটকে শোষক শ্রেণির প্রতিনিধি কে?
২. ‘রক্তকরবী’ নাটকে শোষিত কারা?
৩. ‘রক্তকরবী’ নাটকের পরিণতির শৈল্পিক দিকটি বিশ্লেষণ করো।
৪. রক্তকরবী নাটকের নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।
৫. “আমার স্বপ্নায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি একই দেহে রাবণ ও বিভীষণ, সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে।”—রক্তকরবী নাটক প্রসঙ্গে এই মন্তব্যের যৌক্তিকতা বিচার করো।
৬. রক্তকরবী নাটকে নন্দিনী চরিত্রের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।
৭. রূপক-সাংকেতিক নাটক হিসাবে রক্তকরবীর সার্থকতা বুঝিয়ে দাও।
৮. রাজা ও রঞ্জন চরিত্রের মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনা লিপিবদ্ধ করো।

৯. রক্তকরবী নাটকে বিশুপাগলা চরিত্র সংযোজনের গুরুত্ব নির্দেশ করো।
১০. কৰ্ষণজীবী ও আকৰ্ষণজীবী সভ্যতার দ্বন্দ্ব রক্তকরবী নাটকে কিভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তা আলোচনা দ্বারা পরিস্ফুট করো।
১১. রক্তকরবী নাটকে সংগীত ব্যবহারের গুরুত্ব আলোচনা করো।

৭.২.৭.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. রবীন্দ্র নাট্যধারা—ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য।
২. বাংলা নাটকের ইতিহাস—ড. অজিতকুমার ঘোষ।
৩. রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ—শ্রী প্রমথনাথ বিশী।
৪. রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা—শ্রী অশোক সেন।
৫. রক্তকরবী : গানের ভিতর দিয়ে— শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী।

পর্যায় গ্রন্থ-৩

গল্পগুচ্ছ (নির্বাচিত ১০টি গল্প)

একক ৮

‘গল্পগুচ্ছ’ : বর্গীকরণ—সাধারণ পরিচিতি

বিন্যাসক্রম

৭.৩.৮.১ : প্রেক্ষাপট

৭.৩.৮.২ : ‘গল্পগুচ্ছ’ : বর্গীকরণ—সাধারণ পরিচিতি

৭.৩.৮.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৭.৩.৮.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৭.৩.৮.১ : প্রেক্ষাপট

কবিচিন্তার নব জন্মগ্রহণে ‘জীবনস্মৃতি’ যেখানে খাসমহলের দরজায় এসে শেষ হয়েছিল ঠিক সেই সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের ‘গল্পগুচ্ছ’র শুভ উদ্বোধন। রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর মানস-জগতে বিভিন্ন সময়ের সুখ-দুঃখ, বিলাস-বেদনা, আশা আকাঙ্ক্ষাকে ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করেছেন তাই তাঁর ছোটগল্পগুলিতে বাস্তব রূপ লাভ করেছে। সাজাদপুর-শিলাইদহ-কুষ্টিয়া-ত্রিবেণী তীর্থে প্রকৃতি ও মানুষের যে মহামিলন সৃষ্টি হয়েছিল, পল্লীজীবনের নানা টুকরো খণ্ডচিত্র কবিকে নাড়া দিয়েছিল তারই রূপ অঙ্কিত হয়েছে তাঁর এই পর্বের ছোট গল্পগুলিতে রবীন্দ্রনাথ নিজেই নানাভাবে সেকথা ‘ছিন্নপত্রে’-র বিভিন্ন চিঠিতে স্বীকার করেছেন—‘অসংখ্য ছোট ছোট লিরিক লিখেছি, বোধহয় পৃথিবীর সদ্য কোন কবি এত লেখেননি। কিন্তু আমার অবাক লাগে, তোমরা যখন বল

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলিতে তাঁর মানসজগতের সুখ-দুঃখ, বিলাস-বেদনার খণ্ড চিত্র ধরা পড়েছে। জমিদারী পরিদর্শনের সূত্রে পদ্মা বিধৌত জনসমাজের সঙ্গে জটিলতর জীবনের ছবিও অঙ্কন করেছেন।

যে, আমার গল্পগুচ্ছ গীতধর্মী। একসময় ঘুরে বেড়িয়েছি বাংলার নদীতে নদীতে, দেখেছি বাংলার পল্লীর বিচিত্র জীবনযাত্রা। একটি মেয়ে নৌকো করে শ্বশুরবাড়ী চলে গেল, তার বন্ধুরা ঘাটে নাইতে নাইতে বলাবলি করতে লাগল, আহা যে পাগলাটে মেয়ে, শ্বশুরবাড়ী গিয়ে ওর কিনা জানি দশা হবে। কিম্বা ধরো একটা খ্যাপাটে ছেলে সারা গ্রাম দুষ্টুমির চোটে মাতিয়ে বেড়ায়, তাকে হঠাৎ একদিন চলে যেতে হল শহরে তার মামার কাছে। এইটুকু চোখে দেখেছি, বাকিটা নিয়েছি কল্পনা করে। একে কি তোমরা গান জাতীয় পদার্থ বলবে? আমি বলবো আমার গল্পে বাস্তবের অভাব কখনো ঘটেনি। যা কিছু লিখেছি, নিজে দেখেছি, মর্মে অনুভব করেছি, সে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। গল্পে যা লিখেছি, তার মূলে আছে আমার অভিজ্ঞতা আমার নিজের দেখা। তাকে গীতধর্মী বললে ভুল করবে।... ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে, আমি যে ছোট ছোট গল্পগুলো লিখেছি বাঙালী সমাজের বাস্তব জীবনের ছবি তাতেই প্রথম ধরা পড়ে।’

জমিদারী পরিদর্শনের সূত্রে পদ্মা বিধৌত জন সমাজের সঙ্গে কবির নিবিড় যোগ সম্ভব হয়েছিল। পদ্মার চলমান বোটে অবস্থান করে তিনি স্থলভূমির বিচিত্র খণ্ডিত জীবনের চিত্র অবলোকন করেছেন, আর এই ছোট ছোট দৃশ্যগুলি মহৎ ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে—‘আজ খুব ভোরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনছিলুম, ঘাটে মেয়েরা উলু দিচ্ছে। শুনে মনটা কেমন হঠাৎ বিকল হয়ে গেল, অথচ তার কারণ ভেবে পাওয়া শক্ত। বোধহয় এই রকমের একটা আনন্দধ্বনিকে হঠাৎ অনুভব করা যায়, পৃথিবীতে একটা বৃহৎ কর্মপ্রবাহ চলছে, যার অধিকাংশের সঙ্গেই আমার যোগ নেই, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ তোমার কেউ নয়, অথচ তাদের কত কাজকর্ম, সুখ-দুঃখ, উৎসব আনন্দ চলছে। কী বৃহৎ পৃথিবী। কী বিপুল মানবসংসার!’ এইভাবে রবীন্দ্রনাথের বাস্তব অভিজ্ঞতার দৃশ্য-পটভূমি, সেখানকার মানুষ তাদের বিভিন্ন আচার আচরণ, প্রকৃতির সঙ্গে তাদের যোগ ইত্যাদি সবই তাঁর ছোটগল্পগুলিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

পদ্মা-বিধৌত পল্লীজীবনের রোমান্টিক ছবি ও জীবন ব্যাকুলতার চিত্র অঙ্কনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দায়িত্ব শেষ করেননি। পল্লীজীবনের সঙ্গে নাগরিক পরিবেশের জীবন-ধর্মেরও তুলনা করেছেন। জীবনের মর্মে, গভীরে প্রবেশ করে জটিলতর জীবনের ছবিও অঙ্কন করেছেন। আবেগের প্রচণ্ড আলোড়নে যন্ত্রণাদীর্ণ মানুষের হতাশাকে তিনি দেখেছেন, ভালবাসার অপমান-অবসান, রোমান্টিক প্রণয়ের বেদনা-অভিসম্পাত সবই তিনি অঙ্কন করেছেন তাঁর ছোটগল্পগুলিতে। আর এইভাবেই রবীন্দ্র-ছোটগল্পগুলি যথার্থ মানবজীবনের ও যুগশ্রবণের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে।

৭.৩.৮.২ : ‘গল্পগুচ্ছ’: বর্গীকরণ—সাধারণ পরিচিতি

সমালোচকগণ রবীন্দ্রছোটগল্পের নানারকমের বর্গীকরণ করেছেন। এই বর্গীকরণগুলি যেমন কালানুক্রমিক তেমনি চরিত্রমুখ্যতা, ঘটনামুখ্যতা ও ভাবমুখ্যতা সাপেক্ষেও লক্ষ্য করা গেছে। আবার অনেকে মনে করেন রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন পত্রপত্রিকার চাহিদা অনুসারে এই ছোটগল্পগুলি রচনা করেছিলেন। ফলে এই দৃষ্টিকোণ থেকেও গল্পগুলির চরিত্রবৈশিষ্ট্য ধরা পড়তে পারে। গল্পগুচ্ছের প্রথম গল্প ‘ঘাটের কথা’ অন্যদিকে ‘রাজপথের কথা’ রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প সংকলন গ্রন্থের প্রথম গ্রন্থ। এর প্রায় সাতবছর পরে ১২৯৮ বঙ্গাব্দে ‘হিতবাদী’ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের যথার্থ সূচনা বলে অনেকে মনে করেন।

‘হিতবাদী’ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ সাতটি ছোটগল্প লিখেছিলেন—‘দেনা পাওনা’, ‘রামকানাইয়ের নিবুদ্ধিতা’, ‘তারাপ্রসঙ্গের কীর্তি, পোস্টমাস্টার’, ‘ব্যবধান’, ‘গিল্লী’ ও ‘খাতা’। আমাদের পাঠ্য ‘দেনাপাওনা’ ও ‘পোস্টমাস্টার’ এই পর্বের উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প। প্রথম গল্পটি নিতান্তই বিবৃতি সর্বস্ব হলেও সমকালীন সমাজের সমালোচনা অত্যন্ত বাস্তব সচেতন দৃষ্টিতে করা হয়েছে। পণপ্রথায় জর্জরিত এক বধু এবং তার অসহায় পিতার দুঃসহ যন্ত্রণা রবীন্দ্রনাথ সুকৌশলে আমাদের কাছে হাজির করেছেন। গল্পশিল্পের বিচারে ‘পোস্টমাস্টার’ গল্পটিকে সমালোচকগণ এই পর্বের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে চিহ্নিত করেছেন। এটি পদ্মা তীরবর্তী পল্লী বাংলার এক বালিকার ‘বয়ঃসন্ধিলগ্নে হৃদয় উন্মীলনের বেদনা বিধুর’ কথাশিল্প।

‘হিতবাদী’ পর্বের গল্প থেকে বেরিয়ে এসে ‘সাধনা-ভারতী’ পর্বে রবীন্দ্র ছোটগল্প আরও গভীরতর বিষয়কে আহরণ করেছে। আরও সংহত শিল্পরূপ লাভ করেছে। এই সময়ের গল্পগুলির মধ্যে ‘কঙ্কাল’ ‘অতিথি’, ‘ত্যাগ’,

‘ছুটি’, ‘মেঘ ও রৌদ্র’, ‘ক্ষুধিত পাষণ’, ‘কাবুলিওয়ালা’, ‘শাস্তি’, ‘সমাপ্তি’ প্রভৃতি তাঁর অন্যতম সেরা ছোটগল্প। ১২৯৯ বঙ্গাব্দের সাধনা পত্রিকায় (পৌষ সংখ্যায়) ‘ছুটি’ গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। এক পল্লীশিশুর সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বকে আলোচ্য গল্পে তুলে ধরা হয়েছে, শহরের কৃত্রিমতায় এক পল্লী শিশুর অকাল ‘মেঘ ও রৌদ্র’ এবং ১৩০২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র-কার্তিক সংখ্যায় ‘ক্ষুধিত পাষণ’ গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম গল্পটিকে ইংরেজ আমলের এদেশের মানুষদের বিপর্যস্ত ও অসহায় অবস্থা রূপায়িত হয়েছে। ইংরেজ প্রভুদের দোদard প্রতাপের ফলে স্বদেশীয় মানুষদের যে দুঃসহ অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল তারই প্রেক্ষাপটে এই সমস্যামূলক গল্পটি রচিত হয়েছে। শেষোক্ত গল্পটি একটি রোমান্টিক স্বপ্নের মতো, যেখানে স্নায়বিক টেনসন টান টান করে ধরে রেখেছে সমস্ত গল্পের অবয়বকে।

রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের প্রথম গল্প ‘ঘাটের-কথা’, অন্যদিকে ‘রাজপথের কথা’ রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প সংকলন গ্রন্থের প্রথম গ্রন্থ। ‘হিতবাদী’ পর্বের উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প ‘দেনাপাওনা’ ও ‘পোস্টমাস্টার’। ‘সাধনা-ভারতী’ পর্বের উল্লেখযোগ্য গল্পের মধ্যে কঙ্কাল, অতিথি, ছুটি, মেঘ ও রৌদ্র, ক্ষুধিত পাষণ ইত্যাদি। সবুজপত্র পর্বে তিনি জীবনের সমালোচকও। নারী ও পুরুষ দুয়ের সামগ্রিক রূপই হল মানুষ। যা শেষ পর্বের গল্পে বিশেষ করে ‘রবিবার’, ‘শেষকথা’, ‘ল্যাবরেটরি’ প্রভৃতি ছোটগল্প প্রকাশিত।

রবীন্দ্র-ছোটগল্পের এই বিবর্তন ‘সাধনা-ভারতী’ পর্বের পরে ‘সবুজপত্র’ পর্বে পরিলক্ষিত হয়। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প স্পষ্টতই বাঁক নিয়েছে। প্রাক ‘সবুজপত্র’ পর্বের গল্পগুলিতে রবীন্দ্রনাথ সহৃদয় রসিক শিল্পীর মতো জীবনকে দেখেছেন, শিল্পীর তুলিতে সেই জীবনের টুকরো খণ্ড চিত্র অঙ্কন করেছেন। কিন্তু ‘সবুজপত্র’ পর্বে তিনি জীবনের নানা রঙ অঙ্কন করেই ক্ষান্ত থাকেননি এখানে তিনি জীবনের সমালোচকও বটে। বিশিষ্ট সমালোচক-এর মতে—‘প্রাক সবুজপত্র পর্বের ছোটগল্প হল জীবনের রূপ রচনা : Impression of life। পক্ষান্তরে সবুজপত্র পর্বের ছোটগল্প অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জীবনের ভাষ্য রচনা, Story around and impression (রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ—তপোব্রত ঘোষ পৃ ৩২৩)। উত্তম পুরুষের জবানীতে রচিত এই পর্বের রচনাগুলিতে জীবন ও সমাজের নানা সমস্যার বিচার বিশ্লেষণ ব্যাখ্যাধর্মী বিস্তৃতি দেখা গেছে। সাধু ভাষার পরিবর্তে চলিত ভাষারীতি ব্যবহৃত হয়েছে, ঘটনা-বিন্যাসে, চরিত্র-চিত্রণে, সময় ঐক্য বিধানে তথা প্রতিবাদী মানসিকতায় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়াস দেখা গেছে। সবুজপত্রের ১৩২১ বঙ্গাব্দের যথাক্রমে-বৈশাখ, আষাঢ়, শ্রাবণ সংখ্যায় ‘হালদারগোষ্ঠী’, ‘বোষ্টমী’, ‘স্ত্রীরপত্র’, প্রকাশিত হয়। শেষোক্ত গল্পটিতে এক অবরোধবাসিনীর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যথার্থ শিল্পরূপ লাভ করেছে।

নারী ও পুরুষ এই দুয়ের সামগ্রিক রূপই হল মানুষ। অথচ নারী পুরুষের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ভেদরেখা প্রায়ই সর্বত্র টেনে দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ কোনদিন এই ভেদরেখা স্বীকার করেননি। মানবসত্তার ভিন্ন ভিন্ন উপাদানকে চরিত্রায়িত করে যখন পাঞ্চভৌতিক সভা সৃষ্টি হয় তখনই নারী চরিত্রের চিত্র শক্তির প্রার্থ্য পরিলক্ষিত হয়। সবুজপত্র পর্ব থেকে রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত নারী-চরিত্রগুলিতে এই বিশেষ দিকটি লক্ষ্য করা যায়। আর সেই বিশেষ দিকেরই সার্থক অভিব্যক্তি ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের গল্প বিশেষ করে ‘রবিবার’ (আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয়া সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৬), ‘শেষকথা’ (শনিবারের চিঠি, ফাল্গুন ১৩৪৬), ‘ল্যাবরেটরি’ (আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয়া সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৭) প্রভৃতি ছোটগল্প।

৭.৩.৮.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. রবীন্দ্রনাথ কোথায় জমিদারী পরিদর্শনে গিয়েছিলেন?
২. রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের প্রথম গল্পের নাম কি?
৩. ‘হিতবাদী’ পর্বের দুটি গল্পের নাম বল?
৪. বর্গীকরণ সহ রবীন্দ্র ছোটগল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৭.৩.৮.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. সাহিত্যে ছোটগল্প—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।
২. বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার—ড. ভূদেব চৌধুরী।
৩. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড)—ড. সুকুমার সেন।
৫. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য় খণ্ড)—ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

একক ৯

হিতবাদী পর্ব

বিন্যাসক্রম

- ৭.৩.৯.১ : ভূমিকা
৭.৩.৯.২ : দেনাপাওনা
৭.৩.৯.৩ : পোস্টমাস্টার
৭.৩.৯.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলি
৭.৩.৯.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৭.৩.৯.১ : ভূমিকা

‘হিতবাদী’ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের সূচনা বলে অনেকে মনে করেন। ‘হিতবাদী’ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ সাতটি ছোটগল্প লিখেছিলেন—‘দেনা পাওনা’, ‘রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা’, ‘তারাপ্রসন্নের কীর্তি’, ‘পোস্টমাস্টার’, ‘ব্যবধান’, ‘গিল্লী’ ও ‘খাতা’। আমাদের আলোচ্য ‘দেনাপাওনা’ ও ‘পোস্টমাস্টার’ এই পর্বের উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প যেগুলি যথাক্রমে ১২৯৬ এবং ১২৯৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। আলোচ্য প্রথম গল্পটি নিতান্তই বিবৃতি সর্বস্ব হলেও সমকালীন সমাজের সমালোচনা অত্যন্ত বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে করা হয়েছে। পণপ্রথায় জর্জরিত এক গৃহবধু ও তার অসহায় পিতার দুঃসহ যন্ত্রণা রবীন্দ্রনাথ সুকৌশলে আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন। গল্প শিল্পের বিচারে সমালোচকরা ‘পোস্টমাস্টার’ গল্পটিকে এই পর্বের শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করেছেন। এটি পদ্মাতীরের পল্লী বাংলার এক বালিকার বয়ঃসন্ধিলগ্নের হৃদয় উন্মীলনের বেদনা বিধুর এক কথাসিঁলি।

৭.৩.৯.২ : দেনাপাওনা

১২৯৬ বঙ্গাব্দে লিখিত ও প্রকাশিত ‘দেনাপাওনা’ গল্পটি শতাধিক বছর অতিক্রম করেও আজও প্রাসঙ্গিক, সমভাবেই প্রাসঙ্গিক। গল্পটিকে সমাজের এক নিষ্ঠুরতা ও অবক্ষয়ের প্রতি ব্যঙ্গের একটি দিক নির্দেশিত হয়েছে। মূলতঃ এই গল্পেই সর্বপ্রথম রবীন্দ্র ছোটগল্পের সমাজ বাস্তবতার পরিচয় ফুটে ওঠে। এই ধরনের গল্প সাধারণতঃ যান্ত্রিকভাবে পরিসমাপ্ত হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব শিল্পকৌশলে গল্পের অবয়বটিকে ভ্রূমায়ায় নিয়ে গেছেন। আলোচ্য গল্পে পরিবেশ নির্মিত হয়েছে অবক্ষয়িত মধ্যবিত্ত সমাজজীবনকে কেন্দ্র করে। দরিদ্র রামসুন্দরের কন্যাদান, পণপ্রথার অমানবিক

১২৯৬ বঙ্গাব্দে লিখিত ও প্রকাশিত ‘দেনাপাওনা’ গল্পটি একবিংশ শতাব্দীতেও প্রাসঙ্গিক। মূলতঃ এই গল্পেই সর্বপ্রথম রবীন্দ্র ছোট গল্পের সমাজ-বাস্তবতায় পরিচয় ফুটে ওঠে। পণপ্রথায় জর্জরিত এক গৃহবধু ও তার অসহায় পিতার দুঃসহ যন্ত্রণা রবীন্দ্রনাথ সুকৌশলে আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন।

নৃশংসতা এই দুইয়ের মধ্যে রামসুন্দরের অসহায়তাকে রবীন্দ্রনাথ সামাজিক পরিবেশের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। বরের পিতার বাণিজ্যিক স্বভাবে বৃদ্ধ রামসুন্দর মিত্রের অসহায়তা আর এরই মধ্যে পিতার বিরুদ্ধে বরের প্রতিবাদ—“কেনাবেচা দরদামের কথা আমি বুঝি না, বিবাহ করিতে আসিয়াছি বিবাহ করিয়া যাইব।’ প্রবীণ রায়বাহাদুর উদ্ধত দুর্বিনীত পুত্রের ব্যবহারের সমালোচনা করেছেন, উপস্থিত ভদ্রজনের সাক্ষী মেনেছেন, দু’একজন স্বাভাবিকভাবেই রক্ষণশীলতার দোহাই দিয়ে বলেছেন—‘শাস্ত্রশিক্ষা, নীতিশিক্ষা একেবারেই নাই, কাজেই...’ বর্তমান সভ্যতার বিষময় ফল নিজ সন্তানের মধ্যে প্রত্যক্ষ করে রায়বাহাদুর হতোদ্যম হয়েছে যথেষ্টই।

এরপরেই গল্পটি প্রচলিত পথে এগিয়েছে, বৃদ্ধ রামসুন্দর মিত্র পণের বকেয়া অর্থ প্রদানের তাগিদে সংগ্রহ করতে গিয়ে অশেষ লাঞ্চিত হয়েছেন তথাপি তিনি যথাসর্বস্ব খুইয়েও কন্যাকে নিজগৃহে নিয়ে যেতে উদ্যোগী হয়েছেন। নিরুপমা যখন এই অর্থসংগ্রহের নেপথ্য কাহিনি জানতে পেরেছে তখন সে দীপ্তকণ্ঠে জানিয়েছে, ‘আমি কি কেবলই একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ দাম। না বাবা এ টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান করো না। তাছাড়া আমার স্বামীতো এ টাকা চান না।’ স্বাভাবিকভাবেই রামসুন্দরবাবু টাকা না দিয়ে ফিরে গেছেন। শাশুড়ি এ খবর জানতে পেরে নিরুপমার প্রতি আক্রোশ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। নিরুপমার শাস্ত স্নিগ্ধরূপের কেউ স্মৃতি করলে তিনি বলেন ওঠেন ‘শ্রী তো ভারি, যেমন ঘরের মেয়ে তেমনি শ্রী’। এই ব্যঙ্গোক্তি আরও তীব্র হয়ে উঠেছে গল্পের শেষাংশে। নিরুপমা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে শাশুড়ি জানিয়েছে—‘ওর সমস্ত ন্যাকামি’। কখনো কখনো তার উক্তি ছিল ‘নবাবের বাড়ির মেয়ে কিনা। গরীবের অন্ন ওঁর মুখে রোচে না।’ মৃত্যুশয্যায় নিরুপমা বাবা ও ভাইকে দেখতে চাইলে শাশুড়ি তখনও নিষ্ঠুরভাবে বলেছে—‘কেবল বাপের বাড়ী যাইবার ছল’। নিরুপমা আরও গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ডাক্তার দেখানো হয়েছে তবে—‘সেইদিন প্রথম ডাক্তার দেখিল এবং সেইদিন ডাক্তারের দেখা শেষ হইল’। এরপর নিরুপমার মৃত্যু হয়েছে। নিতান্ত অবহেলার অত্যাচারে তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হলেও সৎকার করা হয়েছে রাজকীয়ভাবে। এরপর নিরুপমার স্বামী প্রেরিত চিঠি এসেছে। তাতে তার স্ত্রী অর্থাৎ নিরুপমাকে তাঁর কর্মস্থলে পাঠাতে বলা হয়েছে। পত্নী কর্মস্থলে না গেলেও পত্রের উত্তর গেছে ঠিকই। তাতে রায়বাহাদুর মহিষী লিখেছেন—‘বাবা তোমার জন্য আরেকটি মেয়ের সম্বন্ধ করিয়াছি অতএব অবিলম্বে ছুটি লইয়া এখানে আসিবে। এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়’। গল্পশেষের এই খণ্ড মুহূর্ত গল্পটিতে অন্যমাত্রা যোগ করেছে সন্দেহাতীতভাবেই।

গল্পটিকে ‘নিতান্ত বিবৃতিসর্বস্ব’ বলা অযৌক্তিক এবং সেই সঙ্গে বধূ নির্যাতন এবং বধূ হত্যার এই নির্মম ঘটনাকে কখনোই যান্ত্রিক বলা যাবে না। গল্পটিতে রবীন্দ্রনাথের জীবনবীক্ষা অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে অভিব্যক্ত হয়েছে। বিষয়ের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন চরিত্র সৃষ্টিতে যথেষ্ট মনঃসংযোগ করেছিলেন এবং গল্পের ক্রমিক উন্মোচনের প্রতি যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন, তাই এক্ষেত্রে কোন শিল্পগত বিভ্রাট ঘটেনি। নিরুপমা এবং তার পিতা গল্পটিতে বারংবার লাঞ্চার শিকার তথাপি এই দৃশ্যগুলি আতিশয্যের দোষে দুষ্ট নয়। এখানে লক্ষণীয় পুরুষশাসিত সমাজে সব পুরুষ কিন্তু অত্যাচারের ভূমিকা গ্রহণ করেনি। বরের পিতার ব্যবসায়িক মনোভাবের প্রতিবাদ বর নিজেই করেছে। গল্পটির বিভিন্ন খণ্ড দৃশ্যে বাস্তবানুগত লক্ষ্য করা যায়। ঋণের টাকা শোধ না করতে পারার যন্ত্রণা বুকে নিয়ে টাকা সংগ্রহ করে দীর্ঘ অনশনের পর রামসুন্দর যখন বেহাই বাড়ী পৌঁছে কন্যাকে দেখলেন তখন ‘বাপও কাঁদে মেয়েও কাঁদে দুই জনে কেহ আর কথা কহিতে পারে না।’ এই দৃশ্যে হৃদয়ধর্মী বাস্তবানুগতা লক্ষ্য করা যায়। আমরা গল্পে লক্ষ্য করেছি বিবাহের স্বল্পদিন পরেই নিরুপমার স্বামী ‘ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট’ হয়ে দেশান্তরে

তলে গিয়েছেন। সেইসঙ্গে তার (নিরুপমার) বিয়ের পণ পুরোপুরি শোধ না হওয়ায় বাপের বাড়ীর কারও সঙ্গে তার দেখাশোনা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। অতএব নিরুপমা চূড়ান্তভাবে একাকীত্বের গহ্বরে নিষ্কিপ্ত হয়ে গেছে। এই একাকীত্ব ও বহুমুখী নির্যাতন তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। একদিকে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু অপরদিকে রাজকীয় সৎকার গল্পটির বাস্তবমূল্যকে জীবন্ত করেছে। গল্পশেষে নিরুপমার স্বামীর চিঠি প্রেরণ এবং নিরুপমাকে তার কর্মস্থলে পাঠাতে বলা এবং প্রত্যুত্তরে রায়বাহাদুর পত্নীর উক্তি ‘তোমার নতুন বিয়ে ঠিক করেছেি এবারে বিশ হাজার টাকা পণ হাতে হাতে আদায়’ পণপ্রথার বাস্তব পরিস্থিতিকে অবিকৃতভাবে জ্ঞাপন করেছে। সুতরাং গল্পের এইসব খণ্ড দৃশ্য বাস্তবকার সীমা অতিক্রম করে যায়নি সেইসঙ্গে বধু অত্যাচারে ও বধুহত্যার এই মর্মস্পর্শী চিত্র আমাদের সমাজ বিবেকের উপরে শিক্ষণীয় চাবুক হানতে সক্ষম হয়েছে যথার্থভাবেই। সুতরাং ‘দেনাপাওনা’ গল্পের প্রাসঙ্গিকতা এবং সার্থকতা অবশ্যই প্রশ্নের উদ্দেশে।

৭.৩.৯.৩ : পোস্টমাস্টার

এই পর্বে আমাদের দ্বিতীয় আলোচ্য গল্প হল ‘পোস্টমাস্টার’ যেটি ১২৯৮ বঙ্গাব্দে হিতবাদীতে প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটিতে পোস্টমাস্টার উপলক্ষ মাত্র। গল্পটিতে মূলতঃ রতন নামক বালিকার মৌলিক একাকীত্বের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে গল্পটি রচনার পূর্বে রবীন্দ্রজীবনে শুরু হয়েছিল শিলাইদহ পর্ব। রবীন্দ্রনাথ তখন নাগরিক জীবনের আভিজাত্যপূর্ণ জীবনচর্যা ছেড়ে নেমে এসেছিলেন পল্লীবঙ্গের বিস্তৃত পটভূমে এবং হিতবাদী পর্বের এই গল্পে তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ ছিন্নপত্রের একখানি পত্রে লিখেছেন—

“তোকে চিঠিতে লিখেছিলাম কাল ৭টার সময় কবি কালিদাসের সঙ্গে একটা এন্‌গেজমেন্ট করা যাবে। বাতিটি জ্বালিয়ে কেরারাটি টেনে যখন প্রস্তুত হয়ে বসেছি হেনকালে কবি কালিদাসের পরিবর্তে এখানকার পোস্টমাস্টার এসে উপস্থিত.... অতএব পোস্টমাস্টারকে চৌকিটি ছেড়ে দিয়ে কালিদাসকে আস্তে আস্তে বিদায় নিতে হলো। এই লোকটির সঙ্গে আমার একটু বিশেষ যোগ আছে। যখন আমাদের কুঠিবাড়ির একতলাতেই পোস্ট অফিস ছিল এবং আমি ঐকে প্রতিদিন দেখতে পেতুম, তখন আমি একদিন দুপুর বেলায় এই দোতলায় বসে গল্পটি লিখেছিলাম এবং সে গল্পটি যখন হিতবাদীতে বেরোলো তখন আমাদের পোস্টমাস্টারবাবু তার উল্লেখ করে বিস্তর লজ্জামিশ্রিত হাস্য বিস্তার করেছিলেন। যাইহোক এই লোকটিকে আমার বেশ লাগে। বেশ নানারকম গল্প করে যায় আমি চুপ করে বসে শুনি।” (পত্র-৬২, সাজাদপুর, ২৯শে জুন, ১৮৯২)

রবীন্দ্রনাথ এই পত্রটি বর্ষাকালে (২৯শে জুন) লিখেছিলেন আর ‘পোস্টমাস্টার’ গল্পটিতেও বর্ষাকাল বিশেষভাবেই প্রভাব ফেলেছে। সুতরাং পত্রটির পোস্টমাস্টারের সঙ্গে গল্পের পোস্টমাস্টারের যোগসূত্র থাকা অসম্ভব নয়। গল্পটির পোস্টমাস্টার হলেন কলকাতার এক নব্য যুবক যিনি নিতান্তই দায়ে পড়ে উলাপুর গ্রামে পোস্টমাস্টারী করতে এসেছেন। এই অখ্যাত উলাপুর গ্রামের জীবনশ্রোত অতি মন্থর। ‘পোস্টমাস্টারের কর্মভার স্বল্প, বেতনও তদৈরূপ। তাঁর সমস্ত মন কলকাতায় ফিরে যেতে চায়। এখানে তাঁর কোন মানসিক অবলম্বন নেই। পিরিস্থিতিটা ঠিক এইরকম। এর কিছু পরেই তাঁর জীবনাকাশে আর্বিভূত হল রতন— পিতৃ মাতৃহীন এক বালিকা। অনেক কমহীন দুপুর আর নিস্তব্ধ রজনীতে সঙ্গী হয়ে উঠল এই বালিকা। অচিরেই সে সেবাকারিণী পরিচারিকা ভগিনী ও জননীর পদে অধিষ্ঠিত হল। পোস্টমাস্টার রোগশয্যায় শায়িত হলে ‘বালিকা রতন আর বালিকা রইল না। সেই মুহূর্তেই সে জননীর পদ অধিকার করিয়া বসিল, বৈদ্য ডাকিয়া আনিল, যথাসময়ে বটিকা খাওয়াইল,

সারারাত্রি শিয়রে জাগিয়া রহিল আপনি পথ্য রাঁধিয়া দিল...।’ এর কিছুদিন পর পোস্টমাস্টার আরোগ্য লাভ করলেন এবং তারপরেই বদলির আবেদন করলেন। এদিকে রতন কিন্তু দ্বারের বাহিরে ‘স্বস্থান’ অধিকার করে রইল এবং পূর্বে পোস্টমাস্টারের শেখানো পড়া রোমন্থন করতে থাকলো—আশঙ্কা যদি যুক্ত অক্ষরগুলি গোলমাল হয়ে যায়। সহসা ঘরের মধ্যে ডাক পড়লে যদি সমস্ত মনে না পড়ে। এখানেই ভাবী বিচ্ছেদের পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যায়। এর কিছুদিন পরে একদিন পোস্টমাস্টারের ডাকে উদ্বেলিত মনে রতন ঘরে প্রবেশ করলো এবং তাঁর কর্মত্যাগ

‘পোস্টমাস্টার’ গল্পটি ১২৯৮ বঙ্গাব্দে ‘হিতবাদীতে’ প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটিতে মূলতঃ রতন নামক বালিকার মৌলিক একাকীত্বের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। পোস্টমাস্টার হলেন কলকাতার এক নব্যযুবক যিনি অখ্যাত উলাপুর গ্রামে পোস্টমাস্টারী করতে এসেছেন। গল্পটি পদ্মাতীরের পল্লীবাংলার এক বালিকার বয়ঃসন্ধি লগ্নের হৃদয় উন্মীলনের বেদনা বিধুর এক কথাশিল্প।

ও বিদায় বার্তা শুনলো। দীর্ঘ নৈশব্দের মধ্যে রতনের ক্ষুদ্র হৃদয়খানি এক মুহূর্তেই করুণ রাগিনীতে আবিষ্ট হয়ে গেল। এদিকে ‘মিটিমিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল’ আর ‘একস্থানে ঘরের জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া একটি মাটির সরার উপর টপটপ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল।’ গ্রাম ত্যাগের পূর্বরাতে “‘বালিকা হঠাৎ তাঁহাকে (পোস্টমাস্টারকে) জিজ্ঞাসা করিল ‘দাদাবাবু আমাকে তোমাদের বাড়ী নিয়ে যাবে?’ পোস্টমাস্টার প্রত্যুত্তরে বললেন ‘সেকি করে হবে’। ব্যাপারটা যে কী কারণে অসম্ভব ‘বোঝানো

আবশ্যক বোধ করিলেন না’। ফলত “সমস্ত রাত্রি স্বপ্নে এবং জাগরণে বালিকার কানে পোস্টমাস্টারের হাস্যধ্বনির কণ্ঠস্বর বাজিতে লাগিল। ‘সে কী করে হবে’। গ্রামত্যাগের দিন স্নানান্তে রতনকে ডেকে সম্মুখে ও সহৃদয় কণ্ঠে ‘প্রভু কহিলেন, তাঁর জায়গায় যে লোকটি আসবেন তাঁকে তিনি বলে দিয়ে যাবেন’ তিনি ‘তোকে আমারই মতন যত্ন করবেন, আমি বলে যাচ্ছি তোকে কিছু ভাবতে হবে না’। কথাগুলি যদিও আন্তরিক ‘কিন্তু নারীর হৃদয় কে বুঝিবে’। তাই ‘যে রতন অনেকদিন প্রভুর তিরস্কার নীরবে সহ্য করিয়াছে কিন্তু এই নরম কথা সহিতে পারিল না একেবারে উচ্ছ্বাসিত হৃদয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, না না তোমার কাউকে কিছু বলতে হবে না, আমি থাকতে চাই নে।’ চলে যাওয়ার সময় রতনকে কিছু টাকা দিতে গেলে তখনও ‘রতন ধূলায় তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল দাদাবাবু, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার জন্য কাউকে কিছু ভাবতে হবে না-বলিয়া এক দৌড়ে সেখান হইতে পলাইয়া গেল।’ অতঃপর পোস্টমাস্টার নিঃশ্বাস ফেলে হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে ছাতা নিয়ে এবং মুটের মাথায় টিনের পেটরা তুলে দিয়ে নৌকা অভিমুখে চললেন।

নৌকা যখন ছেড়ে দিয়েছে বর্ষার নদী বিস্তারিত এবং ছলছলে প্রবাহিত তখন অতি সাধারণ পোস্টমাস্টারের মনেও ‘একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মকথা প্রকাশ করিতে লাগিল।’ একবার ইচ্ছা হলো, ফিরে গিয়ে ‘জগতের ত্রোড় বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে লইয়া আসি—কিন্তু তখন পালে বাতাস লাগিয়াছে...নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে তবে পোস্টমাস্টারের মনে যে তত্ত্বেরই উদয় হোক না কেন রতনের মনে ‘কোন তত্ত্বের উদয় হইল না।’ সে ব্যাকুল চিন্তে ভাবছিল যদি দাদাবাবু শেষ পর্যন্ত ফিরে এসে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়? ডাকঘরের চারিপাশে তাই সে ঘুরছিল। তাই তো রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন ‘হায় বুদ্ধিহীন মানবহৃদয়। ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না, যুক্তি শাস্ত্রের বিধান বহুবিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে, প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা আশাকে দুই বাহুপাশে বাঁধিয়া বুকুর ভিতর প্রাণপণে জড়াইয়া ধরা যায়, সবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ী কাটিয়া হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া সে পলায়ন করে, তখন চেতনা হয় এবং দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে পড়িবার জন্য চিন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।’

‘পোস্টমাস্টার’ গল্পের পোস্টমাস্টার শেষ পর্যন্ত নদীপ্রবাহে ভাসমান উদাস হৃদয় পথিক। কিন্তু পুরুষের অনাসক্তি নয়, নারীর অবোধ অনুরক্তির মধ্যে দিয়েই গল্পটি শেষ হয়েছে। গল্পটিতে শ্রেণিচেতনা অভিব্যক্ত হয়েছে। রতন যখন তার দাদাবাবুর সাথে তাঁর বাড়ী যেতে চাইল তখন দাদাবাবুর উক্তি ছিল ‘সে কী করে হবে।’ এই ‘সে কী করে হবে’র মধ্যেই শ্রেণিচেতনার বীজ নিহিত রয়েছে। গল্পটির ভাষা বিবৃতিপ্রধান নয় রীতিমত নাট্য তাত্ত্বিক অনুসারী। এখানে পোস্টমাস্টার চরিত্রে আত্মকেন্দ্রিকতা এবং রতন চরিত্রে আলো আঁধারে ভাব অভিস্থাপিত হয়েছে। গল্পটির সমগ্র পরিসরে রতনের ভালোবাসা বাঁধ ভেঙে প্রকাশিত হয়েছে। লেখক এখানে একটি সাধারণ বিচ্ছেদ বেদনার গল্পকে অসাধারণ পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। এখানে কালের পটভূমে বৃহৎ জীবনস্রোতে ভাসমান মানবজীবনের অনিবার্য বিচ্ছেদবেদনাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে এক গ্রাম্য বালিকার বেদনাকে বিশ্বজনীন রূপ দেওয়া হয়েছে, স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মানবজীবনের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক। জীবন ও প্রকৃতি দুয়ে মিলে গড়ে তুলেছে অখণ্ড সংগীত। এখানে প্রকৃতি অমোঘ বিশ্বনীতির ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই বিশ্বনীতি জীবনে কোন কিছুকেই স্থায়ী বলে স্বীকার করে না, জীবনপ্রবাহে বিচ্ছেদকে অনিবার্য সত্য বলে ঘোষণা করে। এ গল্পের আরও প্রাপ্তি নবজন্ম-রতনের নবজন্ম। ত্রয়োদশী বালিকা ভালোবাসার স্পর্শে ও প্রত্যাখ্যানে যুবতীতে পরিণত হয়েছে যার হৃদয় যুক্তি প্রমাণ মানে না, বাস্তব বাধা মানে না, কেবল ভালবাসাতে ও ধরা দিতে চায়। সুতরাং সঠিক বিচারে একথা বলার আর কোন দ্বিধা থাকার কথা নয় যে পোস্টমাস্টার গল্পটিই হিতবাদী পর্বের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

৭.৩.৯.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. নিরুপমার বাবার নাম কি?
২. ‘এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়’—এখানে লেখক কি বলতে চেয়েছেন?
৩. ‘পোস্টমাস্টার’ গল্পের বালিকাটির নাম কি?
৪. ‘পোস্টমাস্টার’ গল্পের পোস্টমাস্টার কোন গ্রামে চাকরি করতে এসেছিলেন?
৫. ‘দেনাপাওনা’ গল্পে সমাজের যে কুপ্রথার কথা প্রকাশিত, সেটি উল্লেখ করে মূল গল্পের পরিণতি বিশ্লেষণ করো।
৬. পোস্টমাস্টার গল্পে যে তত্ত্বটি ব্যঞ্জনাकारে প্রকাশিত সেটি আলোচনা করো।

৭.৩.৯.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. সাহিত্যে ছোটগল্প—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।
২. বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার—ড. ভূদেব চৌধুরী।
৩. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড)—ড. সুকুমার সেন।
৫. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য় খণ্ড)—ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

একক ১০

সাধনা ও ভারতী পর্ব

বিন্যাসক্রম

- ৭.৩.১০.১ : ভূমিকা
 ৭.৩.১০.২ : ছুটি
 ৭.৩.১০.৩ : মেঘ ও রৌদ্র
 ৭.৩.১০.৪ : ক্ষুধিত পাষণ
 ৭.৩.১০.৫ : আদর্শ প্রশ্রাবলি
 ৭.৩.১০.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৭.৩.১০.১ : ভূমিকা

পূর্বে আলোচিত ‘হিতবাদী’ পর্ব অতিক্রম করে ‘সাধনা-ভারতী’ পর্বে রবীন্দ্রছোটগল্প আরও গভীরতর বিষয় আহরণের পথে যাত্রা করেছে এবং গভীর শিল্পরূপ লাভ করেছে। এই সময়ের গল্পগুলির মধ্যে ‘কঙ্কাল’, ‘অতিথি’, ‘ত্যাগ’, ‘ছুটি’, ‘মেঘ ও রৌদ্র’, ‘ক্ষুধিত পাষণ’, ‘কাবুলিওয়ালা’, ‘শাস্তি’, ‘সমাপ্তি’ প্রভৃতি তাঁর অন্যতম সেরা গল্প। আমাদের আলোচ্য গল্পসমূহের মধ্যে ‘ছুটি’ গল্পটি ১২৯৯ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যার ‘সাধনা’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটিতে এক পল্লীশিশুর সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং শহরের কৃত্রিম আবহে পল্লীশিশুর এই অকালমৃত্যু গল্পটিকে ভিন্ন মাত্রা দান করেছে। ‘সাধনা’ পত্রিকারই ১৩০১ বঙ্গাব্দের আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় ‘মেঘ ও রৌদ্র’ এবং ১৩০২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র-কার্তিক সংখ্যায় ‘ক্ষুধিত পাষণ’ গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম গল্পটিতে ইংরেজ আমলে এদেশীয় মানুষের বিপর্যস্ত ও অসহায় সহ্য করতে হয়েছিল তারই প্রেক্ষাপটে এই সমস্যামূলক গল্পটি রচিত হয়েছে। শেষোক্ত গল্পটি একটি রোমান্টিক স্বপ্নের মতো, যেখানে স্নায়বিক টেনসন টান টান করে ধরে রেখেছে সমস্ত গল্পের অবয়বকে।

৭.৩.১০.২ : ছুটি

১২৯৯ বঙ্গাব্দের ‘সাধনা’ পত্রিকায় পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘ছুটি’ গল্পটি শিশু মনস্তত্ত্বের এক ভিন্নতর রূপ পরিগ্রহ করেছে। ছিন্নপত্রাবলীর নিম্নধৃত পত্রখানিতে গল্পটির প্রেক্ষাপট খুঁজে পাওয়া যায়—

“ডাঙার উপর একটা মস্ত নৌকার মাস্তুল পড়ে ছিল—গোটাকতক বিবস্ত্র ক্ষুদে ছেলে মিলে অনেক বিবেচনার পর ঠাওরালে যে, যদি যথোচিত কলরব সহকারে সেইটেকে ঠেলে ঠেলে গড়ানো যেতে পারে তা হলে খুব একটা নতুন এবং আমোদজনক খেলার সৃষ্টি হয়। যেমন মনে আসা অমনি কার্যারম্ভ। ‘শাবাস জোয়ান হেঁইয়া!’

সব কটায় মিলে চীৎকার এবং ঠেলা মাস্তুল যেমনি এক পাক ঘুরেছি অমনি সকলের আনন্দের উচ্চাশাস্য”। (পত্র ২৪, সাজাদপুর, জুন ১৮৯১)।

ফটিক তার ভাই মাখনকে নিয়ে খেলছিল। ফটিকের প্রস্তাব মতো মাখনকে সহ ঐ কাঠ গড়াতে গেলে মাখন পড়ে যায়। এবং রেগে গিয়ে ফটিককে অন্ধভাবে মারতে থাকে। মাখন কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরে যায়। বাইরে থেকে একটি নৌকা ঘাটে এসে লাগে। অর্ধবয়সী এক ভদ্রলোক চক্রবর্তীদের বাড়ী কোথায় জানতে চাইলে ফটিক অনিদিষ্টভাবে উত্তর দেয় ‘ঐ হোথা’। পুনরায় প্রশ্ন করলে বলে ‘জানিনে’। অচিরেই ফটিকের মা ফটিককে ডেকে পাঠান। মাখনকে কেন্দ্র করে অশান্তি হয়। মা ফটিককে প্রহার করেন। ফটিক মাকে ঠেলে দেয়। অর্ধবয়সী ভদ্রলোক ঘরে ঢোকেই ইনি ফটিকের মামা। ফটিকের অবাধ্যতার জন্য মামা বিশ্বস্তর ফটিককে নিয়ে কলকাতায় রওনা হন। কলকাতায় মামীর সঙ্গে ফটিকের সম্পর্ক তেমন সুখের হয়নি।

১২৯৯ বঙ্গাব্দের ‘সাধনা’ পত্রিকায় পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘ছুটি’ গল্পটি শিশু মনস্তত্ত্বের এক ভিন্নতর রূপ পরিগ্রহ করেছে। শহর বনাম গ্রাম এবং মামী বনাম মা অর্থাৎ উদার গ্রামের মাঠ-ঘাট-নদী ও মাতৃহৃদয়ের স্বাভাবিক প্রীতি বনাম শহুরে কৃত্রিম জীবন গল্পটিতে ফুটে উঠেছে।

মামীর স্নেহহীন চোখে সে যে দুর্গহের মতো প্রতিভাত হয় এতেই ছিল তার দুঃখ। শুধু তাই নয় গ্রামের খোলামেলা প্রকৃতির কাছে জীবনযাপনের অভিজ্ঞতার পাশাপাশি কলকাতা শহরের পরিবেশ তার কাছে কারাগার সদৃশ হয়ে ওঠে। ফটিক এই অসহায় পরিস্থিতিতে মামাকে মার কাছে পৌঁছে দেবার জন্য বারংবার আবেদন করে। মামা বলেন স্কুলের ছুটি হোক। কিন্তু তার তখনো অনেক দেরি। ফটিক এর মধ্যে বই হারিয়ে মামীর কাছে তিরস্কৃত হয়। এভাবে ক্রমেই অভিমানপূর্ণ ঘনীভূত হয়ে ফটিক প্রবল জুরাক্রান্ত হয়। সে বোঝে তার এই অসুখ মামী ক্ষমা করবে না। সে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। সেদিন প্রবল বর্ষণ। অসুস্থ ফটিককে পুলিশের লোক গাড়ী থেকে নামায়। বিশ্বস্তর পূর্বেই পুলিশে খবর দিয়েছিলেন। ফটিকের অসুস্থতা বৃদ্ধি পায়। সে মায়ের প্রতীক্ষায় থাকে এবং বিড়বিড় করে বকতে থাকে ‘একবাঁও মেলে না। দো বাঁও মেলে-এ-এ না’। কলকাতায় আসার পথে স্টীমারের খালাসিরা জল মাপছিল ‘ফটিক তাহাদেরই অনুকরণে করুণস্বরে জল মাপিতেছে এবং যে অকুল সমুদ্রে যাত্রা করিতেছে বালক রশি ফেলিয়া কোথাও তাহার তল পাইতেছে না’। এমন সময় ঝড়ের বেগে ফটিকের মা ঘরে ঢুকে ফটিকের বিছানায় আছাড় খেয়ে পড়েন এবং ডাকেন ‘ফটিক সোনা মানিক আমার’। ফটিক সাড়া দেয় কোনক্রমে। মা আবার ডাকেন—‘ওরে ফটিক, বাপধন রে, ‘ফটিক ধীরে ধীরে পাশ ফিরে মৃদুস্বরে উত্তর দেয়, ‘মা এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ী যাচ্ছি।’

গল্পটিতে এক পল্লীশিশুর মনস্তত্ত্বকে নিপুণভাবে তুলে ধরা হয়েছে। শহর বনাম গ্রাম এবং মামী বনাম মা অর্থাৎ উদার গ্রামের মাঠ-ঘাট-নদী ও মাতৃহৃদয়ের স্বাভাবিক প্রীতি বনাম শহুরে কৃত্রিম জীবন এইভাবে সাদৃশ্য বৈপরীত্যের সূত্রে গল্পটিকে হাজির করানো যেতে পারে। গল্পটির শেষ পর্বে ফটিকের প্রলাপ ‘এক বাঁও মেলে না দো বাঁও মেলে-এ এ না’ অন্তহীন বিস্তৃতিতে নিমগ্ন হয়ে যাওয়ার এক বেদনাবিধুর পরিবেশ তৈরী করে। এ যেন গ্রাম জীবনের পরিচিত ক্ষেত্র ছেড়ে শহর জীবনে এসে নিষ্ঠুর নিয়ম শাসনের তলহীন সীমাহীন রূপের প্রতি শিশুমনের বিস্ময়।

৭.৩.১০.৩ : মেঘ ও রৌদ্র

‘মেঘ ও রৌদ্র’ মূলতঃ সমস্যামূলক গল্প যেখানে প্রধানত- ইংরেজ আমলে এ দেশীয় মানুষের বিপর্যস্ত অবস্থা রূপায়িত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ১৩০১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যার ‘সাধনায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন ‘অপমানের প্রতিকার’ শিরোনামে। সেই প্রবন্ধে তিনি যা বলেছেন সেই দেশের দুর্বল মানুষের অসহায়তার কথাই ‘মেঘ ও রৌদ্র’ গল্পে বিন্যস্ত হয়েছে। সভ্য ইংরেজ জাতির বর্বর আচরণে রবীন্দ্রনাথ অতিশয় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সেইসঙ্গে স্বদেশবাসীর এক গোষ্ঠীর দাসসুলভ তাঁবেদারিতে মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন ‘স্বজাতি এখনও আমাদের স্বজাতীয়ের পক্ষে ধ্রুব আশ্রয়ভূমি হইয়া উঠেতে পারে নাই।’ তিনি আরও অনুভব করেছিলেন ‘যাহার হিতের জন্য প্রাণপণ করা যাইবে সেই আমাদের প্রধান বিপদের কারণ, আমরা যাঁহার সহায়তা করিতে যাইব তাঁহার নিকট হইতে সহায়তা পাইব না।

‘মেঘ ও রৌদ্র’ গল্পে দেশ-কাল-সমাজের এক বহুবিধ সমস্যা রূপায়িত হয়েছে। গল্পের প্রধান চরিত্র শশিভূষণ আদর্শবাদী ও ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী স্বভাবের। লেখক চেয়েছিলেন পদ্মার বোটে বসে গিরিবালা নাম্নী মানবীর মেঘ ও রৌদ্রের কাহিনি শোনাবেন, কিন্তু সেখানে প্রকৃতির লীলা রচনায় বাধা পড়েছিল আমলাবর্গের উপস্থিতির কারণে।

কাপুরুষগণ সত্য অস্বীকার করিবে, নবপীড়িতগণ আপন পীড়া গোপন করিয়া যাইবে, আইন বজ্রমুষ্টি প্রসারিত করিবে এবং জেলখানা আপন লৌহবদন ব্যাদান করিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসিবে।’ তবে রবীন্দ্রনাথ হতাশাবাদী নন। তিনি অটল ন্যায়প্রিয় ‘দু-চারি জন’ মানুষের প্রতি ভরসা করেন এবং তাঁদের হাতে জাতীয় বন্ধন এবং ন্যায়বিচার পাবার অধিকার আশা করেন। অতএব দেশ কাল সমাজের এই বহুবিধ সমস্যা রবীন্দ্রনাথকে অতি সন্তুর্ণণে আলোড়িত করেছিল যার প্রতিফলন দেখা গেল আলোচ্য ‘মেঘ ও রৌদ্র’ গল্পে।

রবীন্দ্রনাথ আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অত্যাচার সামন্ততান্ত্রিক নায়েব গোমস্তার অন্যায় ষড়যন্ত্র স্বজাতির ইংরেজের তাঁবেদার হয়ে ওঠার চেষ্টা, সাধারণ গ্রামবাসী এবং শ্রমিক পল্লীসমাজের দুর্বলতাকে গভীর চোখে দেখেছিলেন। আলোচ্য গল্পে তারই রূপায়ণ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ ছিন্নপত্রের ১২৩ নং পত্রে (১৮৯৪, ২৭ জুন) ইন্দিরাকে লিখেছেন—‘কাল থেকে আমার মাথায় একটা হ্যাপি থট এসেছে। আমি চিন্তা করে দেখলুম পৃথিবীর উপকার করব ইচ্ছা থাকলেও কৃতকার্য হওয়া যায় না। কিন্তু তার বদলে যেটা করতে পারি সেইটে করে ফেললে অনেক সময় আপনি পৃথিবীর উপকার হয়, নিজের একটা কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়।’ এভাবেই ‘মেঘ ও রৌদ্র’ রচনার সূত্রপাত। এই গল্পের প্রেরণা স্বরূপ একটি সত্য ঘটনা আছে। সেটি খুলনার ম্যাজিস্ট্রেট বেটসন্ বেল্ এর এক মুহুরীকে প্রহারের ঘটনা। এই নিয়ে মোকদ্দমা হয় এবং সেই বিচারের সওয়ালের সময় বাঙালী ব্যারিস্টারের অপমানকর স্বীকারোক্তি রবীন্দ্রনাথকে বিরক্ত করে, যার ফসল পূর্বে উক্ত প্রবন্ধটি। এই সমস্ত প্রেক্ষিত মেঘ ও রৌদ্র রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

‘মেঘ ও রৌদ্র’ গল্পের প্রধান চরিত্র হল শশিভূষণ যার অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। গল্পটিতে প্রধানত দুটি ধারা প্রবাহিত হয়েছে যেগুলি সাধারণভাবে একে অপরের উপরে প্রভাব ফেলেনি। প্রথম কাহিনিতে ইংরেজের হাতে স্বদেশীয় লাঞ্ছনা এবং স্বচ্ছল এক শ্রেণির মানুষের তাঁবেদারির কথা, সেইসঙ্গে মহৎ প্রাণ শশিভূষণের ভূমিকা বিবৃত হয়েছে। দ্বিতীয় কাহিনিতে শশিভূষণ-গিরিবার ব্যক্তিগত কাহিনি রূপায়িত হয়েছে। গল্পটির দ্বিতীয় কাহিনিতে গিরিবালা এক স্বতন্ত্র চরিত্র হিসাবে স্বীকৃতিযোগ্যতা লাভ করেছে এবং এখানে শশিভূষণ গিরিবার পারস্পরিক সম্পর্ক আলো আঁধারি আবেগে আচ্ছন্ন হয়েছে। শশিভূষণের স্বাতন্ত্র্য তাকে গ্রামের লোকেদের থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। শশিভূষণের সবচেয়ে বড়ো অপরাধ সে কোন বিষয়বুদ্ধির কাজ করে

না এবং ‘বিবাহ করিতে সম্মত নয়’। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ আরও জানিয়েছেন ‘মানুষের মধ্যে তাহার সম্পর্ক ছিল গিরিবালার সহিত’। গিরিবালার পড়ুয়া দাদারা তাকে লেখাপড়া শেখাতে রাজী না হওয়ায় শশিভূষণের কাছেই গিরিবালার লেখাপড়ার চর্চা আরম্ভ হল। তৃতীয় পরিচ্ছেদে গিরিবালার বৈষয়িক বাবা হরকুমারের সঙ্গে শশিভূষণের আনুকূল্য চায় কিন্তু শশিভূষণ এ বিষয়ে একেবারেই নারাজ। একটি মোকদ্দমায় প্রজাদমনের জন্য শশিভূষণের আনুকূল্য চায় কিন্তু শশিভূষণ এ বিষয়ে একেবারেই নারাজ। একটি মোকদ্দমায় পরাজিত হয়ে হরকুমারের মনে হয় শশিভূষণই এজন্য দায়ী। তাই শশিভূষণকে গ্রাম থেকে বিতাড়িত করতে হরকুমার উঠে পড়ে লেগে যায়। শান্তিপ্রিয় নিরীহ প্রকৃতির শশিভূষণ গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চলে যেতে উদ্যত হয় কিন্তু জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব গ্রামে এসে পড়ায় এবং তাকে নায়েব ইচ্ছামতো খুশি করতে না পারায় হরকুমারকে ডাকিয়ে এনে লোকারণ্যের মধ্যে মেথরকে দিয়ে দৈহিক নিপীড়ন চালায়। এই অবস্থায় উত্তেজিত শশিভূষণ হরকুমারকে দেখতে গেলে হরকুমার শশির হাত ধরে ব্যাকুলভাবে কাঁদতে থাকে। শশিভূষণ ব্যাকুল হরকুমারকে মামলা করবার পরামর্শ দেয়। একথা শুনে ভয় পেয়েও হরকুমার নিজের সম্মান রক্ষার্থে মামলায় রাজী হয় এবং শশিভূষণকে গ্রামে থেকে যেতে অনুরোধ করে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে হরকুমারের বিশ্বাসঘাতকতায় শশির বিরুদ্ধে ব্রিটিশ প্রশাসন ক্রুদ্ধ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে শশি মামলা নিয়ে আইনের পড়াশোনায় ব্যস্ত ও বিব্রত থাকায় গিরিবালা তার হৃদয়ের উপচার নিয়ে বারবার গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। অভিমানে গিরিবালার দুচোখ ভরে জল আসে। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দেখা যায় ম্যাজিস্ট্রেটের নামে মোকদ্দমা আকস্মিকভাবে মিটে গেছে। হরকুমার ম্যাজিস্ট্রেটকে তৈলমর্দন করে জেলার বেঞ্চে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হয়। শশিভূষণ আবার আইনের কালো মোট বইগুলিকে দূরে নিক্ষেপ করে এবং গিরিবালাকে খুঁজতে থাকে। গিরিবালা আর আসে না। শশিভূষণ গিরিবালার অসুখ করেছে ভেবে গোপনে সন্ধান নিয়ে জানতে পারে গিরিবালার পাত্র স্থির হয়ে গেছে। তার আগেই গিরিবালা ‘শশিদার বাড়ি’ যেতে গিয়ে বাবা হরকুমারের দ্বারা তিরস্কৃত হয় এবং সেদিন থেকে তার বাড়ির বাইরে পদক্ষেপ নিষিদ্ধ হয়।

গল্পটিতে নায়িকার পিতা ধূর্ত স্বার্থান্ধ ভিলেনের ভূমিকা গ্রহণ করে। শশিভূষণ আদর্শবাদী, বিদেশী ইংরেজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদীস্বভাব এবং মামলা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় গিরিবালার প্রতি মন দিতে পারে না। তাই সপ্তম পরিচ্ছেদে যখন গিরিবালার বিয়ের সানাই বাজছিল তখন অনিমন্ত্রিত শশিভূষণ নৌকাযোগে কলকাতা যাচ্ছিল। কিন্তু পথে আবার বিপত্তির সৃষ্টি হয়। এখানে এক ইংরেজ আমলা তুচ্ছ কারণে গুলি করে নৌকা ডুবিয়ে এদেশের দরিদ্র মানুষকে বিপন্ন করে। মাঝিমাল্লা যারা বেঁচে ছিল তাদের নিয়ে শশি গ্রামে ফিরে আসে। অত্যাচারী সাহেবের বিরুদ্ধে পুলিশে দরখাস্ত করতে অনুরোধ করে মাঝিকে। সে সম্মত হয় না। দেশের অপদার্থতাকে ধিক্কার দিয়ে শশি একাই মোকদ্দমার কাজ চালায়। কিন্তু সাহেব ব্যারিস্টারী পাঁচ খাটিয়ে মুক্তি পায়। এই চিন্তদাহ নিয়ে শশিভূষণ গ্রামে ফিরে আসে এবং দেখে সেদিনই নৌকা সাজিয়ে গিরিবালাকে শ্মশুরবাড়ি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বিনা আহ্বানেই শশিভূষণ নদীতীরে উপস্থিত হয় এবং চকিতে একবার নববধূকে দেখতে পায়। গিরিবালা জানতেও পারেনা তার শশিদাদা এই বিদায় বেলায় নদীতীরে উপস্থিত।

অষ্টম পরিচ্ছেদে শশিভূষণ নদীপথে কলকাতায় যাচ্ছিল। এবারও এক বিভ্রাট উপস্থিত হলো। এক পুলিশ সাহেব জেলেদের ওপর অত্যাচার করছিল। শশিভূষণ সেই অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে গেলে তাকে আপমান করা হলো। তখন শশিভূষণ সাহেবের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ‘বালকের মতো, পাগলের মতো মারিতে লাগিলেন’।

বলাই বাহুল্য পুলিশের থানায় শশিভূষণকে ধরে নিয়ে গিয়ে তার শরীরে ও মনের উপর পাশবিক অত্যাচার চালানো হলো। নবম পরিচ্ছেদে দেখা গেল শশিভূষণের বাবা উকিল ব্যারিস্টারের সাহায্যে প্রথমে শশিকে খালাস করেন। তারপর মোকদ্দমা। মোকদ্দমায় ‘শশিভূষণের পক্ষ কিছুতেই টিকিতে পারিল না।’ তার দীর্ঘ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড হয়ে গেল। অতঃপর শশিভূষণ তার প্রিয় গ্রন্থগুলি ফেলে জেল খাটতে গেলো। তার পিতা আপিল করিতে উদ্যত হলে তাকে নিষেধ করলেন বললেন, ‘জেল ভালো। লোহার বেড়ি মিথ্যা কথা বলে না, কিন্তু জেলের বাহিরে যে স্বাধীনতা আছে সে আমাদেরকে প্রতারণা করিয়া বিপদে ফেলে। আর যদি সংস্কারের কথা বল তো, জেলের মধ্যে মিথ্যাবাদী কৃতঘ্ন কাপুরুষের সংখ্যা অল্প, কারণ স্থান পরিমিত বাহিরে অনেক বেশি।’

দশম বা শেষ পরিচ্ছেদে শশিভূষণ অন্যায় ও তার ক্ষেত্রে অনেক বেশি অত্যাচারমূলক পাঁচ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করে বাইরে বেরিয়ে এলো। ইতিমধ্যেই তার পিতার মৃত্যু হয়েছে, ভাই বাইরে কর্মরত থাকায় সেখানেই বাড়ী করে বাস করছে আর রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বিষয়সম্পত্তির অধিকাংশই হরকুমার অত্মসাৎ করে নিয়েছে। গৃহহীন আত্মীয়হীন সমাজে জীবনযাত্রার ছিন্নসূত্র আবার কোথা থেকে সূচনা করবেন তাই ভাবছেন এমন সময়ে এক বৃহৎ জুড়ি তার সামনে দাঁড়াইল। একজন ভৃত্য এসে জিজ্ঞাসা করল ‘আপনার নাম শশিভূষণবাবু?’ শশিভূষণ পথচারীদের কৌতুহলী দৃষ্টি এড়াতে বাদানুবাদ না করে গাড়িতে উঠে পড়লো। ভাবলো এতে নিশ্চয় কোন ভ্রম হচ্ছে। পথে একজন ভিক্ষুক দৃশ্যগোচর হল যারা গুপিয়ন্ত্র-খোল সহযোগে গাইছিল ‘এসো এসো ফিরে এসো-নাথ হে ফিরে এসো!’ গানের কলি ক্রমশ ক্ষীণতর হতে হতে মিলিয়ে গেল। কিন্তু গানের কথা শশিভূষণের পরাণবীণায় নতুন রাগিণীর আলাপ শুনিয়ে গেল। একটু পরেই শশিভূষণ বুঝতে পারলো সে কোথায় এসেছে। মৃদ শব্দে সচকিত শশি দেখলো রূপোর থালায় ফলমূল মিষ্টান্ন রেখে অদূরে অপেক্ষারত গিরিবালা। মাথা তুলতেই ‘নিরাভরণা শুভ্রবসনা বিধবাবেশধারিণী গিরিবালা তাঁহাকে নতজানু হইয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল।’ গিরিবালা ভগ্নশরীর স্নানমুখ শশিভূষণের দিকে স্নিগ্ধ চোখে দেখলো এবং তাহার দুই চক্ষু বারিয়া দুই কপোল বাহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল।’ শশিভূষণ কোন ভাষা খুঁজে পেল না। অবরুদ্ধ অশ্রুবাস্পে তার বাক্যপথ রুদ্ধ হয়ে গেল তখনও মুদির দোকানের সামনে ভিক্ষুকদল গেয়ে চলেছে

‘এসো এসো ফিরে এসো...

আমায় শয়নে স্বপনে বসনে ভূষণে নিখিল ভুবনে এসো....।’

‘মেঘ ও রৌদ্র’ শুধু আকারের দিক থেকেই নয় জীবনের নানা ব্যঞ্জনায়ে ছোটগল্পের চেয়ে আলাদা। রবীন্দ্রনাথ বিপরীতধর্মী বিবিধ জটিল ঘটনার সাহায্যে ছোটগল্পের এক-লক্ষ গতিপথে জটিল বহুমাত্রিক আবর্ত তথা একাধিক শীর্ষবিন্দু রচনা করেছেন যা মূলত বড়গল্প বা উপন্যাসের আঙ্গিকেই প্রত্যাশিত তবে এক্ষেত্রে গল্পটির এই লক্ষণগুলিকে উপন্যাসের সম্ভাবনা বলা সংগত নয় বরং বড়গল্প বা নভেলেট বলা যেতে পারে। গল্পের প্রথম, দ্বিতীয়, পঞ্চম ও দশম পরিচ্ছেদে গল্পের মূল রসাবেদন সৃষ্টির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তবে ‘মেঘ ও রৌদ্র’ গল্পের দুটি স্বতন্ত্র কাহিনিবৃত্ত এবং শশিভূষণের বাইরের বৃহত্তর জগতের কাহিনিতে একাধিক ঘটনাংশের সমাবেশ ছোটগল্পের নিদিষ্ট পরিমিতিকে দ্বিধাশ্রিত করেছে। দুটি কাহিনিকে মেলাতে গিয়ে গল্পকারকে অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে হয়েছে এবং স্বাভাবিক নিয়মে গল্প পরিণামমুখী হয়নি। এখানে শশিভূষণ-গিরিবারার মধুর যন্ত্রণাময় কাহিনিবৃত্তের পাশে দ্বিতীয় কাহিনিবৃত্তটি বাইরের ঘটনার অস্তির চাঞ্চল্য অতিরিক্ত বর্ণাঢ্য হয়েছে। শুধু তাই নয় শশিভূষণের আমলাতন্ত্রিক বিরোধে গিরিবারার কোন ভূমিকাই ছিল না। শশিভূষণের ক্রমগত পরাজয় তার কাছে অজ্ঞাত ছিল বলেই

প্রিয়জনের বেদনার অংশীদার হতে তাকে দেখা যায়নি। লেখক জন্মলগ্নে গিরিবালার কাহিনি লেখার বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন, চেয়েছিলেন পদ্মার বোটে বসে গিরিবালা নান্নী মানবীর মেঘ ও রৌদ্রের কাহিনি শোনাবেন, কিন্তু সেখানে প্রকৃতির লীলা রচনায় বাধা পড়েছিল আমলাবর্গের উপস্থিতির কারণে। ব্যঞ্জনাময় ও গুঢ়ার্থবাচক নামকরণের এই ছোটগল্পের রসাবেদন স্থানে স্থানে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বড়গল্প এবং বেদনাময় প্রেম মাধুর্যমণ্ডিত কাহিনিরূপে এ গল্প অসামান্য।

৭.৩.১০.৪ : ক্ষুধিত পাষণ

১৩০২ বঙ্গাব্দের ‘সাধনা’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘ক্ষুধিত পাষণ’ গল্পটি রবীন্দ্র ছোটগল্পের ধারায় একটি ভিন্নধর্মী গল্প। মনের একটি বিশেষ ‘মুড’, মানসিক বিকৃতির এক অপূর্ব গীতিময় প্রকাশ গল্পটিকে এই বিশেষ মাত্রা দান করেছে। এই গল্পটির পূর্বে রচিত ‘কঙ্কাল’, ‘জীবিত ও মৃত’, ‘নিশীথে’ কিংবা পরবর্তীকালে রচিত ‘মণিহারী’ গল্পটির সঙ্গে এর কিছু সাদৃশ্য থাকলেও ‘ক্ষুধিত পাষণ’ রবীন্দ্রসাহিত্যে একক, বিশ্বসাহিত্যেও দুর্লভ। অতিপ্রাকৃত পরিবেশ-নিভর গল্পগুলির মধ্যে ‘ক্ষুধিত পাষণ’ সত্যিই তুলনাহীন।

গল্পটির উৎস প্রসঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমেদাবাদের বাসভবনটির উল্লেখ করছেন। এই বাসভবনটি একটি পূর্বতন নবাব প্রাসাদ। ‘ছেলেবেলা’য় স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সেই বাসভবনটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন— ‘দিনের বেলায় মেজদাদা চলে যেতেন কাজে, বড়ো বড়ো ফাঁকা ঘর হাঁ হাঁ করছে, সমস্ত দিন ভূতে পাওয়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি.....আমেদাবাদে এসে এই প্রথম দেখলুম চলতি বড়ো ঘরোয়ানা। তার সাবেক দিনগুলো যেন যক্ষের ধনের মতো মাটির নীচে পৌঁতা। আমার মনের মধ্যে প্রথম আভাস দিয়েছিল ক্ষুধিত পাষণ গল্পের।’

মূল গল্পটি একটি রোমান্টিক স্বপ্নের মতো। এর পটভূমি চড়া পর্দার রোম্যান্স। এক রেল জংশনে ওয়েটিং রুমে মধ্যরাতে এক বিচিত্র যাত্রীর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনি। গল্পটির মূলে আছে সেই আড়াইশো বছরের পুরোনো প্রাসাদ, দ্বিতীয় শাহ্ মামুদ যেটি ভোগবিলাসের জন্য নির্মাণ করেছিলেন। গল্পকথক এই প্রাসাদের প্রতি মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। গল্পের শুরু এই মোহজাল বদ্ধ হওয়ার বর্ণনায়। লেখক বক্তা গল্পটিকে আগাগোড়া বানানো বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন আর তারই পরিণতিতে ওই দিব্যজ্ঞানী আত্মীয়ের সঙ্গে তার চিরবিচ্ছেদ ঘটেছে। তবে গল্পের সামগ্রিক পরিমণ্ডলে ক্ষুধিত পাষণের তৃষ্ণার্ত হাহাধ্বনি সর্বদাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রাসাদের অন্দরে যারা ত্রিরাত্রি বাস করেছে তারা কেউ এর গ্রাস এড়াতে পারেনি। ব্যতিক্রম মেহের আলী। সে এই পাষণ রাক্ষসের মোহজাল ছিন্ন করে বাইরে আসতে পেরেছিল তবে সে পাগল হয়ে গিয়েছিল। তাই প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করতে করতে মেহের আলির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে ‘সব বুট হ্যাঁয়’। মেহের আলির এই প্রলাপ গল্পটির আবহ রচনা করেছে। মেহের আলি বেরিয়ে আসলেও মাশুল কালেকটরের চাকুরী নিয়ে আসা ব্যক্তিটি এই প্রাসাদের মোহাবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তার আপিসের বৃদ্ধ কেরানি করিম খাঁ তাকে ঐ প্রাসাদে রাত্রি যাপন করতে নিষেধ করেছিল। ভৃত্যরাও রাতে এখানে থাকতে রাজি হয়নি, তবু এই প্রাসাদে সে থেকেই যায় আর সাতদিনের মধ্যে এই মোহপুরী তাকে পেয়ে বসে। এই প্রাসাদের সিঁড়িতে হঠাৎ একদিন পায়ের শব্দ শোনা গেছে। যেন একসাথে অনেকে ঘাটের পথ বেয়ে নেমে আসছে। সেকৌতুক কলহাস্যের রব শোনা গেল। সেই শুরু। আড়াইশো বছরের অতীত যেন পাষণের রূপ ধরে মোহবিস্তার করেছে। আর সেই মোহ ছড়িয়ে গেছে গল্পকথকের মনে। অথচ সেই গল্পকথক

কে তার পরিচয় নেই। গল্পের পরিবেশ, চরিত্র, ঘটনা সবই ছায়াচ্ছন্ন। স্পষ্ট করে বোঝা যায় না, উপলব্ধি করা যায়। গল্পকথক করিম খাঁর কাছে এই পাষণ রাক্ষসের থেকে উদ্ধারের উপায় জিজ্ঞাসা করলে সে ইরাণী ক্রীতদাসীর কথা বলবার উপক্রম করতেই ট্রেন এসে গিয়েছিল। তা সেই ইরাণী ক্রীতদাসী কে তাও জানা যায় না। শুধু অনুভব করা যায় তার ত্রন্দনধ্বনি, অশ্রুত-স্বর। সব মিলিয়ে এক অধরা ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশই এইগল্পশৈলীর মূলে। সেখানেই লেখকের জাদু, বর্ণনার কৌশল।

ক্ষুধিত পাষণ একটি অতিপ্রাকৃত গল্প। অর্থাৎ এই গল্পের বিষয় সামাজিক বা পারিবারিক কোন ঘটনা নয়

১৩০২ বঙ্গাব্দের ‘সাধনা’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘ক্ষুধিত পাষণ’ গল্পটি রবীন্দ্র ছোটগল্পের ধারায় একটি জ্ঞানধর্মী গল্প। ‘ক্ষুধিত পাষণ’ একটি অতিপ্রাকৃত গল্প। গল্পটির পরিমণ্ডলের স্বার্থে সৃষ্ট মেহের আলি চরিত্রটিও অসাধারণ সৃষ্টি। তাই ‘ক্ষুধিত পাষণ’ রবীন্দ্রসাহিত্যের একক, বিশ্বসাহিত্যেও দুর্লভ।

মূলত ভৌতিক, যুক্তিবুদ্ধির অতীত ঘটনা ও অনুভূতি অতিপ্রাকৃত গল্পে রূপায়িত হয়। অতিপ্রাকৃত গল্পে প্রাকৃত জগতের অতীত কোনো অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে ইচ্ছাকৃতভাবে যুক্তি-বুদ্ধির অতীত এক পরিবেশ সৃজন করা হয় এবং সেই পরিবেশকে প্রাকৃত পরিবেশের পাশে স্বতন্ত্রভাবে অভিস্থাপন করা হয় ও সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রেখে শঙ্কা শিহরিত পরিবেশ নির্মাণ করা হয়। সুতরাং অতিপ্রাকৃত জগতে বোধ বুদ্ধি সবসময় ক্রিয়াশীল থাকে না। সেখানে

ছায়াঘেরা অনুভূতি আর অনুভবের জগৎ রূপায়িত হয়।

ক্ষুধিত পাষণ অতিপ্রাকৃত গল্পরূপে এক সার্থক রসসৃষ্টি। ভাষা ও রচনাশৈলী সেই সার্থকতা সঞ্চারে সহায়ক হয়েছে। গল্পটির পরিমণ্ডলের স্বার্থে সৃষ্ট মেহের আলি চরিত্রটিও অসাধারণ সৃষ্টি। গল্পটির গভীরে সত্য ও তাৎপর্য নিহিত আছে সংবেদনশীল হৃদয়ের জন্য। অতএব ক্ষুধিত পাষণ এক অসাধারণ অতিপ্রাকৃত গল্প একথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

৭.৩.১০.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. ‘ছুটি’ গল্পে ফটিকের ভাইয়ের নাম কি ছিল?
২. ফটিকের মামা বাড়ি কোথায় ছিল?
৩. ‘মেঘ ও রৌদ্র’ গল্পের মূল চরিত্রটির নাম কি?
৪. ‘মেঘ ও রৌদ্র’ সমস্যামূলক গল্প কেন?
৫. ‘ক্ষুধিত পাষণ’ কোন শ্রেণির গল্প?
৬. ‘ক্ষুধিত পাষণ’ গল্পটি কোন পত্রিকায়, কত বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল?
৭. ‘ক্ষুধিত পাষণ’ গল্পটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

৭.৩.১০.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. সাহিত্যে ছোটগল্প—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।
২. বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার —ড. ভূদেব চৌধুরী।
৩. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড)—ড. সুকুমার সেন।
৫. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য় খণ্ড)—ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

একক ১১

সবুজপত্রের গল্প

বিন্যাসক্রম

- ৭.৩.১১.১ : ভূমিকা
৭.৩.১১.২ : স্ত্রীর পত্র
৭.৩.১১.৩ : হালদার গোষ্ঠী
৭.৩.১১.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলি
৭.৩.১১.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৭.৩.১১.১ : ভূমিকা

রবীন্দ্র ছোটগল্পের বিবর্তনের ধারায় ‘সাধনা-ভারতী’ পর্বের পরে (প্রায় ৮ বছর পরে) ‘সবুজপত্র’ পর্বের সূচনা হয়েছে। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প স্পষ্টতই বাঁক নিয়েছে। প্রাক ‘সবুজপত্র’ পর্বের গল্পে রবীন্দ্রনাথ সহৃদয় রসিক শিল্পীর মতো জীবনকে দেখেছেন, শিল্পীর তুলিতে সেই জীবনের খণ্ড দৃশ্য অঙ্কন করেছেন, কিন্তু সবুজপত্র পর্বে তিনি জীবনের সমালোচকও বটে। প্রাক সবুজপত্র পর্বের ছোটগল্প হল জীবনের রূপরচনা "impression of life" পক্ষান্তরে সবুজপত্র পর্বের ছোটগল্প অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জীবনের ভাষ্যরচনা : "Story around an impression" এই পর্বে ‘স্ত্রীর পত্র’, ‘বোষ্টমী’, ‘হালদার গোষ্ঠী’ প্রভৃতি গল্পগুলি উল্লেখযোগ্য। এই পর্বে ভাষায় আঙ্গিকগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রাপ্ত গল্পগুলির মধ্যে ‘স্ত্রীর পত্রে’ এক অবরোধবাসিনীর মুক্তি অকাঙ্ক্ষা যথার্থ রূপ লাভ করেছে।

১৩২১ বঙ্গাব্দে ‘স্ত্রীর পত্র’ গল্পখানি সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটিতে নারীর ব্যক্তিত্ব উন্মোচনের যে পথ মৃণাল দেখিয়েছে তা এক কথায় অভিনব। পত্নীত্ব নয় মনুষ্যত্বই নারীর পরমত্ব। যা রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম চলিত ভাষায় গল্প।

৭.৩.১১.২ : স্ত্রীর পত্র

আমাদের এইপর্বের আলোচ্য প্রথম গল্পখানি ‘স্ত্রীর পত্র’—একটি ব্যতিক্রমী আঙ্গিকের গল্প যেটি ১৩২১ বঙ্গাব্দে সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটিতে এক অবরোধবাসিনীর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত হয়েছে। নারীর ব্যক্তিত্ব উন্মোচনের যে পথ মৃণাল দেখিয়েছে তা এককথায় অভিনব। গল্পটির শিরোনাম থেকে একটা কথা স্পষ্ট যে এটি পত্রাকার গল্প। গল্পটিতে একটি বিষয়ে মৃণাল যেন জোর দিয়েছে—‘আমি তোমাদের মেজ বউ’ আবার সাহস করে লেখা তার এই চিঠিখানিতে জানিয়েছে ‘এ তোমাদের মেজ বউয়ের চিঠি নয়।’ পত্নীত্ব নয় মানুষত্বই নারীর পরমত্ব। ‘স্ত্রীর পত্র’ তাই শেষ পর্যন্ত মনুষ্যত্বের আবিষ্কারে গিয়ে আর ‘স্ত্রীর পত্র’ থাকেনি। মনুষ্যত্বের নতুন ঠিকানা লাভের আশায় এক স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্বময়ী নারীর পত্র হয়ে উঠেছে।

‘স্বীর পত্র’ মূলত একটি পত্র যেখানে একটি পরিবারের কীর্তি কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। মৃণাল তীর্থ করতে এসে স্বামীকে পত্র লিখেছে কলকাতার সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলির সম্পন্ন পরিবারের মেজ বউ হয়ে মৃণাল এই প্রথম শ্রীক্ষেত্রে এসে স্বামীকে পত্র লেখার সুযোগ পেয়েছে। পরিবারের কেউ জানত না যে মৃণাল সকলের অগোচরে কবিতা লেখে। এখানে কবিতা ছিল তার মুক্তির উপায়। যথাসময়ে সে একটি মেয়ের জন্মও দিয়েছিল। জন্মেই মেয়েটি মারা যায়। ঠিক এই সময়ে বড়জায়ের অত্যাচারিতা অনাথা বোন বিন্দু দিদির কাছে এসে আশ্রয় নিতে চাইল। তখন মৃণাল তাকে নিজের কাছে টেনে নিয়েছে। কিন্তু বাড়ীর সকলের বিষদৃষ্টিতে বিন্দুকে যখন এই বাড়ী থেকে বিদায় নিতে হল ঠিক সেই সময় মৃণাল প্রতিবাদ করেছে। বিন্দুকে যখন কৌশলে এক পাগলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয় তখন মৃণালের বড় জা সহজেই বলতে পেরেছে—‘ওর পোড়া কপাল, তা নিয়ে দুঃখ করে কী করব। তা পাগল হোক ছাগল হোক স্বামীতো বটে।’ এখানে বঞ্চিত লাঞ্চিত নারীর হয়ে মৃণালের প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদের সূত্রে তথাকথিক ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও মৃণালের বিদ্রোহিনী সত্তার আত্মপ্রকাশ আমাদের মুগ্ধ করে। মৃণাল দেখেছে কিভাবে বিন্দু সমস্ত অপমানের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। পাগল স্বামীর ঘর ছেড়ে বিন্দুকে ফিরে আসতে হয়েছিল মৃণালের শ্বশুরগৃহে। যদিও তার এই ফিরে আসা কেউই মেনে নিতে পারেনি। তার অত্যাচারের কথাগুলো কেউ আমল দিতে চায়নি। মৃণাল তাকে ঘরে বন্দী করে চেষ্টা করেছিল। ভালবাসার একমাত্র পাত্রীকে তারই জন্য গঞ্জনা সহ্য করতে হবে বলে বিন্দু স্বামী গৃহে ফিরে এসেছে। যদিও শেষরক্ষা হয়নি। অবশেষে কাপড়ে আগুন লাগিয়ে সে মুক্তি পেতে চেয়েছে। মৃণাল অনুভব করেছে এই সংসার— এই সমাজ নারী হত্যার এক একটি অন্ধকূপ। নিজের বুদ্ধিশক্তির উপর না দাঁড়াতে পারলে নারীদের মুক্তি নেই। মৃণালের স্বামী তার সংসারে প্রভুত্ব এবং অফিসে গোলামী করে জীবনপাত করেছে। বিন্দু বা মৃণালের দেখবার সুযোগ তাদের নেই। তাই ‘শ্রীচরণকমলেশ্বর’র মধ্যে দিয়ে পত্রের যে সূচনা ‘তোমাদের চরণতলাশ্রয়ছি’ মৃণালের মধ্যে দিয়েই তার পরিসমাপ্তি। স্বামীর চরণকমলেই স্বীর আশ্রয়। শেষে সেই চরণতলাশ্রয় ছিন্ন করে মৃণাল তার স্বাধীন মনুষ্যত্ব অর্জন করেছেন। মৃত্যুর পথে নয় জীবনের পথে মুক্তির পথ দেখতে পেয়েছে মৃণাল। তাই স্বীর পত্র হয়ে উঠেছে এক অবরোধবাসিনীর যথার্থ মুক্তি আকাঙ্ক্ষার কাহিনি যে কাহিনি রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম চলিত ভাষায় গল্প।

৭.৩.১১.৩ : হালদার গোষ্ঠী

এই পর্বের আমাদের তৃতীয় আলোচ্য গল্প হল ‘হালদারগোষ্ঠী’ যেটি ১৩২১ বঙ্গাব্দের বৈশাখের সবুজপত্রের প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটিতে আমরা দেখেছি একটি জমিদার বংশ কতকগুলি অচল-অনড় মূল্যবোধ নিয়ে ব্যক্তি মানুষকে গ্রাস করতে চেয়েছে। গল্পটির নায়ক বনোয়ারীর এই লড়াই বংশের বিরুদ্ধে ব্যক্তির লড়াই বা প্রকারান্তরে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। গল্পটির বাইরের চেহারা জমিদার-প্রজার সংঘাতের মতো সামাজিক সত্যের বাস্তবায়ন ঘটেছে। মধু কৈবর্তের সঙ্গে জমিদারের লড়াইয়ে বনোয়ারী কৈবর্ত প্রজার পক্ষ নিলে মধু কৈবর্ত জয়ী হয়েছে। কিন্তু জমিদারী রাখতে সত্যের অপলাপ ঘটানো হয়েছে। জমিদারই গোপনে টাকা দিয়ে মধুকে দেশান্তরী করে রটিয়ে দিয়েছেন মধুকে অমাবস্যার রাতে মা-কালীর সামনে বলি দেওয়া হয়েছে যেহেতু সে জমিদারের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। কিন্তু এই গল্প গোঁসাইগঞ্জের হালদার গোষ্ঠীর গল্প হয়ে থাকেনি গোষ্ঠী থেকে বেরিয়ে আসা ব্যক্তিমানুষের কাহিনি এই গল্প। বনোয়ারীর মধুর পিছনে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্য ছিল নায়েব নীলকণ্ঠের প্রতি বিরূপতা, মধুর ন্যায়

দুর্বল মানুষের প্রতি মমত্ব সর্বোপরি আপন বধু কিরণকে একান্ত করে পাওয়ার স্বার্থে তার কাছে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য প্রদানের ইচ্ছা প্রভৃতি একাধিক কারণ। বনোয়ারী সে পথে বাধা পেয়েছে একাধিকবার। ইঙ্গিত জয়ের লক্ষ্যে সে যতই পিছিয়ে পড়েছে ততই চরিত্র বাঁক নিয়েছে নতুন নতুন অভিমুখে।

কিরণ সম্পর্কে অসাধারণ সংবেদনশীল ছিল বনোয়ারী। বনোয়ারী ইচ্ছা করলে সংসারের গতানুগতিক চাকায় বাঁধা জীবনযাপন করতে সম্মত থাকলে সে প্রভূত সম্পত্তি পরিবার পরিজনসহ একটি মোটাসোটা গোলগাল বড় বউএর পদে আসীন স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে স্বচ্ছন্দে সুখে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতো। বনোয়ারীও স্ত্রীর পত্রের মৃণালের ন্যায় কবিতাপ্রেমিক নিসর্গ রসিক এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিল। সে-ও দুর্বলের প্রতি অবিচার ও লাঞ্ছনার প্রতিবাদ করতে গিয়ে আত্মীয়স্বজন এমনকি স্ত্রী সহানুভূতি পায়নি। তাই যে সংসারে বিচার-বিবেচনা অনুভূতি, প্রেম এমনকি স্বপ্নও নেই যেখান থেকে কিরণলেখাও গেছে হারিয়ে সেখানে থেকে আর কী হবে এই প্রশ্ন বনোয়ারীর সমগ্র হৃদয় জগৎকে মস্থিত করেছে। এখানে কিরণ বনোয়ারীর স্ত্রী নয় মুখ্যত হয়ে উঠেছে হালদার গোষ্ঠীর বধু। তাই বনোয়ারীর কোন সন্তানাদি না হলে এই নারী তা নিজেরই অক্ষমতা মনে করে বনোয়ারীর দ্বিতীয় বিবাহে আপত্তি করেনি। কিন্তু বনোয়ারী এই হীন প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে কিরণকে আপন মনের দোসর করে তুলতে চেয়েছে, তা ব্যক্তিসত্তাকে গুরুত্ব দিতে চেয়েছে। অথচ কিরণ বনোয়ারীর এই আচরণে সে হতবাক হয়েছে। সম্পত্তির উত্তরাধিকার এবং ভাইপো হরিদাসকে নিয়ে আর একবার প্রমাণ হয়ে গেছে কিরণ বনোয়ারীর কেউ নয়, সে সুবিখ্যাত গৌসাইগঞ্জের হালদার বংশের বড় বউ। অতএব বনোয়ারীর নিঃসঙ্গতা দূরীভূত হয়নি। সুতরাং আদর্শনিষ্ঠ রুচিবান মানুষটি আশ্রয়চ্যুত হয়ে চিঠি লিখে আবাস ত্যাগ করেছে। তার এই নিঃসঙ্গতার মূল কারণ বহুলাংশে আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নটিও আদৌ উপেক্ষণীয় নয়। কিরণকে ঘিরে বনোয়ারী চরিত্রের ঘোরাফেরা এবং মনোভূমির পরিচয় এই গল্পের অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি।

৭.৩.১১.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. ‘স্ত্রীর পত্র’ কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল?
২. ‘স্ত্রীর পত্র’ গল্পে লেখক কি বলতে চেয়েছেন?
৩. ‘হালদার গোষ্ঠী’ গল্পের নায়কের নাম কি?
৪. বনোয়ারীর নিজের বংশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কারণ কি?
৫. ‘স্ত্রীর পত্র’ গল্পে লেখকের জীবনদৃষ্টির স্বরূপ বিশ্লেষণ করো।
৬. হালদার গোষ্ঠী গল্পে পারিবারিক পরিস্থিতির মধ্যে লেখক কোন গুঢ়ার্থ প্রকাশ করতে চেয়েছেন আলোচনা করো।

৭.৩.১১.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. সাহিত্যে ছোটগল্প—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।
২. বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার —ড. ভূদেব চৌধুরী।
৩. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড)—ড. সুকুমার সেন।
৫. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য় খণ্ড)—ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

একক ১২

শেষ পর্যায়ের গল্প

বিন্যাসক্রম :

- ৭.৩.১২.১ : ভূমিকা
৭.৩.১২.২ : রবিবার
৭.৩.১২.৩ : শেষ কথা
৭.৩.১২.৪ : ল্যাবরেটরি
৭.৩.১২.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলি
৭.৩.১২.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলি
-

৭.৩.১২.১ : ভূমিকা

রবীন্দ্র ছোটগল্পের অন্য পর্যায়গুলি অতিক্রম করে অন্ত্যপর্বে উপস্থিত হলে দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথ এই সময় নারী পুরুষের ভেদরেখা স্বীকার করেননি। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে "Personality" গ্রন্থের "Woman" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "With the growth of man's spiritual life, our worship has become the worship of love." এই "growth of...spiritual life" মূলত চিন্তাশক্তির সম্প্রসারণ। এই চিন্তাশক্তির সম্পদ শুধু পুরুষের নয়, নারীরও বটে। নারী পুরুষ মিলিয়ে যে সামগ্রিক মানুষ তারই ধর্ম 'মানুষের ধর্ম'। 'সবুজপত্র' পর্ব থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত নারীচরিত্রে এই চিন্তাশক্তির প্রাথমিক উত্তরোত্তর গুরুত্ব পেয়েছে এবং এই অন্ত্য পর্বের গল্পে নারীর প্রেমে জৈব প্রাণশক্তির পরিবর্তে মানবিক চিন্তাশক্তিই জয়যুক্ত হয়েছে। পুরুষ ও নারীর স্বতন্ত্র সাধনা এখানে পরস্পরের প্রতিকূল নয়, পরস্পরের 'পথের আলো'। এই বিশেষ দিকেরই সার্থক অভিব্যক্তি।

অন্ত্য পর্বের গল্পে নারীর প্রেমে জৈব প্রাণশক্তির পরিবর্তে মানবিক চিন্তাশক্তির গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের গল্প বিশেষ করে 'রবিবার', 'শেষকথা', 'ল্যাবরেটরিতে' পুরুষ ও নারীর স্বতন্ত্র সাধনা 'পথের আলো' হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। 'রবিবার' গল্পে অভীক ও বিভার পূর্ব ইতিহাস এবং শেষে রয়েছে বিভার কাছে প্রতীচ্য যাত্রী অভীকের লেখা পত্র।

৭.৩.১২.২ : রবিবার

'রবিবার' গল্পটি আনন্দবাজার পত্রিকার ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 'রবিবার' প্রকাশের প্রায় দশ বছর পূর্বে ১৩৩৬ সালের কার্তিকে প্রকাশিত 'চিত্রকার' গল্পে যেন 'রবিবার' এর নায়ক অভীককুমারের বাল্যলীলা বর্ণিত হয়েছে। এই গল্পের প্রথমে রয়েছে অভীক ও বিভার পূর্ব ইতিহাস এবং শেষ রয়েছে বিভার কাছে প্রতীচ্য যাত্রী অভীকের লেখা পত্র। মধ্যবর্তী অংশে মূল গল্পটি রবিবারের সংকীর্ণ সীমায় বদ্ধ। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই

যায় ‘রবিবার’ কেন? রবিবার হল বিভার ব্রহ্ম মন্দিরে উপাসনার দিন। ব্রহ্মমন্দির থেকে ফিরে এসেই বিভার সঙ্গে অভীকের সাক্ষাৎ। ধর্ম যেমন অভীকের সঙ্গে তার পিতার সম্পর্ক ছিল করেছে তেমনি নাস্তিক অভীক ও আস্তিক বিভার মধ্যে ঘটিয়েছে মর্মঘাতী বিচ্ছেদ। রবিবার গল্পনামের এখানেই তাৎপর্য।

অভীকের জীবনে দুটো ‘উল্টো জাতের সখ’ আছে, তার একটি হল কলকারখানা জোড়াতাড়া দেওয়া আর অপরটি হল ছবি আঁকা। তার এই দুটি সখের মধ্যে তর-তম ভেদটি সুস্পষ্ট। বিজ্ঞান শুধু তার প্রয়োজনের পথে পাথেয় জুগিয়েছে। ত্যাজ্য পুত্র হবার পর অভীক বার্ণ কোম্পানীর কারখানায় মিস্ত্রির কাজ চালিয়েছে শেষে জাহাজের এঞ্জিনে কয়লা যোগানোর কাজ পর্যন্ত করেছে। তথাপি তার জীবনের পরম লক্ষ্য চিত্রশিল্পে প্রতিষ্ঠা অর্জন। অর্থাৎ বিজ্ঞান তার জীবনের বহির্মহলে সীমাবদ্ধ অন্তরঙ্গ চরিত্রধর্মে সে বিশুদ্ধ শিল্পী।

অভীকের আঁকা ছবির উপাসিকা সম্প্রদায়ের কোনদিনই অভাব হয়নি। অভীকের নির্দিষ্ট উক্তি ‘মেয়েদের ভালোবাসায় যে সদটুকু আছে সেটাতে আমার ইন্সপিরেশন।’ কিন্তু বিভা এই উপাসিকা মণ্ডলীর অর্ন্তগত নয়। অভীকের ছবি নিয়ে উল্লাস তার দৃষ্টিতে অশিক্ষিতের ন্যাকামি। অনেক পেয়েও শুধু বিভার অভ্যর্থনার অভাবে অভীকের তীব্র ক্ষোভ ছিল। সে কেবল ভাবতো সে যুরোপ যাবে আর সেখানে তার জয়ধ্বনি উঠলে বিভাও বসবে জয়মাল্য গাঁথতে।

বিভার সৌন্দর্য অভীকের ভাষায় ইন্সক্রুটেবল। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির ছবির সঙ্গে তুলনীয়। মোনালিসা। দুর্জয় বলেই বিভার প্রতি তার অনিশেষে আকর্ষণ। অমিতের কাছে যেমন লাভণ্য ছিল ‘বন্যা’। ঠিক তেমনি বিভা অভীকের ভাষায় ‘বী, আমার মধুকরী।’ এই ‘বী, আমার মধুকরী’ প্রেমিক হৃদয় মস্থিত শব্দদ্বয়ে রবিবার গল্পের গভীরতর ভাবসংকেত হয়ে উঠেছে। মৌমাছির সংসারে রাণী মৌমাছির অধিনেত্রী, যাকে ঘিরেই পুরুষ মৌমাছিদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড। অনুরূপভাবে অভীকের জীবনের বহির্বিশ্বে নানা নারীর আনাগোনা থাকলেও অন্তর্লৌকি তার জীবনের একমাত্র কেন্দ্রবর্তী শক্তি হল বিভা। পুরষের সাধনার নেপথ্যে রূপকার রূপে নারীশক্তিকে রবীন্দ্রনাথ যে কত বড় মর্যাদা দিয়েছেন, ‘মধুকরী’ শব্দটি তারই নিদর্শন।

বিভার কাছে কোন সুস্পষ্ট স্বীকৃতি না পাওয়ার অভীক কাঙাল হয়ে আছে। বিভার ঈর্ষা জাগিয়ে তোলার তাগিদে অভীক তার নব সহচরী শীলার স্তুতি করেছে। এমনকি শীলার জন্য ক্রাইসলার কিনবার জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মনীষার দেওয়া উপহার বহুমূল্য ঘড়িটি বেচার প্রস্তাব করেছে। ঈর্ষাজনিত বেদনার আঘাতে হৃদয় উন্মোচন করাই এই বানিয়ে তোলা গল্পের উদ্দেশ্য। তাই তার কথা—‘তোমার কাছে তা কেবল দাম চাইতে আসিনি। যেখানে তোমার ব্যথার উৎস সেখানে ঘা মেরে অঞ্জলি পাততে চেয়েছিলাম’।

অভীক বিভার ঈর্ষা উদ্রেকে ব্যর্থ হলেও স্বয়ং অভীকের গভীরে লুকানো কথা উদ্ঘাটিত হয়েছে ঈর্ষার পথেই। অমরবাবু চরিত্র নির্মাণের মূলে এই অভীকের গভীরে লুকানো কথা উদ্ঘাটিত হয়েছে ঈর্ষার পথেই। অমরবাবু চরিত্র নির্মাণের মূলে এই অভিপ্রায়ই ক্রিয়াশীল হয়েছে। এখানে লক্ষ্যণীয় বিভা তার পৈতৃক ট্রাস্ট ফাণ্ডের টাকা দু-দুবার অভীককে দিতে চেয়েছে। কিন্তু অমরবাবুর ক্ষেত্রে ‘ভালোবাসার সেই স্পর্ধাবেগ’ বিভার মনে নেই। অমরবাবু বিলাতযাত্রার পারানির বাড়ির প্রয়োজনে বিভা তার মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া গহনা বিক্রয়ে উদ্যত হয়েছে। এখানেই অভীক ও অমরবাবু সম্পর্কে বিভার মনোবভাবের বিস্তার পাঠ্যক্য বোঝা যায়। এর ফলেই অভীকের প্রেমিক হৃদয়ে উছলে পড়েছে বার্ণ। দুর্গাপূজার চাঁদার টাকা অভীক অমরবাবুর বিলাতযাত্রার ফাণ্ডে দান করেছে যার উদ্দেশ্য ছিল অমরবাবুর বিদেশযাত্রা ত্বরান্বিত করে বিভাকে অমরবাবুর সংস্পর্শ মুক্ত করা।

এই ঘটনায় অভীকের উপলব্ধি কঠিন প্রয়াসে নারীচিত্তের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি অর্জন করেই পুরষের তপস্যার সার্থকতা। নিজে থেকে পূর্ণ প্রকাশের সাধনায় স্বনির্ভর হয়েই তার বিলাতযাত্রা কিন্তু যাবার আগে সবার অগোচরে চুরি করে নিয়ে গেছে সেই হারখানি যেটি তাদের দুজনের প্রথম পরিচয়ের স্মৃতিতে এক হয়ে মিশে আছে। মনীষা উপহৃত ঘড়ি বেচতে গিয়ে সে স্পর্ধাভরে প্রামাণ্য করতে গিয়েছিল যে প্রেমের স্থায়ী মূল্যে সে বিশ্বাস করে না। কিন্তু বিভার হার বিক্রি করতে যাওয়া অভীকের পাঁজর ভাঙারই সামিল। রবিবার সকালে বিভার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে অভীকের প্রথম কথাই ছিল চুরির কথা যাকে চিঠিতে বলা হয়েছে, ‘মধুময় ঘর হতে একখানি মধুময় অপবাদ’। বিভার হারের বদলে অভীক গহনার বাস্তবের কাছে রেখে এসেছে তার আঁকা একতাড়া ছবি। তার বিশ্বে ‘হঠাৎ যেমন কোদালের মুখে গুপ্তধন বেরিয়ে পড়ে, আমি জাঁক করে বলছি, তেমনি আমার ছবিগুলোর দুর্মূল্য দীপ্তি হঠাৎ বেরিয়ে পড়বে।’ এই বিনিময়ের তাৎপর্য হল অভীক তার চিত্রকলন প্রতিভা দিয়েই একদিন বিভার গলার হারখানি জয় করে নেবে।

চিঠির মধ্যে দিয়ে সমে এসে পৌঁছানো ‘রবিবার’ গল্পের কাল-ঐক্য দৃঢ়সংবদ্ধভাবে রূপায়িত হয়েছে। অভীকের এই চিঠির মধ্যে দিয়েই রবিবার গল্পের মূল বক্তব্য সম্যকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। একমাত্র ‘ডিটেক্টিভ’ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের অন্য কোন ছোটগল্প চিঠি দিয়ে শেষ হয়নি। অভীকের জীবনে অন্য নারী নীহারিকা মণ্ডলী আর বিভা একটিমাত্র ধ্রুবনক্ষত্র। অভীকের সমুদ্রযাত্রার ধ্রুবনক্ষত্র রূপকল্পটি মিলিয়ে দেখলে স্পষ্টই অনুভূত হয় বিভাই অভীকের তরঙ্গ-চঞ্চল জীবনের স্থির দীপ্তির পথপ্রদর্শিকা। ‘শেষের কবিতা’র অমিতের মতোই অভীকও প্রেমদর্শনে রবীন্দ্রবৃত্তে প্রত্যাবর্তন করেছে। বিভাকে অভীক বলেছিল ‘তপস্বীনি’—প্রেমই তার তপস্যা। নাস্তিক অভীক শেষ পর্যন্ত তপস্বিনীকে বলেছে ‘এই আমার মধুকরী জগতে সবচেয়ে ভালোবেসেছি তোমাকে। সেই ভালবাসার কোন একটা অসীম সত্যভূমিকা আছে যদি মনে করা যায়, আর তাকেই যদি বল তোমাদের ঈশ্বর, তাহলে তাঁর দুয়ার আর তোমার দুয়ার এক হয়ে রইল এই নাস্তিকের জন্য’। ধর্ম একদিন তাদের মধ্যে ব্যবধান রচনা করেছিল কিন্তু ‘প্রেমের পূজাই যখন হবে ঈশ্বরের পূজা তখন ঈশ্বরের দুয়ার আর প্রেমের দুয়ার এক বাহ্যিক আচারধর্মে যে নাস্তিক, আত্মিক প্রেমধর্মে সে ভক্ত।

৭.৩.১২.৩ : শেষ কথা

‘শেষ কথা’ এই পর্বের একখানি অসাধারণ গল্প যেখানে নারীর জৈব শক্তির পরিবর্তে মানবিক চিত্রশক্তিই জয়যুক্ত হয়েছে। পুরুষ ও নারীর স্বতন্ত্রসাধনা এখানে পরস্পরের প্রতিকূল নয় ‘পথের আলো’। গল্পটি ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন মাসে ‘শনিবারের চিঠি’তে প্রকাশিত হয়। গল্পটির দুটি স্বতন্ত্র পাঠ আছে যেগুলি খুঁটিয়ে মেলালে উভয়ের ভাষাশিল্পে ‘সূক্ষ্ম স্বরাস্তর’ লক্ষ্য করা যায়।

গল্পটির নায়ক নবীনমাধব আর নায়িকা অচিরা। অত্যন্ত সামান্য চরিত্রের মধ্যে দিয়েই এই ভাবগর্ভ গল্পটি রূপায়িত হয়েছে। নবীনমাধবের ব্রত হল ‘ন্যাশনাল দুর্গের ভক্তি দৃঢ় করা। সে পাশ্চাত্যে শিক্ষাগ্রহণ করেছে। দীক্ষা নিয়েছে যন্ত্রবিদ্যায় আর সেইসঙ্গে খনিবিদ্যা আর খনিজ বিদ্যা শিখেছে যা দিয়ে মাটি ফুঁড়ে দুহাত ভরে আনা যায় রত্নগর্ভা ধরণীর গুপ্তধন। ছত্রিশ বছরের এই ছেলেমানুষ পাশ্চাত্যে নারীসত্তা সম্পর্কে বিশেষ সংযম রক্ষা করেছে আর দেশে ফিরে মায়ের বিবাহের অনুনয় উপেক্ষা করে কর্মযোগী হয়েছে ছোটনাগপুরে জিলাজিক্যাল সার্ভের কাজে। জঙ্গল মহলের এই পৃথিবী তাকে জিলাজি চর্চার মধ্যেই ভিতরে ভিতরে মায়াময় এবং আবিষ্ট করে

তুলেছে। গোপুলির সময়ঝুলিতে মাটি পাথরের নমুনা নিয়ে বাংলা ঘরে তার প্রাত্যহিক কর্ম ছিল। এমনই এক অপরাহ্ন আর সন্ধ্যার মাঝখানেই হঠাৎ অচিরার সঙ্গে দেখা। গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে পাঁদুটি বুকের কাছে নিয়ে সে একমনে লিখছিল ডায়েরির খাতা। নবীনমাধবের একটা কিছু বলতে ইচ্ছে করছিল কিন্তু মানুষের সাথে আলাপের প্রথম কথাটি খুঁজে পাচ্ছিল না। ক্রমে ঘটনাচক্রে সে খুঁজে পেল আলাপের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম কথা। তার বিজ্ঞানী বুদ্ধিতে রহস্য উদ্ভিক্ত হল— কার অপেক্ষায় বসে আছে মেয়েটি— ক্রমে খুঁজে পাওয়া গেল ভাবতোষের নাম ঠিকানা লেখা ছেঁড়া খাম।

‘শেষকথা’ গল্পের নায়ক নবীনমাধব আর নায়িকা অচিরা। এখানে নবীনমাধবের জীবনে অচিরার মুক্তিই বড় দান, অধ্যাপকের মতে যা তার কীর্তির পথকে প্রশস্ত করবে।

পরে সেই সূত্রধরেই আবিস্কৃত হল অচিরার জীবনরে পূর্বকথা। ভবতোষ অচিরাকে ভালোবাসার ভান করেছিল। পরে তাদেরই আনুকূল্যে বিদেশ যায়। সেখান থেকে ফিরে এসে ভারত সরকারের এক উচ্চপদস্থ ব্যক্তির (কর্মচারী) মেয়েকে বিয়ে করে এবং অচিরাকে বোঝাতে চায় এও দেশের জন্য। কিন্তু এত সহজ নয় অচিরাকে ছলনা করা। এরপর নবীন অচিরার বাড়ীতে গেছে তার দাদুর সাথে আলাপ হয়েছে। অধ্যাপক দাদু ডক্টর নবীনমাধবের আগমনে খুশিই হয়েছেন। এর পূর্বে ভাবতোষের কাণ্ডে অধ্যাপক ভীড়ে ঠাসা সামাজিক জীবন পরিত্যাগ করেছেন এবং নাতনিকে নিয়ে মানব সঙ্গহীন পরিবেশে জীবন নির্বাহ করছেন। সেখানেই নবীন মাধবের সঙ্গে অধ্যাপকের আলাপন। ক্রমে নবীন-মাধব-অচিরার দেখাশোনা, আলাপ চেনাশোনা পর্যবাসিত হয়। পারস্পরিক মোহ ক্রমশ ঘনীভূত হতে থাকে। অচিরা ও তার দাদুর চেতনার চিন্তধর্মের ঐশ্বর্যের সাথে পরিচিত হয়েছে নবীনমাধব। অচিরার মুখে শুনেছে দাদুর উক্তি ‘মানুষের সত্য তার তপস্যার মধ্যে দিয়ে অভিব্যক্ত হয়ে উঠছে। তার অভিব্যক্তি বায়েলজির নয়’ কিংবা দাদুর মানববোধ তার মুখে উঠে এসেছে ‘পুরাণে দেবতার কল্পনা আছে কিন্তু অতীতে দেবতা ছিলেন না, দেবতা আছেন ভবিষ্যতে মানুষের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে।’ অধ্যাপক একদিন নবীনকে জিজ্ঞাসা করেছেন তোমার কি বিবাহ হয়েছে? নবীন উত্তর দিয়েছে এখনও তো হয়নি। ক্রমে নবীন পাশ্চাত্যে আত্মসংযমী থাকতে পারলেও এক্ষেত্রে অচিরার প্রতি অসীম ভাবাবিস্তি হয়েছে। তার উক্তি ‘কোন প্রবল ভূমিকম্পে পৃথিবীর তলায় যে লুকানো আগ্নেয় সামগ্রী উপরে উঠে পড়ে, জিয়লজিস্ট্রে তা পড়েনি। নিজের মধ্যে দেখলুম সেই নীচের তলায় অন্ধকারে তপ্তবিগলিত জিনিসকে হঠাৎ উপরের আলোতে’। নদীতীরে চডুইভাতির দিনে অচিরা-নবীনমাধবের কথোপকথনের গল্পটি চূড়ান্ত মাত্র পেয়েছে। তখন নবীন মাধবের জিয়লজিক্যাল সার্ভের কাজ প্রায় শেষ। তাই সে ভালোবাসার কথাটা প্রকাশ না করে পারেনি। এখানে অচিরা ‘এখনো’ বিবাহ হয়নি শব্দটাকে নিয়ে নবীনকে বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করেছে এবং এখানেই শুনিয়েছে তার প্রধান বক্তব্য বা শেষ কথা। অচিরা বলেছে সে অনুভব করেছে বনের মধ্যে একটা রান্সস আর একটা অন্ধ প্রাণশক্তি আছে ক্রমেই সে তাকে গ্রাস করেছে। এক্ষেত্রে তার অভিমত দীর্ঘকালের প্রয়াসে মানুষ চিত্রশক্তিতে নিজের আদর্শকে আক্রমণ। এই পরাজয়ের বিষ আপনাকে আপনার কর্ম থেকে বিরত করেছে। নবীনমাধব ভালোবাসা এবং ভবতোষের কথা তুললে অচিরা বলেছে সেই আমার জীবনের প্রথম ভালোবাসা আর এই মোহ এক নয় এ অন্ধশক্তির আক্রমণ। এ নিষ্ফল সাধনা তার মতে পুরুষের সম্পদ তার জ্ঞান যার মেয়েদের হৃদয়-মেয়েদের লক্ষ্য ব্যক্তিগত পুরুষের নৈব্যক্তিক। তাই তার ভবতোষকে ভালবাসা নয় এ তার জীবনের প্রথম ভালোবাসাকেই ভালোবাসা। অচিরা একেই বলেছে সত্যি। অবশেষে উভয়েই অরণ্যলোক থেকে প্রত্যাবর্তন করেছে। অধ্যাপকও পুনরায় শিক্ষাদানে ব্রতী হয়েছেন। নবীন ফিরে পেয়েছে তার বিজ্ঞান সাধনা অচিরা শেষ কথাটা বলেছে— খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেছে পাখি কিন্তু পায়ে আছে একটুকরো শিকল, নড়তে চড়তে সেটা বাজে। এই অসাধারণ উক্তি আমাদের প্রাণকেও স্পর্শ করে। এখানে

নবীনমাধবের জীবনে অচিরার মুক্তিই বড় দান অধ্যাপকের মতে যা তার কীর্তির পথকে প্রশস্ত করবে। ছিন্ন শিকল তার ওড়াতে ব্যাঘাত ঘটাবে না, ও ডাকেই আনন্দময় করে তুলবে।

নবীনমাধবের কীর্তিসাধনার ভাবী দিগন্তে হঠাৎ যে একটুকু গল্প ফুটে উঠেছে তাতে আলেখ্যের চেহারাও আছে আরো শুকতারার। গল্পটি কাব্যসুরভিত গদ্যে রচিত এবং ছোটগল্পের শিল্পশালায় দীপ্তিতে ভাস্বর। শুধুমাত্র আঙ্গিক নয় অসাধারণ ভাববস্তু গল্পটিকে কালের সীমা উত্তরণের পথে পাথেয় জুগিয়েছে।

৭.৩.১২.৪ : ল্যাবরেটরি

আজকের এই পর্বের তৃতীয় আলোচ্য গল্প ‘ল্যাবরেটরি’ যেটি ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে আনন্দবাজার পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটিতে বিজ্ঞানী নন্দকিশোর এবং সোহিনীর কথাই মূলত বলা হয়েছে। সোহিনী নন্দকিশোরের অনুরতা অর্থাৎ নন্দকিশোরের ব্রতই সোহিনীর ব্রত, একত্রিত্যই তাদের দাম্পত্যের ভিত্তি। নন্দকিশোর ছিল বিজ্ঞানসাধক। তার জীবনব্যাপী সেই অনন্য সাধনারই প্রতীক ল্যাবরেটরী। সেই সাধনার কাছে কার নিজের প্রাণও তুচ্ছ। তাই দুঃসাহসিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাসমূহ সে নিরন্তরভাবেই করে চলেছিল যার ফলশ্রুতি তার মৃত্যু। তার কথায় ‘মানুষ প্রাণপণে প্রাণ বাঁচাতে চায়, কিন্তু প্রাণ তো বাঁচে না। সেইজন্য বাঁচবার শখ মেটানোর জন্য এমন কিছুকে সে খুঁজে বেড়ায় যা প্রাণের চেয়ে অনেক বেশি।’ সেই দুর্লভ জিনিস নন্দকিশোর ল্যাবরেটরিতে পেয়েছিলেন। ল্যাবরেটরিতে সোহিনী প্রতিষ্ঠিত মূর্তিটি তাকে যশঃশরীরে মৃত্যুঞ্জয় করেছে। এজন্য এই ল্যাবরেটরীই সোহিনীর কাছে পূজার দ্রব্য এবং এই ল্যাবরেটরির টাকা দেবতার ভাণ্ডার।

পাঞ্জবের মেয়ে সোহিনীকে যে অবস্থা থেকে নন্দকিশোর এনেছিলেন সেটা খুব নির্মল নয়। সোহিনীর মধ্যে ঝকঝক করছিল ক্যারেকটারের তেজ। তাই তার আইমার কাছে থেকে সাত হাজার টাকায় কিনে এনে নন্দকিশোর নিজমস্ত্রে দীক্ষিত করেছিল এবং বলেছিল ওকে নন্দকিশোরী করতে হবে। সেটা যে-সে মেয়ের কাজ নয়। শাস্ত্রমতে তাদের বিয়ে না হলেও সোহিনী কিন্তু পতির অনুরতা— এই নব অর্থেই সে পতিব্রতা। ‘পতিব্রতা স্ত্রী চাও যদি, আগে ব্রতের মিল করাও,’ নন্দকিশোরের এই উক্তিই সমগ্র গল্পের সারকথা।

এখানে আমরা দেখেছি সোহিনীর চরিত্রে চিন্তাশক্তি এবং ঘ্রাণশক্তির সহাবস্থানের নবরূপ। চিত্রধর্মে সোহিনী নন্দকিশোরের যথার্থ অনুরতা কিন্তু প্রাণধর্মে সে ছিল স্বচ্ছন্দ স্বেয়িণী। তাই সে বলে— ভড়ং করতে করতে প্রাণ বেরিয়ে গেল মেয়েদের দ্রৌপদী কুন্তীদেব তাই সেজে বসতে হয় সীতা সাবিত্রী। নন্দকিশোর সম্পর্কে তাই সোহিনীর উক্তি, ‘যেখানে আমি ছিলাম ছোট সেখানে আমি তাঁর চোখে পড়িনি। যেখানে আমি ছিলাম বড়ো সেখানে তিনি আমাকে পুরো সম্মান দিয়েছেন।’ অর্থাৎ জীবনসত্তার স্বভাবজ ধর্মকে অতিক্রম করেই তাদের ব্রতের মিল সুসম্পন্ন হয়েছে। নিজের প্রাণধর্মের বহুচারীতাকে সোহিনী শেষ পর্যন্ত জয় করেছে। তার জীবনে নন্দকিশোরের মৃত্যুই এই জয় দান করেছে। তিনি যাবার পথে তার চিতার আগুনে আমার আসক্তিতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন। জমা পাপ একে একে জ্বলে যাচ্ছে। এই ল্যাবরেটরিতে

‘ল্যাবরেটরি’ গল্পটি ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে ‘আনন্দবাজার’ পত্রিকায় শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটিতে বিজ্ঞানী নন্দকিশোর এবং সোহিনীর কথাই মূলত বলা হয়েছে নন্দকিশোর ছিলেন বিজ্ঞান সাধক। তার জীবনব্যাপী সেই অনন্য সাধনারই প্রতীক ল্যাবরেটরী।

জ্বলছে সেই হোমের আগুন'। নন্দকিশোর নিষ্কাম লোভে ল্যাবরেটরি গড়ার জন্যই রেলওয়ে কোম্পানী থেকে টাকা চুরি করেছিলেন। আর সোহিনী ল্যাবরেটরি রক্ষার জন্যই নিজের নারীত্বকে অনাসক্তভাবে ব্যবহার করেছে।

গল্পটিকে রেবতী, নীলা, প্রভৃতি কয়েকটি চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। রেবতী যখন প্রথম ল্যাবরেটরিতে উপস্থিত হয়েছে তখন তাকে দেখে মনে হয়েছে সে বিজ্ঞান সাধনায় নিষ্কম্প সনিষ্ঠ। কিন্তু পরে তার মধ্যে নীলার প্রতি আকর্ষণ লক্ষ্য করা গেছে। রেবতীকে পরীক্ষা করে সোহিনী বুঝেছে হাতে হাতে ফল পাওয়া যেতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকবে না। এই কারণে নীলার সঙ্গে রেবতীর বিবাহের সংকল্প পরিত্যক্ত হয়েছে। স্থির হয়েছে ল্যাবরেটরি হবে জনগণের সম্পত্তি আর রেবতী হবে তার প্রেসিডেন্ট। কিন্তু সেই সাবধানমূলক প্রচেষ্টায় রেবতীকে নীলার মৃত্যুটান থেকে রক্ষা করতে পারেনি। সোহিনী বলে যাওয়ার অব্যবহিত পরেই ল্যাবরেটরিতে নীলার নেপথ্যাভিসারে রেবতী সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়েছে। রেবতীর জীবনে এ সময় দুটি ভিন্ন দিক থেকে দুটো প্রস্তাব এসেছিল। প্রথমটি ল্যাবরেটরির ট্রাস্ট প্রেসিডেন্ট পদগ্রহণের, আর দ্বিতীয়টি জাগানী ক্লাবের প্রেসিডেন্ট পদের। প্রথম সাক্ষাতে যে বিজ্ঞানরতী ব্রাহ্মণ রূপে রেবতীর পায়ে প্রণাম করেছিল সোহিনী সেই রেবতী গল্পের অন্ত্যভাগে জাগানী সভার সভাপতির অভিভাষণ সম্পর্ক আলোচনা রত এবং তার আসন নীলার পদপ্রান্তে।

ল্যাবরেটরির ঋত্বিক নির্বাচনে সোহিনী ভুল করেছিল। কিন্তু সর্বনাশের আগেই তা সংশোধিত হয়েছে এবং সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করে সোহিনী ল্যাবরেটরি রক্ষার্থে সক্ষম হয়েছে।

গল্পটি রচনাকালে রবীন্দ্রনাথের বয়স উনআশি অতিক্রম করেছে সেজন্য গল্পটির ভাষায় ও নির্মাণশিল্পে কোথাও কোথাও বাধ্যকের দৌর্বল্য ও অবসাদজনিত ভুলভ্রান্তি লক্ষ্য না করে পারা যায় না। গল্পের প্রথম পরিচ্ছেদে সোহিনীর সঙ্গে নন্দকিশোরের প্রথম সাক্ষাতের পরবর্তী অংশে নন্দকিশোর সম্পর্কিত ক্রিয়াপদে অনেক সময় অসঙ্গতি দেখা গেছে। যেমন বললে ও বললেন, বলত ও বলতেন ইত্যাদি পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে রেবতী পরদিন সকালে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আর এসেছে সপ্তম পরিচ্ছেদে ২ দিন পরে। এটি সময় বিন্যাসের ত্রুটি। তাছাড়া উৎকৃষ্ট ছোটগল্পের দৃঢ়তাবদ্ধ ভাব সর্বদা রক্ষিত হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে সংলাপ প্রগল্ভতায় পর্যবসিত হয়েছে। তবে সংলাপের নেপথ্যে ভাষ্যের ক্ষেত্রে মনন প্রধান ও বাঙ্গ প্রধান ভাষার ঘনিষ্ঠ সহাবস্থানে গল্পের গতি তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে। এইসব অল্পস্বল্প ব্যতিরেকে মানবমনের পরীক্ষাগার তথা প্রতীকরূপে ল্যাবরেটরি অসামান্য।

৭.৩.১২.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের তিনটি গল্পের নাম কি?
২. রবিবার গল্পের নায়কের নাম কি?
৩. 'শেষকথা' গল্পের মূল লক্ষ্য কি?
৪. 'ল্যাবরেটরি' গল্পটি কত বঙ্গাব্দে কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল?
৫. 'ল্যাবরেটরি' গল্পে একজন বিজ্ঞান সাধক আছেন, তার নাম কি?
৬. রবীন্দ্র ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করো।

৭. রবীন্দ্রনাথের হিতবাদী— পর্বের গল্পে জীবনের শিল্পিত রূপায়ণ কিভাবে হয়েছে তা ‘দেনা-পাওনা’ অথবা ‘পোস্টমাস্টার’ গল্প-অবলম্বনে আলোচনা করো।
৮. সবুজপত্র-পর্বের ছোটগল্পগুলি কেবল খণ্ডিত মানবজীবনের প্রতিভাস নয়, জীবন-ব্যাখ্যার রসভাষ্য— পঠিত গল্প অবলম্বনে আলোচনা করো।
৯. রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের গল্পগুলি আসলে মানবসত্তার বিচিত্র অনুষঙ্গ ও চিত্তশক্তির প্রাচুর্যের রূপায়ণ।—আলোচনা করো।
১০. ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ নিবন্ধ রচনা করো।
১১. স্ত্রীরপত্র/হালদার গোষ্ঠী— তিনটি গল্পের যে-কোনো একটিকে অবলম্বন করে লেখকের জীবনদৃষ্টি ব্যাখ্যা করো।
১২. সাধনা-পর্বের গল্পগুলির (ছুটি, মেঘ ও রৌদ্র, ক্ষুধিত পাষণ প্রভৃতি) মধ্য থেকে যে-কোনো একটি গল্প বেছে নিয়ে তার শিল্পমূল্য বিচার করো।
১৩. ‘ক্ষুধিত পাষণ’ গল্পে অতিপ্রাকৃত আবহের ব্যবহার কিভাবে গল্পরসের আকর্ষণ বর্ধিত করেছে তা আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।

৭.৩.১২.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. সাহিত্যে ছোটগল্প—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।
২. বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার —ড. ভূদেব চৌধুরী।
৩. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড)—ড. সুকুমার সেন।
৫. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য় খণ্ড)—ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

পর্যায় গ্রন্থ-৪
গোরা
একক ১৩
উপন্যাসের প্রেক্ষাপট

বিন্যাসক্রম

- ৭.৪.১৩.১ : ভূমিকা
৭.৪.১৩.২ : উপন্যাসের প্রেক্ষাপট
৭.৪.১৩.৩ : বিষয়বস্তুর মহনীয়তা
৭.৪.১৩.৪ : তত্ত্বগত ভিত্তি
৭.৪.১৩.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলি
৭.৪.১৩.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৭.৪.১৩.১ : ভূমিকা

সাধারণভাবে উপন্যাস হলো দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ বিমথিত মানবজীবনের শিল্পিত গদ্যরূপ। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞায় উপন্যাসের মৌল জীবনধর্মকে বোধকরি সামগ্রিকভাবে ধরা যায় না। তাই উপন্যাসের সংজ্ঞা-আকার-প্রকৃতি জীবনাবেদন প্রভৃতি সাহিত্যকেদ্রিত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে সমালোচকগণের মধ্যে সহমতের নিতান্ত অভাব। কিন্তু মহাকাব্য ও মহৎ উপন্যাসের স্বরূপধর্ম প্রসঙ্গে তাঁরা আশ্চর্যভাবেই ঐক্যমত্যে পৌঁছেছেন। আকার ও প্রকৃতিগতভাবে মহাকাব্য একদিক থেকে যেমন বিশাল পরিসরে বিধৃত কাব্য, অন্যদিকে তেমনি মহত্ব ও গুরুত্ব অনন্য। মহাকাব্য তা বৃহৎ ও মহৎ কাব্য। উপন্যাসও যদি মহাকাব্যের পরিসর ও মহত্বের লক্ষণে বিধৃত হয় তবে তা অবশ্যই হয়ে ওঠে মহাকাব্যিক ও মহৎ উপন্যাস। স্বভাবতই মহাকাব্যের সঙ্গে উপন্যাসের শিল্পরূপ বা শৈলীগত স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও ঐ মৌল বৈশিষ্ট্যের নিরিখে তাদের মধ্যকার মিলটুকু খুঁজে নিতে হয়।

মহাকাব্যে যেমন সমস্ত জাতির সমষ্টিগত জনমানসের সঙ্গে যোগ থাকে, মহৎ উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তাই। সেজন্য মহৎ উপন্যাসকে এপিক-উপন্যাস বলা হয়ে থাকে। ‘যাহার রচনার ভিতর দিয়া একটি সমগ্র দেশ, একটি সমগ্র যুগ আপনার হৃদয়কে, আপনার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করিয়া তাহাকে মানবের চিরন্তন সামগ্রী করিয়া তোলে—’ সেই সাহিত্যসৃষ্টিকে রবীন্দ্রনাথ মহাকাব্যিক লক্ষণযুক্ত বলেছেন। সেদিক

উপন্যাস দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ বিমথিত মানবজীবনের শিল্পিত গদ্যরূপ। মহাকাব্য যেমন বিশাল পরিসরে বিধৃত কাব্য, উপন্যাসেও মহাকাব্যের পরিসরে ও মহত্বের লক্ষণে বিধৃত হয়। সাধারণ উপন্যাসে চরিত্রের সঙ্গে কোনও জাতির খণ্ডাংশ মাত্র অভিব্যক্ত হয়, শিল্পীর উপন্যাসকে মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত বলে ধরা হয়, তার জন্য সমগ্র-জাতির হৃদয় থেকে, জনমানস মন্থন করে।

থেকে বস্তুনিষ্ঠ ভাবের এক ব্যাপক মহান প্রকাশ মহাকাব্য। যে উপন্যাসকে মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত বলে ধরা হয়, তার জন্ম সমগ্র জাতির হৃদয় থেকে, জনমাস মস্থন করে।

সাধারণ উপন্যাসে কিন্তু এমন হয় না। সেখানে চরিত্র হিসেবে কয়েকজন মানুষ উপস্থাপিত হয়, কখনও বা কোনও জাতির খণ্ডাংশমাত্র অভিব্যক্ত হয়, সেই প্রকাশ হয় শিল্পীর বিশেষ চিত্তের অনুরঞ্জে। এদিক থেকে গীতিকবিতার সঙ্গে উপন্যাসের সাদৃশ্যের কথা মনে আসে। ব্যক্তি বা শিল্পীর হৃৎপদ্ম সম্ভব গীতিকবিতার সাথে সাধারণ উপন্যাসের মিল আছে কোথাও। ‘সর্বরসসিদ্ধ’ উপন্যাসিক তা কবিতার আবেগকে বিপুল চৌম্বকে আকর্ষণ করেই থাকেন।

৭.৪.১৩.২ : উপন্যাসের প্রেক্ষাপট

রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা’ মহৎ উপন্যাস। শিল্পী রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিমানস মাত্র নয়, তার আশ্রয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশের সমগ্র বঙ্গমানস এই উপন্যাসে প্রতিফলিত। এই সময়ে জাতির ভাবনা, ধ্যান, তপস্যা, ধর্মীয় অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তা ‘গোরা’র রূপান্তরিত। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগের জনমানস মস্থন করে ‘গোরা’—সুখালক্ষ্মী আবির্ভূত। সে যুগের সমস্ত সমস্যা ও সংকট উপলব্ধি করলে একথা আরও স্পষ্ট হয়।

গোরা আইরিশ দম্পতির সন্তান, সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তার জন্মকাল। উপন্যাসের পটভূমি আনুমানিক ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে। কংগ্রেসের সূত্রপাত ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে—আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের এটিই আনুষ্ঠানিক তারিখ। রবীন্দ্রনাথ ১৮৮০-৮৫ এই সময়কে রেখেছেন উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে।

উল্লিখিত কালপূর্বে বাংলাদেশের ধর্মসংক্রান্ত আন্দোলন মূলত ব্রাহ্মধর্ম ও হিন্দুধর্মকেন্দ্রিক। ব্রাহ্মধর্মের মৌল আদর্শ একেশ্বর উপাসনার জন্য রামমোহন রায় ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে ‘আত্মীয়সভা’ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরে এই সভাই ‘ব্রাহ্মসমাজ’ নাম ও রূপ পায়। রামমোহন মূলত যুক্তিবাদী বা বিজ্ঞানবাদ দিয়ে নয়, হিন্দুশাস্ত্র থেকেই প্রমাণ দাখিল করে সহমরণ প্রথা প্রমুখ হিন্দুধর্মের জঞ্জাল সরাতে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রতিপাদ্য ছিলো ‘হিন্দুধর্মে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাই প্রকৃষ্ট।’ এই বক্তব্য প্রকাশ ও প্রচারের সামাজিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো দূরকম। একদিকে তাঁকে ঘিরে শহরের কিছু বিশিষ্ট বিদ্বজ্জন সমবেত হলেন। নতুন চিন্তার আলোয় রামমোহন যে শিক্ষা সাহিত্য, জ্ঞান বিজ্ঞান, সভ্যতা সংস্কৃতি সকল দিক থেকেই মানুষের দৃষ্টিকে নতুন দিগন্তে প্রসারিত করতে চাইছেন, কিছু সংখ্যক মানুষ এই বিষয়টি উপলব্ধি করলেন। অন্যদিকে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ হয়ে উঠলেন তাঁর শত্রু। ‘ধর্মসভা’ (১৮৩০)-র আশ্রয়ে থেকে রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিরোধী শক্তির প্রতিভূ। ১৮৩২-এ রামমোহনের বিদেশে মৃত্যু হলো। তার পর থেকেই ‘ব্রাহ্মসভা’র পূর্বদীপ্তি কমে গিয়ে স্তিমিত হয়ে এলো। ১৮৪৩ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ১৮৪৬-এ রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলে এই শুষ্কপ্রায় ব্রাহ্মসভাতে

রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা’ মহৎ উপন্যাস। ঊনবিংশ শতাব্দীর জাতির ভাবনা, তপস্যা, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তা উপন্যাসে রূপান্তরিত। রবীন্দ্রনাথ ১৮৮০-৮৫ এই সময়কে রেখেছেন উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে। ‘গোরা’ উপন্যাসে হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মের সংঘাতের রূপচিত্র রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরতে চেয়েছেন। ‘গোরা’ যে প্রেক্ষাপটের ওপরে চিত্রিত এবং যে সামগ্রিকতা নিয়ে উপস্থাপিত তা যথার্থই মহাকাব্যোচিত। ‘গোরা’ উপন্যাসের স্থানগত পটভূমি কলকাতা শহর হলেও দেশকে জানার উদ্দেশ্য নিয়ে গোরা ত্রিবেণী-সংগমে দেশবাসীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এবং চারঘোষপুরের বিচিত্র অভিজ্ঞতার শোষণ ও অত্যাচারের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

পুনঃপ্রভাব দেখা দিলো। এর আগেই অবশ্য ধর্মতত্ত্ব আলোচনার উদ্দেশ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক তত্ত্বরঞ্জিনী সভা স্থাপিত হয়েছিলো (৬/১০/ ১৮৩৯)। দ্বিতীয় অধিবেশনে এই সভার পরিবর্তিত নাম হয় ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ প্রকাশিত হয়। এ বছরেই দেবেন্দ্রনাথ ও আরও উনিশ জন বন্ধুর সঙ্গে অক্ষয় দত্ত ও ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের ধর্মবিশ্বাস বেশিদিন একাত্ম থাকেনি। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদে বিশ্বাসী অক্ষয়কুমার বেদের তথা দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রাহ্ম সমাজশাস্ত্রের অদ্রোহিতার বিশ্বাস বর্জন করলেন। দেবেন্দ্রনাথের মূল বিশ্বাস হৃদয়োপলব্ধির গহনে, তিনি বললেন হৃদয়বৃত্তির সত্যই ধর্ম। এরপর ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে স্বদেশপ্রেমী, সুপণ্ডিত ও অসাধারণ বাগ্মী তরুণ কেশব সেন যোগ দিলেন ব্রাহ্মসমাজে। দেবেন্দ্রনাথের প্রিয়পাত্র এবং ব্রাহ্মসমাজের নেতা কেশব সেনের বক্তৃতা বা সভা প্রসঙ্গ ‘গোরা’ উপন্যাসে বারে বারেই এসেছে অনুঙ্গ হিসেবে। কেশব সেনের সময়ে ও তৎপরবর্তীকালেও ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যে মতান্তর ও বিরোধ সক্রিয় ছিলো, দেশের বিদগ্ধজনকে তা অনিবার্যভাবে ভাবিয়েছে, প্রভাবিত করেছে। ১৮৬১-তে কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ‘ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ’, ১৮৭৮ এ শিবনাথ শাস্ত্রীর সাধারণ ব্রাহ্মণসমাজ, পুনরাপি কেশব সেন স্থাপিত ‘নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ’ ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারপ্রবণতা ও সজীবতারও সাক্ষ্য বহন করে। উল্লেখ্য, ব্রাহ্মসমাজ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সকলের কাছেই জাতীয়তামূলক ও সমাজসংস্কারমূলক শিক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পরিকল্পনা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে গৃহীত হয়েছিলো। কেশববাবুর বক্তৃতা শোনায গোরায় আগ্রহ— ‘এদিকে কেশববাবুর বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া গোরা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল’ (পরিচ্ছেদ-৫)। অপরদিকে হিন্দুধর্মীয়দের গোঁড়ামি—‘আবার এই সময়টাতেই কৃষ্ণদয়াল ঘোরতর আচারনিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। এমনকি গোরা তাঁহার ঘরে গেলেও তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। গুটি দুই-তিন ঘর লইয়া তিনি নিজের মহল স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলেন। ঘটা করিয়া সেই মহলের দ্বারের কাছে ‘সাধনাশ্রম’ নাম লিখিয়া কাস্টফলক লটকাইয়া দিলেন’ (পরিচ্ছেদ-৫)।

আবার স্বাদেশিক-চেতনায় উদ্দীপিত গোরাকে বড়দাদা মহিম ‘পেট্রিয়ট জ্যাঠা’, ‘হরিশ মুখুজে দি সেকেণ্ড’ এসব সম্বোধনের দ্বারা ব্যঙ্গ ও তিরস্কার করেছেন। প্রচণ্ড ইংরেজ বিদ্বেষের দ্বারা গোরা ‘রাস্তায় ঘাটে কোনো সুযোগে ইংরেজের সঙ্গে মারামারি করিতে পারিলে জীবন ধন্য মনে করিত।’

‘গোরা উপন্যাসে ধর্মীয় সংঘর্ষ ও রেষারেষি এবং তার অনুবৃত্তি হিসেবে সামাজিক সংকটও বারবার দেখানো হয়েছে। ধর্মীয় পরিস্থিতিতে দুটি দিক উপস্থাপিত—হিন্দু ও ব্রাহ্ম। কৃষ্ণদয়াল এবং পরেশবাবুর দুই পরিবারের সংঘাতের মূলে সুচরিতা ও ললিতা থাকলেও মূলত হিন্দু ও ব্রাহ্ম ধর্মের সংঘাতের রূপচিহ্ন রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরতে চেয়েছেন। ‘গোরা’র পটভূমিতে এই ধর্মীয় সংকট যেমন বাস্তব ও ঐতিহাসিক সত্য, তেমনই সত্য তখনকার সদ্যজাগ্রত স্বদেশপ্রেম, নবোদ্ভূত স্বাধীনতাভাবের অনুপ্রেরণা। গোরা ও বিনয়ের সমবয়সী রবীন্দ্রনাথ এই সংঘাতের চিত্র নিজে দেখেছেন। সেই অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিই প্রকাশ হয়েছে ‘গোরা’তে।

দেশ ও কালগতভাবে ‘গোরা’ যে প্রেক্ষাপটের ওপরে চিত্রিত এবং যে সামগ্রিকতা নিয়ে উপস্থাপিত, তা যথার্থই মহাকাব্যোচিত। চিত্রশিল্পীর ক্যানভাসের রূপ-রং-পরিধি চিত্রকলার উৎকর্ষ সৃষ্টিতে অনেকখানি ভূমিকা নেয়, তেমনই উপন্যাসিকের আয়োজিত পটভূমিতে বিশিষ্টতার ওপরে উপন্যাসের তাৎপর্য-সৌন্দর্য বহুলাংশে নির্ভরশীল। ‘গোরা’ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ যে পটভূমি ব্যবহার করেছেন, তার একটা কালগত বিশিষ্টতা আছে। উপন্যাসে ব্যবহৃত সময় পুরো এক বছরও নয়। কিন্তু যে সমস্যাও আলোড়ন এখানে উপস্থিত, তার মধ্যে ঊনবিংশ শতকের একটি যুগ, তার শেষ চতুর্থাংশ সামগ্রিক ভাবনা চিন্তাসহ ধরা পড়েছে।

‘গোরা’র স্থানগত পটভূমি প্রধানত কলকাতা শহর। কলকাতারই কোথাও কৃষ্ণদয়ালের গৃহ, কোথাও পরেশবাবুর, তারই কাছাকাছি বিনয় ও সুচরিতার বাড়ী। ব্রাহ্মসভা এবং হারাণবাবুর অবস্থিতি সবই কলকাতাকেন্দ্রিক। কিন্তু গভীরতর দৃষ্টিতে সমগ্র বাংলাদেশই ‘গোরা’র পটভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। উপন্যাসের বিভিন্ন ঘটনা ঘটেছে কলকাতায় এবং অধিকাংশ পাত্রপাত্রীর জীবন পরিচালিত হয়েছে এখানে। কিন্তু তাই বলে গ্রামবাংলাও উপন্যাস থেকে বাদ যায়নি। উদাহরণস্বরূপ, গোরার কর্মধারা, গ্রামবাংলাকে ও দেশকে জানবার জন্য গ্র্যাণ্ড ট্রান্স রোড ধরে তার যাত্রার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। গ্রহণের স্নান উপলক্ষে স্টিমারে ত্রিবেণী যাত্রাকালে দরিদ্র দেশবাসীর হেনস্থাও গোরার ক্ষোভ ও মর্মপিড়ার কারণ হয়েছিলো। দেশকে জানার উদ্দেশ্য নিয়ে গোরা ত্রিবেণী-সংগমে দেশবাসীর সঙ্গে মিলতে চেয়েছে, চরঘোষপুরের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ও অঘটনে সমস্ত গ্রামবাংসার শোষণ ও অনাচারের চিত্র প্রতিফলিত।

৭.৪.১৩.৩ : বিষয়বস্তুর মহনীয়তা

বিষয়বস্তুর প্রসারও পরিধির দিক থেকে ‘গোরা’র ভূমিকা সাধারণ উপন্যাসের তুলনায় দূরপ্রসারী। এই বিশালতা ও বিস্তৃতি এসেছে উনিশ শতকের শেষ দিককার বাংলাদেশের আলোড়ন ও আন্দোলন নিয়ে, ধর্মীয় এবং সামাজিক বিক্ষোভ ও সংঘর্ষ, স্থিতিশীলতা ও প্রগতিশীলতা, স্বাদেশিকতার প্রথম চেতনার উন্মেষ ইত্যাদির ভিত্তিতে।

উনিশ শতকের শেষ দিককার ধর্মীয় ও সামাজিক বিক্ষোভ, সংঘর্ষ, স্বাদেশিকতার প্রথম চেতনার উন্মেষে ‘গোরা’ উপন্যাসের ভূমিকা দূর প্রসারী। ব্রাহ্মসমাজের মতানৈক্যের দ্বন্দ্ব উপন্যাসে আছে। সাহেবদের সঙ্গে গোরার বিবাদ উন্মেষযুগের স্বদেশচেতনার দৃষ্টান্ত। স্বদেশ প্রেমের স্পিরিটটুকু রবীন্দ্রনাথ গোরার চরিত্রে নিয়ে এসেছেন। আবার পরেশবাবু ও আনন্দময়ীর ঔদার্য ও ত্যাগের মধ্যে দিয়ে সমস্ত সংঘাত রেষারেষির প্রান্তে এক আদর্শ মিলনভূমি রচনা করেছেন শ্রষ্টা।

উপন্যাসের চরিত্রগুলির পরস্পর সংঘাত যুগস্বরূপকে তুলে ধরতে সহায়তা করেছে। আচার বাতিকগ্রস্ত কৃষ্ণদয়ালের সন্ন্যাসিকতার সঙ্গে কিস্বা তখনকার আত্মভাবত, আত্মতুষ্ট এ্যাভারেজ বাঙালীর আদলে গড়া মহিমের সঙ্গে সহজ বোধে, সরল ভালোবাসায় প্রসারিত-হৃদয় আনন্দময়ীর সংঘাতের চিত্র আছে এখানে। আনন্দময়ী স্বামীকে স্পষ্টতই বলেন—‘হায় হায়, তুমি মনে কর তোমার মতো পৃথিবীময় গঙ্গাজল আর গোবর ছিটিয়ে বেড়াইনে বলে আমার ধর্মজ্ঞান নেই।’ (পরিচ্ছেদ-৬)। ভারতবর্ষের প্রশান্ত প্রজ্ঞাসত্তা, সংসারে থেকেও ঋষিতুল্য পরেশবাবুর সঙ্গে তাঁর পরিবারের, তথাকথিত ব্রাহ্ম সমাজের এবং গোরা ও বিনয়ের সংঘাত উল্লেখযোগ্য। পরিবারের ভেতরে তাঁর সত্যকে অন্তরে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ আর বরদাসুন্দরীর ব্রাহ্মিকতার বহিরাচরণের মধ্যে এই সংঘাত ছিলো অবশ্যম্ভাবী। আবার গোরার তর্ক যে তর্কযুদ্ধমাত্র নয়, ‘তাহা বিশ্বাসের বলে এবং স্বদেশপ্রেমের বেদনায় পরিপূর্ণ’— একথা পরেশবাবুর আগে এমন করে কেউ বুঝতে পারেনি। সত্যোপলব্ধির আত্মস্থতায় গোরা-বিনয়ের বিরুদ্ধতা, জাতিভেদের গোঁড়ামির মূল উৎস পরেশবাবুর কাছে কতো সহজ হয়ে ধরা পড়েছে—“তাঁদের বুদ্ধি কম বলে যে এইসব কথা বোঝেন না তা নয়, বরঞ্চ তাঁদের বুদ্ধি বেশি বলেই তাঁরা বুঝতে চান না, কেবল বোঝাতেই চান”(পরিচ্ছেদ-২৩)। পানুবাবুর ও ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে পরেশবাবুর সংঘাতের বিষয়টিও অভিনিবেশযোগ্য। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে নানা পরিবর্তন, সংগঠন, মতানৈক্যের কথা সকলেরই জন্য হীন -কুরূচিপূর্ণ কাজও যখন ব্রাহ্মসমাজের নামে চালানো হয়, তখন পরেশবাবু সেখান থেকে সবিনয়ে নিজের সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নেন—“ললিতার বিবাহ আমাকেই সম্পাদন করিতে হইবে। ইহাতে আমাকে যদি ত্যাগ করেন তাহাতে আপনাদের অন্যায় বিচার হইবে না। এক্ষণে

ঈশ্বরের কাছে আমার এই একটিমাত্র প্রার্থনা রহিল তিনি আমাকে সমস্ত সমাজের আশ্রয় হইতে বাহির করিয়া লইয়া তাঁহারই পদপ্রান্তে স্থান দান করুন।” (পরিচ্ছেদ-৬৫)

সাহেবদের সঙ্গে গোরার বিবাদ ও ম্যাজিস্ট্রেটের বিচার-প্রহসন সেই উন্মেষযুগের স্বদেশচেতনার দৃষ্টান্ত। দেশে রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইংরেজদের সঙ্গে ক্রমশ ভারতীয়দের সম্পর্কের অবনতি হচ্ছিলো। ইংরেজরা যেখানে অন্যায় করেও শাস্তি পায় না, ভারতবাসীর ক্ষেত্রে তার বিপরীত অবস্থা, তার অন্যায় না করেও শাস্তি পায়। গোরার রচনাকাল (১৯০৭-১৯০৯) পরিপূর্ণ স্বদেশীয়ুগে। এ যুগের আবহাওয়া সূক্ষ্মভাবে যেন জড়িয়ে রয়েছে প্রায় পাঁচশ বছর আগেকার গোরার প্রেক্ষাপটকে। তবু ‘গোরা’র অনৌচিত্য দোষ তো ঘটেইনি, বরং সমসাময়িক স্বদেশ-উন্মাদনার ‘ফিলেট্রিশন’ করে নিয়ে তার স্বদেশপ্রেমের ‘স্পিরিট’টুকু গোরার চরিত্রে নিয়ে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ। তার জন্যই শেষ পর্যন্ত স্বদেশী আন্দোলন থেকে মানবতাবাদী শাস্ত্র ভারতাত্মা সন্ধানের মহৎ লক্ষ্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ সচেতনায় ও উপলব্ধিতে ঋদ্ধ হয়ে উঠেছে গোরা। বিষয়বস্তুর এমন বিশালতা ও ব্যাপকতা সমগ্র জাতির সত্তাসমুত্ত বললে অত্যাধিক হয় না। তৎকালীন বাংলাদেশের সনাতন ও নব্য, রক্ষণশীল ও সংস্কারক রূপ এতে প্রতিভাত হয়েছে। আবার পরেশবাবু ও আনন্দময়ীর ঔদার্য ও ত্যাগের মধ্যে দিয়ে সমস্ত সংঘাত-রেষারেষির প্রান্তে এক আদর্শ মিলনভূমি রচনা করেছেন স্রষ্টা। এই মিলনভূমিতেই হিন্দু বিনয় ও ব্রাহ্মণের মেয়ে ললিতা পরস্পরকে গ্রহণ করেছে সকল বাধা অতিক্রম করে, এবং জন্মলব্ধ নিজস্ব ধর্মগত ত্যাগ না করেই।

৭.৪.১৩.৪ : তত্ত্বগত ভিত্তি

‘গোরা’-উপন্যাসে একটা আইডিয়াগত বা তত্ত্বগত ভিত্তি আছে। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি থেকে উদার বিশ্বমানবতায়, আত্মগত উপলব্ধি থেকে বৃহত্তর সমষ্টিগত উপলব্ধির মধ্যে উত্তরণই ‘গোরা’-র তাত্ত্বিক আদর্শ। তত্ত্বগত এই প্রেরণা এই উপন্যাসে ব্যক্তিগত জীবন থেকে উদ্ভূত হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা গিয়ে মিলেছে জাতিগত জীবনের মধ্যে। গোরা-চরিত্রে দেখানো হয়েছে সত্তাসংকটের মর্মগ্রাহী চিত্র। সংকটের পথ বেয়ে সংস্কারক গিয়ে পৌঁছেছে সর্বসংস্কারমুক্ত সর্বমানুষের মিলনক্ষেত্রে। গোরার চরিত্রে হিন্দুধর্মের সংকীর্ণতা থেকে বৃহৎ মানবধর্মের উদারতার মধ্যে নবজন্ম লাভের প্রয়াস ও উত্তরণ আছে। আনন্দময়ী ঐক্যধর্মী ও সমন্বয়বাদী ভারতাত্মার প্রতিমূর্তি। সবচেয়ে বড়ো কথা, তত্ত্ব হিসেবে সমষ্টিগত (এবং ব্যক্তিগত তো বটেই) হৃদয়ভিত্তিক সত্যধর্মকে এই উপন্যাসে প্রতিষ্ঠা দেবার সকল আয়োজন আছে।

‘গোরা’ উপন্যাসে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি থেকে উদার বিশ্বমানবতায়, আত্মগত উপলব্ধি থেকে বৃহত্তম সমষ্টিগত উপলব্ধির মধ্যে উত্তরণই ‘গোরা’-র তাত্ত্বিক আদর্শ। গোরার চরিত্রে হিন্দুধর্মের সংকীর্ণতা থেকে বৃহৎ মানবধর্মের উদারতার মধ্যে নবজন্ম লাভের প্রয়াস ও উত্তরণ আছে।

‘গোরা’ উপন্যাসের তত্ত্ব বা আদর্শমূলকতা সহজেই ধরা পড়ে। সার্থক জীবনচিত্রণের মাধ্যমে তার মহান বাণী ধরা পড়ে বলেই এই আবেদন সরস ও হৃদয়বেদ্য।

৭.৪.১৩.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. উপন্যাস কাকে বলে?

২. উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য কি?
৩. মহাকাব্য কাকে বলে?
৪. উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ কোন সময়কে রেখেছেন?
৫. উপন্যাসে কোন কোন ধর্মের কথা বলা হয়েছে।
৬. ‘গোরা’ উপন্যাসের রচনাকাল কত?
৭. ‘গোরা’ উপন্যাসের মূল তত্ত্ব কি?

৭.৪.১৩.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।
২. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা উপন্যাসের কালান্তর।
৩. বুদ্ধদেব বসু—রবীন্দ্রনাথ — কথাসাহিত্য।
৪. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় — কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ।
৫. সুবোধ সেনগুপ্ত— রবীন্দ্রনাথ।
৬. নীহাররঞ্জন রায়—রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা।
৭. বিশ্বপতি চৌধুরী —রবীন্দ্র উপন্যাসে দেশ ও কাল।
৮. অমিয়রতন বন্দ্যোপাধ্যায়—রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শন।

চরিত্রসৃজনে অসাধারণত্ব

বিন্যাসক্রম

- ৭.৪.১৪.১ : চরিত্রসৃজনে অসাধারণত্ব
- ৭.৪.১৪.২ : চরিত্র ও প্লটের পারস্পরিক সম্পর্ক
- ৭.৪.১৪.৩ : উপন্যাসের ভাষা
- ৭.৪.১৪.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলি
- ৭.৪.১৪.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৭.৪.১৪.১ : চরিত্রসৃজনে অসাধারণত্ব

আলোচ্য উপন্যাসে প্রায় সমস্ত চরিত্রেরই ব্যক্তিগত জীবন উপেক্ষিত হয়নি। কিন্তু চরিত্রগুলি আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে নানা ধর্মীয়, সামাজিক তথা স্বদেশ সাধনার আদর্শ খুঁজতে গিয়ে। এই সন্ধান শেষ পর্যন্ত আত্মোপলব্ধির সমে পৌঁছেছে ঠিকই, তবে গোয়ার ‘আপনাকে এই জানা’র অন্যতম কথা ‘সেই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা’। গোরা-সুচরিতা-বিনয়-ললিতা-আনন্দময়ী বা পরেশবাবুর ব্যক্তিজীবনের সূক্ষ্মতা, নিগূঢ়তা ও অন্তঃশীলতার প্রতি লেখকের সমধিক দৃষ্টিপাত ঘটেনি। এঁদের মনস্তাত্ত্বিক জীবনালেখ্যও ততটা নেই। ব্যক্তিগত জীবনের প্রসার ও সীমা সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা আছে, অধিকাংশ চরিত্রই তার রেখায়িত গণ্ডী অতিক্রম করেছে। বেশির ভাগ চরিত্রই আভ্যন্তর সত্তার প্রকাশের চেয়ে বেশি উদ্গ্রীব কোনো-না-কোন আদর্শসন্ধান, ধর্ম ও ব্যবহারগত জীবনে এক একটি বিশেষ পথ ও চিন্তাসূত্র অনুসরণে। সুচরিতার মতো গৃহললিতা সতেরো বছরের তরুণীও স্বদেশসাধনায় অনুপ্রাণিত করতে চায় ছোট ভাই সতীশকে, “অনেক কাজ করবার আছে ভাই। আমাদের দুই ভাই-বোনের কাজ আমরা দুজনে মিলে করব। কী বলিস সতীশ? আমাদের দেশকে প্রাণ দিয়ে বড়ো করে তুলতে হবে। জানিস? বুঝতে পেরেছিস?” (পরিচ্ছেদ-৬৬) এবং “মানুষকেই সমাজের খাতিরে সংকুচিত হয়ে থাকতে হবে একথা কখনোই ঠিক নয়—সমাজকেই মানুষের খাতিরে নিজেকে কেবলই প্রশস্ত করে তুলতে হবে” (পরিচ্ছেদ-৬০)। পরেশবাবুর এই উক্তির মর্ম সর্বাস্তঃকরণে গ্রহণ করে সে। যে সমাজে ছোটো অমিলকে মানে না, বড়ো মিলে সবাইকে মিলিয়ে দেয়, সুচরিতা মনে-প্রাণে সেই মানবিক সমাজকে চেয়েছে।

গোরা-সুচরিতা-বিনয়-ললিতা-আনন্দময়ী বা পরেশবাবু প্রতিটি চরিত্রই আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে নানা ধর্মীয়, সামাজিক তথা স্বদেশ সাধনার আদর্শ খুঁজতে গিয়ে। বেশিরভাগ চরিত্রই আভ্যন্তর সত্তার প্রকাশের চেয়ে বেশি উদ্গ্রীব কোনো-না-কোন আদর্শ সন্ধান, ধর্ম ও ব্যবহারগত জীবনে এক একটি বিশেষ পথ ও চিন্তাসূত্র অনুসরণে।

৭.৪.১৪.২ : চরিত্র ও প্লটের পারস্পরিক সম্পর্ক

‘গোরা’ উপন্যাসের পটভূমি ও চরিত্রসৃষ্টির পারস্পরিক সম্পর্ক যদি বিচার করি, তাহলে তার অসাধারণত্ব চোখে পড়ে। শরৎচন্দ্র ‘গৃহদাহ’ হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে বিরোধের কথা এনেছেন, ‘দত্তা’রও সেই একই বিষয়।

‘গোরা’ উপন্যাসের পরিণতিতে গোরার মহৎ আত্মোপলব্ধি বা বিশ্বাত্মবোধে উত্তরণ ঘটেছে। গোরা সুচরিতার চিত্তকে প্রবল প্রেমে আকর্ষণ করেছে, আবার তার মন-প্রাণকে ভারতবর্ষের অভিমুখে প্রসারিত করে দিয়েছে। ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক জীবনের সমাধান ও ‘গোরা’ উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু সে শুধু ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা বোঝাবার জন্য। তবে সেই ব্যাপক ধর্মীয় ও সামাজিক পটভূমি সত্ত্বেও উপন্যাস দুটিতে তিনি ব্যক্তিগত জীবনের রূপ-রস-রঙ, তার সমস্যা এবং সর্বোপরি তার ব্যক্তিগত সমাধানই খুঁজেছেন, দেশ-কাল-সমাজগত সমাধান নয়। মহিম-সুরেশ-অচলা-বিজয়া-নরেন-বিলাস প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই একথা সত্য। ‘পল্লীসমাজ’-এও একটা বড়ো সামাজিক পটভূমি আছে।

সেই পটভূমি রচনা করেছে বেণী ঘোষাল-গোবিন্দ গাঙ্গুলি-ধর্মদাসের দল। কিন্তু সেখানেও শেষ পর্যন্ত সমষ্টিগত সমস্যাকে আবৃত করে ব্যক্তিগত সমস্যাটিকে (এক্ষেত্রে বিধবার ভালোবাসার অধিকারের সমস্যা) বড়ো করে তোলা হয়েছে। রমার কাশীবাসে ব্যক্তিগত সমস্যার একটা দুঃখজনক সমাপ্তি আছে (তাকে সমাধান বলা যায় না), সামাজিক সমস্যার কোনো সমাধান নেই। কিন্তু ‘গোরা’ উপন্যাসে পরিণতিতে গোরার মহৎ আত্মোপলব্ধি বা বিশ্বাত্মবোধে উত্তরণ ঘটেছে—যার প্রতীকী প্রকাশ খ্রিস্টানী লছমিয়ার হাতে জলগ্রহণে, বিনয়ের সঙ্গে পুনরায় আগের সম্পর্ক ফিরিয়ে আনার আভাসে। ব্রাহ্মকন্যা সুচরিতা যেমন তার জীবনে নির্দিধায় গৃহীত হয়েছে, তেমনই স্বীকৃত হয়েছে ভারতাত্মার চিরকালের সমন্বয়ধর্মী মর্মবাণী। গোরা সুচরিতার চিত্তকে প্রবল প্রেমে আকর্ষণ করেছে, আবার তার মন প্রাণকে ভারতবর্ষের অভিমুখে প্রসারিত করে দিয়েছে। জন্ম পরিচয় জানার সঙ্গে সঙ্গে সাময়িকভাবে গোরার সমস্ত অতীত ও এতকালের একাগ্রলক্ষ্যবর্তী সনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ বিলুপ হয়ে গিয়েছে। দিক্চিহ্নহীন অদ্ভুত শূন্যময় উপলব্ধিতে ক্ষণকালের জন্য গোরা নীরব হয়ে গেলেও সে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েনি। বরং সে বুঝেছে তার চারদিকের সঙ্গে তার এতদিনের লড়াই ছিলো ‘নিষ্কণ্টক নির্বিকার ভাবের ভারতবর্ষ গড়ে তুলে সেই অভেদ্য দুর্গের মধ্যে (আমার) ভক্তিকে সম্পূর্ণ নিরাপদে রক্ষা করবার জন্য...।’ আর যখন ভাবের দুর্গ স্বপ্নের মতো উড়ে গেলো, তখন ছাড়া পেয়ে ‘হঠাৎ একটা বৃহৎ সত্যের মধ্যে’ এসে পড়লো সে। সংকীর্ণ সমাজবদ্ধহীন পরেশবাবুকে গুরুত্বে বরণ করে নিলো, সুচরিতাকে নিজের জীবনে অঙ্গীকার করে নেবার বাধা অন্তরে-বাহিরে অপসারিত হলো। ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক জীবনের এমন সমতাৎপর্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র ‘গৃহদাহ’, ‘দত্তা’ বা ‘পল্লীসমাজে’ নেই। ‘গোরা’ সেই মহনীয়তায় অন্যতম মাত্রা পেয়েছে।

৭.৪.১৪.৩ : উপন্যাসের ভাষা

এপিক-উপন্যাসের বিশালতা ও গাভীর্যের প্রকাশবাহন যে ভাষা, তার শক্তি ও সম্ভাবনার পরিচয় ‘গোরা’র বৃহৎ পরিসরে সর্বব্যাপী হয়ে ছড়িয়ে আছে। মূলগতভাবে এই ভাষা গতিময়—শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই

স্বতঃস্ফূর্ত গতি সাবলীলভাবে সঞ্চরণশীল। মূল কল্পনা ও জীবনদর্শনের সঙ্গে অনায়াস সম্পৃক্তির জন্য এই উপন্যাসের ভাষা এত সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কখনো হঠাৎ জেগে ওঠা চরের মতো পিঠ উঁচিয়ে দেয়নি। ভারসাম্য ও সুযম্য বজার রেখে তা সমস্ত শ্রেণির চরিত্রের কণ্ঠেও যথোপযুক্ত হয়েই দেখা গেছে। পরেশবাবু, হারাগবাবু, মহিম, হরিমোহিনী, বরদাসুন্দরী, ললিতা, চরঘোষপুরের নাপিত—এই বৈচিত্রময় চরিত্রমালার কয়েকটি সংলাপ বিভিন্ন জায়গা থেকে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, কথ্যরীতিকে কতখানি শক্তিতে লেখক তাঁর অখণ্ড কল্পনার সঙ্গে দৃঢ়বদ্ধ রেখেছেন। এতে উপন্যাসের এপিক-মর্যাদাও যেমন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে আবার পাত্রপাত্রীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও অক্ষুণ্ণ রয়েছে :

‘গোরা’ উপন্যাসের ভাষা গতিময়। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই গতি সাবলীলভাবে সঞ্চরণশীল। উপন্যাসের চরিত্রগুলির ভাষাবিন্যাসের কুশলতাও, কথ্যরীতিকে লেখত তাঁর অখণ্ড কল্পনার সঙ্গে দৃঢ়বদ্ধ রেখেছেন। উপন্যাসের মূল কাঠামো সাধু গদ্যরীতির। যাইহোক উপন্যাসে স্থান ও কালগত পটভূমি, বিষয়বস্তুর বিস্তৃতি, ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনের সুযম মীমাংসা হয়েছে সরল-গতিশীল-সূচ্য ভাষা রীতির প্রয়োগে।

পরেশবাবু : “মা নিজের বুদ্ধির উপরেই যদি আমি একমাত্র নির্ভর করতুম তা হলে আমার ইচ্ছা ও মতের বিরোধে কোনো কাজ হলে দুঃখ পেতুম। ...আমিও একদিন বিদ্রোহ করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম, কোনো সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তাই করিনি। সমাজের উপর আজকাল এই যে ক্রমাগত ঘাত প্রতিঘাত চলছে এতে বোঝা যাচ্ছে তাঁরই শক্তির কাজ চলছে। তিনি যে নানাদিক থেকে ভেঙ্গে গড়ে শোখন করে কোন্ জিনিসটাকে কীভাবে দাঁড় করিয়ে তুলবেন আমি তার কী জানি! ব্রাহ্ম সমাজই কি আর হিন্দুসমাজই কি, তিনি দেখছেন মানুষকে।” (পরিচ্ছেদ-৫৯)

হারাগবাবু : “তোমার গৌরমোহনবাবুকে বিনয়বাবু পাওনি। তুমি নিজেকে হিন্দু হিন্দু বলে গলা ফাটিয়ে ম’লেও গৌরবাবু যে তোমাকে গ্রহণ করবেন এমন আশাও করো না। শিষ্যকে নিয়ে গুরুগিরি করা সহজ কিন্তু তাই বলে তোমাকে ঘরে নিয়ে ঘরকন্না করবেন একথা স্বপ্নেও মনে কোনো না।” (পরিচ্ছেদ-৬২)

মহিম : “শশীর বিবাহের প্রস্তাবটা ঘনিয়ে আসছে। আমাদের বেহাই যতটুকু পরিমাণ মেয়ে ঘরে নেবেন সোনা তার চেয়ে বেশি না নিয়ে ছাড়বেন না, কারণ তিনি জানেন মানুষ নশ্বর পদার্থ, সোনা তার চেয়ে বেশিদিন টেকে। ওষুধের চেয়ে অনুপাতটার দিকেই তাঁর ঝোঁক বেশি। বেহাই বললে তাঁকে খাটো করা হয়, একেবারে বেহায়া।” (পরিচ্ছেদ-৬৩)

হরিমোহিনী : “মা, সকল বিষয়েই তোমরা খৃষ্টানের মতো হলে চলবে কেন? গৃহস্থ ঘরের মেয়ে ইঙ্কলে পড়ায় এ তো বাপের বয়সে শুনিনি।” (পরিচ্ছেদ-৪৪)

বরদাসুন্দরী : “অত বামনাই করতে চান (হরিমোহিনীর কথা) তো আমাদের ব্রাহ্ম বাড়িতে এলে কেন? আমাদের এখানে ও সমস্ত জাতের বিচার করা চলবে না। আমি কোনোমতেই এতে প্রশ্রয় দেব না।” (পরিচ্ছেদ-৩৮)

ললিতা : “(পানুবাবুকে) বিনয়বাবু আজ অনেকদিন পরে এসেছেন, তাঁর সঙ্গে গল্প করতে যাচ্ছি। ততক্ষণ আপনি নিজের লেখা যদি পড়তে চান তাহলে— না ঐ যা, সে কাগজখানা দিদি দেখছি কুটি কুটি করে ফেলেছেন। পরের লেখা যদি সহ্য করতে পারেন তাহলে এইগুলি (‘টেবিল হইতে সযত্নে রক্ষিত গোরার রচনাগুলি আনিয়া’) দেখতে পারেন।” (পরিচ্ছেদ ৩৯)

নাপিত : “দোহাই আপনার, রক্ষা করবার যদি চেষ্টা করেন তাহলে আমাদের আর রক্ষা থাকবে না। ও বেটারা ভাববে আমিই চক্রান্ত করে আপনাকে ডেকে এনে ওদের বিরুদ্ধে সাক্ষী জোগাড় করে এনে দিয়েছি।... আমাকে সুদ্ধ যদি এখান থেকে উঠতে হয় তাহলে গ্রাম পয়মাল হয়ে যাবে।” (পরিচ্ছেদ-২৬)

সংলাপের ভাষা কথ্যরীতির হলেও উপন্যাসের মূল কাঠামো সাধু গদ্যরীতির। সেই গদ্যরীতি তুলে ধরেছে গভীর-ব্যাপক প্রেক্ষাভূমিতে বৃহত্তম মানবনীতির ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ মানুষকে। বিচিত্র চরিত্রপাত্র উপন্যাসের প্রাণশক্তিকে বাড়িয়ে-ছড়িয়ে দিয়ে মহিমাম্বিত করেছে ভাষাবিন্যাসের কুশলতাগুণে। অথচ ভাষার সরলতা ও স্নিগ্ধতা তার গাভীর্য রক্ষার পরিপন্থী হয়নি কোথাও। মহাকাব্যোচিত মহিমা রেখে অবলীলায় সংস্থান পেয়েছে আনন্দময়ী ও হরিমোহিনীর, সুচরিতা-বরদাসুন্দরীর কিস্বা গোরা ও দারোগা মাধব চাটুজ্যের বাক্যবন্ধ। এই বিশিষ্ট গদ্যভাষা ‘গোরা’ উপন্যাসের ‘এপিক-স্পিরিট’কে রক্ষা করেছে, নিজেকেও সেই আবহে যথোচিতভাবে জড়িয়ে নিয়ে।

‘গোরা’র কাহিনি সুদীর্ঘব্যাপ্ত নয়, ঘটনাপ্রবাহের বিপুলত্বও এখানে উল্লেখ্য নয়। তা সত্ত্বেও উপন্যাসরূপে ‘গোরা’র মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি ও গভীরতা অন্য সাধারণ উপন্যাসের সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যায়। এই উপন্যাসে স্থান ও কালগত পটভূমি, বিষয়বস্তু বিস্তৃতি, তত্ত্বগত ভিত্তি, চরিত্র-সমূহের আদর্শসন্ধানী অন্তঃপ্রেরণা, উত্থাপিত সমস্যার সামগ্রিক সমাধান, ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনের সুষম মীমাংসা হয়েছে সরল-গতিশীল-সুঠাম ভাষারীতির প্রয়োগে। আর এই সব কিছু মিলে ‘গোরা’কে অসাধারণত্বগুণে মণ্ডিত করেছে—দিয়েছে এপিক-উপন্যাসের মহিমা।

৭.৪.১৪.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. চরিত্রগুলির মানবিক সমাজকে চাওয়ার কারণ কি?
২. শরৎচন্দ্রের কোন উপন্যাসে হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মের বিরোধের কথা আছে?
৩. উপন্যাসের মূল কাঠামো কোন ভাষারীতির?

৭.৪.১৪.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।
২. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা উপন্যাসের কালান্তর।
৩. বুদ্ধদেব বসু—রবীন্দ্রনাথ — কথাসাহিত্য।
৪. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় — কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ।
৫. সুবোধ সেনগুপ্ত— রবীন্দ্রনাথ।
৬. নীহাররঞ্জন রায়—রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা।
৭. বিশ্বপতি চৌধুরী —রবীন্দ্র উপন্যাসে দেশ ও কাল।
৮. অমিয়রতন বন্দ্যোপাধ্যায়—রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শন।

একক ১৫

গোরার জন্মবৃত্তান্ত

বিন্যাসক্রম

৭.৪.১৫.১ : গোরার জন্মবৃত্তান্ত—উপন্যাসে তার গুরুত্ব

৭.৪.১৫.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৭.৪.১৫.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৭.৪.১৫.১ : গোরার জন্মবৃত্তান্ত—উপন্যাসে তার গুরুত্ব

‘গোরা’-উপন্যাসের প্রধান চরিত্র গোরা আইরিশ দম্পতির সন্তান। সিপাহী-বিদ্রোহের আলোড়নের মধ্যে প্রাণরক্ষা করার জন্য আসন্ন প্রসবা এক আইরিশ নারী নিঃসন্তান আনন্দময়ীর আশ্রয় নেন। একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়ে সেই বিদেশিনী মারা যান। তখন কৃষ্ণদয়াল ও তাঁর স্ত্রী সন্তানবুভুক্ষু আনন্দময়ী সন্তানপরিচয়ে গোরা তথা গৌরমোহনকে লালন করেন। এই তথ্য তৃতীয় কোন ব্যক্তির জানা ছিল না। গোরা নিজেও একথা জানে না। কিন্তু পাঠককে উপন্যাসের প্রথম পর্বেই সত্যটি বলে দেওয়া হয়েছে।

‘গোরা’ উপন্যাসের মর্মবাণী ভারতীয় মানবতার (Humanisitic Indianism) আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা। গোরার জন্মরহস্য-বিষয়টি সেই তত্ত্বপ্রকাশে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। সর্বভারতীয় জাতীয়তাবোধের কথা বললে নিশ্চয়ই তা কোনওপ্রকার সাম্প্রদায়িকতায় অথবা রেখাচিত্রনির্দিষ্ট ভূখণ্ডসীমায় খণ্ডিত হয়ে থাকতে পারেনা। ভারতীয় মানবতা সেখানে বৈশ্বিক সর্বমানবতায় উন্নীত ও প্রসারিতরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। গোরার জন্মবৃত্তান্ত থেকে যে সমস্যার উদ্ভব-সম্ভাবনা, তাকে উপন্যাসে সরাসরি উপস্থিতি করে সেই সমস্যা-সমাধানের বীজমন্ত্রটিও উপন্যাসের কোষে সংস্থাপিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। যাকে বলা যেতে পারে বিশ্বমানবতাবাদ।

গোরাকে কুড়িয়ে না পেলে কাশীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পৌত্রী আনন্দময়ী তাঁর আচার-বিচার- সংস্কার চিরতরে বিসর্জন করতে পারতেন না। আনন্দময়ী অবলীলায় সুচরিতাকে মাতৃশ্লেহের মধ্যে টেনে নিতে পেরেছেন, ব্রাহ্ম ধর্মীয়া ললিতাকে বিবাহ করে বিনয়কে মুছে দিতে বলেছেন তার অসম্মানের কালিমা, খ্রিস্টানী লছমিয়াকে অন্তঃপুরের কাজে স্বচ্ছন্দে সামিল করেছেন অথবা সতীশের পোষা কুকুরটিকে কোলে তুলতেও তাঁর বাধেনি। এমন অব্যবহৃত উদারতা ও মানসখাদি আনন্দময়ী পেয়েছেন গোরাকে প্রাপ্তিসূত্রে— “মানুষ বস্তুটি যে কত সত্য— আর মানুষ যা নিয়ে দলাদলি করে, বাগড়া করে মরে, তা যে কত মিথ্যে— সে কথা ভগবান গোরাকে যেদিন দিয়েছেন সেই দিনই বুঝিয়ে দিয়েছেন।”

কাহিনির শেষ পর্বে কৃষ্ণদয়াল এখুনি মারা যাবেন এই আশঙ্কায় গোরাকে তাঁর পারলৌকিক কাজ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য তার জন্মরহস্যের কথা বলে দিলেন। আকস্মিক বজ্রপাতের মতো এই জানার বেদনা গোরাকে প্রচণ্ড শূন্যতাবোধের ট্রাজিক অভিভবে ক্লিষ্ট করল। কিন্তু সেই আঘাত তার স্বকৃত বন্ধনদশা থেকে বেরিয়ে আসবার পথও তাকে দেখিয়ে দিল। মানবতার মুক্তিমন্ত্রদীক্ষাদাতা পরেশবাবুর শিষ্যত্ব নিয়ে সংস্কারমুক্ত আনন্দময়ীর আশ্রয়ে ফিরে গোরা পরম আশ্বাসে উচ্চারণ করল তাঁর একান্ত আত্মগত উপলব্ধি, যা কিনা একাধারে বিরাট তত্ত্ব হয়েও লেখকেরই আত্মিক নির্যাসরূপে প্রকাশ পেল সহজতম শব্দপুঞ্জে—“মা, তুমিই আমার মা, ... তুমিই আমার ভারতবর্ষ”।

‘গোরা’ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র গোরা আইরিশ দম্পতির সন্তান। কৃষ্ণদয়াল ও তার স্ত্রী আনন্দময়ী সন্তান পরিচয়ে গোরাকে লালন করেন। উপন্যাসটিতে গোরার মধ্য দিয়ে বিশ্ব মানবতাবাদের কথা শোনানো হয়েছে। মানবতার মুক্তিমন্ত্র দীক্ষাদাতা পরেশবাবুর শিষ্যত্ব নিয়ে সংস্কারমুক্ত আনন্দময়ীর আশ্রয়ে ফিরে গোরা পরম আশ্বাসে উচ্চারণ করলেন—“মা, তুমিই আমার মা,....তুমিই আমার ভারতবর্ষ।”

সূচরিতাকে ভাব ও ভাবনার দিক থেকে একান্ত সহমর্মী জেনেও গোরার সঙ্গে বিধর্মী সূচরিতার মিলনের বাধা গোরা অতিক্রম করতে পারেনি। সেই বাধা অপসৃত হয়েছে নিজের জন্মবৃত্তান্ত জানার পর। এই দিন তেকে অবশ্য উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রয়োজনে রহস্য-মোচন-পর্বের অবতারণা আরোপিত তথা দুর্বল বলে মনে হতে পারে। তবে এই যুক্তি যে অকাট্য নয়, তার প্রমাণ রয়েছে বিনয়-ললিতার বিবাহ-মিলনে। এদের দুজনের মধ্যে কেউই হিন্দু বা ব্রাহ্ম ধর্ম ত্যাগ না করেও সামাজিক বাধার অসারতাকে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। গোরার মহনীয় বোধ সূচরিতার সহযোগে যে দৃঢ় ও বলীয়ান দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুন জীবনপথে অগ্রসর হবে, তারই সঙ্কেত যেন পাই উপন্যাস-অন্তে ‘নবজন্মলব্ধ’ গোরার মধ্য দিয়ে।

৭.৪.১৫.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. গোরা কার সন্তান ছিলেন?
২. কৃষ্ণদয়ালের স্ত্রী নাম কি ছিল?
৩. গোরার জন্মবৃত্তান্ত উপন্যাসে কতটা শৈল্পিক তা বিচার করো।

৭.৪.১৫.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।
২. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা উপন্যাসের কালান্তর।
৩. বুদ্ধদেব বসু—রবীন্দ্রনাথ — কথাসাহিত্য।
৪. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় — কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ।
৫. সুবোধ সেনগুপ্ত— রবীন্দ্রনাথ।
৬. নীহাররঞ্জন রায়—রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা।
৭. বিশ্বপতি চৌধুরী —রবীন্দ্র উপন্যাসে দেশ ও কাল।
৮. অমিয়রতন বন্দ্যোপাধ্যায়—রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শন।

একক ১৬

বিনয়-ললিতা উপকাহিনির তাৎপর্য

বিন্যাসক্রম

৭.৪.১৬.১ : বিনয়-ললিতা উপকাহিনির তাৎপর্য

৭.৪.১৬.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৭.৪.১৬.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৭.৪.১৬.১ : বিনয়-ললিতা উপকাহিনির তাৎপর্য

‘গোরা’ উপন্যাসে গৃহীতকালের ব্যাপ্তি সুবিস্তৃত নয়। এক বছরের কম সময়সীমার মধ্যে উপন্যাসের ঘটনাবলী উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই বহু ও বিচিত্র চরিত্রের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন লেখক। প্রধান চরিত্র, অপ্রধান চরিত্র—সকলেই আপন-আপন দায়িত্ব পালন করে গেছে। তেমনই এ উপন্যাসে আছে মূল কাহিনির সঙ্গে উপকাহিনিরও সংস্থান। গোরার উত্তরণ যদি মূল কাহিনিধারা হয়, তবে বিনয়-ললিতার কাহিনি বা হরিমোহিনীর কাহিনিকে উপ ও শাখা কাহিনি বলা যেতে পারে। বিনয়-ললিতাকে নিয়ে যে উপকাহিনি, তার সার্থকতা সেখানেই, যেখানে তার দ্বারা মুখ্য প্রতিপাদ্য বিকাশ লাভ করতে সমর্থ হবে। বিষয়টি বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

সাধারণত নদী-উপনদীর সঙ্গে তুলনা করে আমরা কাহিনি-উপকাহিনি বিষয়টির উল্লেখ করে থাকি। উপনদী যেমন তার জলধারা দিয়ে নদীকে পরিপূর্ণ করে, তেমনই উপকাহিনির প্রভাব মূল কাহিনির গতি ও তাৎপর্যকে বেগবান ও সমৃদ্ধ করে থাকে। স্বকীয়তাপূর্ণ হয়েও তাই সার্থক উপকাহিনি স্বতন্ত্র নয়, অন্তত তেমন হলে উপকাহিনি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ার সম্ভাবনা।

গোরার আশৈশব বন্ধু বিনয় যৌবনকাল পর্যন্ত ছিল অজ্ঞানহৃদয়। কিন্তু পরেশবাবুর বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে পরিচিত হবার পর অনাঙ্গীয় নারীর অসংকোচ সংস্পর্শ লাভ করে বিনয়ের আত্মার অনভিজ্ঞ দিকটি যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠল—“এমন অপূর্ব আনন্দের সঙ্গে এমন নিবিড় বেদনা তাহার বয়সে কখনো সে ভোগ করে নাই।... বর্ষাপ্রভাতের রৌদ্রের দীপ্ত আভা তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার রক্তের মধ্যে প্রবাহিত হইল, তাহার অন্তঃকরণের সম্মুখে একটা তাহার রক্তের মধ্যে প্রবাহিত হইল, তাহার অন্তঃকরণের সম্মুখে একটা জ্যোতির্ময় যবনিকার মতো পড়িয়া প্রতিদিনের জীবনের সমস্ত তুচ্ছতাকে

‘গোরা’ উপন্যাসে বহু ও বিচিত্র চরিত্রের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন লেখক। গোরার উত্তরণ যদি মূল কাহিনিধারা হয়, তবে বিনয় ললিতার কাহিনি বা হরিমোহিনীর কাহিনিকে শাখাকাহিনি বলা যেতে পারে। সুচরিতা নয়, লালিতাই বিনয়ের মনে যথার্থ অনুরাগের উন্মেষ ঘটিয়েছে। প্রবল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন গোরা যখন কারান্তরালে, তখনই লেখক অন্যান্য চরিত্রগুলিকে বিকশিত করবার সুযোগ নিয়েছেন।

একেবারে আড়াল করিয়া দিল।” (প্রথম পরিচ্ছেদ) এর ফলে বিনয়ের ওপর থেকে গোরার ব্যক্তিত্বের প্রবল চাপ সরে গিয়ে সেখানে স্বাভাবিক মুক্তির হাওয়া এসে পৌঁছাল। বিনয় প্রথম দেখেছিল সুচরিতাকে। এই নিয়ে একটি সাময়িক বিভ্রম সৃষ্টি হলেও পাঠক ক্রমেই বুঝে নিতে পারেন যে, সুচরিতা নয়, ললিতাই বিনয়ের মনে যথার্থ অনুরাগের উন্মেষ ঘটিয়েছে। ললিতার আপাত-বিরোধী মনোভাবকে আশ্রয় করে এই অল্পস্বাদ অনুরাগ গভীর ও পরিণামী প্রেমে উত্তীর্ণ হয়েছে।

বিনয় ও ললিতার প্রেমানুভবের আড়ালটুকু সরে গিয়েছে এক আকস্মিক পরিস্থিতিতে—স্টীমারযাত্রার ঘটনায়। গোরার কারাদণ্ড বিনয়কে মর্মান্বিত ও ললিতাকে অপমানক্লিষ্ট করে একটি অনুভববিন্দুতে মিলিয়ে দিয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটের জন্মতিথি উদ্‌যাপনের আয়োজন ত্যাগ করে তারা কলকাতায় চলে এসেছে। এই সহযাত্রাপথে বিনয় ললিতার নির্ভরতার স্থানটি লাভ করে নিজের পুরুষোচিত উপলব্ধির কেন্দ্রে প্রেমের গৌরব উপভোগ করেছে—“তাহার প্রতি ললিতার এই নির্ভর-কল্পনা যেন একটি স্পর্শের মতো তাহার সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ সঞ্চর করিতে লাহিল। ... ললিতার সহিত এই সম্বন্ধে তাহার পুরুষের বক্ষ ভরিয়া উঠিল।” (পরিচ্ছেদ-৩০)

ললিতা তার অকুণ্ঠিত তেজ ও সততা নিয়ে বিনয়ের সঙ্গী হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। গোরার ছায়ামাত্র ধরে নিয়ে যে-বিনয়কে এতদিন পর্যন্ত সে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করত, তারই বিচক্ষণতা, স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব ও পরিশীলিত সৌজন্য তাকে নির্দিষ্টায় সুযোগ্য প্রেমিক বলে আপন হৃদয়ে গ্রহণ করেছে। ... বিনয়ের স্বাভাবিক ভদ্রতা এমনি সংযমের সহিত একটি আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছিল যে এই আশঙ্কাজনক অবস্থায় মাঝমাঝে বিনয়ের সুকুমারশীলতার পরিচয় ললিতাকে ভারি একটা আনন্দ দান করিতেছিল। ... একটি অনির্বচনীয় গান্ধীর্ষ্য ও মাধুর্যে তাহার সমস্ত হৃদয় একেবারে কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া উঠিল, দেখিতে দেখিতে ললিতার দুই চক্ষু কেন যে জলে ভরিয়া আসিল তাহা সে বুঝিতে পারিল না।” (পরিচ্ছেদ-৩০)

প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন গোরা যখন কারান্তরালে, তখনই লেখক অন্যান্য চরিত্রগুলিকে বিকশিত করবার সুযোগ নিয়েছেন। বিনয় ও ললিতার একত্রে কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের প্রতিক্রিয়ার সমাজ এতই উত্তাল হয়ে উঠেছিল—যার সমাধান হলো এদের বিবাহের মধ্যে। ললিতার কুৎসা ও অপপ্রচার ছড়িয়ে ব্রাহ্ম সমাজের কিছু লোক তাদের নীচতাকেই প্রকাশ্যে এনে দিল। এই ঘটনায় অভিযুক্ত ললিতার প্রজ্ঞাবান পিতা পরেশবাবু স্বেচ্ছায় ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নিলেন ব্রাহ্ম সমাজের কমিটির কাছে পত্র লিখে—“ললিতার বিবাহ আমাকেই সম্পাদন করিতে হইবে। ইহাতে আমাকে যদি ত্যাগ করেন তাহাতে আপনাদের অন্যান্য বিচার হইবে না। এক্ষণে ঈশ্বরের কাছে আমার এই একটিমাত্র প্রার্থনা রহিল তিনি আমাকে সমস্ত সমাজের আশ্রয় হইতে বাহির করিয়া লইয়া তাঁহারই পদপ্রান্তে স্থান দান করুন।” (পরিচ্ছেদ-৬৫)

বিনয় ও ললিতার উপকাহিনির দ্বারা এই উপন্যাসে লেখকের মূল বক্তব্য বিভিন্ন দিক থেকে পূর্ণাঙ্গ ও সার্থক হয়ে উঠেছে। তার মধ্যে প্রধান সূত্রগুলি হলো :

১. বিনয় ব্রাহ্মণসন্তান, গোরারও একই পরিচয়। বিনয় এবং ব্রাহ্ম কন্যা ললিতা মানসিক সাধর্ম্যের কারণে বিবাহবন্ধনে মিলিত হয়েছে। সামাজিক অনুশাসন না মানলে ক্ষতি নেই, যদি ব্যক্তি সমাজের চেয়ে মহনীয় হতে পারে। এই দৃষ্টান্ত গোরাতে আপাতভাবে যতটা না বিরূপ করেছে, তার চেয়ে বেশি বিব্রত এবং উৎসুক করেছে: “বিনয়ের সঙ্গে আজ সামাজিক বিচ্ছেদের দিনে বিনয়ের হৃদয় গোরার হৃদয়ের” পরে একটি অখণ্ড একতান সঙ্গীত বাজাইয়া দিয়া গেল। ...সমুদ্রগামিনী দুই নদী একসঙ্গে মিলিলে যেমন হয়,

তেমনি বিনয়ের প্রেমের ধারা আজ গোরার প্রেমের উপরে আসিয়া পড়িয়া তরঙ্গের দ্বার তরঙ্গকে মুখরিত করিতে লাগিল। (পরিচ্ছেদ-৬৯)

২. সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধি থেকে গোরার যে মহৎ চেতনায় উত্তরণ ঘটেছে তার একটি সূত্র গোরার জন্মবৃত্তান্ত। কিন্তু একথা মানলে ‘গোরা’র আবেদন সীমিত হয়ে পড়ে। ললিতা-বিনয়ের বিবাহ থেকে প্রমাণ হয় মানসমুক্তির জন্য কোনও ইতিহাস, দৈব বা জন্মরহস্য না থাকলেও চলে। স্বতঃস্ফূর্ত মানবিক আবেগ এবং মানবকল্যাণস্পৃহা থেকেই সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করা যায়।
৩. ললিতার বিবাহসঙ্কট থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি পরেশবাবুর ব্রাহ্ম সম্প্রদায় সম্পর্কে চোখ খুলে দিয়েছে। একদিন যে মুক্তিপ্রয়াসে তিনি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেছিলেন, আজ সেই মুক্তির তপস্যাই তাঁকে সর্বধর্মসম্প্রদায়ের সীমাবদ্ধতার বাইরে নিজেকে মেলে ধরবার স্থান করে দিয়েছে।
৪. গোরার ভাবধর্মী জীবনদর্শনের পাশাপাশি বিনয়ের জীবনধর্মী রূপায়ণে উপন্যাসের বয়নশিল্প পূর্ণাঙ্গ ও সার্থক হয়ে উঠেছে।

৭.৪.১৬.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. ললিতা কে?
২. বিনয় কে?
৩. ‘গোরা’ উপন্যাসের অসাধারণত্ব সম্পর্কে আলোচনা করো।
৪. ‘গোরা’ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ‘গোরা’র বিবর্তনরেখা আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট করো।
৫. ‘গোরা’র জন্মবৃত্তান্ত উপন্যাসের দুর্বলতা কিনা সে বিষয়ে তোমার সুচিন্তিত মতামত দাও।
৬. ‘গোরা’ রবীন্দ্রনাথের ‘ভারতচিন্তার দলিল’—আলোচনা করো।
৭. ললিতা-বিনয় উপকাহিনির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।
৮. ‘গোরা’র প্লট ও থীম-এর মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করা যায় কি? —আলোচনা করো।
৯. ‘গোরা’ উপন্যাসের মূল বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় গৌণ চরিত্রের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।
১০. আনন্দময়ী অথবা পরেশবাবুর চরিত্র বিশ্লেষণ করো।
১১. ‘মা, তুমিই আমার মা, তুমিই আমার ভারতবর্ষ’। —এই উক্তির আলোকে গোরার সংস্কারমুক্তির পরিচয় দাও।

৭.৪.১৬.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।
২. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা উপন্যাসের কালান্তর।
৩. বুদ্ধদেব বসু—রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য।
৪. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় — কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ।
৫. সুবোধ সেনগুপ্ত— রবীন্দ্রনাথ।
৬. নীহাররঞ্জন রায়—রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা।
৭. বিশ্বপতি চৌধুরী —রবীন্দ্র উপন্যাসে দেশ ও কাল।
৮. অমিয়রতন বন্দ্যোপাধ্যায়—রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শন।

বাংলা
স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম
এম.এ
দ্বিতীয় সেমেস্টার

অষ্টম পত্র

পাঠ-সহায়ক উপাদান



মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ
ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যান্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫
পশ্চিমবঙ্গ

পাঠ-প্রণেতা

ড. বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য — প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রী হরেন ভৌমিক — প্রাক্তন অংশকালীন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস — বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. প্রবীর প্রামানিক — বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

জুন ২০১৯

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও

প্রিন্টটেক্, ১৫এ, অম্বিকা মুখার্জী রোড, কলকাতা-৭০০০৫৬ দ্বারা মুদ্রিত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ-সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোন অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইনানুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের লেখক/পাঠপ্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Message

Satisfying the varied needs of distance learners, overcoming the obstacle of distance and reaching the unreached students are the threefold functions catered by Open and Distance Learning (ODL) systems. The onus lies on writers, editors, production professionals and other personnel involved in the process to overcome the challenges inherent to curriculum design and production of relevant Self Learning Materials (SLMs). At the University of Kalyani a dedicated team under the able guidance of the Hon'ble Vice-Chancellor has invested its best efforts, professionally and in keeping with the demands of Post Graduate CBCS Programmes in Distance Mode to devise a self-sufficient curriculum for each course offered by the Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Development of printed SLMs for students admitted to the DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2017 had been our endeavour. We are happy to have achieved our goal.

Utmost care and precision have been ensured in the development of the SLMs, making them useful to the learners, besides avoiding errors as far as practicable. Further suggestions from the stakeholders in this would be welcome.

During the production-process of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) Sankar Kumar Ghosh, Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Sincere gratitude is due to the respective chairpersons as well as each and every member of PGBOS (DODL), University of Kalyani. Heartfelt thanks is also due to the Course Writers-faculty members at the DODL, subject-experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have enriched the SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would especially like to convey gratitude to all other University dignitaries and personnel involved either at the conceptual or operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their persistent and co-ordinated efforts have resulted in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any form without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Director
Directorate of Open and Distance Learning
University of Kalyani

পাঠক্রম
অষ্টম পত্র
আধুনিক বাংলা উপন্যাস

পর্যায় গ্রন্থ : ১ হাঁসুলী বাঁকের উপকথা : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (সময় : ৪ ঘণ্টা)

- একক ১. বিষয় সংক্ষেপ
- একক ২. গঠন রীতি
- একক ৩. লোকসংস্কৃতি ও লোকসংস্কার
- একক ৪. নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ২ পুতুলনাচের ইতিকথা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (সময় : ৪ ঘণ্টা)

- একক ৫. পুতুলনাচের ইতিকথা (১৯৩৬) : উপন্যাসের আধুনিকতার সূচনা
- একক ৬. নায়ক শশী : অন্তর্দ্বন্দ্ব ও পরিণতি
- একক ৭. কুমুদ—মতি উপকাহিনির গুরুত্ব
- একক ৮. কুসুম চরিত্র

পর্যায় গ্রন্থ : ৩ আরণ্যক : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সময় : ৪ ঘণ্টা)

- একক ৯. আরণ্যক লেখক পরিচয়
- একক ১০. বিভূতিভূষণের নিসর্গচেতনা ও আরণ্যক
- একক ১১. ‘আরণ্যক’ এর গোত্রবিচার
- একক ১২. কথক সত্যচরণের ভূমিকা

পর্যায় গ্রন্থ : ৪ লালসালু : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (সময় : ৪ ঘণ্টা)

- একক ১৩. লালসালুর কাহিনি সংক্ষেপ
- একক ১৪. রহিমা ও জমিলা
- একক ১৫. অপ্রধান চরিত্র
- একক ১৬. উপন্যাসের ভাষা

সূচিপত্র

অষ্টম পত্র

অষ্টম পত্র	একক	শিরোনাম	পাঠপ্রণেতা	পৃষ্ঠা
পর্যায় গ্রন্থ ১	১.	হাঁসুলী বাঁকের উপকথা	অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস	১-৪
	২.	গঠন রীতি	অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস	৫-৯
	৩.	লোকসংস্কৃতি ও লোকসংস্কার	অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস	১০-১৬
	৪.	নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্ব	অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস	১৭-২৪
পর্যায় গ্রন্থ ২	৫.	পুতুলনাচের ইতিকথা	ড. বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য	২৫-৩৩
	৬.	নায়ক শশী : অন্তর্দ্বন্দ্ব ও পরিণতি	ড. বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য	৩৪-৩৮
	৭.	কুমুদ—মতি উপকাহিনির গুরুত্ব	ড. বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য	৩৯-৪০
	৮.	কুসুম চরিত্র	ড. বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য	৪১-৪৪
পর্যায় গ্রন্থ ৩	৯.	আরণ্যক লেখক পরিচয়	শ্রী হরেন ভৌমিক	৪৫-৪৮
	১০.	বিভূতিভূষণের নিসর্গচেতনা ও আরণ্যক	শ্রী হরেন ভৌমিক	৪৯-৫৩
	১১.	‘আরণ্যক’-এর গোত্রবিচার	শ্রী হরেন ভৌমিক	৫৪-৫৮
	১২.	কথক সত্যচরণের ভূমিকা	শ্রী হরেন ভৌমিক	৫৯-৬২
পর্যায় গ্রন্থ ৪	১৩.	লালসালুর কাহিনি সংক্ষেপ	অধ্যাপক ড. প্রবীর প্রামানিক	৬৩-৬৭
	১৪.	রহিমা ও জমিলা	অধ্যাপক ড. প্রবীর প্রামানিক	৬৮-৭০
	১৫.	অপ্রধান চরিত্র	অধ্যাপক ড. প্রবীর প্রামানিক	৭১-৭২
	১৬.	উপন্যাসের ভাষা	অধ্যাপক ড. প্রবীর প্রামানিক	৭৩-৭৬

পর্যায় গ্রন্থ - ১

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা

একক ১

বিষয় সংক্ষেপ

বিন্যাসক্রম

- ৮.১.১.০ : ভূমিকা
- ৮.১.১.১ : বিষয় সংক্ষেপ
- ৮.১.১.২ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৮.১.১.০ : ভূমিকা

বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার চিত্রকল্প রচয়িতা হিসাবে তিনি বিখ্যাত। ১৮৯৮-এর ২৩ আগস্ট লেখকের জন্ম বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে। সেখানকার ইংলিশ স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে তিনি কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু ম্যালেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়ে গ্রামে ফিরে যান এবং আশুতোষ কলেজে ভর্তি হন।

কবিতা রচনার মাধ্যমেই সাহিত্যে তাঁর অনুপ্রবেশ। ‘ত্রিপত্র’ তাঁর প্রথম মুদ্রিত কবিতাগ্রন্থ। তিনি ‘পূর্ণিমা’ পত্রিকার নিয়মিত লেখকও ছিলেন। নাটক রচনায়ও তাঁর ঝোঁক ছিল। ‘মারাঠা তর্পণ’ নামে একখানি নাটকও তিনি লিখেছিলেন। তারাশঙ্করের প্রথম গল্প ‘রসকলি’। দীনেশরঞ্জন দাশ সম্পাদিত ‘কল্লোল’ পত্রিকায় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে ফাল্গুনে প্রকাশিত হয়। আইন অমান্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ায় ১৯৩০ সালে তিনি কারাবরণ করেন। এক বছর পরে কারা থেকে মুক্তি পেয়ে আবার কলম ধরেন।

তারাশঙ্করের বিপুল সংখ্যক রচনা সাহিত্যাকাশকে ভরে দিয়েছে। ‘অগ্রদানী’, ‘তিনশূন্য’, ‘ডাইনি’, ‘তারিণী মাঝি’, ‘তমসা’, ‘জলসাঘর’ ‘বেদেনী’, ‘ডাক হরকরা’, ‘বেদের মেয়ে’, ‘বোবাকান্না’ প্রমুখ লেখকের কালজয়ী ছোটগল্প।

‘চৈতালী’ তাঁর প্রথম মুদ্রিত উপন্যাস। আর ‘নবদিগন্ত’ তাঁর জীবদ্দশায় মুদ্রিত শেষ উপন্যাস। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল ‘ধাত্রীদেবতা’, ‘কবি’, ‘কালিন্দী’, ‘গণদেবতা’, ‘পঞ্চগ্রাম’, ‘সন্দীপন পাঠশালা’, ‘আগুন’, ‘অভিযান’, ‘হাঁসুলীবাঁকের উপকথা’, ‘সপ্তপদী’, ‘নাগিনী কন্যার কাহিনী’, ‘পদচিহ্ন’, ‘আরোগ্য নিকেতন’, ‘বিচারক’, ‘নিশিপদ্ম’, ‘শতাব্দীর মৃত্যু’ ইত্যাদি। তারাশঙ্করের একাধিক উপন্যাসের মধ্যে সময় এবং কালের সন্ধান পাওয়া যায়। ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’ ও তার ব্যতিক্রম নয়।

৮.১.১.১ : বিষয় সংক্ষেপ

‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’ উপন্যাসটির মধ্যে তারাশঙ্কর কাহার জনগোষ্ঠীর সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। কোপাই নদীর প্রায় মাঝামাঝি অংশে হাঁসুলীর মত বাঁক নেওয়া বাঁশবাদী গ্রামে কাহারদের বাস। আগে এরা পাক্কী বহন করত। এদের দুটি পাড়া— ‘কাহার পাড়া’ ও ‘আটপৌরে পাড়া’। বাঁশবাদী এলাকার আড়াইশো বিঘা জমি নিয়ে কাহারদের বাস। আর জঙ্গুল গ্রামের তিনহাজার বিঘা জমিতে আটপৌরে কাহারদের বাস।

কাহারপাড়াতে হঠাৎ কেউ শিস্ দিচ্ছে। সবাই ভীত। উপকথার কথক সুচাঁদ বলে চলে—

“এ ভাল নয়, এ ভাল নয়।”

বাবুমশায়রা সদরে খবর দেন। ফলে কাহারপাড়ার ডাকাবুকো ছেলে করালী তার প্রিয় কুকুরকে ছেড়ে দেয় বাঁশবাদীতে। করালী ভেবে পায় না শব্দটার উৎস কোথায়।

সন্ধ্যায় কাহারপাড়ার মজলিস জমে উঠেছে যখন, ঠিক তখনই করালীর কুকুর ছুটে যায় বাঁশবাদীর দিকে। কিছু পরে তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা যায় এবং কালুয়া মজলিসে ছুটে আসে। কিন্তু বিষের জ্বালায় সে মারা যায়। করালী কুকুরটাকে বাড়িতে সমাধি দেয়। এই নিয়ে বনওয়ারীর সঙ্গে করালীর দ্বন্দ্ব বাঁধে এবং সে পালিয়ে যায়। কিন্তু করালী রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যে বাঁশবনে আগুন লাগায়। চন্দ্রবোড়া সাপ মারা যায়। এই সাপই শিস্ দিচ্ছিল এতদিন। সাপ মারার জন্য দারোগা সাহেব করালীর প্রশংসা করে। বনওয়ারী সন্ধ্যাবেলা সাপটাকে পোড়াবার কথা বলে। আর সুচাঁদ সাপকে কত্তাবাবার বাহন বলে উল্লেখ করলে কাহার সমাজ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। কাহার পাড়া করালীর কৃতকর্মের জন্য পূজো দিতে প্রতিশ্রুত হয়। নিমতেলে পানু এর জন্য কত্তার পূজোতে খুঁতো পাঁঠা বলি দেওয়ার অভিযোগ করে। প্রায়শ্চিত্তের পূজোতে দুটে পাঁঠাবলি দেওয়া হয়।

এদিকে করালী সাপ মারার কৃতিত্ব পায়। বনওয়ারীকে সে অমান্য করে সাপটিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। কিন্তু করালী সাপটিকে চন্দনপুর নিয়ে যেতে গেলে বনওয়ারী বাধা দেয়। সুচাঁদের পরামর্শে বনওয়ারী বাবার বাহনকে দাহের কথা বলে এবং কাহারদের চান করতে বলে। আর কাহাররা তা মেনে নেয়।

কাহার পাড়ার পাখি বিবাহিতা। হেঁপো রোগী নয়ান তার স্বামী। কিন্তু নয়ানকে ছেড়ে সে করালীকে সাঙা করে। করালী চন্দনপুরে রেলস্টেশনের কাজ করে। সুখে-দুখে তাদের দিন কাটতে থাকে। শুধু পাখি নয়, করালীর সঙ্গে থাকে বনওয়ারীর বোন সিধু। কিন্তু লাইনমিস্ত্রির সঙ্গে ‘অঙ্গ’ মাখামাখি হলে সিধুকে কাহার পাড়া ছাড়তে হয়।

‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’ উপন্যাসে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কথক সুচাঁদের মাধ্যমে হাঁসুলীবাঁকের পরিচয় দান ও বাঁশবাদী জঙ্গল গড়ে ওঠার বৃত্তান্ত শুনিয়েছেন। কত্তাবাবার থানে কাহার সমাজের পূজো দেওয়া, শিস্ দেওয়াকে কেন্দ্র করে কাহারদের আতঙ্ক, শিমুল গাচে উঠে ও কোঠাবাড়ি তৈরি করে করালীর সংস্কার ভাঙা ও কাহারদের জনজীবনের উপন্যাসে। বনওয়ারী প্রাচীন সংস্কারে আবদ্ধ, কিন্তু করালী প্রচলিত সংস্কার মানেনা। শুরু হয় লড়াই, কিন্তু হার হয় বনওয়ারীর। কাহাররা কৃষিকর্মের সঙ্গে সকলে মিলে পাক্কি বয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করে। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে করালী চন্দনপুরে কাজ নেয়ও অন্যান্য কাহারদের প্রলোভন দেখায়। বলে, না খেয়ে মরার চেয়ে চন্দনপুরের কুলীর কাজ অনেক ভাল। কালোশশীর সঙ্গে বনওয়ারীর গোরন প্রেম এবং পাখিতে ছেড়ে করালীর সুবাসীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উপন্যাসে লক্ষ্য যায়। শেষে বনওয়ারী মৃত্যু ঘটেছে, কিন্তু পাগল আজও গান গায়। সুচাঁদ বলে চলে স্টেশনের পাশে উপকথার গল্প। করালী আবার নতুন করে গড়বে হাঁসুলী বাঁক।

এই সময়ে যুদ্ধ লেগেছে খবর পাওয়া যায়। চাল-ডাল কাপড়ের আগুন ছোঁয়া দাম। চন্দনপুরের ডাকে খবর আসছে। ফলে কাহার পাড়ার লোকজন ক্রমশ ঝুঁকে পড়ছে চন্দনপুরের দিকে। তারা করালীর প্রলোভনে মেতে উঠেছে। আবার বনওয়ারীর রক্ত চক্ষুকেও উপেক্ষা করতে পারছে না। কিন্তু বনওয়ারী বুঝতে পারছে কাহার পাড়াকে আর এইভাবে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।

বনওয়ারীর স্ত্রী গোপালীবালা। কিন্তু গোরাকাদের মেয়ে কালোশশীর সঙ্গেও বনওয়ারীর রঙের সম্পর্ক ছিল। কালোশশী আটপৌরে পাড়ার মাতব্বর পরমের স্ত্রী। বনওয়ারী, গোপালপুরে পাঙ্কি বইবার কাজে লাগে আটপৌরে কাহারদের সঙ্গে নিয়ে। সকলে মিলে পাঙ্কি বয়ে মোটা টাকা বকশিস পায়। পরম জানতে পারে তার অনুপস্থিতিতে কালোশশী বনওয়ারীর সঙ্গে মিলিত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিষধর সাপের ছোবলে কালোশশীর মৃত্যু হয়। এই মৃত্যু কাহারপাড়ায় ভয়ের সঞ্চার করে। আটপৌরে কাহাররা চায় বনওয়ারীর মাতব্বরীতে একত্রিত হতে। সুবাসীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে এ ব্যবস্থা পাকা করা হয়। কিন্তু গোপালীবালার আকস্মিক মৃত্যু বনওয়ারীকে চিন্তিত করে। আবার সুবাসীর চাল-চলনও তার ভালো লাগে না।

এদিকে করালীকে কোনও মতেই ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছেনা। সে যুদ্ধের কাজ নিয়েছে। নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আইনকে সে ব্যবহার করতে শিখেছে। প্রচলিত সংস্কার সে মানছে না। পাখির সঙ্গে সাঙার পর সে ঘর তুলেছিল। কিন্তু ঝড়ে সে ঘর ভেঙে পড়লে করালী কোঠাবাড়ি তৈরির চেষ্টা করে। কাহারদের মাতব্বর ও অন্যান্যরা বাঁধা দেওয়া সত্ত্বেও সে নিয়মভঙ্গ করে কোঠাবাড়ি তোলে। বনওয়ারী অসুস্থ থাকায় তখন প্রতিবাদ করেনি। কিন্তু একটু সুস্থ হলে বসন বনওয়ারীকে সব বলে। বনওয়ারী করালীকে বাধা দেয়। কিন্তু করালী পুলিশি সাহায্য নিয়ে কোঠাঘর তোলে। বনওয়ারীর শাসন ভেঙে করালী আত্মহারা। সে সমগ্র কাহারপাড়াকে চন্দনপুরের কারখানার কাজের জন্য আহ্বান করে। বনওয়ারী মনে করে করালী কাহার পাড়ার সর্বনাশ করবে। পুত্রসন্তান না থাকায় করালীকে সে কোলগত করতে চায়। কিন্তু পারে না। যুদ্ধের বাজারে করালী কাহারদের চাকরির প্রলোভন দেখায়। না খেয়ে মরার চেয়ে চন্দনপুরের কুলীর কাজকে কাহাররা হাসি মুখে মেনে নেয়। যুদ্ধের বাজারে কাহাররা চিনি ও কেরোসিন থেকে বঞ্চিত হয়। বনওয়ারী ঘোষবাড়িতে চিনি চাইতে গেলে পায় না। কিন্তু এর জন্য সে প্রতিবাদ করেনি। অথচ করালী এর জন্য সরাসরি ইউনিয়ন বোর্ডে নালিশ জানিয়েছে।

করালী যেন নতুনকালের মাতব্বর। তার জাতের ব্যাখ্যা শুনে পাগল মুগ্ধ হয়। মোড়ল করালীকে ব্যাটা বলে সম্বোধন করলে সে প্রতিবাদ করে। সে যেন কাহারদের মধ্যে স্বতন্ত্র। যুদ্ধের বাজারে সে পাখি ও নসুবালাকে কাপড় দেয়। কিন্তু বেশিদিন পাখির ভাগ্যে সুখ স্থায়ী হয় না। করালী সুবাসীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। বনওয়ারীও সুবাসীকে সন্দেহ করতে থাকে। কিন্তু করালী গোপনে সুবাসীর সঙ্গে মিলিত হয়। পাখি আপত্তি করলে পাখিকে স্পষ্ট জানায় সে সুবাসীকে সাঙা করবে। পাখির যদি থাকতে ইচ্ছে হয় থাকবে, না হলে চলে যেতে পারে। করালী-পাখির কথা শুনে বনওয়ারী ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হয় লড়াই। কিন্তু হার হয় বনওয়ারীর। আতর্জনাদ করে ওঠে পাখি। পরাজিত, আহত, বনওয়ারী বাড়ি ফিরতে ফিরতে অনেক কথা ভাবে। করালী কাহারদের সর্বনাশ করবে ভেবে সে তাকে মারতে চায়। বাড়ির কাছে সে নীচু স্বরে কাদের কথাবার্তা শুনে পায়। সে তাদেরকে করালী ও পাখি মনে করে মারতে চায়। কিন্তু বনওয়ারীর প্রবল চিৎকারে রাত জাগা দুটি হুমহুমে পাখি যারা কথা বলছিল তারা ডানা ঝাপটে উড়ে পালায়। আর বনওয়ারী ওদেরকে কালোশশী ও গোপালীবালার প্রেতাত্মা মনে করে জ্ঞান হারায়।

বনওয়ারীর এ অচেতনতার সুযোগ নিয়ে সুবাসী করালীর সঙ্গে পালিয়ে যায়। এদিকে কাহাররাও করালীকে অনুসরণ করতে থাকে। যুদ্ধের বাজারে বাঁশবাদী জঙ্গলে যুদ্ধের তাবু পড়েছে। উড়োজাহাজের আনাগোনা। সাফ করা হচ্ছে বাঁশবন। রমন বনওয়ারীর অসুস্থতার সুযোগে দুধেল গাই বিক্রি করে পালিয়ে গেছে চন্দনপুরে। সুবাসীও সব হাঁস-মুরগী বিক্রি করে করালীর ঘরে উঠেছে। পাখি কান্নাকাটি করে করালীর মাথায় কোপ মেরে কোঠাবাড়িতে এসে গলায় দড়ি দিয়েছে। আর বসন মেয়ের দুগ্ধে চৌধুরী বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। উপকথার কথক সুচাঁদ সাইক্লোনের দাপটে আছাড় খেয়ে পড়ে পা ভেঙে হাসপাতালে। বনওয়ারী ঘর থেকে ষাট দিন পর বেরিয়ে দেখেছে হাঁসুলীবাঁক আর নেই। শোকে-দুগ্ধে সে মারা গেছে। আর করালী তার চিতায় দিয়েছে শালকাঠ এবং ঘি।

এরপরই এসেছে ১৯৪৩ এর বন্যা। ভেসে গেছে হাঁসুলীবাঁকের বাঁশবাদী গ্রামের কাহারপাড়া। উপকথার ছোট নদীটি ইতিহাসের বড় নদীতে মিশে গেছে। সেও বন্যার সঙ্গে মিশে ইতিহাস হয়ে গেছে। তবে পাগল আজও গান গায়। নসুবালা যায় বাঁশবাদীতে গোবর কুড়াতে। আর সুচাঁদ বলে চলে স্টেশনের পাশে উপকথার গল্প। কেউ শোনে, কেউ বা শোনে না। এরই মাঝে উল্লসিত নসুবালা ডাকাবুকো ফেরার খবর দেয়। মাটি কাটছে গাইতি দিয়ে, যেন খুঁজেছে কিছু। ঔপন্যাসিক বলেছেন উপকথার কথক কোপাইকে ইতিহাসের গঙ্গায় মিশিয়ে দেবার পথ কাটছে। করালী গড়বে নতুন হাঁসুলীবাঁক।

৮.১.১.২ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

- ১। উপন্যাসে কাহারদের কতগুলি পাড়ার নাম পাওয়া যায় ও কিকি?
- ২। করালী কোথায় কুলীর কাজ নিয়েছিল?
- ৩। শিস দেওয়াকে কেন্দ্র করে কাহারদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হওয়ার কারণ কি?
- ৪। উপন্যাসে তিনটি নারী চরিত্রের নাম করো।
- ৫। উপন্যাসের কাহিনি সংক্ষেপে নিজের ভাষায় আলোচনা করো।

একক ২ গঠন রীতি

বিন্যাসক্রম

- ৮.১.২.১ : গঠন রীতি
৮.১.২.২ : উপকথার কথক সূচাদ
৮.১.২.৩ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৮.১.২.১ : গঠন রীতি

উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তারাক্ষর পূর্বসূরীদের পদ্ধতি অবলম্বন করেননি। এক্ষেত্রে তিনি মৌখিক রীতিকেই অনুসরণ করেছেন। একজন কথক গোটা কাহিনি বলে গেছে। তবে বিশেষ কোনও ঘটনা বা জীবনের বিবরণ দেওয়া কিন্তু উপন্যাসিকের উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি কাহার সমাজের ক্ষয়িষ্ণুতার বিবরণ দিতে চেয়েছেন। আর এর জন্য তিনি কথক সূচাদের সাহায্য নিয়েছেন।

আলোচ্য উপন্যাসে একাধিক ঘটনার ভিড় লক্ষ করা যায়। যেমন—হাঁসুলী বাঁকের পরিচয় দান ও বাঁশবাদী জঙ্গল গড়ে ওঠার বৃত্তান্ত। কত্তাবাবার থানে কাহারদের পরিচয় পূজা দেওয়া। করালীর সঙ্গে পাখির প্রণয়, শিসকে কেন্দ্র করে কাহারদের আতঙ্ক ও শিসের সন্ধানে করালীর জঙ্গলে প্রবেশ। বিষের জ্বালায় তার কুকুরের মৃত্যু। কালোশশীর সঙ্গে বনওয়ারীর গোপন প্রেম। সুবাসীর সঙ্গে করালীর অবৈধ মেলামেশা ও বনওয়ারীর রাগ। করালীর বিদ্রোহ ও বনওয়ারীর পরাজয়। বাঁশবাদীর বনে আগুন লাগিয়ে সাপ মেরে করালীর পুরস্কৃত হওয়া ও কাহার সমাজে অসন্তোষ। পাখির করালীর ঘরে ওঠা, করালীর চন্দনপুরে বসবাস ও প্রথা না মানা, বনওয়ারী-কালোশশীকে নিয়ে

হাঁসুলীবাঁকের উপকথায় লেখক বিশেষ কোনও ঘটনা বা জীবনের বিবরণ দিতে চাননি। তিনি কাহার সমাজের ক্ষয়িষ্ণুতার বিবরণ দিতে চেয়েছেন। কাহিনী বর্ণনায় সমস্ত ঘটনায় যুক্তি আছে, যা উপন্যাসকে বাস্তবতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। বিভিন্ন শাকা কাহিনীর বিস্তার ঘটেছে। ফলে মহাকাব্যিক বিস্তার লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি চরিত্রটি সীমাবদ্ধ জীবনের গম্ভীর পার হয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ফলে কাহিনীটি সংকীর্ণ জীবনের সীমা পার হয়ে উঠেছে বৃহৎ সময়ের অনন্ত সম্ভাবনার গম্ব।

আটপৌরেদের ঘেঁটুগান রচনা করা। সুবাসীর সঙ্গে করালীর বিয়ে কাহারদের চন্দনপুরে কুলির কাজে নিয়ে যাবার জন্য করালীর প্রলোভন এবং বনওয়ারীর মৃত্যু ও নতুন হাঁসুলী বাঁক গঠন ইত্যাদি। ঘটনা আরও এগিয়ে যায় জটিলের দিকে, কেননা বনওয়ারী করালীকে করায়ত্ত্ব করতে গেলেও পারে না। করালীকে পরমের ডাকাত দলে যোগদান করানোর চেষ্টায় বনওয়ারী বাঁধা দেয়। চড়কের পাটায় শুয়ে সে পাপ দূর করে পুণ্য অর্জনের চেষ্টা করে।

কাহার পাড়ার লোকজনদের চন্দনপুরের কারখানায় কাজে যোগদান, বনওয়ারীর প্রবল প্রতিবাদ, কত্তাবাবার আশ্রয় শিমুল গাছে উঠে করালীর সংস্কার ভাঙা, কালবৈশাখীর ঝড়ে চালা ভেঙে গেলে কোঠা বাড়ি তোলার উদ্যোগ, কালোশশীকে কেন্দ্র করে পরম ও বনওয়ারীর লড়াই-এর ঘটনা উপন্যাসকে শীর্ষবিন্দুতে নিয়ে গেছে।

কালোশশী ও বনওয়ারী গোপনে মিলিত হলে পরমের উপস্থিতি বুঝে বনওয়ারী পালিয়ে যায়। আর সায়েবডুবির খালে পড়ে সাপের কামড়ে কালোশশীর মৃত্যু হয়। কালোশশীর মৃত্যুতে বনওয়ারী ভয় পায়, কিন্তু পাগল বনওয়ারীকে রক্ষার চেষ্টা করে।

উপন্যাসে আনন্দ বেদনার যুগলশ্রোত বয়ে চলে করালীর কোঠাঘর করা নিয়ে। এ ছাড়াও করালীর ঘর ভাঙা, সুবাসীর বিয়ে, নয়ানের মৃত্যু, আইনী সাহায্য নিয়ে পুনরায় করালীর কোঠাঘর তৈরি, ঝড়ে কত্তাবাবার বেলগাছ পড়ে যাওয়া ইত্যাদি ঘটনাকে কেন্দ্র করে। এইসব ঘটনা ছাড়াও উপকথায় স্থান পেয়েছে ভাঁজো পরবের সুবাদে কাহার পাড়ার দুটি দল গড়ে ওঠা, বনওয়ারীর প্রথমা স্ত্রী গোপালীবালার মৃত্যু, বনওয়ারী ও করালীর মুখোমুখি সংঘাত, সুবাসীকে কেন্দ্র করে পাখির দুর্ভাগ্য ও বনওয়ারী করালীর সংঘাত, বনওয়ারীর পরাজয় সুবাসীর করালীর ঘরে যাত্রা ও পাখির আত্মহত্যা, কাহারদের চন্দনপুরে কাজে যাওয়া, কত্তাবাবার থানের বিলোপ, যুদ্ধে বাঁশবাদী গ্রাম ধ্বংস, বনওয়ারীর মৃত্যু, করালীর প্রত্যাবর্তন ও নতুন কাহার পাড়া গঠন প্রভৃতি ঘটনা।

উপকথাতে ঘটনার রূপায়ণে খুব বেশি নাটকীয়তার সৃষ্টি হয়নি। ঘটনার তীব্র আলোড়ন দেখা যায়নি। আসলে কাহারদের দৈনন্দিন জীবনের চিত্রই এখানে তারাশঙ্কর এঁকেছেন। সংস্কারমুখী জীবনকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করেছেন। স্বামী ত্যাগ করে পাখির করালীর ঘরে যাওয়া বা করালীর সঙ্গে সুবাসীর গোপন প্রণয় উপন্যাসে বিশেষ আলোড়ন তোলে না। করালীর সাপ মারা কাহারপাড়ায় সম্ভ্রাসের আবহাওয়া সৃষ্টি করলেও দারোগার পুরস্কার প্রদানে কোনও নাটকীয়তার সৃষ্টি হয়নি। আসলে এখানে সমস্ত ঘটনায় যুক্তির শৃঙ্খল আছে। প্রস্তুতিপর্ব আছে। কাহারদের দুঃখ দারিদ্র্য, তাদের আঁকড়ে ধরা সংস্কার, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, তাদের পাক্ষীবহন করে জীবিকা নির্বাহ, কারখানার নতুন পথের সন্ধান উপন্যাসকে বাস্তবতার দিকে ঠেলে নিয়ে গেছে।

তবে বিশাল এই উপন্যাসকে ঔপন্যাসিক কয়েকটি পর্বে ভাগ করেছেন। মোট ছটি পর্ব এখানে আছে। তবে ষষ্ঠ পর্বকে শেষ পর্ব বলা হয়েছে। প্রথম পর্বে আছে পাঁচটি উপপর্ব, দ্বিতীয় পর্বে নয়টি, তৃতীয় পর্বে আরও পাঁচটি উপপর্ব। কিন্তু শেষপর্বে একটিও নেই। এই পর্বটি সংক্ষিপ্ত। কাহার পাড়ার ধ্বংসের বিবরণ ও নতুন কাহার পাড়া গঠনের ইঙ্গিত এখানে মেলে।

উপকথায় বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্রে না রেখে, বিভিন্ন শাখাবিস্তার করা হয়েছে। ফলে মহাকাব্যিক বিস্তার ঘটেছে। বিশালতা, সফলতা বৈশিষ্ট্যে দৈনন্দিন জীবন চিত্রণ হয়েও এটি হয়ে উঠেছে মহাকাব্য।

তবে উপন্যাসটি নিঃসন্দেহে বিবরণমূলক। সুঁচাদের মাধ্যমে তারাশঙ্কর কাহারদের জনজীবনের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। তাদের জন্ম মৃত্যু, পূজো-পার্বণ, আনন্দ-উৎসব ও দুঃখ-বেদনাকে তুলে ধরা হয়েছে আলোচ্য উপন্যাসে। কত্তাবাবার থানে পূজো, ভাঁজো পরব, নবান্ন উৎসব, চড়ক পূজোর পাশাপাশি করালী-পাখির বিয়ের নানা রীতি-নীতির কথা, মিত্রবাড়ির বিয়েতে কাহারদের পাক্ষীবহনের বর্ণনা উপন্যাসে বিবৃত। উপন্যাসের সূচনা অংশে ভৌগোলিক ও পরিবেশগত বর্ণনা আছে। আছে কোপাই নদীর সুন্দরতার পরিচয়। অতীত দিনের বিবরণ এখানে জীবন্ত হয়ে উঠেছে সুঁচাদের বর্ণনার ছটায়। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে কাহারদের বেঁচে থাকা, তাদের দুঃখ-আনন্দভরা জীবনের পরিচয়, একটি বিশেষ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে চিনিয়ে দিয়েছে।

উপকথার আঙ্গিক গঠনে বিভিন্ন চরিত্র দারুণভাবে সাহায্য করেছে। নায়ক বনওয়ারী, প্রতিনায়ক করালী, সুঁচাদ, নসুবালা, পাখি, সুবাসী, কালোশশী, পরম—প্রতিটি চরিত্রই সীমাবদ্ধ জীবনের গম্ভীর পার হয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

তারাশঙ্কর পর্ব থেকে পর্বান্তরে কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। কোথাও থামেননি। তাইতো সুচাঁদ রেলস্টেশনের ধারে অবিরাম বলে চলেছে উপকথার গল্প। এই কাহিনি সংকীর্ণ জীবনের সীমা পার হয়ে উঠেছে বৃহৎ সময়ের অনন্ত সম্ভাবনার গল্প। যেখানে অঞ্চলের পরিচয় মুছে গেছে। কোন শ্রেণি নয়, ক্ষুদ্রতা নয়, সংস্কারাচ্ছন্নতা ভেদ করে চিরকালের জীবনছন্দের রাগিণী বেজে উঠেছে। আর তা সম্ভব হয়েছে ঔপন্যাসিকের কাহিনি গঠনের পরিপাট্যতার ওপর নির্ভর করেই। ঘটনার বহুলতা, নাটকীয়তা, চরিত্রের মনস্তত্ত্ব কাহিনিকে মহাকাব্যিক পটভূমি উপহার দিয়েছে। নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্ব, সভ্যতার সংকট ও নতুন সভ্যতার গঠন ঔপন্যাসিক খুব যত্নসহকারে বর্ণনা করেছেন। দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি বনওয়ারী অদ্ভুত এক প্রশান্তি দেখেছিল। কিন্তু সে সত্যিই যেন কাহিনির শেষে অনিবার্যভাবে ধরা পড়ল। বনওয়ারীর শবদেহের পাশে করালীর শ্রদ্ধা নিবেদন যেন অনেক বড় ফ্রেমে কাহিনির ভিতরকে বেঁধে দেওয়া হল। আর তাই নিম্নবর্ণের ছায়াপাত থাকলেও বৃহৎ ব্যঞ্জনা আবৃত হয়ে উঠেছে এই কাহিনি। সময় ও সময়ান্তরের ব্যঞ্জনা ও উপলব্ধিকে নিয়ে বেঁচে রয়েছে এই উপন্যাস।

৮.১.২.২ : উপকথার কথক সুচাঁদ

‘কথক’ শব্দের আভিধানিক অর্থ যিনি বর্ণনা করেন। অর্থাৎ ‘বর্ণয়িতা’। মধ্যযুগের সাহিত্যে এই বর্ণয়িতা ব্যক্তির সম্মান মেলে। গ্রামাঞ্চলে এখনও এই রকমের মানুষ পাওয়া যায়। এরা সাধারণত গ্রামের অসংস্কৃত ও অজ্ঞ মানুষদের চিত্ত আকর্ষক বিভিন্ন কাহিনির মাধ্যমে দেব-মহিমা প্রচার করার চেষ্টা করে। তবে গরীব, সরল জনসাধারণের কাছে তাদের গুরুত্ব বেশি, কেননা দরিদ্ররা দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কথক কথিত সেই মহাশক্তির কাছে নিজেদের সাঁপে দিতে চায়।

‘হাঁসুলীবাঁকের উপকথা’-র কথক সুচাঁদ। কাহার পাড়ায় তার ভূমিকা অপরিসীম। কত্তাবাবার মহিমার কথা সে শোনায় কাহারদের। তার তৈরি উপকথা কাহাররা সত্যি বলে মেনে নেয়। সুচাঁদের কাহার পাড়াকে শাসন করার ক্ষমতা না থাকলেও প্রধান অস্ত্র আছে কথন। সুচাঁদ তো কাহার পাড়ার অতীত ইতিহাস, সেই জানে কাহার পাড়ার সৃষ্টি রহস্য। তাই কাহিনীর বিস্তারে অতীত ইতিহাসকে সঞ্চারিত করে দেবার জন্যই একান্ত প্রয়োজন সুচাঁদকে।

‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’ উপন্যাসটিতেও এই একই ধরনের একজন আছে সে কাহার গোষ্ঠীর প্রাচীন বৃদ্ধা সুচাঁদ। সে নিয়তির অবশম্ভাব্যতা নিয়ে বেঁচে আছে। কাহার পাড়ায় তার ভূমিকা অপরিসীম। কত্তাবাবার মহিমার কথা সে শোনায় বাঁশবাদী জঙ্গলের কাহারদেরকে। সাধারণ কথকদের মতো সেও কাহারদের ন্যায়ধর্মে অটল রাখার জন্য বলে চলে কত্তাবাবার মাহাত্ম্যের কথা। শুধু বলেই যায় না, ভাষা ব্যবহার ও বর্ণনার ছটায় সে বিষয় বাস্তব করে তোলার চেষ্টাও করে। হাত পা নেড়ে, চোখ বড় করে, আকাশের দিকে তাকিয়ে সে যেন দেখা সময়কে দেখতে পায় না, অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে খুঁজে পায় সেকালের মানুষকে। গোটা কাহার পাড়া তার মুখের দিকে যখন তাকিয়ে থাকে, তখন সে চুলের উকুন মারতে মারতে বলে—

“কত বছর হল কে জানে।...মাথার চুলের সংখে হয়, তার আর সংখে নেই।” বোঝা যায় অমোঘ নিয়তির প্রতীক যেন সুচাঁদ।

তার তৈরি উপকথার গল্প কাহাররা সত্যি বলে মেনে নেয়। কাহারদের সে বলে আগেকার কালে কাহার পাড়া ছিল না। সব জলে পরিপূর্ণ ছিল। সে সময় ঘটেছিল প্রবল বন্যা। ফলে ভেসে গিয়েছিল নীলকুঠি। নীলকর সাহেবরা এই বাঁশবাদী গ্রামে আস্তানা গড়েছিল। নীলচাষ যখন লাভজনক হল না, তখন নীলকররা এই গ্রাম থেকে

চলে যেতে থাকে। ফলে বাঁশবাদী গ্রামে কাহাররা থেকে গেল। প্রকৃতপক্ষে সুচাঁদের এই কথার সঙ্গে সত্যের কোনও মিল নেই। কিন্তু সরল ও অশিক্ষিত অঙ্গ, কাহাররা সুচাঁদের এই গল্প বিশ্বাস করে।

সুচাঁদ উপকথার গল্পের জালে কাহারদেরকে দারুণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। সে বৃদ্ধা, চার কুড়ি বয়স তার। দক্ষ হাতে কাহারপাড়া শাসন করার ক্ষমতা তার নেই। তার অস্ত্র কখন। বনওয়ারীকে সে উপকথার জালে জড়িয়ে ফেলে। আটপৌরে পাড়ার মাতব্বর পরম ও কাহার পাড়ার বনওয়ারী যেন সুচাঁদ ছাড়া পূর্ণ নয়। কেন না বনওয়ারী ছেলে বেলা থেকেই সুচাঁদের উপকথার গল্প শুনে শুনে বড়ো হয়েছে। সুচাঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই বনওয়ারী বলেছে রাজার পাপে রাজ্যনাশ হয়, আর মণ্ডলের পাপে গ্রামনাশ হয়। বনওয়ারী তাই গ্রামের ভালো করার জন্যই চেষ্টা করেছে।

সুচাঁদের গল্পকথার যেন বিরাম নেই। কোনও ভাবেই কাহার পাড়ার জনজীবন থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করা যায়নি। কাহার পাড়াকে যেন সে নির্দিষ্ট একটা ছাঁচে ফেলতে চায়। কাহারদের সে বিশ্বাস করতে শেখায় কত্তাবাবা স্বয়ং আছেন। সে বলে প্রবল বন্যায় বাঁশবাদী জঙ্গল ভেসে গেলে চৌধুরী কত্তাবা গাছের ডালে আশ্রয় নেয়। ঘোর অন্ধকার। কিন্তু আলোময় একটা নৌকা এসে থামল। সাহেব, মেমরা তখন এক গলা জলে। উদ্ধার পাবার জন্য তারা নৌকাটিকে ধরতে চাইলেন। আর কত্তাবাবা দণ্ড হাতে এস চৌধুরীদের নৌকায় বসতে আদেশ দিলেন। ফলে সাহেব মেমরা জলে তলিয়ে গেলেন। আর চৌধুরী কত্তা হয়ে উঠলেন বাঁশবাদীর প্রধান। তিনি কাহারদের জমি দিলেন। গড়ে উঠল কাহার সমাজ। সুচাঁদ আরও বলে প্রথমে এই বাঁশবাদী জঙ্গল সর্পসঙ্কুল ছিল। বন্যার সময়ে কোপাই নদীতে স্রোতে ভেসে আসত বাঘ, কুমির, নেকড়ে। সাপের বাসস্থান বাঁশবাদীর বাঁশবন ও শ্যাওড়াগাছ। কত্তাবাবার অধিষ্ঠান বেলগাছেও ছিল সাপেদের আনাগোনা। এছাড়া ছিল ভূতদের রাজ্য। অবকটে বিশ্বাস করে কাহাররা সুচাঁদের কল্পিত এইসব উপকথার কাহিনি। কেননা পূর্বপুরুষের কথা মিথ্যা হতে পারে না। তাই গভীর বিশ্বাসে কাহার পল্লীর প্রতিটি মানুষ সুচাঁদের কথায় সমর্থন জানায়।

কিন্তু কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সুচাঁদের কথায় বিশ্বাস বেড়ে ওঠে। করালী সুচাঁদের সংস্কারে আঘাত হানে। পাড়ার মাতব্বর বনওয়ারী সুচাঁদকে পুরোপুরি সমর্থন করে। এমনকী প্রাচীনত্ব বজায় রাখতে করালীর সঙ্গে দ্বন্দ্বও অবতীর্ণ হয়। দীর্ঘদিন ধরে সাপের শিস্ শোনা গেলেও কেউ তা প্রতিকারের ব্যবস্থা করেনি। কিন্তু করালী সাপ হত্যা করলে কাহাররা ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছে। সুচাঁদ কত্তাবাবার রোষের কথা উল্লেখ করেছে। সাপ হত্যা করার জন্য প্রায়শ্চিত্তের পূজোর আয়োজন করতে হয়েছে। আর চন্দ্রবোড়া সাপের দংশনে পানুর ছেলের মৃত্যু হলে সুচাঁদ আবার সেই দেবী রোষের প্রসঙ্গ তুলেছে। সে বলেছে কত্তাবাবাকে খুঁতো পাঠাবলি দেবার জন্যই এমনটি হয়েছে। তাই পানুকে আবার একটি পাঠাবলি দিতে হবে কত্তাবাবাকে সন্তুষ্ট করার জন্য।

সুচাঁদ সংস্কার আশ্রয়ী। তাই করালীর নতুন সমাজ গঠনকে সে মেনে নিতে পারেনি। তাই বেলগাছ উপড়ে গেলে সে বলেছে এই পাপের রাজ্য থেকে কত্তাবাবা বিদায় নিয়েছেন। কারণ, করালী বাবার বাসস্থান বেলগাছে উঠেই ঝড়ের আগাম সতর্কবার্তা জানিয়েছিল কাহারদের। কিন্তু শেষপর্যন্ত করালী জিতে গেছে। বনওয়ারী করালীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব হেরেছে। আর তার অসুস্থতার সুযোগে কাহাররা করালীকে অনুসরণ করে একে একে চলে গেছে চন্দনপুরের কারখানার কাজে। বনওয়ারীও বুঝতে পেরেছে তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। কিন্তু সুচাঁদ তাও থামেনি। পা ভাঙার পর হাসপাতালে সে যায়। আবার ফিরে এসে নতুন করে বলে উপকথার গল্প। নতুন সময়ে তাঁর গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। কাহাররা যাতে বিভ্রান্ত না হয়ে যায়, নতুন সময়ের আলোক প্রভায় তাদের চোখে যাতে ধাঁধা

না লাগে তার জন্য প্রয়োজন অতীতকে বহন করে চলা। —সুচাঁদ তাই করে। অবিরাম বলে চলে উপকথার গল্প। সময়ের দাবিতে বনওয়ারীকে বিদায় নিতে হয়, কিন্তু সুচাঁদকে বেঁচে থাকতে হয় সময়ের প্রয়োজনে। শিকড়কে অস্বীকার করা তো যায়না। সে মাতব্বরির দায়িত্ব নেয়নি। করালী কাহারপাড়ার নেতৃত্ব নিলে বনওয়ারীর প্রয়োজন ফুরিয়েছে, কিন্তু সুচাঁদ তো কাহারপাড়ার অতীত ইতিহাস, সেই জানে কাহারপাড়ার সৃষ্টি রহস্য। তাই এক পর্ব থেকে অন্য পর্বে কাহারপাড়ার অতীত ইতিহাসকে সঞ্চারিত করে দেবার জন্যই একান্ত প্রয়োজন সুচাঁদকে। সুচাঁদ শুধু উপকথার কথকই নয়, কাহারপাড়ার অতীত ইতিহাসের বাহকও। সময় থেকে সময়ান্তরে তার গুরুত্ব ও দায়িত্ব অপরিসীম।

৮.১.২.৩ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

- ১। ‘হাঁসুলীবাঁকের উপকথা’ উপন্যাসে মহাকাব্যিক লক্ষণ আছে কি? দুটি যুক্তি দাও?
- ২। উপকাহিনি বা শাখাকাহিনি কাকে বলে?
- ৩। সুচাঁদের প্রধান কাজ কি?
- ৪। উপন্যাসে ভাবে ভঙ্গীতে চরিত্রটি একেবারে মেয়ের মতো, চরিত্রটির নাম কী?
- ৫। উপন্যাসের গঠনরীতি সম্পর্কে নিজের ভাষায় আলোচনা করো।
- ৬। ‘উপকথার কথক সুচাঁদ’—‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’—অবলম্বনে সুচাঁদ চরিত্রটি বিশ্লেষণ করে উক্তিটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।

একক ৩

লোক সংস্কৃতি ও লোকসংস্কার

বিন্যাসক্রম

- ৮.১.৩.১ : লোকসংস্কৃতি ও লোকসংস্কার
৮.১.৩.২ : নামকরণ
৮.১.৩.৩ : আঞ্চলিকতা
৮.১.৩.৪ : আদর্শ প্রশাবলী

৮.১.৩.১ : লোক সংস্কৃতি ও লোকসংস্কার

তারশঙ্করের প্রায় প্রতিটি উপন্যাসে গ্রামবাংলার লোক সংস্কার জড়িয়ে আছে। আসলে যেখানেই গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের কথা এসেছে, সেখানে লোক সংস্কারের বিশাল ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গেছে। ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’তেও এই সংস্কারে সমৃদ্ধ।

বাঁশবাদির জনজীবনে সমস্ত নিয়মনীতি গড়ে উঠেছে তাদের বিশেষ বিশ্বাসকে ভিত্তি করে। আর এই বিশ্বাসই পরিণত হয়েছে সংস্কারে। সেই সংস্কারবদ্ধ জীবন স্রোতহীন জলাশয়ের মত একটা জায়গায় এসে পৌঁছে ছিল। সেখানে সমাজকে বেঁধে রেখেছিল কুসংস্কার। সংস্কার লঙ্ঘনকে কাহাররা পাপকর্ম বলে ভাবত। কিন্তু নতুন কাহাররা সাপকে সাপ মনে করত। সাপ দেবতার বাহন—এ কথা তারা মানত না। আর এসব নিয়ে প্রবীণ কাহারদের সঙ্গে নবীন কাহারদের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র রচিত হতে দেখা যায়।

তারশঙ্করের উপন্যাসে গ্রামবাংলার লোক সংস্কারের বিশাল ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া যায়। ‘হাঁসুলী বাঁকের উপন্যাস’ ও তার ব্যতিক্রম নয়। সমাজের সংস্কারকে লঙ্ঘন করা কাহাররা পাপ কর্ম বলে ভাবত। সুচাঁদ সংস্কারের ধারক ও বাহক। তারা সাপকে কত্তাবাবার বাহন বলে মনে করে। শিমুল গাছে উঠে ও কোঠাবাড়ি তৈরি করাতেও সমাজের মাতব্বরদের আপত্তি আছে। সংস্কার ভরা মন নিয়ে তারা সব ঘটনার মধ্যে পাপের খনি লক্ষ্য করে।

বাঁশবাদির সমাজব্যবস্থায় নীতিনির্ধারক মাতব্বর, অজ্ঞতা, কুসংস্কারের মোড়কে ঢেকে দিয়েছিল কাহারসমাজকে। প্রবীণ মাতব্বরদের এই সংস্কারের মর্যাদাহানি হলেই তা পাপকর্ম বলে গণ্য। উপকথার সুচাঁদ আদ্যিকালের বুড়ি। সে সংস্কারের ধারক ও বাহক। তার কাছে সংস্কার অমান্য করার অর্থ অমঙ্গল ডেকে আনা। মাতব্বর বনওয়ারীকে সমর্থন করে সে লোকসংস্কারনির্ভর-জীবন কাটাতে চেয়েছে।

সরীসৃপময় বাঁশবাদির গ্রামের মানুষের বিশ্বাস সাপ কর্তা বাবার বাহন, তাই সাপকে তারা মারে না। করালী সাপ মারলে সাপকে চিতায় সাজিয়ে দাহ করতে হয়। সংস্কারবশত কাহার পাড়ার সকলে স্নান করে শুদ্ধ হয়।

কাহাররা সাপকে বাবার বাহন মনে করে। বাবার থানে যায় রক্ষা পাবার আশায়। তার ‘পিত্তিবিধেন’ অর্থাৎ বাবাঠাকুরের পূজো করে ‘মদ মাংসে ঢাকে ঢোলে আতপে’। সুচাঁদ এ পূজোকে অপরাধের পূজো বলে মনে করে। তাই কলহ করতে নিষেধ করে। শনিবার পাওয়া না গেলেও পুরুত ঠাকুরের কথায় কাহাররা রবিবারে অমাবস্যার রাতে প্রায়শ্চিত্তের পূজো করে।

সংস্কারে বিশ্বাসী কাহাররা পূজোর শেষে বলিদানের কথা বলে। কিন্তু এই সংস্কার, এই লোক উৎসবের মোহ সকলরকম নৈতিকতার উর্ধ্বে, বিশ্বাস অবিশ্বাসের সীমানা ছাড়িয়ে। তাই বলিদানের পূজো শেষে কত্তাবাবার চরম অবিশ্বাসী করালীকে তিনটি হাঁস হাতে দেখা যায়। সেও বলিদান করতে চায়। মহোৎসবে মাততে চায়। কিন্তু সমবেত জনতা তাকে বাঁধা দিলে সে হাঁসগুলির মুণ্ড ছিঁড়ে সংস্কারকে ছিঁড়ে ফেলে বলে—

“...কত্তা, খাবে তো খাও, না খাবে তো খেয়ো না, যা মন চায় তাই কর।

আমাদের হাঁস খাওয়া নিয়ে কথা, আমাদের বলিদান হয়ে গেল।”

কাহারদের সংস্কার কোঠাবাড়ি করতে নেই। কেননা কত্তাবাবার কোঠাবাড়ি নেই এবং “বাবা ঠাকুরের বারণ আছে।” করালীর জেদ সংস্কার না মেনে সে কোঠাবাড়ি করবেই। কিন্তু লোক-সংস্কার তাকে বাধা দেয়। মাতব্বর বনওয়ারী ধর্মের ভয় দেখিয়ে করালীকে বিরত করে। শুধু তাই নয় বনওয়ারী দল নিয়ে এসে করালীর কোঠাঘরের ভীতসমেত উপড়ে ফেলেছে। কিন্তু করালী পুলিশি সহায়তা নিয়ে ঘর তৈরি করেছে। এইভাবে সংস্কারকে কেন্দ্র করে প্রবীণ ও নবীনদের দ্বন্দ্ব দেখা গেছে।

কাহার রাজ্যে যুক্তির সিড়ি নেই। বিশ্বাসের বাইরে যা কিছু ঘটছে সেখানেই তাদের মানা। চন্দনপুরে রেললাইনের কাজে কাঁচা পয়সা থাকা সত্ত্বেও কাহাররা সেখানে যেতে চায় না। কেননা ‘ওখানে গেলে মঙ্গল হয় না’। তা ছাড়া ওপথে যেতে কত্তাবাবার নিষেধ আছে। সংস্কারে জর্জরিত কাহাররা মনে করে কৃষিকাজ ও মনিবের মজুরি না খেটে না খেয়ে ধর্ম রক্ষা করাই শ্রেয়। কিন্তু করালী ও তার দলবল এই নিষেধ অমান্য করে চন্দনপুরে কারখানার কাজে যায়। শুধু তাই নয় যুদ্ধের সময় কাহারদেরও সে এই পথে আহ্বান করেছে। শুধু সংস্কার দিয়ে যে জাতি বাঁচে না তা করালী বোঝাতে চেয়েছে। তাইতো উপন্যাসের শেষে দেখা গেছে রেল কুলিরাই খেয়ে পরে বেঁচে আছে।

কাহারদের আরও একটা সংস্কার হল শিমুল গাছকে তারা বাবাঠাকুরের আশ্রয় মনে করত। তাই সেই গাছে কার চড়া পাপকর্ম। অথচ করালী শিমুল গাছে চড়ে কাহার পাড়ার মানুষকে ঝড়ের আগাম সতর্ক বার্তা জানিয়েছে। কিন্তু সংস্কারাচ্ছন্ন কাহাররা করালীর এই পরোপকারবৃত্তিকে ভালো ভাবে নেয়নি। বরং তার ওপর চাপিয়ে দিয়েছে উল্টো শাসন। সংস্কারের চাপে তারা করালীকে চেপে রেখেছে।

কিন্তু সংস্কারের পিছনে থাকে সমষ্টিগত মানুষের সমর্থন। তাই লড়াই চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সংস্কারভরা মন নিয়ে তারা সব ঘটনার মধ্যে পাপের খনি লক্ষ করে। যেমনটি তারা করেছিলে করালীর ক্ষেত্রেও। ঝড়ে যে কোনও লোকেরই ঘর ভেঙে যেতে পারে। কিন্তু করালীর ঘর সব থেকে উঁচু থাকার কারণে ভেঙেছে। আর সংস্কারের ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা কাহাররা ভেবেছে এটা করালীর পাপের জন্যেই।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে সংস্কারে লালিত হাঁসুলীবাঁকের মানুষদের জীবনযাত্রা। অবশ্য এটা হয়েছে কাহারদের অজ্ঞতার জন্যে। তাদের এই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে সমাজের মাতব্বররা ক্ষমতায় এসে তাদের নানা সংস্কারের আবর্তে ফেলেছে।

৮.১.৩.২ : নামকরণ

‘হাঁসুলী’ শব্দের অর্থ গয়না, যা নারীর শোভা বর্ধনকারী। আর বাঁশবাদি গ্রামকে ঘিরে বয়ে চলা কোপাই নদীর আকৃতি যেন হাঁসুলী গয়নার মত। ঘন সবুজ বাঁশবনের চারপাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া এই নদী গ্রামের সৌন্দর্য বাড়িয়েছে। লেখক কোপাই নদীকে কাহার কন্যার সঙ্গে তুলনা করেছেন। সোনার দ্যুতিতে নারী যেমন সুন্দরী হয়ে ওঠে, তেমনি বর্ষাকালে গিরিমাটি গোলা জল যখন কোপাইয়ের বুকে ভেসে চলে, তখন তার শোভা সত্যিই মন ভুলিয়ে দেয়। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে তার নির্মল জল ঝকঝকে, আলোকময় হয়ে ওঠে। হাঁসুলীর কথা আসলেও বাঁশবাদি গ্রামের অসাধারণত্ব বোঝাতে লেখক এই আলংকারিক উপমা ব্যবহার করেছেন।

‘বাঁক’ কথাটি দুভাবে ধরা যেতে পারে—কোপাই নদীর বাঁশবাদি জঙ্গলকে ঘিরে তৈরি বাঁক, যা দেখতে হাঁসুলী গয়নার মত। অন্যদিকে এই বাঁকটি কাহিনি কথনের বিশিষ্ট অঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত। এই বাঁক কথনে এসেছে নাটকীয়তা। এই বাঁকই নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্ব সূচনা করেছে, কখনও কাহারপুরের নিস্তরঙ্গ জীবনে ছন্দপতন ঘটিয়েছে। আবার কখনও অলৌকিকতায় বিশ্বাসী বাঁশবাদিকে দাঁড় করিয়েছে লৌকিকতার ভূমিতে।

এই ‘বাঁক’ করালীর হাত ধরেই কাহিনি কথনে জায়গা করে নিয়েছে। তৈরি হয়েছে উপকথা। বনওয়ারী ও সুচাঁদ কাহারদের কত্তাবাবার অনুশাসনে আবদ্ধ। কিন্তু

করালী প্রতিবাদ করেছে, এমনকী দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছে। সাপ মারার জন্যে তাকে পাপী বলা হয়েছে। গোটা কাহার সমাজ তার বিরোধিতা করেছে। প্রায়শ্চিত্তের পূজোর আয়োজন করেছে। বনওয়ারী করালীকে বাধা দিলেও সে নিজেই পূজো দিয়েছে। করালীই কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষকে বুঝিয়েছে খুঁকে মরার চেয়ে চন্দনপুরে কারখানায় মজুরির কাজ ভাল। শেষপর্যন্ত কাহাররা তার কথা শোনে এবং সেখানে কাজ করতে যায়। অথচ আগে তারা এই কাজকে পাপ মনে করত। কত্তাবাবা বারণ করেছে তাই একাজ করা যাবে না ভাবত। তারা ভাবত চন্দনপুরে গেলে

‘হাঁসুলী’ শব্দের অর্থ গয়না, যা নারীর শোভা বর্ধনকারী। বাঁশবাদি গ্রামের অসাধারণত্ব বোঝাতে লেখক এই আলংকারিক উপমা ব্যবহার করেছেন। কোপাই নদীর বাঁশবাদি জঙ্গলকে ঘিরে তৈরি বাঁক, যা দেখতে হাঁসুলী গয়নার মত। এই বাঁকটি কাহিনী কথনের বিশিষ্ট অঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত। যা কাহারপুরের নিস্তরঙ্গ জীবনে ছন্দপতন ঘটিয়েছে। ‘উপকথা’ হল মূল কথার বিচ্ছিন্নধারা। আবার উপকথা হল রূপকথার কোনও অংশ। নিম্নবর্ণীয় মানুষদের শোষণ, বঞ্চনা, এমনকী তাদের জীবন সংগ্রামের কথা ‘হাঁসুলীবাঁকের উপকথায়’ বিবৃত। মূল স্রোতের চাপের কাছে উপস্রোতহার মেনেছে। মূলস্রোত থেকে দূরত্বে থাকায় এ হয়েছে উপকথা। তিনটি আলংকারিক শব্দে লেখক নামকরণ করেছেন। উপন্যাসে তিনটি শব্দ (হাঁসুলী, বাঁক, উপকথা) তিন রকমের ব্যঞ্জন্য প্রকাশক।

অমঙ্গল হয়। মেয়েদের জাত থাকে না। কিন্তু প্রলোভন দেখিয়ে করালী তাদের পুরনো জীবন থেকে সরিয়ে এনে চন্দনপুরের নতুন জীবনের সন্ধান দেয়। করালীই বাঁশবেড়ের মানুষদের বোঝায় মোড়ল, মাতব্বররা তাদের ওপর অত্যাচার করতে পারে না, কেননা তাদের সে অধিকার নেই। এমনকী সে হেঁদো মোড়লের কথায় প্রতিবাদ জানিয়েছে। সমাজ শাসনকে উপেক্ষা করে কাহারদের চেতনা ফেরাতে চেয়েছে।

কাহাররা মনে করত সাপ কত্তাবাবার বাহন। তাই সাপকে মারা যাবে না। অথচ করালী সাপকে কত্তাবাবার বাহন বলে স্বীকার করেনি। সে সাপকে হত্যা করে জীবনরক্ষাকে শ্রেয় মনে করেছে। কাহারপুরের মানুষকে সে সংস্কারমুক্ত করতে চেয়েছে।

কাহাররা প্রাচীন শিমুলগাছকে পূজো করত। তাদের বিশ্বাস কত্তাবাবা শিমুলগাছে থাকে। কাজেই শিমুলে চড়া উচিত নয়। অথচ করালী সমাজ সংস্কারের নাগপাশ কাটিয়ে শিমুলে চড়ে ঝড়ের আগামবার্তা জানিয়েছে।

এতদিন কাহাররা সদগোপদের ঐঁটো পাত কুড়িয়ে খেয়েছে। ঘোষ মশায়ের নাতির অন্তপ্রাশনে নিমন্ত্রিত হলে করালী সরাসরি জানায় তারা ঐঁটো পাতে খাবে না। এমনকী তার দলের কেউ খেলে করালী তাকে ত্যাগ করবে বলে জানায়। কাহারদেরকে অন্যায়, অধর্ম থেকে রক্ষা করার জন্য করালী আপ্রাণ চেষ্টা করেছে।

কাহারপুরের আর একটি সংস্কারও করালীকে আঘাত হানে। যুদ্ধের বাজারে তার পদবৃদ্ধি হতে থাকে। সে কোঠাবাড়ি তৈরি করতে উদ্যত হলে বনওয়ারী অভিযোগ জানায়। কেননা কত্তাবাবার কোঠাবাড়ি নেই, কাজেই আর কারোর কোঠাবাড়ি থাকা উচিত নয়। কিন্তু করালী শেষপর্যন্ত পুলিশি সাহায্য নিয়ে কোঠাবাড়ি তৈরি করে বনওয়ারীর শাসনকে অগ্রাহ্য করেছে। করালী নতুন যুগের প্রেমিক। বউ পাখিকে ফেলে সে বনওয়ারীর স্ত্রী সুবাসীর প্রেমে মজে। এতে বনওয়ারীর সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব প্রবল হয়, কিন্তু এ দ্বন্দ্ব বনওয়ারী হার মানে। সুবাসীকে বিয়ে করে করালী সমাজ সংস্কারকে উপেক্ষা করেই। আর বনওয়ারী হেরে গিয়ে ষাট দিনের জ্বরে অচেতন হয়ে মারা যায়। বনওয়ারীর শোষণ-সংস্কার থেকে মুক্তি পায় কাহাররা করালীর হাত ধরেই।

‘উপকথা’ হল মূলকথার বিচ্ছিন্ন ধারা। আবার উপকথা হল গৌণকথা বা রূপকথার কোনও অংশ। নিম্নবর্ণীয় মানুষদের শোষণ, বঞ্চনা ও লাঞ্ছনা সহ্য করে যারা দিন কাটায়, বেঁচে থাকার রসদ যাদের সামান্য, তাদের জীবন সংগ্রামের কথাই হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় বিবৃত।

মূল নদীকে পুষ্ট করার জন্য যেসব নদী এসে মেশে তাদের বলে উপনদী। তেমনি এ উপন্যাসে দেখা যায় উপস্রোতের মানুষদের প্রাধান্য। তাদের জীবন প্রবাহ, ভাঙা-গড়া, স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গ, আদর্শকে টিকিয়ে রাখার লজ্জা, পরিবর্তনের পথে পা বাড়াতে দ্বিধা সংকোচ ও তাদের পরাজয় ব্যর্থতা সবকিছুই উপকথায় আছে। উপস্রোতের গভীরতা কম নয়। সেখানে আছে নাটকীয়তা, সংঘাত-দ্বন্দ্বের অবস্থান তবে মূলস্রোতের চাপের কাছে উপস্রোত হার মেনেছে। মূলস্রোত থেকে দূরত্বে থাকায় এ হয়েছে উপকথা।

সুতরাং বুঝতে পারি, তিনটি আলংকারিক শব্দে লেখক নামকরণে সার্থক। উপন্যাসে তিনটি শব্দ (হাঁসুলী, বাঁক, উপকথা) তিন রকমের ব্যঞ্জনার প্রকাশক। কোপাই নদীর সৌন্দর্য বর্ণনা কাব্যিক না হয়ে লেখক শোষিত বঞ্চিত মানুষদের নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন। সময়ের স্রোতে তাদেরকে শিকড় চ্যুত করতে চেয়েছেন। শুধু তাই নয়, বনওয়ারীকে নিয়ে তৈরি সুঁচাদের বলা উপকথাকে করালীর হাতে লেখক নতুন রূপ দিয়েছেন।

৮.১.৩.৩ : আঞ্চলিকতা

উপন্যাস হল জীবনের শিল্প, সমগ্রতার শিল্প। মাটি ও মানুষের ঘনিষ্ঠ বন্ধনে রচিত। আর সেই সূত্রেই উপন্যাসে এসে হাজির হয় মৃত্তিকা সংলগ্ন গ্রাম-জীবন, ব্রাত্য-অবহেলিত জনমানস। উপন্যাস হয়ে পড়ে ‘আঞ্চলিক’। তবে হাঁসুলী বাঁকের উপকথাকে আঞ্চলিক উপন্যাস হিসাবে বর্ণনা করার আগে আঞ্চলিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলি আগে জানা দরকার। সেগুলি—

ক. ভৌগোলিক সীমা-সংহতি।

খ. মানবমনের উপর এই ভূ-প্রকৃতির সর্বাঙ্গিক প্রভাব বিস্তার। মানুষের প্রকৃতিতে অন্তঃরঙ্গ যোগসাধন। এবং এক অদম্য একমুখীনতা ও সার্বভৌমতা।

- গ. নিদিষ্ট অঞ্চলের মানুষকে উপন্যাসের চরিত্র হিসাবে চিত্রণ ও প্রাধান্য দান।
- ঘ. সংশ্লিষ্ট চরিত্রগুলির মনস্তাত্ত্বিক ও ঘটনাগত ক্রিয়ার প্রতিফলন।
- ঙ. নিদিষ্ট অঞ্চলের জীবনচর্যার ধারাবাহিক ঐতিহ্যের উদাহরণ।
- চ. সংশ্লিষ্ট মানুষগুলির ভাষা-উপভাষা-বিভাষা সার্থকভাবে ব্যবহার।
- ছ. পরিবেশ সাপেক্ষতাকে যথার্থভাবে পরিস্ফুট।
- জ. সেই অঞ্চলের লোক-সংস্কৃতির সঠিক উপস্থাপন।
- ঝ. মানুষের জীবনচর্যার অর্থনৈতিক পটভূমি।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় মানুষ ও প্রকৃতির অঙ্গঙ্গি যোগ সাধিত। ভৌগোলিক সত্তা এখানে শুধু পটভূমি হিসাবে না থেকে স্বতন্ত্র।

কাহিনি পরিকল্পনায় হাঁসুলী বাঁকের একদিকে গভীর বাঁশবন, অন্যদিকে মুক্ত প্রান্তর। বাকি দুদিক ঘিরে কোপাই নদী। পাহাড়িয়া কোপাই এখানে এসে হঠাৎ মোড় নিয়েছে। তার গিরিমাটি গোলা জলে অপরূপ বালক। এই ভূ-খণ্ডের মানুষ কাহারদের এ উপন্যাসে চিত্রিত করা হয়েছে। কাহারদের সংস্কার বিশ্বাস, কোপাই নদী ও বাঁশবাদি গ্রাম এই নর গোষ্ঠীর জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এখানে নেই পটভূমির অতিব্যাপ্তি, নেই উদ্ভেজনা সঞ্চারের চাতুরী।

কোপাই দহের বেড় দিয়ে ঘেরা কাহারদের গ্রামের সঙ্গে প্রকৃতির যোগ নিবিড়। শিমুল, শ্যাওড়াবন, চন্দ্রবোড়া সাপ সবকিছুতেই দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে। অন্ত্যজ নরগোষ্ঠীর লৌকিক সংস্কার কাহারদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। বীরভূমের রুগ্ম প্রকৃতির উদাসীন শূন্যতা এখানে প্রতীকীরূপে চিহ্নিত। কত্তাবাবা এখানে কালরুদ্রের চরিত্র। এই প্রকৃতিকে কাহারদের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। কাহারদের সমাজব্যবস্থাও এই প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত। গোষ্ঠীপতির নেতৃত্বের দায়িত্ব ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রয়াসের কঠোর নিয়ন্ত্রণ এখানে আছে। প্রকৃত যৌনকাঙ্ক্ষা ও প্রবল হৃদয়বেগের অনিবার্যতা নিবিড় আঞ্চলিক জীবন যাত্রার ক্ষেত্র রচনা করেছে। এই সমাজের মোড়ল বনওয়ারীর কথাই শেষ কথা। পাখি ও করালীর ব্যক্তি স্বাধীনতাও যেন এখানে নিয়ন্ত্রিত।

উপন্যাস হল জীবনের শিল্প। মানুষ ও প্রকৃতির যোগ উপন্যাসে প্রতিফলন রূপে দেখা যায়। ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’ উপন্যাসে কাহারদের সংস্কার, বিশ্বাস, কোপাই নদী ও বাঁশবাদের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসে বীরভূমের রুগ্ম প্রকৃতির উদাসীন শূন্যতা প্রতীকরূপে চিহ্নিত। উপন্যাসের সংলাপ ও মন্তব্যে কোপাই তারবতী আদিম নর গোষ্ঠীর বাংলা ভাষার আঞ্চলিক রূপ ফুটে উঠেছে। চরিত্রগুলি লৌকিক ধর্মীয় বোধের দ্বারা প্রভাবিত। কাহারদের কর্মজীবন লেখকের তুলিতে জীবন্ত। বহুকালের গ্রামীণ সভ্যতাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটি গড়ে উঠলেও আঞ্চলিক ও সর্বজনীন দুটি গুণেরই প্রকাশ ঘটেছে।

উপন্যাসের সংলাপ ও মন্তব্য বিশ্লেষণে বীরভূম জেলার কোপাই তীরবর্তী আদিম নরগোষ্ঠীর বাকরীতির চমৎকার ও অব্যভিচারী যোগ বর্তমান। এই ভাষা বাংলাভাষার একটি আঞ্চলিক রূপ। এই ভাষার ভাবপ্রকাশ ও ছবি ফুটিয়ে তোলার শক্তি অসাধারণ। এই ভাষা চেতন মনের সীমা ছাড়িয়ে অবচেতন স্তরের অদৃশ্য ভাবকল্পনাকে ধ্বনিত করেছে। কাহার গোষ্ঠীর বাক রীতির ভেতর দিয়ে মনের যে ছবি ফুটে উঠেছে, তা শুধু বুদ্ধিশাসিত সুশৃঙ্খল সরল রেখাঙ্কিত বৃত্তি সমাবেশ নয়। এর মধ্যে বস্তুজ্ঞান ও অদৃশ্যভীতি ব্যবহারিক উপাদানের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ

ঘটেছে। কাহারদের প্রত্যেকটি উক্তি ও কাজের মধ্যে, তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে এই অনুভূতির পরিচয় আছে। ‘কোপাই নদী ঠিক যেন কাহার কন্যে’—এই উপমাটিতে প্রকৃতি ও কাহার সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের আভাস পাওয়া যায়।

ওই নির্দিষ্ট কোপাই অঞ্চলের সংস্কৃতি বিবর্তিত হয়েছে কত্তাবাবা কালরুদ্র দেবতাকে কেন্দ্র করে। গ্রামীণ ধর্মচর্চার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে এখানকার জীবন জড়িয়ে আছে। নানা অলৌকিক বিশ্বাসের উপরেও দাঁড়িয়ে রয়েছে বাবা কালরুদ্র। তার সম্পর্কে অবিশ্বাস কাহার গোষ্ঠীকে বিবর্তিত করেছে। বনওয়ারী, করালী, সুচাঁদ, নসুবাল, পাখি প্রমুখ চরিত্র এই লৌকিক ধর্মীয় বোধের দ্বারা প্রভাবিত। এই উপন্যাসে কাহার সম্প্রদায়ের কর্মজীবনকেও তুলে ধরা হয়েছে। কৃষি জীবন, পাঙ্কি বাহনের কাজ এরা করত। শুধু করালী রেল কারখানার কাজ করত। কিন্তু তারাশঙ্করের মানসিক সমর্থন ছিল কৃষি জীবনধারার উপরেই। তাই উপন্যাসের শেষে দেখা গেছে করালী পূর্বপুরুষদের কর্মজীবনকে গ্রহণ করার ইচ্ছাতেই গ্রামে ফিরেছে।

এত কথা বলার আমরা পরেও আমরা বলতে পারি ভাল উপন্যাসিকের বোধ উপলব্ধির জগতে সীমাবদ্ধ থাকে। তিনি বিশেষ অঞ্চলের অভিজ্ঞতাকেই শিল্পকলার মধ্যে প্রকাশের চেষ্টা করেন। সমাজের একজন হিসেবে লেখকও তো আঞ্চলিক জীবন ধারার মানুষ। তাই সেখানকার চিত্র তাঁর তুলিতে জীবন্ত। তারাশঙ্কর বীরভূমবাসী। সেখানকার সবকিছুর সঙ্গে তাঁর যোগ ঘনিষ্ঠ। তাঁর চেনা অর্থনৈতিক পরিস্থিতির একটি সার্থক চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন। সভ্যতার আলো যেখানে প্রবেশ করে না, নাগরিক জীবনের আলো সেখানে পাওয়া যাবে না। বহুকালের গ্রামীণ সভ্যতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই উপন্যাস। কিন্তু তাই বলে ‘আঞ্চলিক’ কথাটি খুব জোরের সঙ্গে ব্যবহার করা যায়, বিশেষ করে আধুনিক কালে? কেননা সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক মূল্যবোধের যে রূপান্তর এই উপন্যাসের মূলবিষয়, সেই রূপান্তর যে কোন ও দেশের পক্ষেই সত্যি। আর এখন তো বৃহত্তম দেশকালের হস্তক্ষেপে আঞ্চলিকতা ভেঙে যাবেই। এই উপন্যাসে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

রেললাইন, বিমানঘাঁটি সবকিছু বিজ্ঞানের স্পর্শ গ্রামীণ জীবনকে ভেঙে দিচ্ছে। নাগরিক জীবনের উত্তাপ অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আঞ্চলিকতা দিয়ে তাই উপন্যাসকে সীমাবদ্ধ করা ঠিক হবে না। তারাশঙ্কর তৎকালীন জীবনের যে পরিচয় অঙ্কন করেছেন তার মধ্যে আমাদের পৃথিবীর যে কোনও মূল্য বোধের সঙ্গে হয়তো মিলবে না। কিন্তু ধর্ম ও অর্থনৈতিক কারণগুলির সঙ্গে অবশ্যই মিলবে। চরিত্রের অসহনীয়-অত্যাচার ও অশিক্ষার বেনোজল গ্রামবাংলার যে কোনও গ্রামের সঙ্গে বাঁশবাদী গ্রামের জীবনযাত্রার মিল ঘটবেই। অতএব আঞ্চলিকতা নিয়ে আলোচ্য উপন্যাসকে সীমাবদ্ধ করার পক্ষপাতি হওয়া যায় না।

পরিশেষে একথাও বলা যায় এই উপন্যাসে আঞ্চলিক ও সর্বজনীন দুটি গুণেরই প্রকাশ ঘটেছে। এই উপন্যাসে সমাজ ও চরিত্রকে নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে ফুটিয়ে তুলেছেন তারাশঙ্কর। আঞ্চলিকতাকে ছাপিয়ে গিয়ে উপন্যাসিক এখানে সর্বজনীনতার পথে।

৮.১.৩.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

- ১। কাহার সমাজের দুটি সংস্কারের নাম কর?
- ২। ‘হাঁসুলী’ শব্দের অর্থ কি?
- ৩। ‘উপকথা’ কাকে বলে?
- ৪। উপন্যাসে আঞ্চলিকতার দুটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর?
- ৫। ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’ আঞ্চলিক উপন্যাস হিসাবে কতটা সার্থক আলোচনা করো।
- ৬। তারাক্ষরের ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’ উপন্যাসের নামকরণ কতটা সার্থক? এ বিষয়ে তোমার মতামত লিপিবদ্ধ করো।
- ৭। ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’য় লোকসংস্কার/লোক বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করো।

একক ৪

নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্ব

বিন্যাসক্রম

- ৮.১.৪.১ : নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্ব
৮.১.৪.২ : উপকথায় নারী
৮.১.৪.৩ : উপকথায় পুরুষ
৮.১.৪.৪ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী
৮.১.৪.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৮.১.৪.১ : নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্ব

‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’-র অন্যতম কেন্দ্রীয় বিষয় নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্ব। দুই সময়ের দ্বন্দ্ব বলেও একে আমরা চিহ্নিত করতে পারি। প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে নবীন ও প্রবীণ কে? উত্তরে বলি—নবীন হল নতুনকালের নতুন মাতব্বর করালী, আর প্রবীণ বলতে আমরা বুঝি পুরনো কালের মাতব্বর বনওয়ারীকে। নবীন প্রবীণের দ্বন্দ্ব করালী জিতেছে, আর বনওয়ারী সবদিক থেকেই হার মেনে বিপর্যস্ত হয়েছে।

বনওয়ারী কাহার সমাজের মাতব্বর ও শাসক। তার শাসন কাহাররা মেনে চলে। কিন্তু একমাত্র ব্যতিক্রম করালী। দৈহিক শক্তিতে বনওয়ারীর থেকে এগিয়ে থাকায় সে কাহার সমাজের বিদ্রোহী নেতা। আর তার বিদ্রোহ শেষপর্যন্ত বনওয়ারী ও করালীর মধ্যে কালের হয়ে গেছে। কতগুলি ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে উঠেছে।

প্রথম দ্বন্দ্ব :

সাপ কাহার সমাজের পূজ্য দেবতা। কেননা কাহাররা মনে করত সাপ কত্তাবাবার বাহন। শিস দেওয়ার মাধ্যমে সাপ অদ্ভুত রহস্যময় আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছিল। কাহার সমাজের ধারণা এ কত্তাবাবার রোষের কারণ। কিন্তু করালী এই প্রবল অন্ধসংস্কারে আঘাত হানল সাপটা মেরে তার পরিচয় হল ধর্মনাশা পাপী। কিন্তু এ জন্য করালীর কোনও অনুশোচনা নেই। বরং মানসিক শক্তি বৃদ্ধির কারণে সে সকলকে ঠাট্টা করে বলেছে—

“কত্তার পূজোটা আমাকে দিয়ো গো”

মধ্য যুগ মাড়িয়ে দেবতার আসন যে মানুষই পাবে—তা এখান থেকেই বুঝতে পারা যায়।

‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’ নবীন হল নতুন কালের নতুন মাতব্বর করালী। আর প্রবীণ হল পুরনোকালের মাতব্বর বনওয়ারী। নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্ব করালী জিতেছে ও বনওয়ারী হার মেনেছে। সাপ, শিমুল গাছে ওঠা, কোঠাবাড়ি তৈরি করাতে করালীর সঙ্গে বনওয়ারীর দ্বন্দ্ব ঘটেছে। হেদো মণ্ডলদের মতো মুখোশধারী মানুষদের করালী সরাসরি প্রতিবাদ জানিয়েছে। চন্দনপুরে কুলির কাজ করার সময়েও দ্বন্দ্ব হয়েছে। সেকালকে দমিয়ে রেখে ভাবীকালকে প্রতিষ্ঠিত করেছে করালী। করালীর মধ্যেই শোনা গেছে নবজীবনের গান।

দ্বিতীয় দ্বন্দ্ব :

বাবা ঠাকুরের আশ্রয় বলে শিমুল গাছে চড়া নিষেধ। কিন্তু করালী এ নিষেধ অমান্য করেছে। আকাশে যেদিন ঝড় উঠেছিল সেদিন করালী আগাম সতর্কবাণী পৌঁছে দিতে শিমুল গাছে উঠেছিল। কিন্তু কাহাররা তার কাজকে ‘সর্বনাশ’-এর আগাম চেষ্টা মনে করেছে। ফলে দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে উঠেছে মাতব্বরের সঙ্গে।

তৃতীয় দ্বন্দ্ব :

কাহাররা পাক্কির বাহন ছিল। কিন্তু পাক্কির প্রচলন কমে গেলে তারা চাষবাসকে আঁকড়ে ধরতে চাইল। করালী তাদের পথ পাল্টে ফেলার চেষ্টা করেছিল। চন্দনপুরে প্রথমে কুলি ও পরে কুলি সর্দার রূপে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। শুধু তাই নয় প্রলোভন দেখিয়ে সে কাহারদেরকেও কারখানার কাজের জন্য আহ্বান করে। আর যুদ্ধবিধ্বস্ত মানুষগুলি শেষ পর্যন্ত করালীর ডাকে সাড়া দেয়। এতে বনওয়ারী তাকে কুলনাশা কর্মনাশা বলে অপমান করে।

চতুর্থ দ্বন্দ্ব :

শ্রেণি বৈষম্যের কারণে সমাজের নীচু স্তরে ছিল কাহার সমাজ। অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের কারণে হেদো মণ্ডলদের মত মুকোশধারী ভদ্রলোকের হাতে কাহারেরা নানা অত্যাচার সহ্য করত। কিন্তু করালী এ অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করেনি। সে হেদো মণ্ডলের কথায় সরাসরি প্রতিবাদ জানিয়েছে। বনওয়ারীও বুঝতে পেরেছে রতনকে মারা সম্ভব হলেও করালীকে নয়।

পঞ্চম দ্বন্দ্ব :

হিন্দু ও মুসলমান খালাসির মধ্যে দাঙ্গা বাঁধার সময়েও করালী সক্রিয় হয়েছে। সাধারণ কাহাররা এতদিন মুসলমানদের সঙ্গে একটা ভয়মিশ্রিত দূরত্ব বজায় রেখেই চলত। মুসলমানরা এর আগে দু-একজন কাহার মেয়েকে তুলে নিয়ে গেছে। অথচ বনওয়ারীর মত প্রবীণরা তাতে এতটুকু মাথা ঘামায়নি। কিন্তু দাঙ্গার সময় মুসলমানরা এক হিন্দু কামিনের হাত ধরে টানাটানি করলে করালী ঝাঁপিয়ে পড়ে। এইভাবে হাঁসুলী বাঁকের নিরীহ ছায়াচ্ছন্ন জগত থেকে করালী হয়ে উঠেছে অন্য জাতের।

ষষ্ঠ দ্বন্দ্ব :

প্রতি বৈশাখী সংক্রান্তিতে পুণ্য কর্ম অনুযায়ী ঘোষেরা খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে। কাহাররা সেখানে নিমন্ত্রিত হলেও অপাংক্তেয় অতিথি বলে বিবেচিত হয়। কেননা তারা এঁটো-কাটা সাফ করে পাতায় পড়ে থাকা খাবার গামছায় বাঁধে। কিন্তু করালীই প্রথম এই অপমান ও অনাদরের প্রতিবাদ করে। এইভাবে করালীর সঙ্গে প্রবীণদের দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে।

সপ্তম দ্বন্দ্ব :

যুদ্ধের বাজারে কেরোসিন ও চিনির কালোবাজারি শুরু হলে ইউনিয়ন বোর্ডের মাধ্যমে কন্ট্রোল ব্যবস্থা চালু হয়। ঘোষাবাবু মেম্বার হয়ে কাহার পাড়ার দায়িত্ব নেয়। বনওয়ারী কেরোসিন ও চিনি চাইতে গেলে ঘোষাবাবু দেয় না। এতে বনওয়ারী কোনও প্রতিবাদ করেনি। অথচ করালী সরাসরি ইউনিয়ন বোর্ডে নালিশ করেছে।

অষ্টম দ্বন্দ্ব :

কাহার পাড়ার নিষিদ্ধ সংস্কারের মধ্যে কোঠাঘর তৈরিও পড়ে। কিন্তু করালী এই সংস্কারে প্রবলভাবে ঘা দেয়। বউ পাখির সঙ্গে সংকল্প করে সে কোঠাঘর তোলে। তাতে বনওয়ারীর দল প্রতিবাদ করে। এমনকি বনওয়ারী নিজেও করালীকে কোঠাঘর তৈরি বন্ধ রাখার জন্য নির্দেশ দেয়। কিন্তু করালী পুলিশি ব্যবস্থার সাহায্যে কোঠাবাড়ি তৈরি করে। শুধু তাই নয়, মালিক চৌধুরীদের আপত্তিতেও সে প্রতিবাদ করে।

নবম দ্বন্দ্ব :

বনওয়ারী ও করালীর দ্বন্দ্বের অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে নারী কেন্দ্রিক লোভ। ধর্ম আর লজ্জার ভয় দেখিয়ে বনওয়ারী করালীকে নারী থেকে সংযত করার চেষ্টা করেছে। অথচ নিজে সংযত হতে পারেনি। করালী বনওয়ারীর নারীলোলুপ মনোভাব দেখে ঘৃণা করেছে। গোপালীবালা, সুবাসীকে নিয়ে করালী ও বনওয়ারীর মনোগত অভিপ্রায় ও শরীরী যুদ্ধ জমে উঠেছে। কিন্তু সে যুদ্ধে করালী জিতেছে, হার মেনেছে বনওয়ারী।

এইভাবে সমগ্র উপন্যাসে হার-না মানা এক বনওয়ারীর বিষণ্ণতার পাশাপাশি করালীর জয়যাত্রার উল্লাস ধ্বনিও ব্যাপ্ত। সেকালকে দমিয়ে রেখে ভাবীকালকে প্রতিষ্ঠিত করেছে করালী। সুতরাং সেকাল আর একালের দ্বন্দ্ব ঘটেছে বনওয়ারী ও করালীর হাত ধরে। এবং করালীর মধ্যেই শোনা গেছে নবজীবনের গান।

৮.১.৪.২ : উপকথায় নারী

নবীন ও প্রবীণের বিরোধের মধ্য দিয়েও নারীকে তিনি চিহ্নিত করেছেন। প্রাচীন সংস্কারের প্রতিনিধি বনওয়ারীকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলেছেন সুচাঁদ, গোপালীবালা, নয়ানের মা প্রমুখ চরিত্র। আর আধুনিক সংস্কারের প্রতিনিধি করালীকে কেন্দ্র করে রূপায়িত পাখি আর নসুবালা। সেই সঙ্গে এসেছে কালোশশী, সুবাসী, বসন্ত, করালীর মা প্রমুখ চরিত্র।

সুচাঁদ :

সুচাঁদ পিসি, আদ্যিকালের বুড়ি। পাখি পিসিকে বলেছে—

“হারামজাদী, আমার শরীরে লয় চৌধুরীদের অঙ্ক আছে, তাতেই না হয় আমার

নেশা বেশি, কিন্তু তোর প্যাটের মেয়ের কেনে আজও ছাড়লো না শুনি? বলি

বসন্তের শরীরে কার অঙ্ক আছে তা বল।”

প্রাচীনা সুচাঁদ হাঁসুলী বাঁকের উপকথার চারণ। বধিরতা, ব্যাঙ দেখে ভয়, মোটা গলায় গালিগালাজ, উপর অঙ্গের বস্ত্র নিঃসঙ্কোচে খুলে রেখে অনর্গল বিলাপ সমস্ত জড়িয়ে যেন সে কালীঘাটের পটের মতো। সে উপকথার গল্প বলে। উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত সে আছে, কেননা সে কথক। কুসংস্কারে বিশ্বাসী সুচাঁদ পিসি আপন মনে হাঁসুলী বাঁকের উপকথা শুনিয়া যায়। গল্প শেষ করে সে বলে—

প্রাচীন সংস্কারের প্রতিনিধি বনওয়ারীকে কেন্দ্র করে। গোপালীবালা, নয়ানের মা প্রমুখ চরিত্র গড়ে উঠেছে। আর আধুনিক সংস্কারের প্রতিনিধি করালীকে কেন্দ্র করে রূপায়িত হয়েছে পাখি আর নসুবালা। প্রাচীনা সুচাঁদ কাহার সমাজের সংস্কৃতির বাহক হিসেবে অমর। কালোশশী, বনওয়ারীকে ভালোবেসেছিল অন্তর থেকে। কালে কালে সে নানা পুরুষের মনোরঞ্জন করেছে। পাখি, করালীর প্রেমিকা, পরে বিবাহিতা স্ত্রী। সুবাসী স্বভাবচরিত্রে কালোশশীর অনুবৃত্ত। কাহারদের জীবনে বসন নিটোল চরিত্র। সে সুচাঁদের মেয়ে ও পাখির মা। উপন্যাসে নসুবালা বিচিত্র সৃষ্টি। ভাবে-ভঙ্গীতে একেবারে মেয়ের মতো।

“হিয়ার জিনিস যা তা মাথায় রাখলে উকুনে খায়, মাটিতে রাখলে পিঁপড়ে খায়...। তাই হিয়েতে রেখেছি, হিয়ার জিনিস নিয়ে হিয়েতে যদি কেউ রাখত তবে থাকত, তা তো কেউ নিলে না, রাখলে না। আমার সাথেই এ উপাখ্যান শেষ। তবে পারো তো নিকে রেখো।”

কাহার সমাজের সংস্কৃতির বাহক হিসেবে সুচাঁদ অমর।

কালোশশী :

কালোশশীর প্রেম কাহারপাড়ার মাতব্বর বনওয়ারীকে প্রভাবিত করেছিল। ‘ছেলেনীপনা’ শব্দটি তার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তার জীবনে কোনও স্থিরতা ছিল না। কালে-কালে সে নানা পুরুষের মনোরঞ্জন করে। অবশ্য এর কারণ হিসেবে পরম ডাকাতের অবহেলাকেই প্রাধান্য দিতে হয়। তবে সে বনওয়ারীকে ভালোবেসেছিল অন্তর থেকে। একথা কোনওমতেই অস্বীকার করা যায় না। তবে নায়িকা হবার মত দৃঢ় ভিত কখনই তার ছিল না।

পাখি :

কাহিনির অন্যতম নায়ক করালীর প্রেমিকা—পরে বিবাহিত স্ত্রী। ‘হলুদ পাখি’ কাহিনির সেরা নায়িকা। রঙ-এর মাতনে সে উগ্র, বেপরোয়া, কিন্তু কোথাও নীচতা প্রদর্শন করেনি। হেঁপো রোগী নয়ানকে ছেড়ে সে করালীর ঘরে যায়। কারণ নয়ানের সঙ্গে তার কখনও মনের মিল হয়নি। তবে কিছুটা অন্যায় সে করেছিল। কিন্তু তার প্রতিদানরূপে সুবাসী আসে করালী-পাখির মাঝখানে। ভেঙে দেয় তাদের সাজানো সংসার। করালী সুবাসীকে নিয়ে পালিয়ে যায় আর পাখি আত্মহত্যা করে। করালীর মাথায় চিরকালের জন্য সে ঐঁকে দেয় চিহ্ন, যাতে করালী কোনওদিন পাখিকে ভুলতে পারে না। পাখির এই যে আবেগ তা কিন্তু কাহার নারীদের মত নয়, বরং বলা যায় মধ্যবিত্তদের ভাবাবেগ।

সুবাসী :

কালোশশীর বোনঝি। মেয়েটি বিধবা হয়েছিল একটি সন্তানকে নিয়ে। তবে সে সন্তানটি মারা যায়। স্বভাবচরিত্রে সে কালোশশীর অনুরূপ। কালোশশীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার বিয়ে করে বনওয়ারীকে। কিন্তু তার মন ভরে না। বনওয়ারীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে সে। করালীর প্রেমে আকৃষ্ট হয়। এমনকী পরবর্তীকালে সে তার সঙ্গে চলে যায় বনওয়ারীকে নিঃশ্ব করে দিয়ে। কাহার সমাজের মেয়ের স্বকীয় চরিত্রকে অবলম্বন করে সুবাসীও ‘বেদেনীর রাধিকার পথ ধরে’। তবে বোঝা যায় চরিত্রটিকে ঔপন্যাসিক কাহিনির প্রয়োজনেই এনেছেন।

বসন :

কাহারদের জীবনে বসন নিটোল চরিত্র। রাগ, হিংসা, দ্বেষ, অভিমান, রাগ কিছুই নেই তার। অথচ পরিণত মার্জিত চরিত্র। সে সুচাঁদের মেয়ে ও পাখির মা। পাখির প্রতি তার ভালোবাসার অন্ত নেই। বসন চৌধুরী বাড়ির মেজ ছেলেকে ভালোবাসত। সে কখনও তাকে ভুলতে পারেনি। তাইতো পাখির মৃত্যুর পর সে আশ্রয় নিয়েছে চৌধুরী বাড়ির ভাঙা দালানে। কাহার মেয়েদের যৌবনের উদ্দামতার মধ্যে সে কোমলতার ছোঁয়া।

গোপালীবালা :

কাহারপাড়ার মাতব্বর বনওয়ারীর স্ত্রী। তার মধ্যে কোনও চাঞ্চল্য নেই। স্বামীর দুঃখ-সুখের সঙ্গে সেও জড়িত। স্বামীপ্রেমে অটল। সুবাসীকে বিয়ে করার ব্যাপারে আপত্তি জানালেও বনওয়ারীকে ছেড়ে পাগল কাহারের সঙ্গে সে বিয়ে করতে রাজি হয়নি। কাহারদের সমাজ জীবনে তার মত চরিত্রের দেখা পাওয়া কষ্টকর।

নসুবালা :

এই উপন্যাসে আর একটি অন্যতম চরিত্র ‘নসুবালা’ বিচিত্র সৃষ্টি। সে করালীর পিসতুতো ভাই নসুরাম। ভাবে ভঙ্গীতে একেবারে মেয়ের মত। পুরুষ হলেও নারীর সাজ ও আচরণ করে—

“সে চুল বাঁধে খোঁপাও বাঁধে। নাকছাবি, মাকড়ী, কাচের চুড়ি, লালরুগি ও শাড়ি পড়ে। মেয়েদের মত কাজ করে, গান গায়-নাচে। সবচেয়ে বড় নেশা দুটি— ব্রত-পার্বণ করে, মেয়েদের সঙ্গে ভাজো ও ঘেঁটু পরবে নাচগান করে, আলতা, রঙীন শাড়ি, সিঁদুরটিপসহ বিয়ের বাসরে নাচে গায়।”

নসুবালার চলন, কথাবার্তা কৌতুককর। তার ঝগড়া করার প্রবণতাও একেবারে মেয়েদের মতো। উপন্যাসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আছে। সে যেমন করালীকে সমর্থন করেছে, তেমনি বনওয়ারীকেও রোগশয্যা মাতৃসুলভ সেবা-যত্ন দিয়ে বাঁচিয়েছে। বনওয়ারীকে বলেছে—

“ভগবান যে আমাকে পুরুষ গড়েও মেয়ের মন দিয়েছে। মেয়ের মতন কাজ কর্ম করবার ক্ষমতা দিয়েছে, তাঁর চরণে পেল্লাম তোমাকে বাঁচাতে পেরেছি। তোমার প্রেরমাই আর আমার যত ধান্য।”

উপন্যাসে নসুবালা চরিত্রটি আমাদের আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে। যদিও সে ঘটনা গতির সঙ্গে জড়িত নয়, তবে কাহিনির শোভাবর্ধন করেছে।

নারী চরিত্রগুলির বিবরণ দেওয়ার পর একটা কথা অবশ্যই বলা চলে—যৌবন ও স্থবিরের যুদ্ধে এরা অংশগ্রহণ করেছে। প্রয়োজনভিত্তিক চরিত্র হিসেবে এরা স্বাভাবিক সৃষ্টি করতে পারলেও ভূমিকাই কখনওই প্রাধান্য পায়নি। তবে বোঝা যায় তারাক্ষর, শরৎচন্দ্রের মতে শুধু নর-নারীর প্রেম ভালোবাসায় তন্ময় থাকেননি। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে চরিত্রগুলিকে তিনি জীবন্ত করেছেন।

৮.১.৪.৩ : উপকথায় পুরুষ

বনওয়ারী :

কাহার পাড়ার মোড়ল, বাঁশবাদী গ্রামের প্রধান চরিত্র। একটু বেটে হলেও পেশী বহুল, শারীরিক শক্তি তার নেতৃত্বের সহায়ক। গ্রামের মঙ্গল সাধনের কথা সে চিন্তা করে। ইংরেজদের হাত থেকে কিছু জমি নিয়ে সে একসময় গ্রামের লোককে দিয়েছিল। গ্রামের লোকেরা ও তাকে নেতা বলে মানে।

প্রাচীন সংস্কারে আবদ্ধ বনওয়ারী নবীন যুগের ভাবনাকে গ্রহণ করতে পারেনি। তাই নব যুগের অগ্রদূত করালীর সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব বেঁধেছে। করালী কর্তৃবাবার আসল রূপ উন্মোচন করে কাহারদের বিশ্বাস ভাঙতে চাইলে বনওয়ারীর নেতৃত্বে আঘাত লাগে। আবার করালী কাহার যুবকদের রেল কারখানার কাজের জন্য আহ্বান করে। অলৌকিক দেবত্বে অবিশ্বাস করে। ফলে বনওয়ারী আহত হয়ে করালীকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। বনওয়ারীর একটা স্নেহের স্থান ছিল তার হৃদয়ে। তাই তো করালীকে সে স্নেহ করেছে। করালী পাখিকে চন্দনপুরে নিয়ে গেলেও সে তার প্রতি কঠোর হতে পারেনি।

নারীর প্রতি ভালোবাসাও বনওয়ারীর মধ্যে দেখা যায়। যৌবনে সে কালোশশীকে ভালো বেসেছিল। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে কালোশশীর মৃত্যু হয়। স্ত্রী গোপালীবালাকেও সে ভালোবাসত। কিন্তু প্রেমিক মন যে চটুলতাময় নারীকে খুঁজত তা গোপালীবালার ছিল না। তাই কালোশশীর স্মৃতির হাত ধরে বারবার তার মন বিক্ষিপ্ত হয়েছে। এ জন্যই সে বৃদ্ধ বয়সে বিয়ে করেছিল বিধবা সুবাসীকে। কিন্তু সুবাসী করালীর সঙ্গে চলে গেলে সে ভেঙে পড়ে।

বনওয়ারী কাহার পাড়ার মোড়ল, দীর্ঘকালের সংস্কৃতিকে সে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে। কালোশশীর প্রেমিক রূপে, গোপালী বালার কর্তব্য পরায়ণ স্ত্রীর স্বামী হিসাবেও বনওয়ারী উল্লেখযোগ্য। বনওয়ারী বাঁশবাদি গ্রামের প্রধান চরিত্ররূপে করালীর কাছে হেরে গিয়েও জীবন্ত। করালী সাহসী, বুদ্ধিমান ও নতুন যুগের পথিক। সে পুরনো সংস্কার মানেনা। করালী পাখিকে ভালোবেসে বিয়ে করেছে কিন্তু সুবাসীর সঙ্গেও গোপন সম্পর্ক রেখেছে। করালী কাহার সমাজের উন্নতি চেয়েছে। সব মিলিয়ে করালী হয়ে উঠেছে কাহার সমাজের নতুন পথের দিশারী। পরম পাড়ার মাতব্বর হলেও নিজেকে উচ্চতার কাহার বলে ভাবতো। আর পাগল কাহার স্বতন্ত্র মানুষ। খুব ভালো গান করে। তার গানে কাহার সমাজ মোহিত হয়ে থাকত।

এই ভাবে তিনটি নারীর প্রতি বনওয়ারীর আসক্তি দেখা গেছে। কালোশশীর প্রেমিক রূপে, গোপালী বালার কর্তব্যপরায়ণ স্ত্রীর স্বামী হিসাবে ও সুবাসীর কাছে বিগত প্রেমের আকাঙ্ক্ষা পূরণে সে তার চারিত্রিক জটিলতা বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু একাধিক নারীতে আকৃষ্ট বনওয়ারীর মনে অনুশোচনা এসেছে। পাপবোধ কাজ করেছে। তাই তো কালোশশী শঙ্খচূড় সাপের ছোবলে পুকুরের জলে পড়ে গেলেও বনওয়ারী তাকে তুলতে পারেনি। এখানে তার দুর্বলতা কাজ করেছে। বনওয়ারী সংস্কার মানে। তাই তো চরকের পাটায় সে অংশগ্রহণ করে সাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছে। দীর্ঘকালের সংস্কৃতিকে সে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে। এভাবেই বনওয়ারী চরিত্রটি করালীর কাছে হেরে গিয়েও জীবন্ত।

করালী :

কাহারপুরের প্রহ্লাদ। তিন বছর বয়সে করালী তার বাবাকে হারিয়েছে। তার মাও পাঁচ বছর বয়সে তাকে ফেলে রেখে চন্দনপুরের এক মিস্ত্রির সঙ্গে চলে যায়। কাহারপাড়ার মাতব্বর বনওয়ারী তাকে ঘোষবাড়িতে কাজে দেয়। কিন্তু আম নিয়ে একটি সমস্যায় করালী সেখানকার আশ্রয় হারায়। সে সাহসী, বুদ্ধিমান। সাপের শিশে গোটা কাহার সমাজ সম্বন্ধে। অথচ করালী তার রহস্য উদ্ঘাটন করেছে। বাঁশবনে আগুন দিয়েছে, সংস্কার বিরোধী সুরে কাহারদের জানিয়েছে সাপ কত্তাবাবার বাহন নয়।

করালী নতুন যুগের পথিক। সে পুরোনো সংস্কার মানে না। তাইতো সাপ মারার অপরাধে কাহাররা প্রায়শ্চিত্ত পূজোর আয়োজন। অথচ করালী কাহারদের ব্যঙ্গের সঙ্গে বলে এবার পূজেটা তারা যেন করালীকে দেয়। শুধু তাই নয়, করালী চন্দনপুরে কুলির কাজে গেছে। কিন্তু কাহাররা মনে করত ওখানে যেতে কত্তাবাবার মানা আছে। তবু করালী সে কথা শোনেনি। এমনকী প্রলোভন দেখিয়ে কাহারদেরকেও সে ওই পথে নিয়ে গেছে। কাহাররা কোঠা বাড়ি তোলে না। অথচ করালী কোঠা বাড়ি তুলেছে। কত্তাবাবার আশ্রয় শিমুল গাছে চড়েও সে কাহারদের নীতি নিয়মকে অগ্রাহ্য করেছে।

তবে করালী পাখিকে ভালোবেসে বিয়ে করেছে। কিন্তু সুবাসীর সঙ্গেও গোপন সম্পর্ক রেখে। এমনকি পাখিকে ছেড়ে সে সুবাসীকে বিয়ে করেছে এবং এতে পাখি আত্মহত্যা করেছে। নারী লোলুপ হওয়া সত্ত্বেও কাহার সমাজের উন্নতি চেয়েছে। নিজের মজলিশে কাহার পাড়ার সকলকে ডেকে এনে আনন্দ দিতে চেয়েছে। ঘোষবাবুর বাড়িতে অপাঙতেয় অতিথি হতে কাহারদের নিষেধ করেছে। এবং অধিকার আদায়ের জন্য সে ঘোষবাবুর সঙ্গে

দ্বন্দ্ব করেছে। বনওয়ারীর সঙ্গেও করালীর কাহারদের সংস্কার শাসনে দমিয়ে রাখার জন্য দ্বন্দ্ব হয়েছে। সব মিলিয়ে করালী হয়ে উঠেছে কাহার সমাজের নতুন পথের দিশারী।

পরম :

পাড়ার মাতব্বর। সে নীলকুঠীর সাহেবদের আমলে চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করতো। তাই পাক্ষীবাহকদের থেকে সে উচ্চতর কাহার বলে নিজেকে ভাবতো। পাড়ার মাতব্বর বনওয়ারীর সঙ্গে তার মিল ছিল না।

সে খুব চতুর। তাই প্রায়শ্চিত্তের পূজোর সুযোগে বাবুদের বিলি করা জমি নিতে চন্দনপুরে গেছে। পরম বিশ্বাসঘাতক। তাই তো কালোশশীকে সে বঞ্চনা করেছে। আর কালোশশীর মৃত্যুর পর ফেরার হয়েছে।

পাগল :

কাহারপল্লীর স্বতন্ত্র মানুষ। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়িয়েছে। গুণী হওয়ার জন্যে বনওয়ারী ও করালী তাকে সমীহ করে। করালীকে পাগলের ভালো লাগে। চন্দনপুরের লাল ঠাকুরগকে যে দিদি পাতিয়েছিল। কিন্তু নারীর প্রতি দুর্বলতা না থাকায় সে এই দিদির প্রতি আসক্তিহীন হয়ে পড়ে। পাগল খুব ভালো গান গায়। তার গানে কাহাররা পাগল। এভাবে হাঁসুলী বাঁকের জীবনে পাগলকে একটি স্বতন্ত্র চরিত্র করে এঁকেছেন তারাক্ষর।

৮.১.৪.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

- ১। উপন্যাসে দুটি পুরুষ চরিত্রের নাম করো।
- ২। কাহার সমাজ কার গানে মোহিত থাকত?
- ৩। তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’য় নবীন ও প্রবীণের দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তুলতে কতটা সার্থক হয়েছেন—বিশ্লেষণ করো।
- ৪। করালী ও বনওয়ারী চরিত্র দুটির তুলনামূলক বিশ্লেষণে প্রাচীন ও নতুনকালের সংঘাত কীভাবে রূপ নিয়েছে বুঝিয়ে দাও।
- ৫। উপন্যাসে প্রাচীন সংস্কারের প্রতিনিধির নাম কি?
- ৬। উপন্যাসে নবীন সংস্কারক কে?
- ৭। নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দ্বের তিনটি উদাহরণ দাও?

৮.১.৪.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

পর্যায় গ্রন্থ-১ এর প্রতিটি এককে (১-৪) নিম্নোক্ত বইগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

- ১। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

- ২। ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর—মুক্তি চৌধুরী।
- ৩। তারাশঙ্করের উপন্যাস—অমরেশ দাস।
- ৪। কালের প্রতিমা—অরুণ মুখোপাধ্যায়
- ৫। তারাশঙ্করের শিল্পীমানস—ড. নিতাই বসু।
- ৬। হাঁসুলী বাঁকের উপকথা নানা চোখে—ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত।
- ৭। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড)—ক্ষেত্র গুপ্ত।
- ৮। হাঁসুলী বাঁকের উপকথা : প্রাসঙ্গিক পাঠ—অনন্যা বড়ুয়া।
- ৯। আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস—অশ্রুকুমার সিকদার।

পর্যায় গ্রন্থ - ২
একক ৫
পুতুলনাচের ইতিকথা

বিন্যাসক্রম

- ৮.২.৫.০ : প্রাক্ কথা
৮.২.৫.১ : পুতুল নাচের ইতিকথা (১৯৩৬) : উপন্যাসের আধুনিকতার সূচনা
৮.২.৫.২ : সূচনার ও আঙ্গিকের অভিনবত্ব
৮.২.৫.৩ : আধুনিকতা : গ্রাম শহরের দ্বন্দ্ব
৮.২.৫.৪ : পুতুলনাচের ইতিকথার গদ্যভঙ্গী বিশ্লেষণ
৮.২.৫.৫ : মানিকের উপন্যাস : দাম্পত্য জীবনের অনুপস্থিতি
৮.২.৫.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী
-

৮.২.৫.০ : প্রাক্ কথা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযাত্রীদের অনেকেই ছোটগল্প রচনায় যতটা দক্ষতা দেখিয়েছেন উপন্যাসে ততটা নয়। কিন্তু আবির্ভাব লগ্নেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাস উভয় ক্ষেত্রেই সব্যসাচীর ভূমিকা। তবে সূচনা পর্বে গল্পের তুলনায় উপন্যাসই বোধ হয় কিছুটা এগিয়ে থাকে। ১৯৩৫-৩৬ এর মধ্যে গল্পে বলতে কেবল ‘অতসীমামী’, অথচ উপন্যাস রচিত হল পাঁচটি ‘জননী’, ‘দিবারাত্রির কাব্য’, ‘পদ্মানদীর মাঝি’, ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ এবং ‘জীবনের জটিলতা’। এদের মধ্যে অন্তত তিনটি (দিবারাত্রির কাব্য, পদ্মানদীর মাঝি, পুতুল নাচের ইতিকথা) বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়। অতুলচন্দ্র গুপ্তের কাছে অসুস্থ শরীরে লেখা তাঁর বিখ্যাত চিঠিতে তিনি জানিয়েও ছিলেন যে, প্রথমদিকে ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ প্রভৃতি কয়েকখানা উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে তাঁর সর্বশক্তি ব্যয় হয়ে গিয়েছিল। স্বয়ং লেখকের এই উক্তিই ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’-র মতো অন্যায়ের গুরুত্ব বোঝা যায়। এই পর্বের উপন্যাস রচনায় লেখক নিজেকে প্রায় নিঃশেষিত করেছিলেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গল্প-উপন্যাস উভয়ক্ষেত্রেই পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। ১৯৩৫-৩৬ সালে গল্প বলতে শুধুমাত্র ‘অতসীমামী’। সেই সময়েই রচিত হয় ‘জননী’, ‘দিবারাত্রির কাব্য’, ‘পদ্মানদীর মাঝি’, ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ ও ‘জীবনের জটিলতা’র মতো উপন্যাস। রজনীকান্ত দাস ‘পরিচয়’ পত্রিকায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জী তৈরি করার সময় বলেছেন—প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস ‘জননী’ (১৯৩৫) হলেও দিবারাত্রির কাব্য-ই তাঁর প্রথম রচনা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল প্রয়াণের পরই রজনীকান্ত দাস ‘পরিচয়’ পত্রিকায় (পৌষ ১৩৬৩) বহু পরিশ্রমে তাঁর যে গ্রন্থপঞ্জী তৈরি করেছিলেন তাতে দেখা যায় যে, প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস জননী (১৯৩৫) হলেও দিবারাত্রির কাব্য-ই তাঁর প্রথম রচনা। মানিকের নিজের ভাষায়, ‘সেটা আমার একুশ বছর বয়সের রচনা’। তবে আমাদের আলোচ্য যেহেতু কেবল ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ তাই ‘দিবারাত্রি কাব্য’ বা ‘জননী’-কে আলোচনায় বাদ দিতে হবে। তবে ‘পদ্মানদীর মাঝি’ (১৯৩৬)-কে একেবারে বাদ দেওয়া যাবে না। কারণ এটি পুতুল নাচের ইতিকথা (১৯৩৬)-র সঙ্গে একই বৎসরে প্রকাশিত হয়েছিল। আসলে একই বৎসরে মানিকের এই দুটি গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্য তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দুটি উপন্যাস পেয়ে গেল। ত্রিশের দশকের শেষার্ধ্বে থেকে বাংলা উপন্যাসের বিষয় ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে যেন মোড় নেবার পালা। আর এরই চূড়ান্ত নিদর্শন আলোচ্য দুটি উপন্যাস।

আপাতদৃষ্টিতে ‘পদ্মানদীর মাঝি’ এবং ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’র মধ্যে বিষয়গত বা আঙ্গিকগত কোনো মিলই নেই। প্রথমটিতে আঞ্চলিকতার নতুন মস্তো নির্ধারিত হয়েছে, চরিত্রচিত্রনে মানব-চরিত্রের জটিলতা এসেছে, নিম্ন বর্গের মানুষের জীবনকাহিনি সেখানে সম্পূর্ণ আধুনিক ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চিত্রিত। তাছাড়া উপন্যাসটিতে সমাজ, বাস্তবতারও একটি যথাযথ দিক প্রতিফলিত। ব্যক্তির আদর্শবোধ ও আত্মবিশ্লেষণের সূচনা এখান থেকেই। আবার এখানেই ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’র সঙ্গে ‘পদ্মানদীর মাঝি’-র মিল। সেখানে বাইরের সঙ্গে পরিবার ও সমাজের সংঘাত যতটা গুরুত্ব পেয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে ব্যক্তিকে নিজের সঙ্গে নিজের সংঘাতে।

৮.২.৫.১ : পুতুল নাচের ইতিকথা (১৯৩৬)—উপন্যাসের আধুনিকতার সূচনা

‘পুতুল নাচের ইতিকথা’র (১৯৩৬) মাধ্যমে বাংলা উপন্যাসে সম্পূর্ণ আধুনিকতা এসে গেল। পরিবার বা সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সংঘাত নয়, ব্যক্তির অন্তর্বিরোধ, আত্মবিশ্লেষণই এখন থেকে উপন্যাসের বিষয়। তাছাড়া ত্রিশের দশকের শেষ থেকেই প্রায় অবলুপ্ত সামন্ততান্ত্রিক গ্রামীণ কাঠামোর সঙ্গে মধ্যবিত্ত নাগরিক মানসিকতার দ্বন্দ্বও প্রকাশ্যে এসে পড়ে। এ দ্বন্দ্ব পুরোনো মূল্যবোধের সঙ্গে নূতন জীবনজিজ্ঞাসার। মানিকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেই প্রথম এই সংঘাতটি ধরা পড়ে। এই অন্তর্দৃষ্টির জন্যই তিনি সমসাময়িকদের থেকে আলাদা। তাই যখন তিনি বলেন, “জীবনকে আমি যেভাবে ও যতভাবে উপলব্ধি করেছি অন্যকে তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ দেওয়ার তাগিদে আমি লিখি। আমি যা লিখি। আমি যা জেনেছি এ জগতে কেউ তা জানে না (জল পড়ে পাতা নড়ে জানা নয়)”—তখন তা কেবল অহমিকা বলে মনে হয় না, এ এক প্রবল আত্মপ্রত্যয়। ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’-র শশী তার সমকালীন মধ্যবিত্ত জীবনের অভিজ্ঞতার ফসল। আত্মদ্বন্দ্ব এবং আত্মানুসন্ধানই চরিত্রটিকে আধুনিক নায়ক করেছে।

‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ উপন্যাসটিতে আধুনিকতার লক্ষণ দেখা যায়। ত্রিশের দশকের শেষে সামন্ততান্ত্রিক গ্রামীণ কাঠামোর সঙ্গে মধ্যবিত্ত নাগরিক মানসিকতার দ্বন্দ্ব ও প্রকাশ্যে এসে গেল। এ দ্বন্দ্ব পুরোনো মূল্যবোধের সঙ্গে নূতন জীবনজিজ্ঞাসার।

৮.২.৫.২ : সূচনার ও আঙ্গিকের অভিনবত্ব

উপন্যাসের সূচনা সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণাও উপন্যাসটি ভেঙে দেয়। বলা হয়ে থাকে যে, নাটক অত্যন্ত দৃঢ় সংবদ্ধ শিল্প আর উপন্যাস হচ্ছে সবচেয়ে শিথিল অসংবদ্ধ কাঠামোর রচনা। পুতুল নাচের ইতিকথা-য় কিন্তু গোড়াতেই সংযত নাটকীয় চমক, “খালের ধারে প্রকাণ্ড বটগাছের গুড়িতে ঠেস দিয়ে হারু ঘোষ দাঁড়াইয়া ছিল। আকাশের দেবতা সেইখানে তাহার দিকে চাহিয়া কটাক্ষ করিলেন। হারুর মাথায় কাঁচা-পাকা চুল আর মুখে বসন্তের দাগভরা রক্ত চামড়া পুড়িয়া গেল”। এ যেন নাটকের একটি আকস্মিক দৃশ্য, কোনো বিস্তৃত ন্যারেটিভ-এর প্রয়োজন এখানে দেখা দেয়নি। চোখের সামনেই যেন হঠাৎ ঘটনাটি ঘটে গেল, এবং পাঠক নিজেই মনশ্চক্ষে এটিকে দেখতে থাকুক। এই পদ্ধতি অনুসরণ করেন বলেই মানিকের গদ্যভঙ্গি আবেগবর্জিত, তির্যক। একটি অপ্রয়োজনীয় শব্দও তিনি ব্যবহার করেন না, দীর্ঘ বাক্যবন্ধ তাঁর রচনায় নেই। খালের ধারে হারুর মৃত্যুদৃশ্য অঙ্কিত করার পরই খালে শশীর নৌকা দেখা যায়, আর এই নৌকো থেকেই শশী মৃতদেহটি দেখতে পায়। মাঝি গোবরধনের সহায়তায় মৃতদেহটিকে নৌকায় তুলে গাওদিয়ার ঘাটে নিয়ে যাবার পর থেকেই মূল কাহিনি শুরু হয়ে যায়। পরতে পরতে কাহিনির ভাঁজ খুলতে থাকে, নতুন নতুন ঘটনা এবং চরিত্র তাতে প্রবেশ করে আর সবগুলির সঙ্গে একমাত্র শশীই জুড়ে থাকে। উপন্যাসের সূচনায় মৃতদেহ নিয়ে যে শশী নৌকায় গ্রামে ঢোকে, সমাপ্তিতে কিন্তু সেই শশীকে আর পাওয়া যাবে না। জীবনের নানা জটিলতা, নানা তিক্ত অভিজ্ঞতা, নিজের দোলাচল মানসিকতা, শশীর কল্পনাপ্রবণ, আবেগবিলাসী মনটিকে বিনষ্ট করে দিয়েছে। বন্ধু কুমুদের সহচর্যে একদা যে রোমান্টিক মনটি তার গড়ে উঠেছিল ধীরে ধীরে তা যেন শশীর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে। পিতা গোপাল দাসের ন্যস্ত পারিবারিক দায়িত্ব পালনই এখন তার কাছে বড়। তালবনের ধারে মাটির টিলাটির ওপর সূর্যাস্ত দেখবার সাধ শশীর অনেক দিনের। এখানে দাঁড়ালে তার মন যেন প্রশান্তিতে ভরে যায়। সে যেন অনন্তের আশ্বাদ লাভ করে। কিন্তু যতই গ্রাম্যজীবনের প্রতি তার বিতৃষ্ণা বাড়ে ততই তাকে কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। এখন অনন্তের, অসীম আনন্দের আশ্বাদ লাভ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই “তালবনে শশী আর কখনো যায় না। মাটির টিলাটির উপর সূর্যাস্ত দেখিবার শখ এ জীবনে আর একবারও শশীর আসিবে না।” এই ভাবে এই উপন্যাস শেষ পর্যন্ত একজন ব্যক্তির আত্মানুসন্ধানের কাহিনিতে পরিণত হয়ে যায়। মানিকের প্রায় সব উপন্যাসেই তাই হয়, তাই হওয়ার কথা। কারণ, প্রচলিত পথের অনুসরণ মানিকের চিন্তার বাইরে। ডি. এইচ. লরেন্স তো এই সত্যটির কথা আমাদের আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, “All rules of construction hold good only for novels that are copies of other novels.”

নাটক অত্যন্ত দৃঢ় সংবদ্ধ শিল্প আর উপন্যাস হচ্ছে সবচেয়ে শিথিল অসংবদ্ধ কাঠামোর রচনা। উপন্যাসের গোড়াতেই সংযত নাটকীয় চমক আছে। সেইসঙ্গে মানিকের গদ্যভঙ্গি আবেগবর্জিত ও তির্যক। একটি অপ্রয়োজনীয় শব্দও তিনি ব্যবহার করেননি, দীর্ঘ বাক্যবন্ধ রচনায়।

৮.২.৫.৩ : আধুনিকতা : গ্রাম শহরের দ্বন্দ্ব

শশীকে বাংলা উপন্যাসের প্রথম আধুনিক নায়ক বলা হয়েছে। মধ্যবিত্তের অন্তর্বিরোধ এবং অন্তঃসারশূন্যতার (যুগান্তর চক্রবর্তী) প্রতীক হিসেবেও তাকে চিহ্নিত করেছেন কেউ কেউ। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে হয়েছিল “শশী তিরিশের উপনিবেশের মধ্যবিত্ত জীবনের নিহত উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতিভূ” আবার হোসেন মিয়ার আদলে শশীকে সমগ্র গাওদিয়া গ্রামের নিয়তি বললেও বোধ হয় ভুল হয় না। কারণ কাহিনির কেন্দ্রস্থল থেকে পিতা

গোপাল সহ গ্রামের প্রায় প্রতিটি চরিত্রই তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অনেকেরই পরিণতির জন্য সে দায়ী। আধুনিকতার একটি প্রধান লক্ষণ হল নাগরিকতা। কিন্তু শশী চরিত্র সম্পূর্ণ নাগরিক লক্ষণাক্রান্ত নয়। ডাক্তারি পড়ার সময় বিশেষ করে কুমুদের সাহচর্যে নিজেকে শহুরে ইনটেলেকচুয়ালের পর্যায়ভুক্ত করার বাসনা তার হয়েছিল বটে কিন্তু সেই মনোভাব স্থায়ী হয়নি। শশীর নিজেরই জানা ছিল, “হৃদয় ও মনের গড়ন আসলে তাহার গ্রাম্য। শহর তাহার মনে যে ছাপ দিয়াছিল তাহা মুছবার নয়, কিন্তু ছাপ, দাগ নয়।” শশীকে এই গ্রামজীবনের প্রভাব থেকে সরিয়ে নিয়ে চরিত্রটির যথাযথ মূল্যায়ন সম্ভব বলে মনে হয় না। শশীকে বুঝতে বরং লেখকের সাহায্য নেওয়া ভালো। তিনি সূচনাতেই জানিয়ে দেন, ‘শশীর চরিত্রে দুই সুস্পষ্ট ভাগ আছে।’ আগেই বলা হয়েছে, এই দুটি ভাগের একটিকে তৈরি করেছিল তার পিতা গোপাল দাস, অপরটি কলকাতার কলেজের বন্ধু কুমুদ। খুব সহজভাবেই জানানো হয় যে, শশীর সাংসারিক বুদ্ধি, হিসেবী মানসিকতা এবং গ্রামের প্রতি টানের মূলে রয়েছে পিতা, আর গ্রামের প্রতি বিতৃষ্ণা, নাগরিক রোমাণ্টিকতা বন্ধু কুমুদের কাছ থেকে তার পাওয়া। আপাত-দৃষ্টিতে এই দুই ধারার দ্বন্দের মধ্য দিয়ে শশী চরিত্রটি অগ্রসর হয়েছে। জগৎ ও জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গাওদিয়াতেই স্থায়ী নিঃসঙ্গ জীবনযাপনের জন্য শশীর সংকল্প তাই এক ধরনের প্রায়শ্চিত্ত ও বটে। তাই শশীও পুরোনো সব অভ্যাস থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়।

পিতা, আর গ্রামের প্রতি বিতৃষ্ণা, নাগরিক রোমাণ্টিকতা বন্ধু কুমুদের কাছ থেকে তার পাওয়া। আপাত-দৃষ্টিতে এই দুই ধারার দ্বন্দের মধ্য দিয়েই শশী চরিত্রটি অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু মাঝে মাঝে গ্রামের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মানো এক জিনিস, আর সম্পূর্ণ গ্রামীণ মানসিকতা অন্য জিনিস। দ্বিতীয়টি সম্পর্কে শশীর নিজেরই স্বীকারোক্তি রয়েছে। তবে অনেক সময়ই গ্রাম্যজীবন অসহ্যবোধ হওয়ায় সে বাইরে চলে যেতে চেয়েছে, চিকিৎসাবিদ্যায় উচ্চতর ডিগ্রি লাভ বা জীবিকার ক্ষেত্রে আর্থিক সাফল্যের জন্যও তাকে বাইরে যাবার কথা ভাবতে হয়েছে। পথের পাঁচালী-র অপুকেও তো একই কারণে নিশ্চিন্তিপুর ছাড়তে হয়েছিল। তাই এই জাতীয় সিদ্ধান্তের মূলে সবসময়েই কেবল বিতৃষ্ণা নেই আর্থিক বা সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তির ব্যাপারটিও রয়েছে।

তাই কেবল গ্রাম-শহরের দ্বন্দের মধ্যে দিয়ে শশী চরিত্রকে সম্পূর্ণ বোঝা যাবে না। আমরা শশীকে ভিন্নদৃষ্টিতে বিচারের পক্ষপাতী। তার গড়ে ওঠার ধারাবাহিকতার দিকে তাকাতে হবে। শশী-সম্পর্কিত আলোচনায় কোথাও চোখে পড়ে নি যে, উপন্যাসে তার বাল্য ও কৈশোরের বর্ণনা নেই। নেই তার মায়ের কোনো উল্লেখ। বোঝাই যায় যে, শশী বাল্যেই মাতৃহীন। নিরাসক্ত মানিক এ নিয়ে অকারণ আবেগ সৃষ্টি করতে চান নি। শশীর শৈশবের কোনো মধুর স্মৃতির উল্লেখ উপন্যাসে পাওয়া যাবে না। বরং পিতা গোপালের কঠোর শাসনে তা ছিল ভীতির পর্ব। ‘শৈশব ও কৈশোরের এই যমটিকে ভয় করা তাহার সংস্কারে দাঁড়াইয়া গিয়াছে।’ গোপাল সম্পর্কে শশীর এই মনোভাবে ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মাতৃহীন বালকের মাঝরাতে ঘুমভেঙে যেতে, প্রবল একাকিত্বের জন্য কেবল ভয় করত। এই ভয় তার অবচেতন মনে স্থায়ী বাসা বেঁধেছিল। তাই বড় হয়েও তালবনের মাটির টিলার ওপর দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখার পূর্ব মুহূর্তে শশী কেমন যেন ভীত হয়ে পড়ে, ‘ছেলেবেলা মাঝরাতে ঘুম ভাঙিয়া এক একদিন তাহার যেমন ভয় করিত’, তেমনি ভয়, ‘শৈশবের এই ভয়, এই একাকিত্ব বোধ শশীকে আজন্ম তাড়িত করেছে। পিতা গোপালের প্রতি তার প্রবল বিতৃষ্ণার কারণ ও এই শৈশব ও কৈশোরের স্মৃতি। তার নিজের এবং অন্যান্যদের সঙ্গে গোপালের ব্যবহার ধীরে ধীরে এই বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করেছিল এর সঙ্গে কুমুদ প্রভাবিত নাগরিক মানসিকতার কোনো সম্পর্ক নেই। লেখক এই সত্যটিই স্পষ্ট করেছেন আলোচ্য

বাক্যে, ‘ছেলের মনেও শ্রদ্ধা বজায় রাখিতে হইলে নিজের জীবনকে যে বাপের পর্যন্ত শ্রদ্ধার উপযুক্ত করিয়া রাখিতে হয় এ শিক্ষা গোপালের ছিল না।’ এইভাবেই সাবালক শশীর পিতার প্রতিটি অনুরোধের বিরোধিতা বা তার সঙ্গে রূঢ় আচরণ একটা বিশ্বাসযোগ্যতা পেয়ে যায়। বিশেষ করে শশীর মাতৃহীন সত্তার নিঃসঙ্গতার বেদনাটিকে গুরুত্ব দিতে হবে। পাশাপাশি তার একটি কথা মনে রাখলে শশী চরিত্রটির বিশ্লেষণ সহজ হয়ে যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্র ষোলো বৎসর বয়সে মাতৃহীন হয়েছিলেন, কর্মসূত্রে পিতার ঘনঘন স্থান পরিবর্তন, মাতৃহীন ছন্নছাড়া সংসার, অনেক ভাইবোনের মধ্যে একাকিত্ব শশী চরিত্রে বীজ বপন করছিল।

এইজন্যই শশী সাধারণ চরিত্র থেকে আলাদা। আত্মীয়স্বজন বা পরিচিতের মৃত্যুতে তাই তার শোক হয় না। বরং তার মধ্যে দিয়ে সে যেন জীবনের একটি নতুন মানে খুঁজে পায়। “জীবনটা সহসা তাহার কাছে অতি কাম্য উপভোগ্য বলিয়া মনে হয়।” যেহেতু তার ক্ষেত্রেও মৃত্যু অনিবার্য তাই সীমিত আয়ুর মধ্যে জীবনকে সঠিক ভাবে ব্যবহার করার কথা সে চিন্তা করে। তার ওপর হারুর মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া তাই অন্যদের থেকে আলাদা। এই কারণেই তার দেখা প্রত্যেকটি চরিত্রকেই সে আলাদা ভাবে বিশ্লেষণ করে। প্রথম পর্বে পিতা গোপাল এবং কলকাতা-পর্বে, বন্ধু কুমুদ এই দুটি চরিত্রকে বিশ্লেষণের অবকাশ সে পায় নি। প্রথমজনের ক্ষেত্রে তার সাহস ও সুযোগ ছিল না, দ্বিতীয়জনের ক্ষেত্রে ছিল না ইচ্ছে। যখন তার অনুকরণ করার বয়স তখন কুমুদের তার জীবনে আর্বিভাব। ‘এই একটি মাত্র বন্ধুর প্রভাবে শশী একেবারে বদলাইয়া গেল।’ লক্ষণীয় এই দুই মোহগ্রস্ততাই স্থায়ী হয়নি। গোপালের প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকেই সে বিদ্রোহী। আবার যাত্রার দলের কুমুদকে দেখে তার মনে হয় যে, তার এই ‘অধঃপতন তাহাকে যেন শশীর চেয়েও নীচে নামাইয়া দিয়াছে।’ মোহমুক্ত শশী এরপর থেকে কুমুদের অনেক আচরণের সমালোচক, তার মতিকে বিবাহ করবার সিদ্ধান্তের বিরোধী। এই শশীই যথার্থ একক চরিত্র। আপনাকে তার জানা আর কখনোই ফুরোয় না। আর এই ক্রমাগত আত্মবিশ্লেষণই শশীকে ঘর বাঁধতে দেয় না, কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতেও সে পারে না। বন্ধু কুমুদ শশীর এই দোলাচল মনোভাব দেখেই বোধ হয় তাকে সতর্ক করেছিল, “শান্ত হিসেবী সাধারণ সংসারী মানুষ তুই। সাধারণ মানুষের জীবন যেমন হয় তোরও তেমনি হওয়া দরকার। অন্যরকম করে বাঁচতে গেলে তুই সুখী হতে পারবি না।”

এই ‘অন্যরকম করে বাঁচতে চাওয়াটাই’ শশীকে আলাদা করে রাখে, এও যেন এক ধরনের ‘বিপ্লব বিস্ময়’, অর্থ, কীর্তি বা সচ্ছলতা সত্ত্বেও যার প্রভাব এড়ানোর উপায় নেই। কুমুদও জানত যে, মতি তার উপযুক্ত সঙ্গিনী নয়, কিন্তু এই প্রবল আত্মবিশ্বাসও তার আছে, ‘সঙ্গিনী আমার সৃষ্টি করে নিতে হবে আমাকেই।’ এই ক্ষমতা যে তার ছিল তার প্রমাণ কুমুদের হাতে মতির আমূল পরিবর্তন। কিন্তু শশী অন্যকে যেমন পালটাতে পারে না, তেমনি পালটাতে পারে না নিজেকে। আর যদিও বা কখনও সেই চেষ্টা করে তখন অনেক দেরি হয়ে যায়। কুসুমের কাছে সে যখন নিজেকে তুলে ধরে তখন কুসুমের সব উন্মাদনা চলে গেছে। যে কুসুম শশীর সামান্য ইঙ্গিতে ঘর ছেড়ে চলে আসত অবহেলায় ঔদাসীনে সে কুসুমের মন এখন অসার। চমৎকার উপমা দিয়েছে কুসুম, “লাল টকটকে করে তাতানো লোহা ফেলে রাখলে তাও আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে যায়, যায় না? ... কাকে ডাকছেন ছোটবাবু, কে যাবে আপনার সঙ্গে? কুসুম কি বেঁচে আছে? সে মরে গেছে।” এসব ক্ষেত্রে শশী কেবল অন্যদেরই নয়, যেন নিজেরও নিয়তি। ক্রমশ তার এই তিক্ত উপলব্ধি হয় যে, ‘কুসুমের মতো গোপালের মনটাও শশীই ভাঙিয়া দিয়াছে।’ কুসুমের বাপের বাড়ি চলে যাওয়া বা গোপালের কাশীবাস এই দুইয়ের দায়িত্বই যেন শেষে শশীর ওপর এসে যায়। ‘জীবন সম্পর্কে সে অমন তীব্রভাবে সচেতন, সে হইয়া থাকে পুতুলের মতো চেতনাহীন।’ তাই

চারমাসের ঘটনাপ্রবাহে, নিজের ভালোমন্দের তার আর কিছু আসে যায় না। জগৎ ও জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গাওদিয়াতেই স্থায়ী নিঃসঙ্গ জীবনযাপনের জন্য শশীর সংকল্প তাই এক ধরনের প্রায়শ্চিত্তও বটে। তাই শশী পুরোনো সব অভ্যাস থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়। সে হাসপাতালের দায়িত্ব নেয়, রুগি দেখে, জমির মামলা করতে বাজিতপুরে যায়। তালবনের মাটির টিলার ওপর দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখার সাধ সে চিরতরে বিসর্জন দিয়েছে। কারণ ‘নদীর মতো নিজের খুশিতে গড়া পথে কি মানুষের জীবন বহিতে পারে?’

৮.২.৫.৪ : পুতুলনাচের ইতিকথার গদ্যভঙ্গী বিশ্লেষণ

যুগান্তর চক্রবর্তী একটি উল্লেখযোগ্য উক্তির কথা মনে পড়ে যায়। তাঁর মতে “মানিক বাবুর প্রসিদ্ধ নৈব্যক্তিকতা চূড়ান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অপর দিক”। এখানে ব্যক্তিগত ও নৈব্যক্তিকতা-কে মেলানোর তেমন সুযোগ হয়তো নেই। কিন্তু মানিক সম্পর্কিত আলোচনায় ভবিষ্যতে এই মেলানোটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। তবে পুতুলনাচের ইতিকথা-র রচনা ভঙ্গিকে এই নৈব্যক্তিকতা কতটা প্রভাবিত করেছে তা একবার দেখা যেতে পারে। বস্তুত সমগ্র বাংলা সাহিত্যেই নিরাসক্ত গদ্যব্যবহারে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও প্রায় অদ্বিতীয়। একাধিক বাক্য দূরের কথা, একটি অতিরিক্ত শব্দও তিনি ব্যবহার করেন না। ‘পদ্মানদীর মাঝি’ থেকেই অতিরিক্ত শব্দও তিনি ব্যবহার করেন না। ‘পদ্মানদীর মাঝি’ থেকেই একটি বা দুটি পঙ্ক্তিতে কয়েক পাতার ব্যক্তব্য উপস্থাপিত করার উদাহরণ অজস্র পাওয়া যেতে থাকে। যেমন, “ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে, এখানে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না,” “সকলেই তাহার সমভাবে ধর্মের চেয়ে এক বড় অধর্ম পালন করে দারিদ্র্য”—এই জাতীয় ব্যঞ্জনাগর্ভ পংক্তি সাধারণ মানের লেখকের কলম দিয়ে বেরোয় না। জেলেপাড়ার ধর্ম, সমাজ, অর্থনীতি—সব কিছুই এর মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বঞ্চনার শিকার এই মানুষগুলির অসহায় অবস্থা বর্ণনার জন্যই একটি পঙ্ক্তিই যথেষ্ট মনে হয় তাঁর, ‘মনে মনে সকলেই যাহা জানে মুখ ফুটিয়া তাহা বলিবার অধিকার তাহার নাই।’

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমগ্র বাংলাসাহিত্যেই নিরাসক্ত গদ্যব্যবহারে অদ্বিতীয় শিল্পী। একাধিক বাক্য দূরের কথা, একটি অতিরিক্ত শব্দও তিনি ব্যবহার করেন না। ‘আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোটবাবু?’ অথবা “মাটির টিলাটির ওপর সূর্যাস্ত দেখিবার শখ এ জীবনে আর একবারও শশীর আসিবে না।” খুব বড়ো মাপের শিল্পী ছাড়া এ জাতীয় রচনা প্রায় অসম্ভব।

তবে ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’-য় এই গদ্যভঙ্গি চূড়ান্ত উৎকর্ষে পৌঁছোয়। সূচনার গদ্য তো চিরকালের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছে। এভাবে যে কোনো মৃত্যুদৃশ্য বর্ণনা করা যায় তা পাঠকের আগে জানা ছিল না। “খালের ধারে প্রকাণ্ড বটগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া হারুঘোষ দাঁড়াইয়া ছিল। আকাশের দেবতা সেইখানে তাহার দিকে চাহিয়া কটাক্ষ করিলেন।” এর পরেই পংক্তিগুলিতেও “মৃত্যু” শব্দটির উল্লেখ নেই। তথাপি পাঠক হারুর পরিণামটি বুঝে যায়। মরা শালিকের বাচ্চা মুখে দিয়ে জায়গাটা পার হবার সময় একটা শেয়াল কেবল ব্যাপারটা টের পেয়ে যায়, ‘ওরা টের পায়, কেমন করিয়া টের পায় কে জানে।’ কে কেমন করে টের পায় তা ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব লেখকের নয়। বুঝে নেওয়ার দায়িত্ব পাঠকের। “পরাণের বৌ বললে আমার গোসা হয় ছোটবাবু,” এই একটি বাক্যই শশীর প্রতি কুসুমের মনোভাব বোঝানোর পক্ষে যথেষ্ট হয়ে ওঠে। অন্তত শশীর কাছে পরস্ট্রী হিসেবে পরিচিতি হতে সে রাজি নয়। তার নারীসত্তাটিই যেন শরীর কাছে গুরুত্বপায়। কলকাতা থেকে গ্রামে ফিরে আসার পর শশীর মনের অবস্থা বোঝানোর ভাষা এইরকম, “জীবনটা কলিকাতায় যেন বন্ধুর বিবাহের বাজনার মতো বাজিতে ছিল,

সহসা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।” নিজের বিবাহ নয়, বন্ধুর বিবাহ। কারণ, বন্ধুর বিবাহে ভবিষ্যৎ দায়িত্বের ভার থাকে না। শশী আজীবন নিজের ভারই বহন করে চলেছে।

মানিকের যে গদ্যভঙ্গির মধ্যে অতুলচন্দ্র গুপ্ত dry efficiency লক্ষ করেছিলেন এগুলিই তার উদাহরণ। এতে কোনো স্নিগ্ধতা এবং মাধুর্যের ছাপ নেই। এ যেন নির্মোহ এবং সম্পূর্ণ হৃদয়াবেগ বর্জিত। কিন্তু মাঝে মাঝে অপরাধ রোমান্সের আভাস পাওয়া যায়। কুমুদের যাত্রা দেখার জন্য মতি হাজির। সন্ধ্যার সময় আসরে বাজনা শুরু হলে তার অস্থিরতা বাড়ে আর কি চমৎকার ভাবেই না লেখক জানিয়ে দেন, “অমন করিয়া বাজনা বাজিতে থাকিলে ঘরেও টেকা অসম্ভব।” এতো চিরন্তন বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা। বাঁশী কেবল বনমাঝেই তো বাজেনা, রাধার মনের মধ্যেও তো বাজে। তখন তো রাধার যমুনার তীরের জন্যই মন ছটফট করবে। কৈশোর থেকে শুরু করে পরিণত বয়স পর্যন্ত মানিকের লেখা কবিতায় দুটি খাতা ভর্তি ছিল। দিবারাত্রির কাব্যের প্রতিটি অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল তাঁরই রচিত কবিতা দিয়ে। তাই তাঁর রচনায় সর্বদা আবেগবর্জিত শুষ্কতা থাকা সম্ভব নয়, কবিসত্তা মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দেবেই। ‘আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোটবাবু?’ অথবা, “মাটির টিলাটির ওপর সূর্যাস্ত দেখিবার শখ এ জীবনে আর একবারও শশীর আসিবে না।” “খুব বড়ো মাপের কবি ছাড়া এ জাতীয় পঙ্ক্তির রচনা করা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

৮.২.৫.৫ : মানিকের উপন্যাস : দাম্পত্য জীবনের অনুপস্থিতি

অন্য উপন্যাসগুলিতে তাকানোর আগে একটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত। দিবারাত্রির কাব্য, পদ্মানদীর মাঝি বা পুতুলনাচের ইতিকথা—কোনোটিতেই সুখী দাম্পত্যজীবনের চিত্র নেই। বস্তুত এরকম ধারাবাহিক অসুখী, হৃদয়ের যোগাযোগবিহীন বিবাহিত জীবনের বর্ণনা বাংলা সাহিত্যে খুব কমই পাওয়া যাবে। ‘দিবারাত্রির কাব্য’ সুপ্রিয়া—অলোক, মালতী—অনাথ, মানসিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন দম্পতি। সুপ্রিয়া বিবাহের পরও হেরম্বের প্রতি আসক্ত থেকেই যায়। হেরম্ব তাকে ভুলিয়ে ছোট দারোগার বউ করে দিয়েছিল, কিন্তু মনে প্রাণে সে কোনোদিন এ বিবাহ মেনে নিতে পারে নি। তাই পাঁচবছর বাদে হেরম্বকে দেখেও তার পুরোনো আকর্ষণই জেগে ওঠে। অথচ যার জন্য তার দাম্পত্যজীবন ব্যর্থ হয় সেই হেরম্বকে এখন লাভ করার প্রশ্নও আসে না। গৃহশিক্ষক অনাথের সঙ্গে যোল বছর বয়সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল মালতী। বৈষ্ণব মতে দুজনের বিয়েও হয়েছিল। কিন্তু দাম্পত্যজীবনের নমুনা এই যে, দুজনের মধ্যে কেবল মানসিক ব্যবধান তৈরি হয়নি, অনাথ শেষ পর্যন্ত মালতীকে না জানিয়েই গৃহত্যাগ করেছে। বস্তুত, আনন্দ যে হেরম্বের সঙ্গে ঘর বাঁধতে ভয় পায় তার অন্যতম কারণ পিতামাতার তিক্ত সম্পর্কের অভিজ্ঞতা। হেরম্বকে সে স্পষ্টই এই মনোভাবের কথা জানিয়েছিল, ‘ভাবছি, আমারও যদি একদিন মার মতো দশা হয়।’ আর গোটা উপন্যাসের যে কেন্দ্রীয় চরিত্র সেই হেরম্বের বৌ শেষ পর্যন্ত গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল।

‘দিবারাত্রির কাব্য’, ‘পদ্মানদীর মাঝি’ বা ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’—কোনোটিতেই সুখী দাম্পত্য জীবনের চিত্র নেই। উপন্যাসে প্রেমহীনতার কাহিনি এনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বোধহয় তাঁর নিজস্ব জীবন দর্শনটি তুলে ধরেছেন। আপাত সুখী এবং তৃপ্ত দাম্পত্যজীবনের অন্তরালে রয়ে গেছে একটা চাপা অসুখ। পবিত্র দাম্পত্য জীবনের ধারণাটি যেন একটি মিথ মাত্র। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ ও স্বাভাবিক সম্পর্কও লোপ পেতে বসেছে।

‘পদ্মানদীর মাঝি’-তে কুবের-মালার দাম্পত্যজীবনে কপিলা এসে যেন ঝড় বইয়ে দিয়েছে। বস্তুত পঙ্গু নিরীহ মালার তুলনায় কপিলা বা মোহময়ী আকর্ষণ যে কুবেরকে বিচলিত করবে তা স্বাভাবিক। সন্তানদের নিয়ে

কুবেরের সংসারজীবন সুখদুঃখ মিশ্রিত মস্তুর গতিতে চলছিল। কিন্তু কপিলার আগমনে এই দরিদ্র জেলেটিরও বিবাহিত জীবন বিপর্যস্ত হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত সবাইকে ফেলে কপিলাকে নিয়ে সে ময়নাদ্বীপে পাড়ি জমায়, ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’-য় নন্দ আর বিন্দুর দাম্পত্যজীবন ব্যর্থ হয়েছে, কুসুম-মতির জীবন স্বাভাবিক পথ ধরে এগোয় নি। আর ছোটবাবু শশীর নেপথ্য উপস্থিতি কুসুম-পরানের স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবনযাপনের মধ্যখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কুসুমের গ্রাম ত্যাগে বাইরের বাধা অপসারিত হলেও মনের বাধা চিরস্থায়ী হয়ে গেছে। প্রথম যৌবনে রচিত উপন্যাসগুলিতে বিবাহিত নরনারীর সম্পর্কের মধ্যে প্রেমহীনতার এই প্রাধান্য বিস্ময়কর। এমন কি, প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত ‘জীবনের মধ্যে কবি বিমল এসে সব কিছু তছনছ করে দিয়েছে। শেষে দ্বন্দ্ব মেটাতে শান্তাকে ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে হয়। কুবের-মালা ব্যতীত এই দম্পতির সবারই নিঃসন্তান অথবা এদের একটা সন্তান হয়ে মরে গেছে। হৃদয়ের বন্ধন ছিলই না, সন্তানের বন্ধনও এদের মধ্যে নেই। বারে বারে এই সম্পর্কহীনতা বা প্রেমহীনতার কাহিনি উপন্যাসে এনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বোধহয় এ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব জীবন দর্শনটিকে তুলে ধরেন। আপাতসুখী এবং তৃপ্ত দাম্পত্যজীবনের অন্তরালে রয়ে গেছে একটা চাপা অসুখ। পবিত্র দাম্পত্যজীবনের ধারণাটি যেন একটি মিথ মাত্র। সুস্থ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাছাড়া প্রেমের স্থায়িত্ব সম্পর্কেই তো হেরম্ব প্রশ্ন তুলেছিল। আনন্দকে সে বলেছে, “ একমাসের বেশি প্রেম কারো সহ্য হয়? মরে যাবে আনন্দ একমাসের বেশি হৃদয়ে প্রেমকে পুষে রাখতে হলে মানুষ মরে যাবে।” একথা তার মতে সমগ্র মানবজীবনের ক্ষেত্রেই সত্য, দাম্পত্যজীবনের ক্ষেত্রে তো বটেই। পাশাপাশি প্রতিটি মানুষ, মানুষের প্রতিটি সম্পর্কে ক্রমাগত বিশ্লেষণের যে প্রবণতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে ছিল তার ফলেই তিনি যেন অবচেতন মনের গভীরে সন্ধানী আলো ফেলে গেছেন। সেখানে প্রত্যাশিত মাধুর্যের কোনো সাক্ষাৎ তিনি পান নি, পেয়েছেন তীব্র প্রাণঘাতী হলাহলের সন্ধান।

৮.২.৫.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

- ১। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাসের নাম কি?
- ২। একই সালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল, উপন্যাস দুটির নাম কি?
- ৩। আধুনিকতার দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।
- ৪। মধ্যবিত্ত মানসিকতা কি?
- ৫। নাটক কি?
- ৬। উপন্যাস কাকে বলে?
- ৭। ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ উপন্যাসে কোন গ্রামের ছবি লক্ষ্য করা যায়?
- ৮। গ্রাম ও শহরের দ্বন্দের দুটি লক্ষণ প্রকাশ করো।

- ৯। গদ্যভঙ্গীর দুটি বৈশিষ্ট্য বলো।
- ১০। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি উপন্যাসের নাম করো, যেখানে দাম্পত্যজীবনের অনুপস্থিতি আছে।
- ১১। কুসুম ও কপিলা কোন উপন্যাসের চরিত্র?
- ১২। ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ উপন্যাসে গ্রাম্য চিকিৎসার সঙ্গে আধুনিক চিকিৎসার যে সংঘাত ফুটে উঠেছে, তা আলোচনা করো।
- ১৩। ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ উপন্যাসের গদ্য ভাষা শৈলী সম্পর্কে আলোচনা করো।

একক ৬

নায়ক শশী : অন্তর্দ্বন্দ্ব ও পরিণতি

বিন্যাসক্রম

- ৮.২.৬.১ : নায়ক শশী : অন্তর্দ্বন্দ্ব ও পরিণতি
৮.২.৬.২ : পিতা গোপাল : নায়ক চরিত্র গঠনে প্রভাব
৮.২.৬.৩ : আদর্শ প্রশ্রাবলী

৮.২.৬.১ : নায়ক শশী : অন্তর্দ্বন্দ্ব ও পরিণতি

উপন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনাতেই শশীর দ্বন্দ্বের কারণটি লেখক স্পষ্ট করেন, “শশীর চরিত্রে দুই সুস্পষ্ট ভাগ আছে। একদিকে তাহার মধ্যে যেমন কল্পনা, ভাবাবেগ ও রসবোধের অভাব নাই অন্যদিকে তেমনি সাধারণ সাংসারিক বুদ্ধি ও ধনসম্পত্তির প্রতি মমতাও তাহার যথেষ্ট।” কল্পনা, ভাবাবেগ বা রসবোধ সে পেয়েছিল কলকাতার মেডিকেল কলেজের বন্ধু কুমুদের কাছ থেকে। কুমুদ তার গ্রামীণ মানসিকতার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছিল। তার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি উত্তরাধিকার সূত্রে সে পেয়েছিল পিতা গোপাল দাসের কাছ থেকে। গ্রামের মাটি, মানুষ জীবনযাত্রা, তাদের নানা সংস্কার ও বিশ্বাস সব কিছুই যেন লুকিয়ে ছিল তার রক্তের গভীরে। সেখানে মাঝে মাঝে সে সংকীর্ণ হিসেবী হয়ে ওঠে। যে রোগী মারা গেছে তার বাড়িতে গিয়েও ভিজিটের জন্য কড়া তাগাদা লাগায়। কিন্তু সেটাই চূড়ান্ত নয়। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার জীবনে এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা ঘটেনি। যুগান্তর চক্রবর্তী ঠিকই ধরিয়ে দেন, “বাঙালী মধ্যবিত্ত চরিত্রের এই দ্বৈতরূপ, তার দ্বন্দ্বময় দুই মুখ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পুতুলনাচের ইতিকথা-য় একই সঙ্গে প্রত্যক্ষ করেন—‘শশী কুমুদের চরিত্রে এই উভয় রূপের মৌল লক্ষণগুলি ওতপ্রোত মিশে যায়।’ (অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়) তারও আগে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ওই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, ‘তিরিশের বাংলাদেশের গ্রাম-শহরের সমাজ বাস্তবতার স্বরূপ নির্ণয়ের কাজে শশী সর্বদা স্মরণীয় চরিত্র।’

আমাদের চিন্তাভাবনাও আপাতত এই পথ ধরেই চলে। শশীকে ‘কালোচিত অন্তর্দ্বন্দ্বের ভাৱে পীড়িত নায়ক’ বলেই আমাদেরও বোধ হয়। কিন্তু ‘পুতুল’ শব্দটি আমাদের একটু আলাদা ভাবে ভাবায়। কুসুমের বাবা অনন্ত শশীকে একজায়গায় বলেছিল, “সংসারে মানুষ চায় এক, হয় আর চিরকাল এমনি দেখে আসছি ডাক্তারবাবু। পুতুল বই তো নই আমরা, একজন আড়ালে বসে খেলাচ্ছেন।” এ সেই অদৃশ্য

‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ উপন্যাসে শশী সমকালীন মধ্যবিত্ত জীবনের অভিজ্ঞতার ফসল। গ্রামের মাটি, মানুষ, জীবনযাত্রা, তাদের নানা সংস্কার ও বিশ্বাস সব কিছুই যেন লুকিয়ে ছিল তার রক্তের গভীরে। শশীর আত্মদ্বন্দ্ব এবং আত্মানুসন্ধানই চরিত্রটিকে নায়ক করেছে। নাগরিক ও গ্রামীণ মানসিকতার দ্বন্দ্ব কি ভাবে শশীর মতো এক শিক্ষিত মধ্যবিত্তের স্থায়ী চিন্তা বা স্থায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করে, তাই উপন্যাসের মূল বিষয়।

ভাগ্যদেবতার লীলা যার সম্পর্কে কিং লীয়ার আত্নানাদ করেছিলেন, They kill us for their sports পাঠক হিসেবে আমরাও এই ভাবেই উপন্যাসের নামটিকে দেখতে ভালোবাসি। কিন্তু পরিকল্পিত দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপির খসড়ার একজায়গায় স্বয়ং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই এই তত্ত্ব নস্যাত্ন করে দিয়েছেন, ‘সত্যই তো আর পুতুল নয় মানুষ। অদৃশ্য শক্তি বা অন্য অন্য মানুষের আগুলে বাঁধা সুতোর টানে সত্যই তো মানুষ অচেতন পুতুলের মত নাচে না।... নইলে শশীর কি দরকার ছিল বাপের ফেলে যাওয়া সংসারের দায়, হাসপাতালের দায়, গাঁয়ের চাষাভুষো মানুষগুলির চিকিৎসার দায় থেকে আরও অনেক রকম দায় ঘাড়ে নেবার—তার নিজের স্বপ্ন আর কল্পনাকে যা সার্থক করে না। পুতুলের কি দায়িত্বজ্ঞান থাকে?’

“পুতুল শব্দের তাৎপর্য” যদি বলা যায় যে, এই ‘পুতুল’টি হল মানুষের অবচেতন মন, তারই অজ্ঞাতসারে এই মন মানুষের সমস্ত সিদ্ধান্তকে নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে তাহলে সেই যুক্তিটিকেও বোধহয় অগ্রাহ্য করা যাবে না। দ্বিতীয় অর্থাৎ ১৯৪৭-এ প্রকাশিত বুকম্যান সংস্করণে প্রকাশকের পক্ষ থেকে পশ্চাদ্গত বক্তব্য রাখা হয়েছিল, ‘পৃথিবীর এই বিরাট রঙ্গক্ষেত্রে মানুষ যেন শুধু পুতুল। কোন অদৃশ্য হাতের সুতোর টানাপোড়েনে মানুষ নাচে।’ এই বক্তব্যেরও বিরোধিতা করেছিলেন লেখক। “আত্মসমালোচনা” শীর্ষক একটি রচনায় (এক্সণ, ১৩৪৮ শারদ সংখ্যায় লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত) তাঁর নিজস্ব ভাষ্যটি আবার পাওয়া গেল। যেহেতু উপন্যাসের নাম ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ ‘তবে আর কথা কি, মানিকবাবু মানুষকে পুতুল বানিয়েছেন, ভাগ্যের দাস বানিয়েছেন।’ কিন্তু তাঁর মতে ব্যাপারটি একেবারেই উল্টো। ‘আমি ভাবছি হয়। যদি বইটার একটা ভূমিকা দিয়ে লিখে দিতাম মানুষকে কিভাবে পুতুল করা হয়েছে এটা তারই উপন্যাস—আমার বইখানার পিছনে হয়তো প্রকাশক আমাকে ভাগ্যবাদী ঘোষণা করতেন না।’ মানুষকে কিভাবে পুতুল করা হয়েছে—এই উপন্যাসের সেটাই মূল বক্তব্য— তা মেনে নিলে নামকরণটি আলাদা মাত্রা পেয়ে যায়। ত্রিশের দশকের গ্রামীণ বক্তব্য তা মেনে নিলে নামকরণটি আলাদা মাত্রা পেয়ে যায়। ত্রিশের দশকের গ্রামীণ সামাজিক কাঠামো, নাগরিক ও গ্রামীণ মানসিকতার দ্বন্দ্ব কিভাবে শশীর মতো এক শিক্ষিত মধ্যবিত্তের স্বাধীন চিন্তা বা স্বাধীন সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করে, কিভাবে তা পদে পদে বাধা হয়ে দাঁড়ায়—তাই তখন উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য হয়ে ওঠে। শশীর অন্তর্জন্মের কাহিনি বলে মেনে নিতে হয়।

৮.২.৬.২ : পিতা গোপাল : নায়ক চরিত্র গঠনে প্রভাব

শশীর চরিত্র গঠনে যাদের প্রভাব রয়েছে তাদের দিকে একে একে তাকানো যেতে পারে। প্রথমেই পিতা গোপাল দাসের কথা। কলকাতায় পড়তে যাবার আগে পর্যন্ত এই চরিত্রটিই শশীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। দালালি এবং মহাজনিই তার মূল ব্যবসা। চড়া সুদে সে টাকা ধার দেয় আর সম্পত্তির কেনাবেচা করে। বেশি টাকা নিয়ে অতিবৃদ্ধের বৌ যোগাড় করে দেবার মত চরম অন্যায় কাজও সে করেছে। এরকম তিনজনের মধ্যে যামিনী কবিরাজের বৌ সেনদিদি এখনো জীবিত। নিঃসন্তান সেনদিদির গভীর স্নেহ শশীর প্রতি, আবার গোপালের সঙ্গে তার নাম জড়িয়ে গাঁয়ে নানা ফিসফিস শোনা গেছে। শশী এই অপবাদ বিশ্বাস না করলেও অতিবৃদ্ধ যামিনী কবিরাজ স্বাভাবিক কারণেই স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহান। কলকাতার বড়বাজারের বিখ্যাত পাট ব্যবসায়ী নন্দলালের সঙ্গে মেজ মেয়ে বিন্দুবাসিনীর বিবাহ দেওয়ার ঘটনার মধ্যেও গোপালের শঠতা ও হীন চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যাবে। বছর সাতেক আগে বাজার থেকে পাট সংগ্রহ করার জন্য নন্দলাল একবার গাওদিয়ায় এসেছিল। গোপাল তাকে

আদর করে নিজের বাড়িতে ডেকে এনে আশ্রয় দেয়, ঘরের লোকের মতো আদরযত্ন করে, তারপর দিন তিনেক বাদে তার লোকজন লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে থেকে নন্দলালের সঙ্গে বিন্দুবাসিনীর বিবাহ দিয়ে দেয়। বোঝাই যায় যে, নন্দলালকে চক্রান্ত করে ফাঁসানো হয়েছিল। সে কোনোদিনই এই অসম্মানের কথা ভোলেনি। বিন্দুকে সে কলকাতায় নিয়ে গেছে বটে, কিন্তু কোনোদিনই স্ত্রীর মর্যাদা দেয়নি, তাকে সে রক্ষিতার মতো রেখেছিল। নিজের মেয়ের জীবন এইভাবে নষ্ট করবার দায়িত্ব পিতা গোপালের উপরেই এসে পড়ে।

শশীর চরিত্র গঠনে, পিতা গোপাল দাসের প্রভাব আছে। দালালি ও মহাজন রীতি গোপাল দাসের মূল ব্যবসা। জাগতিক সাফল্য গোপালের আয়ত্ত থাকলেও পুত্র শশীকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারেননি। শিক্ষা-দীক্ষায় পিতা-পুত্রের আকাশ-পাতাল পার্থক্য। ফলে গোপাল-শশীর মনান্তর লেগেই থাকে। গোপাল চরিত্রের স্থূল প্রকৃতি, সঞ্চয়ী মানসিকতা গড়ে উঠেছিল ত্রিশের দশকের গ্রামবাংলার সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোতে। শেষ পর্যন্ত ‘কি আর করিবে শশী, এ ভার তো ফেলিবার নয়’। গোপালের গৃহস্থ সভাই শশীর ঘর-ছাড়া রোমান্টিক সভাকে আড়াল করে ফেলে।

যাকে জাগতিক সাফল্য বলে তার সবটাই গোপালের আয়ত্ত ছিল। কিন্তু একমাত্র পুত্র শশীকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। শশীর চরিত্রে পিতার অবশ্যই কিছুটা প্রভাব ছিল। গোপালের সাংসারিক বুদ্ধি বা হিসেবী মনোভাব শশীর মধ্যেও মাঝে মাঝে মাথাচড়া দিয়ে ওঠে। কিন্তু গোপাল পুত্রকে কোনোভাবেই প্রভাবিত করতে পারেনি। এটাই চরিত্রটির ট্র্যাজেডি। শশীকে বশে রাখার জন্য গোপাল কোনো চেষ্টাই বাকি রাখেনি। তোষামোদ, মিনতি, অভিমান, চোখরাঙানো সব কটি অস্ত্রই তাকে প্রয়োগ করতে দেখা গেছে। এমন কি, হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে আড়াল থেকে শশীর সঙ্গে শত্রুতাও করেছে। সেনদিদির চিকিৎসার সময় গোপালের উজ্জ্বলিত হই যামিনী কবিরাজ শশীর সঙ্গে ঝগড়া করে তার বাড়িতে আসা বন্ধ করতে চেয়েছিল। গোপালের অপরাধী মন বোধ হয় সেনদিদির কাছ থেকে ছেলেকে সরিয়ে নিজের কাছে আনতে চায়। শিক্ষা-দীক্ষায় পিতা-পুত্রের আকাশ-পাতাল পার্থক্য। শশী কলকাতার মেডিকেল কলেজ পাশ করা ডাক্তার আর “গোপাল এ বি সি ডি-ও চেনে না।” গোপালের জন্য শশীকেও কম অপমানিত হতে হয়নি। কুসুম তাকে স্পষ্টই শুনিতে দেয়, ‘আমার বাবা ঢের রোজগার করে। তাই বলে আমরা কি আপনার তুলিয়া? লোকের গলায় ছুরি দেওয়া পয়সায় আমরা বড়লোক হইনি।’ আর শশীরও এই সত্যটি জানা যে, ‘লোকের গলায় ছুরি দিয়েই গোপাল যে পয়সা করিয়াছে একথারও প্রতিবাদ চলিবে না।’

আবার শশীর পক্ষে গোপালকে সম্পূর্ণ এড়ানো কিছুতেই সম্ভব নয়। মননের মিল না থাকলে কি হয় অসৎভাবে উপার্জিত তার বিপুল অর্থের সেই তো উত্তরাধিকারী। উচ্চশিক্ষিত ছেলের জন্য গোপালের গর্ব, আবার দুষ্টর মানসিক ব্যবধানের জন্য তার মনে একধরনের সঙ্কোচ, বলা যেতে পারে এক ধরনের ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স ছিল। শশীকে সে তার পথের পথিক করতে চায়। অথচ তার এই সত্যটিও জানা হয়ে গেছে যে, শশীকে তার ছাঁচে ঢালা সম্ভব হবে না। মেজ মেয়ে বিন্দুকে চক্রান্ত করে নন্দলালের সঙ্গে বিয়ে দেবার পরই যেন গোপালের দায়িত্ব শেষ, মেয়ের ভালো মন্দ দেখার দায়িত্ব তার নয়। কিন্তু শশীর কলকাতায় গিয়ে চোখে পড়েছিল যে, বিন্দুকে নন্দ প্রায় রক্ষিতা করে রেখেছে, সেখানে বিন্দুর নারীত্ব পদে পদে অপমানিত হয়ে চলেছে। তাই বিন্দুকে সে কলকাতা থেকে গাওদিয়ার নিয়ে এসেছিল। কিন্তু গোপালের তাতে প্রবল আপত্তি। স্ত্রীকে মানুষ নিজের খুশিমতো অবস্থায় রাখিবে এই তো সংসারের নিয়ম। মারধোর করিলে বরং কথা ছিল। কিছুই তো নন্দ করে নাই। তাই তার মতে গয়নাগাটি জিনিষপত্র ছাড়া বিন্দুকে নিয়ে আসাটা অত্যন্ত কাঁচা কাজ হয়েছে।

তাই গোপাল-শশীর মনান্তর লেগেই থাকে। এর অনিবার্য ফল পিতা-পুত্রের কথা বন্ধ। আর গোপাল এতেই আঘাত পায় সবচেয়ে বেশি। তার পিতৃসত্তা কাতর হয়ে পড়ে। নিজেই উদ্যোগী হয়ে গোপাল পুত্রের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতে যায়। এই সমস্ত জায়গাতেই গোপালকে শশীর তুলনায় সজীব মানুষ বলে মনে হয়। শশী কখন গ্রাম ছেড়ে শহরে ডাক্তারি করতে চলে যায় এই আশঙ্কায় গোপাল সব সময় কাতর। যে গাওদিয়ায় অত্যন্ত দরিদ্র ঘরে তার জন্ম সেখানেই তার এখন দালানকোঠা, বিস্তার জমি-জায়গা এবং অনেক টাকা। “ঘরে-বাইরে এখানে তাহার আদর্শ বাঙালী জীবনের বিস্তার। এইখানে মরিতে হইবে তাহাকে। শশী এখানে থাকিবে না, অনুসরণ করিবে না তার পদাঙ্ক?” এমন কি শশীকে সে মাঝে মাঝে শহর সম্বন্ধে সতর্কও করে দেয়, ‘শহরে ঢের বড় বড় ডাক্তার আছে—তুমি সেখানে পাত্তাও পাবে না শশী।’ আবার ছেলের মন ঘোরানোর জন্য তার সেন্টিমেন্টেও সে আঘাত করে, ‘গাঁয়ে আর ডাক্তার নেই, অচিকিৎসায় মরে গাঁয়ের লোক, সেটাও তো দেখতে হবে? বড় তুই স্বার্থপর শশী।’ একদিক দিয়ে বিচার করলে গোপালের এই শশী-মূল্যায়নে সত্যতা আছে। শশীর সমস্ত চিন্তাভাবনা নিজেকে ঘিরেই, সে আত্মকেন্দ্রিক। গোপাল শশীর কাছ থেকে শেষ আঘাত পায় হাসপাতালের ব্যাপারে। তার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও শশী তাকে হাসপাতালের উপদেষ্টা কমিটিতে নেয় না। পরিষ্কার কথা, আর্থিক ব্যাপারে পুত্র পিতাকে বিশ্বাস করে না। ছেলের মনে শ্রদ্ধা জাগাতে গেলে বাবাকেও যে শ্রদ্ধার উপযুক্ত হতে হয় গোপাল এটা ভাবেনি। একদা যামিনী কবিরাজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গোপাল শশীকে সেনদিদির চিকিৎসা করতে দেয়নি। আবার সেনদিদির শেষ অবস্থায় সে পুত্র শশীকে কাতর অনুরোধ জানিয়েছিল। শশী চিকিৎসা শুরু করেও সেনদিদিকে বাঁচাতে পারেনি। তবে সমস্ত উপন্যাস জুড়েই গোপাল চরিত্রটি শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিক থাকে। তার স্থূল প্রকৃতি, সঞ্চয়ী মানসিকতা বা কুটিলতা সবকিছুই গড়ে উঠেছিল ত্রিশের দশকের গ্রামবাংলার সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোতে। অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থা থেকে গোপাল দালালি ও মহাজনি করে সচ্ছল হয়েছে। প্রচলিত শিক্ষা অর্জন করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি বলে চরিত্রটির মার্জিত আবরণ নেই। স্ত্রীর অকালবিয়োগ হয়তো তাকে প্রবৃত্তির শিকার করেছিল। সেনদিদির গর্ভে তার সন্তানের জন্ম এক নিদর্শন। কিন্তু দ্বিতীয় বার বিবাহ করে সে সন্তানদের বিমাতার হাতে সমর্পণ করেনি। সেনদিদির মৃত্যুর জন্য পুত্র শশীকেই মনে মনে দায়ী করার মধ্যে গোপালের তীব্র আসক্তির স্পষ্ট হয়। আর এখানেই আঘাত পায় সে সবচেয়ে বেশি।

এরপর থেকেই গোপালের মন চিরকালের মতো ভেঙে যায়, তার সংসার-বৈরাগ্য আসে। তার মতো লোক যখন কোনো মামলার তদ্বির করে হেরে যায় তখন বোঝাই যায় যে, চরিত্রটিও সত্যিই যেন হেরে গেছে। তবে একজায়গায় বোধ হয় গোপাল শেষ পর্যন্ত জিতেও যায়। সাত-আট দিন কাশীর আশ্রমে কাটিয়ে আসার নাম করে সে আর ফিরে আসে না। সংসারীগৃহস্থ মানুষ সারাজীবন ধরে সঞ্চয় করে উত্তরাধিকারীর হাতে তা তুলে দিয়ে যাবার জন্য। ‘এসব তুচ্ছ করিয়া শশী যদি চলিয়া যায়, সমস্ত জীবনটাই গোপালের ব্যর্থ হইয়া যাইবে না?’ তাই গোপাল নিজেই এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বার করে। শশীকে আটকানোর উপায় সে বের করে ফেলে। নিজে গাওদিয়ায় একেবারে না ফিরে এলে তো শশী গ্রামে থেকে যেতে বাধ্য। ঘটনাও ঠিক তাই ঘটে। “কি আর করিবে শশী, এ ভার তো ফেলিবার নয়”। গোপালের গৃহস্থ-সত্তাই শশীর ঘর-ছাড়া রোমাণ্টিক সত্তাকে আড়াল করে ফেলে।

৮.২.৬.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

- ১। উপন্যাসে শশীর অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনির দুটি বৈশিষ্ট্য লেখ?
- ২। শশী চরিত্র গঠনে পিতা গোপাল দাসের প্রভাবের বর্ণনা দাও?
- ৩। ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ উপন্যাসটির শিরোনামের সার্থকতা বিচার করো।
- ৪। ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ উপন্যাসের নায়ক শশীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও পরিণতিতে আধুনিকতার লক্ষণ কিভাবে পরিস্ফুট হয়েছে, ব্যাখ্যা করো।

কুমুদ-মতি উপকাহিনির গুরুত্ব

বিন্যাসক্রম

৮.২.৭.১ : কুমুদ-মতি উপকাহিনির গুরুত্ব

৮.২.৭.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৮.২.৭.১ : কুমুদ-মতি উপকাহিনির গুরুত্ব

উপন্যাসে কুমুদ-মতি উপাখ্যানটি আলাদা মনোযোগের দাবী রাখে। বস্তুত তেরোটি অধ্যায়ের উপন্যাসে সম্পূর্ণ দুই অধ্যায় জুড়ে কেবল কুমুদ-মতির কাহিনি। এই দুটি অধ্যায়ে মূল উপন্যাসের কোনো চরিত্র বা ঘটনার উল্লেখ নেই। এ যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি ধারা, যাকে কেবল উপকাহিনি বললেও ঠিক বলা হয় না। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কলকাতার কলেজে শশীর একমাত্র বন্ধু হিসেবে উপন্যাসে কুমুদের গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশ। শশীকে নাগরিক

করে তোলার মূলে রয়েছে তার এই বন্ধুটি। কুমুদ কবিতা লেখে, তার বেপরোয়া খ্যাপাটে স্বভাব। কলেজে না গিয়ে হোস্টেলে নিজের ঘরে বসে সে ইংরেজি বাংলা নভেল পড়ত, আর ধর্ম সমাজ প্রেম প্রভৃতি বিষয়ে বৈপ্লবিক কথাবার্তা বলত। ত্রিশের দশকের কলকাতায় এই ধরনের বোহেমিয়ান এবং রোমাণ্টিক তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিকের সাক্ষাৎ পাওয়া যেত। কল্লোল-কালিকলম-এর আড্ডায় এদের দু-চারজনকে দেখা গেছে। স্বভাবতই গ্রামের সঙ্কীর্ণ সীমানায় আবদ্ধ শশীর কাছে কুমুদ যেন এক অজানা জগতের বার্তা বহন করে নিয়ে এসেছিল। পিতা গোপাল

‘পুতুলনাচের ইতিকথা’র তেরোটি অধ্যায়ের সম্পূর্ণ দুই অধ্যায় জুড়ে কুমুদ-মতির কাহিনি। শশীকে নাগরিক করে তোলার মূলে রয়েছে তারা এই বন্ধুটি। ত্রিশের দশকে কলকাতায় এই ধরনের বোহেমিয়ান এবং রোমাণ্টিক কল্পনাপ্রবল তরুণ শিল্পী সাহিত্যিকদের মধ্যে কুমুদ অন্যতম। মতির মতো গ্রাম্য সরল মেয়ের সাহচর্য তাকে এমন কি ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখায়। তাই মতিকে ঘিরে কুমুদের জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ের স্বাভাবিক সূচনা। যে ভালোবাসার জোরে কুমুদ মতিকে সম্পূর্ণ নিজের মতো করে গড়ে নিতে পারে, শশীর জীবনে সেই জোরের একান্ত অভাব। কুমুদের বিপরীতে শশীর অবস্থানটুকু দেখানোর জন্যই কুমুদ মতির দাম্পত্য জীবনের এত বিস্তৃত বর্ণনা।

দাসের চেনানো জগৎ ও জীবন থেকে এ সম্পূর্ণ আলাদা। কুমুদের প্রভাবের জন্যই ডাক্তারি পাশ করে আসার পর গ্রাম সম্পর্কে শশীর মনে প্রবল বিতৃষ্ণা জাগে “জীবনটা কলিকাতায় যেন বন্ধুর বিবাহের বাজনার মতো বাজিতে ছিল, সহসা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।”

কলকাতা ছেড়ে গাওদিয়াতে দীর্ঘকাল বাদে আবার কুমুদের দেখা পাওয়া যায়। তবে তখন সে আর কলকাতার কলেজের সেই ঝকঝকে আধুনিক মানসিকতার ছাত্র নেই। তার প্রতিবাদী নাগরিক সত্তাটি তখন অদৃশ্য। এই কুমুদ বিনোদিনী অপেরা পাটিতে যাত্রা করে বেড়ায়। একদা শশীর আদর্শ চরিত্রের এই অধঃপতন তাকেও বিস্মিত করে। আবার শশীর বাড়িতে এই ভবঘুরে চরিত্রটি প্রথম পারিবারিক জীবনের আশ্বাদ পায়। মতির মতো

গ্রাম্য সরল মেয়ের সাহচর্য তাকে এমন কি ঘর বাঁধার স্বপ্নও দেখায়। তাই মতিকে ঘিরে কুমুদের জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ের স্বাভাবিক সূচনা। আর এইভাবেই সে কিছুকালের জন্য কেন্দ্রীয় কাহিনিতে ঢুকে পড়ে। কুমুদের ব্যক্তিজীবনের মধ্যেই যেন তার এই পরিবর্তনের বীজটি নিহিত ছিল। তার যেটুকু পরিচয় উপন্যাসে পাওয়া গেছে তাতে পিতামাতার কোনো উল্লেখ নেই। মনে হয় ধনী ব্যবসায়ী কাকার কাছেই সে মানুষ। তার খামখেয়ালি উদ্ধতস্বভাবের জন্যই বোধ হয় কাকা তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, একই কারণে ধরাবাঁধা চাকরিও তার পোষায়নি। সব জায়গা থেকে তাড়া খেয়ে সে যাত্রায় ঢুকেছে। যাত্রায় রাজপুত্র সাজার মধ্য দিয়েই বোধ হয় কুমুদের অবাস্তব কল্পনাবিলাসের চরিতার্থতা। তার অভিনয় দেখা মতির যে মনে হয়েছিল, ‘কুমুদ মাটির পৃথিবীর কেহ নয়’ তার মধ্যে ভুল ছিল না। সংসারী মানুষের ভূমিকাতেই কুমুদ অসার্থক। গাওদিয়ার আকস্মিক আগমন থেকে মতিকে বিবাহ করা পর্যন্ত উপন্যাসে কুমুদের উপস্থিতি মেনে নিতে আপত্তি থাকে না। বিশেষ করে শশীকে নিয়ে কুসুম-মতির সূক্ষ্ম টানাপোড়েনের এত অবসান ঘটেছে। কিন্তু উপন্যাসে কুমুদমতির দাম্পত্য জীবনের সম্পূর্ণ দুটি অধ্যায় সংযোজনের কারণটি সাধারণ ভাবে পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয় না।

তবে যে কুমুদ আপাদমস্তক গ্রাম্য শশীর মনে শহরের ছাপ লাগিয়ে দিয়েছিল, যে শশীকে শেলীর দুর্বোধ্য কবিতা বুঝিয়েছিল, যার প্রভাব শশী কখনো পুরোপুরি এড়াতে পারে নি, সে যে শেষ পর্যন্ত নিজের সংসার করার ক্ষেত্রে বোহেমিয়ানিজম বজায় রেখেছিল তা দেখানোর প্রয়োজন বোধ হয় ছিল। তাছাড়া অন্য চরিত্রের মন জয় করার যে ক্ষমতা কুমুদের চিরকালীন আয়ত্ত মতির পরিবর্তন ঘটায় মধ্য দিয়ে যেন তার পূর্ণ সার্থকতা। স্বয়ং শশী অনভিজ্ঞ গ্রাম্য বালিকার এই পরিবর্তনে বিস্মিত বোধ করেছিল। এই ভালোবাসার ক্ষমতার কাছেই যেন শশীর হার। আসলে দুটি অধ্যায় জুড়ে কুমুদ-মতির সুখী অথচ বেহিসেবী দাম্পত্য-জীবনের বর্ণনার প্রাসঙ্গিকতা মনে হয় এখানেই। কুমুদ চরিত্রের ভালোমন্দ সমস্ত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে শশী পরিচিত ছিল। কখনো তার প্রতি সে তীব্র আকর্ষণ বোধ করেছে আবার কখনো কুমুদের প্রতি শশীর অবজ্ঞাও এসেছে। ‘কিন্তু মতির সুখে আনন্দে উজ্জ্বল মুখচ্ছবি, মতির পুলকমস্তুর গতিশ্রী দেখিয়া মাঝখানে কুমুদের সম্পর্কে যতটুকু অবজ্ঞা মনে আসিয়াছিল সব যেন আজ মুছিয়া যায়। কুমুদের জীবনের যা মূলমন্ত্র তার সন্ধান শশী কখনো পায় নাই।’ এতদিনে শশী যেন সেই মূলমন্ত্রের সন্ধান পায়। যে ভালোবাসার জোরে কুমুদ মতিকে সম্পূর্ণ নিজের মতো করে গড়ে নিতে পারে শশীর জীবনে সেই জোরের একান্ত অভাব। তাই নিজের সম্পর্কেও কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সে পারে না। কুমুদের বিপরীতে শশীর এই অবস্থানটুকু দেখানোর জন্যই কুমুদ-মতির দাম্পত্যজীবনের এত বিস্তৃত বর্ণনা। প্রয়োজন মেটার পরেই কাহিনি থেকে তাদের স্থায়ী অন্তর্ধান। তাদের পরবর্তী জীবনকাহিনি উপন্যাসের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় বলেই ‘ওদের কথা এইখানেই শেষ হইল।’

৮.২.৭.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

- ১। উপকাহিনি কাকে বলে?
- ২। উপন্যাসে কুমুদ মতির কাহিনি যোগ করার যুক্তিকতা কোথায়?
- ৩। ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ উপন্যাসে কুমুদ-মতি উপকাহিনির গুরুত্ব নির্দেশ করো।

একক ৮

কুসুম চরিত্র

বিন্যাসক্রম

- ৮.২.৮.১ : কুসুম চরিত্র
৮.২.৮.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী
৮.২.৮.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৮.২.৮.১ : কুসুম চরিত্র

‘পদ্মানদীর মাঝি’-র কপিলা এবং কুসুমের নাম একসঙ্গে উল্লেখ করেছি। দুটি চরিত্রের কিছু কিছু সাদৃশ্যের কথাও সেখানে বলা হয়েছে। দুজনেরই বহিজীবন এবং অন্তর্জীবন পৃথক সমান্তরাল ধারায় প্রবাহিত হয়। দুই বিবাহিত রমণী নিজেদের সংসার বা স্বামীর সাহচর্যে থেকেও ঘরের বাইরে পা বাড়াতে চায়। কপিলা শেষ পর্যন্ত সব কিছু ছেড়ে কুবেরের সঙ্গে নৌকোয় ওঠে, এ ব্যাপারে কুবেরের পরোক্ষ সমর্থনও ছিল। কিন্তু শশী কখনোই কুসুম সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি, নিজের মনের কাছেও সে পরিষ্কার ছিল না। শশীর সঙ্গে কুসুমের পরিচয় তার বন্ধু পরাণের সঙ্গে তার বিবাহের পর থেকে। পারিবারিক চিকিৎসা উপলক্ষে তাদের বাড়িতে তার যাতায়াত। কিন্তু কখন যেন কুসুমের মনের কাছাকাছি সে চলে আসে। প্রণয়পর্বের সঙ্গে যুক্ত থাকে অভিমান। শশী তাকে ‘পরাণের বৌ’ বলে ডাকলে কুসুমের অভিমান হয়। অসুস্থ মতির শরীর ডাক্তার হিসেবে পরীক্ষা করার সময়ও কুসুমের কথায় খোঁচা থাকে। ছোটবাবুর প্রতি মতির দুর্বলতা দেখা দিলে কুসুমের কণ্ঠে তীব্র তিরস্কার শোনা যায়, “পেটে ভাত জোটে না। গয়লার মুখ্য মেয়ে তুই-ছোটবাবুর তুলনায় তুই ছোটলোক ছাড়া কি।” একথা বলবার সময় কুসুম বোধ হয় ভুলে যায় যে, সে-ও ওই বাড়িরই বৌ। ছোটবাবুর দিকে একই কারণে তারও হাত বাড়ানোয় বাধা আছে। তবে একথাও ঠিক যে, কুসুম তুলনায় ধনী পরিবারের সন্তান। তার স্বামী-শ্বশুরের প্রায় সর্বস্ব তার বাবার কাছে প্রায় সাত বছর ধরে বাঁধা আছে। তাই কুসুমকে শ্বশুরবাড়ির লোকেরাই তাকে সমীহ করে চলে। এই সামাজিক ও আর্থিক পার্থক্যই কুসুমের ব্যক্তিত্ববিকাশের সহায়ক হয়েছে। গাওদিয়ার গ্রামীণ সমাজ বা অনুশাসন তাকে প্রভাবিত করতে পারেনি। তাছাড়া স্বামী পরাণের সমস্ত ব্যাপারে শশী নির্ভরতাও বোধ হয় কুসুমের কাছে শশীর গুরুত্ব বাড়িয়েছে।

‘পদ্মানদীর মাঝি’-র কপিলা এবং ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ উপন্যাসের কুসুম দুই বিবাহিত রমণী স্বামীর সাহচর্যে থেকেও ঘরের বাইরে পা বাড়াতে চায়। শশীর সঙ্গে কুসুমের পরিচয় তার বন্ধু পরাণের সঙ্গে তার বিবাহের পর থেকে। কুসুম ধনী পরিবারের সন্তান, তাই সামাজিক ও আর্থিক পার্থক্যই কুসুমের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক হয়েছে। মানিকের উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলিকে প্রায়ই মনের কথা বলতে শোনা যায়। সমগ্র উপন্যাস জুড়েই কুসুমের নানা রঙের বিচ্ছুরণ। তার ঘনঘন আচরণের পরিবর্তন, মাঝে মাঝেই দুর্বোধ্য হয়ে ওঠা-সবই তো মনের খেলা। শরীর শুধু উপলক্ষ মাত্র।

শশী-কুসুমের সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথম দিকে কুসুম শশীর কাছ থেকে সাড়া পাবার জন্য আকুল প্রতীক্ষায় থাকে। মাঝে মাঝে স্পষ্ট ইঙ্গিতও সে দেয়, “আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোটবাবু?” বাপের বাড়ি যাওয়া ঠেকানোর জন্য ইচ্ছে করে তালপুকুরের ধারে পড়ে গিয়ে হাত ভাঙে এবং কোমরে চোট লাগায়। শশীর কাছে এই ছলনা ধরা পড়ে গেলে সে বলেই ফেলে যে, “সইতে পারি না ছোটবাবু।” শশীর অদর্শন বেশিদিন সহ্য করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু যে মুহূর্তে শশী তাকে উপদেশ দিয়ে সচেতন করতে চায় তখনই কুসুম যেন নিজেকে ফের গুটিয়ে নেয়। এই গুটিয়েপড়া কুসুম তখন যেন দুর্বোধ্য চরিত্র হয়ে পড়ে। সেই দুর্বোধ্যতার আবরণ ভেদ করা শশীর পক্ষেও তখন সম্ভব হয় না। নারী চরিত্রগুলিকে মানিকের উপন্যাসে প্রায়ই মনের কথা বলতে শোনা যায়। তাদের অবচেতন মনই যে তাদের মাঝে মাঝে পরিচালিত করে তা স্বীকার করতেও তাদের দ্বিধা নেই। হেরম্বকে আনন্দ বলেছিল, “মন বুঝি খালি আপনারই খরাপ হতে জানে? সংসারে আর কারো বুঝি মন নেই?” কুবের তো একসময় হতাশ হয়েই ভেবেছে “না, কপিলার মনের হৃদিস পাইবার ভরসা তাহার আর নাই। কখন কী বলিবে, কখন কী করিবে, কিছুই অনুমান করিতে পারা যায় না।” “তোমার মন নাই কুসুম”-শশীর এই স্বগতোক্তিটি বিখ্যাত হয়ে আছে, কিন্তু এটিকে তার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। কারণ সমগ্র উপন্যাসটি জুড়েই তো কুসুমের মনের নানা রঙের বিচ্ছুরণ। তার ঘনঘন আচরণের পরিবর্তন, মাঝে মাঝেই দুর্বোধ্য হয়ে ওঠা-সবই তো মনের খেলা। শরীর উপলক্ষ মাত্র। শশীর কাছে দাঁড়ালে কুসুমের মন চরম বিচলিত হয়ে উঠত। যেদিন সেই মনই নষ্ট হয়ে গেল সেদিন থেকেই যেন কুসুম স্বাভাবিক। তখন সে আর শশীর প্রেমিকা নেই, সে হয়ে ওঠে পরাণের বৌ, “বাকী জীবনটা ভাত রোঁধে ঘরের লোকের সেবা করে কাটিয়ে দেব ভেবেছি—আর কোন আশা নেই, ইচ্ছে নেই, সব ভোঁতা হয়ে গেছে ছোটবাবু। লোকের মুখে মন ভেঙে যাবার কথা শুনতাম। এতদিনে বুঝতে পেরেছি সেটি।” নিখুঁত শিল্পসম্মত মানবিক পরিণতি।

“শশীর চোখ খুঁজিয়া বেড়ায় মানুষ”—এ কথায় সত্যতা আর একবার বোঝা যায় যাদব পণ্ডিতের কাহিনি বর্ণনা প্রসঙ্গে। এই কাহিনিটিকে মানুষের দৃঢ় ও জটিল মনস্তত্ত্বের অসাধারণ প্রকাশ বলে গণ্য করাই যুক্তিসঙ্গত। মানুষের অবচেতন মন তাকে নিয়ে কিরকম খেলা করে, তাকে শেষ পর্যন্ত কোন পরিণতির দিকে নিয়ে যায় যাদবের পরিণতি তারই উদাহরণ। বিদ্যা যাদবের বেশি ছিল না। কিন্তু ধার্মিক এবং অলৌকিক শক্তির অধিকারী হিসেবেই গ্রামে তাঁর প্রতিষ্ঠা। এই শক্তির কোনো প্রত্যক্ষ নিদর্শন আগে দেখা যায় নি, তবে অনেকেই বিশ্বাস করে যে, তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। যাদব নিজে স্পষ্টভাবে তাঁর সিদ্ধিলাভের কথা স্বীকারও করেন না। আবার তাঁকে নিয়ে গ্রামের লোকের উচ্ছাসের কোনো প্রতিবাদও করেন না। এতে তাঁর প্রতি গ্রামবাসীর বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা আরও বাড়ে। বোঝাই যায় যে, এটা যাদবের এক ধরনের মোহ, এই মোহটুকুই তাঁর গৌরব। আর যে কোনো মূল্যে এই গৌরবটুকু তিনি টিকিয়ে রাখতে চান।

যাদব নিজে এমন একটা ভাণ করেন যে, জীবন মরণ তার কাছে যেন তুচ্ছ। অথচ, শশীর মোহমুক্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার মৃত্যুভয় ধরা পড়ে যায়। সাপের কামড় এড়ানোর জন্য তিনি লাঠির শব্দ করে পথ চলেন। যাদব নিজেকে সুযবিজ্ঞানে বিশ্বাসী বলে ঘোষণা করেন, শশীর চিকিৎসাবিজ্ঞান তাঁর কাছে পরিত্যজ্য। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই

শশীর প্রতি প্রবল স্নেহ ও মমতা। বিশেষ করে যাদবের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হল শশীর কাছ থেকে তার অলৌকিক শক্তির স্বীকৃতি আদায় করা। এই গৃহী সাধক লোকের ভীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র সিদ্ধপুরুষ বলে তাঁর চারদিকে নাম রটে গেছে, কিন্তু শশীর আস্থা তিনি লাভ করেন নি। আসলে শশী কোনো কিছুকে যাচাই না করে গ্রহণ করতে রাজি নয়। তাই যাদবের অনেক আচরণের মধ্যকার ফাঁকটি সে যেন ধরে ফেলে। যাদবের জনমত সম্পর্কে আপাত নিরাসক্তি শশীর কাছে লোকের মনে শ্রদ্ধা ও ভয় জাগানোর কৌশল বলে মনে হয়। শশীর মনোভাব যাদবেরও জানা। তাই বোধ তার বিশ্বাস অর্জনের জন্যই তিনি রথের দিন স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করবার কথা ঘোষণা করে দেন। এটি লোকমুখে পল্লবিত হতে হতে দাঁড়িয়ে যায় আগামী রথের দিন। এই কথা ছড়াতে ছড়াতে যেন প্রকৃতই গণ হিস্টরিয়া তৈরি হয়। যাদবের আর তখন ফেরার উপায় থাকে না। কেবল চিকিৎসক শশীর চোখেই ধরা পড়ে যে, যাদব পণ্ডিত এবং পাগলদিদি নির্দিষ্ট দিনেই দেহত্যাগ করবেন বটে কিন্তু তাদের শরীরে আফিওর বিষক্রিয়ার লক্ষণ স্পষ্ট। এই ঘটনার বিশ্লেষণেও মানিক স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দেন। মানব-মনস্তত্ত্বের জটিলতাই তাঁর কাছে গুরুত্ব পায়। তাঁর শিল্পীসত্তা এক্ষেত্রেও নিজের পথ ধরেই চলে। শশীকে দিয়ে যাদবের মৃত্যুর আসল কারণটি গ্রামের মানুষকে জানিয়ে দিয়ে সস্তা হাততালি পাবার প্রলোভন তিনি অনায়াসে ত্যাগ করেন। তাঁর জানা আছে যে, জীবন কখনো সোজা পথ ধরে চলে না। তাই তিনি নিজস্ব ভঙ্গিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, “সত্যি মিথ্যায় জড়ানো জগৎ। মিথ্যারও মহত্ত্ব আছে। হাজার হাজার মানুষকে পাগল করিয়া দিতে পারে মিথ্যার মোহ।” সাধারণ মানুষ মিথ্যাকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে ভালোবাসে। যা ঘটবার নয়, যা চোখে দেখা যায় না তাই দেখবার জন্য তারা উদগ্রীব। ‘বিসর্জন’ নাটকের রঘুপতি এই গণ-মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে জয়সিংহকে আক্ষেপ করে বলেছিল যে, এরা, “চোখে চাহে দেখিবারে চোখে যাহা দেখিবার নয়।” গাওদিয়ার লোকেরা সত্যিই বিশ্বাস করেছিল যে, যাদব রথের দিনে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করবেন। স্বেচ্ছামৃত্যু যে বরণ করা যায় না, এই সত্যটি মানতে তারা রাজি নয়। তাই যাদব আফিও খেয়ে নিজের অলৌকিক শক্তির অস্তিত্ব তাদের কাছে প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন।

৮.২.৮.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

- ১। কুসুম চরিত্রের মানবিক পরিণতি কোথায়?
- ২। কুসুমের স্বামীর নাম কি?
- ৩। ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ অনুসরণে কুসুম চরিত্রটি বিশ্লেষণ করো।
- ৪। ‘সুখী দাম্পত্যজীবনের অনুপস্থিতি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের সাধারণ বৈশিষ্ট্য’—এই বিশিষ্টতা ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ উপন্যাসকে কতখানি অনন্যতা দান করেছে তা উপন্যাসের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দাও।

৮.২.৮.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

পর্যায় গ্রন্থ-২ এর প্রতিটি এককে (১-৪) নিম্নোক্ত বইগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

- ১। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
- ২। বাংলা উপন্যাসের কথা—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
- ৩। আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস—অশ্রুকুমার সিকদার।
- ৪। অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—যুগান্তর চক্রবর্তী সম্পাদিত
- ৫। কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

পর্যায় গ্রন্থ - ৩

আরণ্যক

একক ৯

আরণ্যক লেখক পরিচয়

বিন্যাসক্রম

৮.৩.৯.১ : আরণ্যক লেখক পরিচয়

৮.৩.৯.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৮.৩.৯.১ : আরণ্যক লেখক পরিচয়

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২৩ সালে উত্তর কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার অক্ষয়কুমার ঘোষের বাড়ির একান্ত সচিব ও গৃহশিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পরের বছর তিনি অক্ষয়বাবুর ভাগলপুরে স্থিত পাথুরিয়াঘাটার জমিদারি এস্টেটে সহকারী ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হন। এই জমিদারিতে বিভূতিভূষণ ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত বহাল ছিলেন। পাথুরিয়া এস্টেটের সহকারী ম্যানেজার হিসেবে ইসলামপুর এবং আজমাবাদের আরণ্যক পরিবেশে চার বছর থাকার সময় বিভূতিভূষণ ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া জেলার বিস্তীর্ণ আরণ্যক অঞ্চলের প্রকৃতির

বিচিত্র রূপ এবং সাধারণ নারী-পুরুষের সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, তাই তাঁকে ‘আরণ্যক’ রচনার পরিকল্পনায় অনুপ্রাণিত করে। তাঁর লেখা দিনলিপিতে আছে—“এই জঙ্গলের জীবন নিয়ে একটা কিছু লিখবো—একটা কঠিন শৈর্যপূর্ণ গতিশীল, ব্রাত্য জীবনের ছবি। এই বন, নির্জনতা, ঘোড়ায় চড়া, পথ হারানো অন্ধকার— এই নির্জনে জঙ্গলের মধ্যে খুবড়ী বেঁধে থাকা। মাঝে মাঝে যেমন আজ গভীর বনের নির্জনতা ভেদ করে যে সুঁড়িপথটা ভিটেটোলার বাগানের দিকে চলে গিয়েছে দেখা গেল, ঐ রকম সুঁড়িপথ এক বাথান থেকে আর এক

বিভূতিভূষণ চারবছর ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া জেলার বিস্তীর্ণ আরণ্যক অঞ্চলের প্রকৃতির বিচিত্র রূপ এবং সাধারণ নারীপুরুষদের সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, তাই ‘আরণ্যক’ রচনার পরিকল্পনায় অনুপ্রাণিত করেন। উপন্যাসের নায়ক সত্যচরণের নাগরিক জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। অরণ্যময় জীবন ও প্রকৃতি এবং সাধারণ মানুষদের স্মৃতি সত্যচরণকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। এমনকি জীবন ও জগৎ বিভূতিভূষণের রচনাত্মক আত্মকৌশল যা তাঁর সামগ্রিক সত্ত্বাকে বিকশিত করেছে।

বাথানে যাচ্ছে—পথ হারানো, রাত্রের অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে ঘোড়া করে যোরা, এ দেশের লোকের দারিদ্র্য, সরলতা, এই virile active life, এই সন্ধ্যায় অন্ধকারে ভরা গভীর বন, ঝাউবনের ছবি—এই সব”। ‘আরণ্যক’ উপন্যাসের পটভূমি যে বাস্তব, তা তিনি সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন—“আরণ্যকের পটভূমি সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়। কুশী নদীর অপর পারে এইরূপ দিগন্ত বিস্তীর্ণ অরণ্য প্রান্তর পূর্বে ছিল, এখনও আছে। দক্ষিণ ভাগলপুর ও গয়া জেলার বনপাহাড় তো বিখ্যাত”।

ভাগলপুরে অবস্থানের সময় অরণ্য জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা বিভূতিভূষণ তাঁর ‘আরণ্যক’ উপন্যাসে চিত্রায়িত করেছেন। ‘স্মৃতির রেখা’ দিনলিপিতে উপন্যাসের বহু ঘটনার সমাবেশ ও উৎস লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ‘আরণ্যক’-এর একটি গ্রাম্যমেলায় চিত্র। উপন্যাসে বর্ণিত মেলার ইজারাদার ব্রহ্মা মাহাতো, দেহাতী মেয়েদের কান্না বা সত্য চরণের মেলায় একটি লোকের বিনম্র মুখশ্রীতে মুগ্ধচিত্ততা বা মুগ্ধ প্রাপ্তরে ঘোড়া ছুটিয়ে যাওয়া। সাহিত্য ও ভ্রমণকাহিনীর অনুরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় সম্পর্কে লেখকের বিশেষ কৌতূহল ও চর্চা ছিল। প্রাচীন ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূবিদ্যা, বিশ্বতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বিভূতিভূষণের আগ্রহ ও অনুশীলন উপন্যাসের বিভিন্ন অংশের চিন্তাভাবনায় প্রতিফলিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ : “অতীত কোন দিনে, এই যেখানে বসিয়া আছি, এখানে ছিল মহাসমুদ্র-প্রাচীন সেই মহাসমুদ্রের ঢেউ আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িত ক্যান্ডিয়ান যুগের এই বালুময় তীরে—এখন যাহা বিরাট পর্বতে পরিণত হইয়াছে। এই ঘন অরণ্যানির মধ্যে বসিয়া অতীত যুগের সেই নীল সমুদ্রের স্বপ্ন দেখিতাম।....এই বালুপ্রান্তরের শৈলচূড়ায় সেই বিস্মৃত অতীতের মহাসমুদ্রের বিস্কুর উর্মিমালার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে—অতি স্পষ্ট সে চিহ্ন—ভূতত্ত্ববিদদের চোখে পড়ে। মানুষ তখন ছিল না, এ ধরণের গাছপালাও ছিল না। যে ধরণের গাছপালা জীবজন্তু ছিল, পাথরের বৃকে তারা তাদের ছাপ রাখিয়া গিয়াছে, যে কোনো মিউজ্যমে গেলে দেখা যায়”। এই দার্শনিক ও তাত্ত্বিক ভাবনার উৎস বিধৃত হয়েছে ‘স্মৃতির রেখায়’—প্রাচীন যুগের অধুনাতমলুপ্ত যে মহাসমুদ্র প্রাচীন পৃথিবীর পৃষ্ঠে হাজার হাজার লুপ্ত জন্তু বৃকে করে প্রবাহিত সেই প্রাচীন মহাসমুদ্রের তীরে যেন এরা চূপ করে বসে থাকতেন। তাদের মাথায় উপরকারের নীল আকাশে অহরহ পরিবর্তনশীল মেঘস্তুপের মত চঞ্চল এই বিশ্ব প্রাচীন আদিম যুগের লতাপাতা, জীবজন্তুসহ তাদের চারধারে এমনি করেই মায়াপুরী রচনা করে রইত।”

বিভূতিভূষণের অপর একটি ডায়েরি-জাতীয় রচনা ‘উৎকর্ণ’-এর মধ্যে অরণ্যের সৌন্দর্য যে কীভাবে তাঁর মননশীল অনুভূতি রোমান্টিকতায় উদ্বেলিত হয়েছিল তার পরিচয় পাই এইভাবে —“১৯২৭ সালে আমি মুক্ত পথিক, পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই অপ্রত্যাশিত অজানার সন্ধানে—চোখে মায়ার ঘোর, সৌন্দর্যের ঘোর, এখনও আমার সে ঘোর কাটে নি, বরং অনেক—অনেক ঘনীভূত হয়েছে”। অরণ্যবাসের সময় জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রির সৌন্দর্য উপভোগের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা তাঁর স্মৃতিচারণজাতীয় রচনা ‘তৃণাকুর’-এ দৃষ্ট হয়” আরও মনে পড়লো ইসমাইলপুরের জ্যোৎস্না রাত্রির সে অপার্থিব, Weired beauty....সেই এক পূর্ণিমা-রাত্রির শুভ্র জ্যোৎস্নার ঢেউয়ের নীচে আকন্দ গাছ... স্বপ্নে যেন দেখি” ইত্যাদি। আলোচ্য উপন্যাসে এইভাবে রূপান্তরিত হয়েছে : “নিঃশব্দ অরণ্যভূমি, নিস্তরঙ্গ জনহীন নিশীথ রাত্রি। সে জ্যোৎস্না-রাত্রির বর্ণনা নাই। কখনও সেরকম ছায়াবিহীন জ্যোৎস্না জীবনে দেখি নাই। এখানে খুব বড় বড় গাছ নাই, ছোটখাটো বনঝাড় ও কাশবন—তাহাতে তেমন ছায়া হয় না। চকচকে সাদা বালি মিশানো জমি ও শীতের রৌদ্রে অর্ধশুষ্ক কাশবনে জ্যোৎস্না পড়িয়া এমন এক অপার্থিব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা দেখিলে মনে কেমন ভয় হয়। মনে কেমন যেন একটা উদাস বাঁধনহীন মুগ্ধভাব—মন ছ ছ করিয়া ওঠে, চারিধারে চাহিয়া সেই নীরব নিশীথের জ্যোৎস্নাভরা আকাশতলে দাঁড়াইয়া মনে হইল এক অজানা, পরীরাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি—মানুষের কোন নিয়ম এখানে খাটিবে না।”

আবার, উপন্যাসের নায়ক সত্যচরণের নাগরিক জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতার সাদৃশ্য পাই ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী ‘স্মৃতির রেখা’র দিনলিপিতে—“অভিজ্ঞতায় একটা বুঝলাম, আজ স্থানটা নতুন, ভাল লাগে না, মন বসে না, যতদিন যায় তার সঙ্গে স্মৃতির যোগ হতে থাকে, ততই সেটা মধুর হয়ে ওঠে। এই ইসমাইলপুর ১৯২৪ সালে আন্দামান দ্বীপের মত ঠেকতো। আজমাবাদকে তো মনে হোত (১৯২৫

সালেও) সভ্যজগতের প্রাপ্ত ভাগ—জঙ্গলে ভরা বেলজিয়াম কঙ্গোর কোন নির্জন উপনিবেশ—আজকাল সেই আজমাবাদ, এই ইসমাইলপুর ছেড়ে যেতে হবে বলে কষ্ট হচ্ছে।” অনুরূপভাবে ‘আরণ্যক’—এর নায়ক সত্যচরণের অরণ্য বাসকালে তার মানসিক অবস্থার বর্ণনা এইরকম—“প্রথম দিন দশেক কি কষ্টে যে কাটিল! কতবার মনে হইল চাকুরীতে দরকার নাই, এখানে হাঁপাইয়া মরার চেয়ে আধপেটা খাইয়া কলিকাতায় থাকা ভাল। অবিনাশের অনুরোধে কি ভুলই করিয়াছি এই জনহীন জঙ্গলে আসিয়া, এ জীবন আমার জন্য নয়।” সেই সত্যচরণই পর এই অরণ্যময় জীবন ও প্রকৃতি এবং সেখানকার অতি সাধারণ মানুষদের স্মৃতি তাকে বেদনায় ভারাক্রান্ত করে তুলেছে।

‘আরণ্যক’ উপন্যাসে চিত্রায়িত চরিত্রগুলি অর্থাৎ রামচন্দ্র আমীন, রাসবিহারী সিং, গোষ্ঠবাবু মুখুরী, ছটু সিং, জয়পাল কুমার, আসরাফি টিঙেল, পণ্ডিত মটুকনাথ, রাখাল ডাক্তারের স্ত্রী—লেখকের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই অঙ্কিত। “স্মৃতির রেখায় উক্ত নামেই চরিত্রগুলির বিবরণ থেকে আমরা বুঝতে পারি। দিনলিপিতে মটুকনাথের উল্লেখ আছে এইভাবে—“রাখালবাবু মারা গিয়েছেন শুনে বৈকালে ঘোড়া নিয়ে তার বাড়ী তিনটাঙাতে দেখতে গেলাম।....এর ওর বাড়ীর সামনে দিয়ে একটা বাড়ীর কাছে এলে, একটা ফর্সা মতো ছেলে বললে, ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে কেউ নেই। সেখানে দেখি, মটুকনাথ পণ্ডিত কি করছে। সেই মটুকনাথ—যে তৌজির দিন কাছারি গিয়ে কানের পোকা বার করবার যোগাড় করেছিল।” আর ১৯২৮ সালের ৭ই জানুয়ারীর দিনলিপিতে দেখি—“বাঁধ ছাড়িয়েই এক দৌড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে একেবারে ঘোড়া নিয়ে এলাম রাসবিহারী সিং-এর টোলার অশ্বখ গাছটার কাছ পর্যন্ত।” এছাড়াও পাই, “ঈশ্বর বা পূজো করতে এল, আমি ও গোষ্ঠবাবু ঠাকুর সাজালাম,” বা রামচন্দ্র সিং আমিনকে আমার বড় ভাল লাগে। এরা জঙ্গলের ধারে থাকে,”—“ছটুসিং এর পাঠানো পেয়ারা খাওয়া গেল” ইত্যাদি।

পরবর্তীকালে ডায়েরি জাতীয় রচনা ‘উৎকর্ণ’-এ লেখক তাঁর গ্রামে প্রকৃতির যে নিবিড় সান্নিধ্য এবং তার রূপ-রস -গন্ধের স্পর্শ অনুভব করেছিলেন, ‘আরণ্যক’-এ সেটিও আমাদের কৌতুহল উদ্বেক করে—“আজ বিকেলে কুঠীর মাঠে গিয়ে সেই ঝোপটার পাশে ঘন অপরাহ্নের ছায়ায় ঘাসের ওপর একটা মোটা চাদর পেতে বলে, কেঁয়োবাঁকা ফুলের সুঘ্রাণের মধ্যে ‘আরণ্যক’-এর একটা অধ্যায়ের খসড়া করছিলাম। কি নীরব শান্তি, কি পাখীর কাকলী, কি বনফুলের সুবাস।” লেখক একটি বর্ণনা দিচ্ছেন সুন্দরভাবে—“আজও বিকেল তিনটার সময় কুঠীর মাঠের জলার ধারে সেই ঝোপটাতে এসে বসে ‘আরণ্যক’—এর একটা অধ্যায় লিখি। লেখবার জন্যেই এই জায়গাটাতে এসেছি। ভারী সুন্দর বন-কুসুমের গন্ধটা—চাঁপা ফুলের গন্ধটাই বেশী। আমার মাথার উপরে থোকা থোকা ফুলে ভরা ডালটা দুলচে, এখন রোদ রাঙা হয়ে এসেচে যখন এটা লিখি, জলার পাখীর দল কি অবাধ কুজন শুরু করেছে, গন্ধটা আরও ঘন হয়েছে। ওপরে গাছগুলোর বিচিত্র ও বিভিন্ন ধরনের শীর্ষদেশে রাঙা রোদ পড়ে কি সুন্দর দেখতে হয়েছে।”

জীবন ও জগৎ বিভূতিভূষণের রচনাধ্বার আত্মকৌশল যা তাঁর সামগ্রিক সত্ত্বাকে বিকশিত করেছে। “বিভূতিভূষণের অনন্ত-ভাবনার একদিকে যেমন দিগন্তহারা দেশ, অপরদিকে তেমনি উধাও কাল। দিশাহারা দেশের চেয়ে কালের চেতনাকেই বিভূতিভূষণ অতিরিক্ত কৌতুহলাক্রান্ত।” জীবনের মধ্য দিয়ে জাগতিক চেতনা তিনি উপন্যাসের মধ্যে যত্রতত্র উল্লেখ করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ‘আরণ্যক’-এর পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে—“এই মুক্ত প্রান্তরের সীমাহীনতার মধ্যে কোন দেবতার স্বপ্ন যে দেখিয়াছি। এই মেঘ, এই সন্ধ্যা, এই বন, কোলাহলরত শিয়ালের দল, সরস্বতী হ্রদের জলজ পুষ্প, মঞ্চী, রাজপাঁড়ে, ভানুমতী, মহালিখারূপের পাহাড়, সেই দরিদ্র গাঁড়

পরিবার, আকাশ, বোম সবাই তাঁর সুমহতী কল্পনায় একদিন ছিল বীজরূপে নিহিত-তাঁরই আশীর্বাদ আজিকার এই নবনীল নীরদমালার মতই সমুদয় বিশ্বকে অস্তিত্বের অমৃতধারায় সিক্ত করিতেছে—এই বর্ষা-সন্ধ্যা তাঁরই প্রকাশ, এই মুক্ত জীবনাননগ তাঁরই বাণী, অন্তরের অন্তরে যে-বাণী মানুষকে সচেতন করিয়া তোলে। সে দেবতাকে ভয় করিবার কিছুই নাই— এই সুবিশাল ফুলকিয়া বইহারের চেয়েও, ঐ বিশাল মেঘভরা আকাশের চেয়েও সীমাহীন...”

প্রকৃতপক্ষে, ‘আরণ্যক’-এ বিভূতিভূষণের ব্যক্তি ও শিল্পীসত্তা—এই দ্বৈতমিলন সংঘটিত হয়েছে। আজমাবাদ-ইসলামপুরে অরণ্যবাসকালীন ব্যক্তিগত কাহিনী তিনি উপন্যাসে আত্মস্মৃতিমূলক আঙ্গিকে বিধৃত করেছেন। ফলস্বরূপ ‘আরণ্যক’ উপন্যাসটি বিষয়বস্তুর সঙ্গে রূপকল্পনার নিবিড় সঙ্গতিতে পরিপূর্ণ ও সার্থক হয়ে উঠেছে।

৮.৩.৯.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

- ১। আরণ্যক উপন্যাসটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
- ২। বিভূতিভূষণ কোথাকার প্রকৃতির রূপকে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন?
- ৩। ‘আরণ্যক’ উপন্যাসটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

বিভূতিভূষণের নিসর্গচেতনা ও আরণ্যক

বিন্যাসক্রম

৮.৩.১০.১ : বিভূতিভূষণের নিসর্গচেতনা ও আরণ্যক

৮.৩.১০.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৮.৩.১০.১ : বিভূতিভূষণের নিসর্গচেতনা ও আরণ্যক

বিভূতিভূষণের নিসর্গচেতনা সম্পর্কে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন : “বিভূতিভূষণ আর সমস্ত সার্থক-কর্ম দিব্য দৃষ্টিসম্পন্ন লেখকের মত এই দুইটি প্রধান বিষয় বা বস্তু নিয়েই তাঁর যা কিছু বলবার বলে গিয়েছেন। সে দুইটি বিষয় হচ্ছে—(১) প্রকৃতি, আর (২) মানুষ। Nature and Man : মানুষের অনুসন্ধান বা জিজ্ঞাসা, যা পরিদৃশ্যমান জগতের মধ্যেই সীমিত, তা এই দুইটির বাইরে আর কোথাও ঠাঁই পায় না। প্রকৃতি আর মানুষের পিছনে, তার আধার বা পটভূমিকারূপে অবস্থিত একটা Ultimate Reality বা পরম বা চরম সত্তার সম্বন্ধে আমাদের সকলের মনের গভীরে একটা আকাঙ্ক্ষা বা আগ্রহ আছে। আবার সেই আকাঙ্ক্ষা বা আগ্রহ অনেকের মনে বিশ্বপ্রপঞ্চের সঙ্গে বিজড়িত, বিশ্বজগৎকে অতিক্রম করে আর সঙ্গে সঙ্গে তাতে অন্তর্নিহিত থেকে বিদ্যমান আর কার্যকর এক ঐশীশক্তি সম্বন্ধে পূর্ণ বিশ্বাস বা আস্থার রূপ গ্রহণ করে থাকে। ...

‘আরণ্যক’-এর প্রকৃতি আমাদের পরিদৃশ্যমান জগত থেকে স্বতন্ত্র। উপন্যাসের দুটি প্রধান বিষয় প্রকৃতি আর মানুষ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। গ্রাম বাঙলার প্রকৃতির বাস্তব অনুপঞ্জকে রোমান্টিক সৌন্দর্যচেতনা, কল্পনা ও নিগূঢ় আত্মিক অনুভূতিতে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সেটিই বিভূতিভূষণের অভিপ্রেত। বাংলা কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রোত্তরের গোষ্ঠীর মধ্যে বিভূতিভূষণই রবীন্দ্র-প্রভাবিত হন সর্বাধিক পরিমাণে। প্রকৃতি ও মানুষের মেলবন্ধনের ছবি বিভূতিভূষণের উপন্যাসে যেমন লক্ষ্য করা যায়, তেমনি ইংরেজী রোমান্টিক কবি ওয়ার্ডস ওয়ার্থের মধ্যেও প্রভাবিত। যাইহোক আরণ্যক উপন্যাসে প্রকৃতি মুখ্য, মানুষ গৌণরূপে বিরাজিত।

বিভূতিভূষণের চিন্তা আর অনুভূতি বিশ্বপ্রপঞ্চের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে, পৃথিবীর সঙ্গে, ভূমিশ্রীর সঙ্গে যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। শিশুকাল থেকেই তিনি বাঙলার পল্লীশ্রীর মধ্যে এমনভাবে মানুষ হয়েছিলেন। যে, সত্যিই তিনি নিজের সত্তাকে নিজের আত্মাকে বনের মধ্যে গাছপালা নদনদী পাহাড় পর্বত ঝরনাটিলার মধ্যে যেন ঢেলে দিয়েছিলেন।” দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর অপূর্ব বই ‘রামায়ণী কথায় রামায়ণ অবলম্বন করে সীতার সম্বন্ধে যে লিখেছিলেন “বন-দর্শন বিস্মিতা প্রকৃতি-প্রিয়া সীতা হরিৎছন্দ বনতরুরাজি দেখিয়া বনোন্মাদিনী হইয়া পড়িলেন।’ আমরা ‘দিব্যোন্মাদ’ শব্দটির সঙ্গে পরিচিত, তার অর্থ আর দ্যোতনা বুঝি, কিন্তু ‘বনোন্মাদ’, এই শব্দটিকে ‘দিব্যোন্মাদ’ শব্দের সঙ্গে এই পর্যায়ের-ই বলতে হয়, অরণ্যানীর সৌন্দর্যে, বনস্পতি-বৃক্ষ-লতা-গুল্ম-পত্র-পুষ্পের মধ্যে যে রসানুভবের উৎস আছে, সাধারণ জীবনের মধ্যেই তার উপলব্ধি আর সেইজন্য অপার্থিব আনন্দের এক পূর্ণ অনুভূতি, আর সেই অনুভূতির মধ্যে বিশ্বপ্রপঞ্চের অন্তরালে

অবস্থিত পরমসত্তার আভাস—এ সমস্ত যেন ‘বনোন্মাদ’ শব্দটির মধ্যেই নিহিত আছে। বিভূতিভূষণকে এই ভাবের বনজঙ্গল, গাছপালা, তরুলতা, ফুলফল, জলপাহাড় নিয়ে সারাক্ষণ মেতে থাকা, একপ্রকারের দিব্যোন্মাদে ভরপুর আত্মভোলা মানুষ ছাড়া আর কিছু আমার মনে হয় না। মানুষের প্রতি তাঁর দরদ অসীম, কিন্তু সেই মানুষকে তিনি তার প্রকৃতির আবেষ্টনী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে অভ্যস্ত নন,”... এবং” অবশ্য স্থূলভাবে দেখলেও, আমরা বলবো বিভূতিভূষণের, সাহিত্যিক প্রতিভার মুখ্যকথা হচ্ছে প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর একটা পূর্ণ আর সমগ্র অনুভূতি। ভাল-মন্দ সুন্দর অসুন্দর আলো—অন্ধকার রমণীয়তা ভীষণতা সব কিছু নিয়ে আমাদের মহীয়সী মহা সুবিস্তীর্ণ পৃথিবী, বিশ্বন্ধরা ধরিত্রী, আর ধরিত্রীর কোলে সকলের উৎপত্তিস্থল মাতা ভূমির কোলে যে গাছপালা, বন-অরণ্য নদ-নদী পাহাড়-পর্বত খদ্-টিলা পশু পক্ষী আর বনবাসী মানুষ রয়েছে, সে সমস্তের সম্বন্ধে তাঁর মনে কে সদা-জাগ্রত অনুভূতি আর আনন্দ, সে সমস্তের প্রতি তাঁর প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি আর সহানুভূতিপূর্ণ অবলোকন”।

‘আরণ্যক’-এর প্রকৃতি আমাদের পরিদৃশ্যমান জগত থেকে স্বতন্ত্র। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদেই লেখকের বিবৃতি আছে...“এত নিঃস্বপ্ন স্থানের কল্পনাও কোনদিন করি নাই। দিনের পর দিন যায়, পূর্বাকাশে সূর্যের উদয় দেখি দূরের পাহাড় ও জঙ্গলের মাথায়, আবার সন্ধ্যায় সমগ্র বনঝাট ও দীর্ঘঘাসের বনশীর্ষে সিঁদুরের রঙে রাঙাইয়া সূর্যকে ডুবিয়া যাইতে দেখি-ইহার মধ্যে শীতকালের যে এগার ঘণ্টা ব্যাপী দিন, তা যেন খাঁ খাঁ করে শূন্য, কি করিয়া তাহা পুরাইব, প্রথম প্রথম সেইটা আমার পক্ষে হইল মহা সমস্যা।” গ্রাম বাঙলার প্রকৃতির বাস্তব অনুপুঙ্খকে যে রোমাণ্টিক সৌন্দর্যচেতনা, কল্পনা ও নিগূঢ় আত্মিক অনুভূতিতে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সেটিই বিভূতিভূষণের অভিপ্রেত।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল ‘স্মৃতির রেখা’র দিনলিপিতে ভাগলপুরে থাকার সময় অরণ্যজগতের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের দিনগুলিতে বিভূতিভূষণ নিসর্গচেতনার মূল বৈশিষ্ট্যকে এইভাবে দেখেছেন, “জগতের অসংখ্য আনন্দের ভাণ্ডার আছে। গাছপালা, ফুল, পাখী, উদার মাঠঘাট, সময় নক্ষত্র, সন্ধ্যায়, জ্যোৎস্না রাত্রি। অন্তঃসূর্যের আলোয় রাঙা নদীতীর, অন্ধকার নক্ষত্রময়ী উদার শূন্য—এসব জিনিস থেকে এমন সব বিপুল, অব্যক্ত আনন্দ, অনন্তের উদার মহিমা প্রাণে আসতে পারে সহস্র বৎসর ধরে তুচ্ছ জাগতিক বস্তু নিয়ে মত্ত থাকলেও সে বিরাট, অসীম শান্ত উল্লাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন জ্ঞান পৌঁছায় না।” অন্যত্র বিভূতিভূষণ যখন প্রকৃতির রূপবর্ণনা করেন, তখন তা হয়ে ওঠে অসীমের ধ্যান—“ওপারের বটেশ্বরের পাহাড়টা কি অপূর্ব নীলরং দেখাচ্ছে। ডানদিকে লাল রং-য়ের অস্ত-আকাশ-উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে একা। সীমাহীন প্রান্তর, ফুলেভরা সবুজ কাশবন, অস্ত-আকাশে রক্তমেঘ নীল পাহাড়, ঢালু দুর্বাঘাসের মাঠ, ধুতুরাফুলের ঝোপ, পড় পাকুড় গাছটার তলায় হলুদ-রাঙা, জরদা রং-এর সন্ধ্যামণি ফুলের বন, এদিকে ওদিকে পাখী ডাকছে, ক্ষেতে গরু চরছে-বাঁধের নীচে জলের ধারে বকের দল বসে আছে, সিঁক খোলা মাঠের সান্ধ্য বায়ু—মনটা যেন এই অপূর্ব সীমাহীনতার মধ্যে, দূরপ্রসারী শ্যামল প্রান্তরের মধ্যে ছড়িয়ে গেল।”

মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় যোগসামিধ্য বাংলাসাহিত্যে সাফল্য ও ব্যাপ্তিতে রবীন্দ্রনাথ অনন্য হলেও বিহারীলালই পথ প্রদর্শক। বিহারীলাল প্রদর্শিত পথেই রবীন্দ্রনাথ যেমন, তেমনি রবীন্দ্রোত্তর কবিগোষ্ঠী এই ধারা অনুসরণ করেন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। বাংলা কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রোত্তর গোষ্ঠীর মধ্যে বিভূতিভূষণই রবীন্দ্র-প্রভাবিত হন সর্বাধিক পরিমাণে। “বিভূতিভূষণ রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির মধ্যে যে বিপুলতার ও রহস্যের সন্ধান পেয়েছেন, সে সন্ধান বিভূতিভূষণেরও প্রকৃতিবোধের অন্যতম উৎস-সন্ধান। ‘আরণ্যক’ গ্রন্থের অষ্টম পরিচ্ছেদে প্রকৃতির

বিশালতা ও রহস্যময়তার চিত্রকল্প আমরা লক্ষ্য করি—“যে কথাটা বার বার নানাভাবে বলিবার চেষ্টা করিতেছি কিন্তু কোনবারই ঠিকমত বুঝাইতে পারিতেছি না, সেটা হইতেছে এই প্রকৃতির একটা রহস্যময় অসীমতার, দুরধিগম্যতার, বিরাটত্বের ও ভয়াল গা-ছম্ ছম্ করানো সৌন্দর্যের দিকটা....। জনশূন্য বিশাল লবটুলিয়া বইহারের দিগন্ত-ব্যাপী দীর্ঘ ঘন ঝাউ ও কাশের বনে নিস্তব্ধ অপরাহ্নে একা ঘোড়ার উপর বসিয়া এখানকার প্রকৃতির এই রূপ আমার সারা মনকে অসীম রহস্যানুভূতিতে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে, কখনও তাহা আসিয়াছে ভয়ের রূপে, কখনও আসিয়াছে একটা নিস্পৃহ, উদাস, গম্ভীর মনোভাবের রূপে, কখনও আসিয়াছে কত মধুময় স্বপ্ন, দেশ বিদেশের নরনারীর বেদনার রূপে। সে যেন খুব উচ্চদরের নীরব সঙ্গীত-নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোর তালে, জ্যোৎস্নারাত্রের অবাস্তবতায়, ঝিল্লীর তানে, ধাবমান উল্কার অগ্নিপুচ্ছের জ্যোতিতে তার লয়-সঙ্গতি।”

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মেলবন্ধন বিভূতিভূষণের উপন্যাসে যেমন আমরা লক্ষ্য করি, ইংরেজী রোমান্টিক কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মধ্যেও ঐ একই সরের স্পর্শ পাই। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কল্পনায় মানুষের বসতির পাশে যে সঙ্গীত ধ্বনিত হচ্ছে তা যেমনই মধুর, তেমনি বিষাদঘন। 'Lucy Gray' কবিতাংশে আছে—

"The Sweetest that ever grew
Beside a human door."

আবার প্রকৃতির মধ্যেও তিনি এই গান শুনেছেন,

" I have learned
To look on nature, not as in the hour
of thoughtless youth, but hearing often times
The still, and music of humanity."

উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও বৈপরীত্যও লক্ষ্য করা যায়। বিভূতিভূষণের কাছে প্রকৃতি এক পরম বিস্ময়ের, অপরদিকে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের দৃষ্টিতে প্রকৃতি কখনও হয়ে উঠেছে নীতিবাদী শিক্ষক। নৈসর্গিক চেতনাবাদীর মত বিভূতিভূষণ অরণ্যপ্রান্তর ও গাছপালার বিশদ বিবরণ বর্ণনা করেছেন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থে তা সত্যিই দুর্লভ। তিনি তাঁর দিনলিপিতে (তৃণাকুর) লিখেছেন—“এই প্রকৃতির সঙ্গে, পাখীর গানের সঙ্গে মানুষের সুখদুঃখের যোগ আছে বলেই এত ভাল লাগে।” ইংরেজী সাহিত্যে হাডসনও বলেছেন যে, আকাশ, মাটি, নক্ষত্র, পশুপক্ষী কোনো কিছুই তাঁর কাছে অপরিচিত নয়। ‘আরণ্যক’-এ সরস্বতী কুণ্ডীর তীরের বর্ণনায় বিভূতিভূষণ যে নিসর্গ চিত্র অঙ্কন করেছেন, হাডসনও Green Mansions-এ অরণ্য প্রকৃতির চিত্র সুন্দরভাবে চিত্রায়িত করেছেন। এ বিষয়ে বিভূতিভূষণ ও হাডসন সমগোত্রীয়। ‘আরণ্যক’-এ প্রকৃতির রক্ষক রূপ কোথাও কোথাও দেখা গেলেও সাধারণভাবে সেই প্রকৃতি কোমল মধুরে পরিণত হয়েছে। “বিভূতিভূষণের সাহিত্যে যেমন সৌদালিফুল, শিমুল, ডাঁসা খেজুর, সোনাডাঙা মাঠ, বৌ কথা কও, পাপিয়া— জীবনানন্দের কবিতায় তেমনি হিজলের ছায়া, বটের লাল ফল, ঘাস, রোদ, মাছরাঙা, বুনোহাঁস প্রভৃতির ভিড়। রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের ‘মৃত্যুর আগে’ কবিতাটি পড়ে বলেছিলেন, চিত্রময়তাই তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতির এই চিত্ররূপময়তার ব্যাপারে বিভূতিভূষণের সঙ্গে জীবনানন্দের মিল আছে এবং এই মিল চিত্রের রূপের শুধু নয় সংগীতেরও মহলে।” ‘উৎকর্ণ’-এর একটি অংশে আছে—এই বিরাট বিশ্বপ্রকৃতি হৃদয়হীন নয়, তা মানুষকে ভালবাসে, দয়া করে, দুঃখে সহানুভূতি দেখায়। প্রকৃতির হৃদয়ে সাড়া জাগানোর একমাত্র উপায় প্রকৃতির সেবা। এই সেবা প্রকৃতিকে উপভোগ করার মধ্যে। ‘আরণ্যক’ এর অষ্টম

পরিচ্ছেদে এই বিষয়ে বিভূতিভূষণ একটি রসগ্রাহী মন্তব্য করেছেন—“অনেকদিন ধরিয়া প্রকৃতির সেবা না করিলে কিন্তু সে দান মেলে না। ...অনন্যমনা হইয়া প্রকৃতিকে লইয়া ডুবিয়া থাকো, তাঁর সর্ববিধ আনন্দের বর, সৌন্দর্যের বর তোমার উপর অজস্রধারে এত বর্ষিত হইবে, তুমি দেখিয়া পাগল হইয়া উঠিবে, দিনরাত মোহিনী প্রকৃতিরোগী তোমাকে শতরূপে মুগ্ধ করিবেন, নতুন দৃষ্টি জাগ্রত করিয়া তুলিবেন, মনের আয়ু বাড়াইয়া দিবেন, অমরলোকের আভাসে অমরত্বের প্রাপ্তে উপনীত করাইবেন।”

‘আরণ্যক’-এ নিসর্গচেতনা সম্পর্কে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’ গ্রন্থে লিখেছেন—“...ইহা সাধারণ উপন্যাস হইতে সম্পূর্ণ নতুন প্রকৃতির। প্রকৃতির যে সূক্ষ্ম কবিত্বপূর্ণ অনুভূতি বিভূতিভূষণের উপন্যাসের গৌরব তাহা এই উপন্যাসে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। প্রকৃতি এখানে মুখ্য, মানুষ গৌণ। সীমাহীন আরণ্য প্রকৃতি লেখকের মন ও কল্পনাকে পূর্ণভাবে অধিকার করিয়াছে। ইহার প্রতি ঋতুতে, দিবারাত্রির প্রহরে প্রহরে, জ্যোৎস্না-অন্ধকারের বিভিন্ন পটভূমিকায়, পরিবর্তনশীল রূপ ও সূক্ষ্ম আবেদন আশ্চর্যরূপ বস্তু নির্মাণ ও কাব্যব্যঞ্জনার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। সর্বোপরি ইহার সমস্ত পরিবর্তনশীলতার মধ্যে এক সুগভীর, অপরিমেয় রহস্যবোধ অবিচল কেন্দ্রবিন্দুর ন্যায় স্থির হইয়া আছে। প্রকৃতির এই ইন্দ্রজাল লেখক কত নিবিড় ও বিচিত্রভাবে অনুভব করিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। জনহীন, বিশাল, আরণ্য প্রান্তরের জ্যোৎস্নারাত্রি তাঁহার কল্পনাকে বিজ্ঞিভাবে উদ্বেগ করিয়াছে—ইহা কখনও পুরীরাজ্যের মায়াময়, অপার্থিব স্বপ্নসৌন্দর্য কখনও বা প্রেতলোকের বিভীষিকা জাগাইয়াছে। তেমনি নিঃসঙ্গ অন্ধকার নিশীথিনী এক গভীরতর রোমাঞ্চকর অনুভূতিকে যাহাকে বলে Cosmic imagination তাহাকেই—স্বুরিত করিয়াছে, কল্পনাকে সৃষ্টিরহস্যের মর্মস্থলে লইয়া গিয়া সৃষ্টি ক্রিয়ার নিগূঢ় আনন্দ-শিহরণ, ও সৃষ্টিকর্তার প্রকৃতি পরিচয়কে উদ্ঘাটিত করিয়াছে। আবার আদিম, আরণ্য জাতির সহিত সংস্পর্শ একদিকে বন্য মহিষের রক্ষাকর্তা ট্যাঁড়বারোদেবের কল্পনাকে রূপ দিয়াছে, অন্যদিকে কেবলমাত্র শিক্ষিত মনের পক্ষেই যাহার ধারণা করা সম্ভব সেই যুগ যুগান্ত-প্রসারিত ঐতিহাসিক কল্পনাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছে। দৃশ্যের পর দৃশ্য একদিকে বর্ণপ্লাবনের বিচিত্র সৌন্দর্যে চক্ষু ও মনকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, অপরদিকে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির নিবিড়তায় রূপাতীত ধ্যানতন্ময়তায় মগ্ন করিয়াছে। প্রকৃতির সহিত মানবমনের এমন অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কাহিনী বাঙলা উপন্যাসে ত নাই-ই, ইউরোপীয় উপন্যাসেও এরূপ দৃষ্টান্ত সুলভ নহে।”

উপসংহারে বলা যায় উপন্যাসে আরণ্য-প্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনও একাকার হয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্যটি স্মরণ করা যেতে পারে। “আরণ্যক”—এর প্রকৃতি আর মানুষ অরণ্যসত্তারই নিগূঢ় রসে-ফোঁটা একই বস্তুর দুটি ফুল। কেউ কারও উদাহরণ নয়, রূপক নয়। প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ ও বিশিষ্ট। তবে বিরোধী হয়ত নয়। সত্তার যে নিগূঢ় রসে ‘ডামাবাণু’ জীবন্ত হয়ে মানুষকে বেঘোরে পেলে মেরে ফেলে, সেই রসেই রাসবিহারী সিং, নন্দলাল গাঙ্গোতা প্রজাদের সর্বনাশ করে। যে প্রাণরসে বসন্তে মাঠে মাঠে দুখলিফুল ফোটে, সেই রসেই ভানুমতী ফোটে, ধাতুরিয়াও ঝড়ে পড়ে। হিংস্রতায়—অতিপ্রাকৃতে, মমতায়—উদাসীনতায় আদিম প্রকৃতি আর মানুষ যেমন জীবন্ত তেমনি রহস্যময়। আর এই দুইকে নিয়ে অরণ্যসত্তার পূর্ণ পরিচয়—তার প্রাণস্পন্দনের স্পর্শ। তর্কের খাতিরে অবশ্য প্রশ্ন তোলা যায়, মানুষ তো অরণ্যসত্তার আদিমতা বা সরলতার উদাহরণ হতে পারে। উত্তরে বলা চলে, উদাহরণ হলেও সে উদাহরণ জীবন্ত এবং মানুষের জীবনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত। কোথাও আরোপিত নয়, সেইজন্য ‘আরণ্যক’—এর অধিকাংশ চরিত্রই ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত। তবে তারা সভ্যতা, নাগরিকতা থেকে বহুদূরে আদিম অরণ্যের অধিবাসী বলে তাদের জীবনে চেতনার সংঘর্ষ ও অস্তিত্বের আত্ননাদ নেই।”

৮.৩.১০.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

- ১। ‘আরণ্যক’ উপন্যাস অবলম্বনে বিভূতিভূষণের নিসর্গচেতনার পরিচয় দাও।
- ২। ‘আরণ্যক’ উপন্যাসের চরিত্রসৃজনে লেখকের নৈপুণ্যের পরিচয় দাও।
- ৩। ‘আরণ্যক’ উপন্যাসে অরণ্য প্রকৃতি ও মানবজীবন কীভাবে অভিন্নতা লাভ করেছে তা উপন্যাসের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দাও।

‘আরণ্যক’-এর গোত্রবিচার

বিন্যাসক্রম

৮.৩.১১.১ : ‘আরণ্যক’-এর গোত্রবিচার

৮.৩.১১.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৮.৩.১১.১ : ‘আরণ্যক’-এর গোত্রবিচার

‘আরণ্যক’-এর ভূমিকায় বিভূতিভূষণ লিখেছেন, “ইহা ভ্রমণবৃত্তান্ত বা ডায়েরী নহে-উপন্যাস”। লেখকের যে-অভিপ্রায় উপন্যাসের মধ্যে লক্ষিত হয়, ভ্রমণ-কাহিনী বা ডায়েরীতে তা অনুপস্থিত। দিনলিপি বা ডায়েরীতে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই লিপিবদ্ধ করা হয়। গ্রন্থটি কিছুটা ভ্রমণবৃত্তান্ত বা ডায়েরীর মত, ‘প্রস্তাবনা’ অংশের পর প্রথম পরিচ্ছেদে উত্তম পুরুষ ‘আমি’—রূপে যে ব্যক্তি কাহিনী-কথকের ভূমিকা নিয়েছে, সেই সত্যচরণ লেখকের একটি কাল্পনিক চরিত্র, ভ্রমণবৃত্তান্ত বা ডায়েরীর কথকের মত লেখকের নিজস্ব ব্যক্তিরূপের প্রতিফলন নয়। প্রসঙ্গত, বিভূতিভূষণ নিজেই তাঁর জবানীতে বলেছেন—“মানুষের বসতির পাশে কোথাও নিবিড় অরণ্য নাই। অরণ্য আছে দূর দেশে, যেখানে পতিতপঙ্ক, জম্বু ফলের গন্ধে গোদাবরী তীরের বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। ‘আরণ্যক’ সেই কল্পনালোকের বিবরণ। ইহা ভ্রমণবৃত্তান্ত বা ডায়েরী নহে-উপন্যাস। অভিধানে লেখে ‘উপন্যাস’ মানে বানানো গল্প। অভিধানকার পণ্ডিতদের কথা আমরা মানিয়া

‘আরণ্যক’-এর ভূমিকায় বিভূতিভূষণ লিখেছেন—“ইহা ভ্রমণ বৃত্তান্ত বা ডায়েরী নহে উপন্যাস।” একথা ঠিক, ভ্রমণ বৃত্তান্ত বা ডায়েরী কোনটির মতই ‘আরণ্যক’ বিচ্ছিন্নভাবে গ্রথিত নয়, উপন্যাসের মতই তা সম্পূর্ণ। উপন্যাসে প্রকৃতি ও মানুষ মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতির কথায় যেমন আদি মধ্য অন্ত নাই, মানুষের কথারও তেমন এখানে আদি মধ্য অন্ত নাই। প্রকৃতি ও মানুষ লইয়া যে জগৎ, তাহার একটা পরিপূর্ণতা ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিষয়ের এই পরিপূর্ণতা উপন্যাসের এক বিশেষ লক্ষণ।

লইতে বাধ্য”। অপর একটি অংশে তিনি লিখেছেন—“তবে ‘আরণ্যক’-এর পটভূমি সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়। কুশীনদীর অপর পারে এরূপ দিগন্ত-বিস্তীর্ণ অরণ্যপ্রান্তর পূর্বে ছিল, এখনও আছে। দক্ষিণ ভাগলপুর ও গয়া জেলার বন পাহাড় তো বিখ্যাত”। লেখকের উক্তি থেকে স্পষ্টই অনুমান করা যেতে পারে যে, ‘আরণ্যক’ ভ্রমণবৃত্তান্ত বা ডায়েরী নয়। উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য অনুসারে কাল্পনিক কাহিনী হলেও পটভূমিগত বাস্তবতা সম্পর্কেও লেখক পাঠকদের উদ্দেশ্যে তাঁর মতামত জানিয়েছেন। সাধারণভাবে কোন উপন্যাসের কাহিনী, চরিত্র, দ্বন্দ্ব, সংলাপ, পরিবেশ যতই লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হোক না কেন, তাদের সঙ্গে লেখকের একটা প্রচ্ছদ দূরত্ব ও ব্যবধান থাকে। এ বিষয়ে লেখকও পাঠকসমাজ সচেতন থাকেন সমভাবে, অথচ বিভূতিভূষণ এ ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে রচনার উপজীব্য বিষয়ের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার সম্পর্কও তিনি বিস্মৃত হননি। ফলে পাঠকদের কাছে তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ প্রকৃতি-পরিবেশ ও মানবচরিত্রকে প্রকাশ করেছেন নিঃসঙ্কোচে।

‘আরণ্যক’-এর গোত্রবিচার করতে গিয়ে প্রখ্যাত সমালোচক সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর “বিভূতিভূষণ : জীবন ও সাহিত্য” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—“এই শ্রেণি নির্দেশ ভ্রমণবৃত্তান্তের বা ডায়েরীর শ্রেণি থেকে গ্রন্থটিকে পৃথক করার জন্য হলেও তা সাধারণ ও শিথিল নির্দেশ। ফুলকিয়া, লবটুলিয়া বইহার, মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্ট ভ্রমণের বৃত্তান্ত ও দিনলিপিকারের গহন অনুভূতি বইটিতে থাকায় বিভূতিভূষণ গ্রন্থটির শ্রেণি নিয়ে যে বিতর্কের সম্ভাবনা দেখেছিলেন তাকেই এড়ানোর জন্য বলেছেন, যেহেতু বানান গল্প বা কল্পনালোকের বিবরণই হচ্ছে উপন্যাস—‘আরণ্যক’ তাই উপন্যাস, অন্য কিছু নয়। একথা ঠিক, ভ্রমণবৃত্তান্ত বা ডায়েরী কোনটির মতই ‘আরণ্যক’ বিচ্ছিন্নভাবে গ্রথিত নয়, উপন্যাসের মতই তা সম্পূর্ণ। ভ্রমণবৃত্তান্ত বা দিনলিপি কোনটির আঙ্গিকেই গ্রন্থটি লিখিত নয়। তবু বানান গল্প বা কল্পনালোকের বিবরণ মাত্রই উপন্যাস নয়। উপন্যাসের বহিরঙ্গের সম্পূর্ণতা অর্থাৎ ঘটনার অখণ্ডতা, চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সবই এতে আছে, কিন্তু উপন্যাসে জীবনের জটিলতার ও মহত্ত্বের যে ব্যাপক ও গভীর ধারণা থাকে তা ‘আরণ্যক’-এ কোথায়? জীবনের জটিলতা ও মহত্ত্ব মানেই মানুষের জীবনের জটিলতা ও মহত্ত্ব। কিন্তু ‘আরণ্যক’-এ রাজু পাঁড়ে, যুগলপ্রসাদ, ভানুমতী, কুস্তা এমন কি এদের গ্রথিত করেছে যে সত্যচরণ এরা কেউই প্রধান নয়, অরণ্যই প্রধান—অমূর্ত অরণ্যস্তার পরিচয় এইসব মূর্ত মানুষের স্পর্শে বোঝা যায়”।

“আরণ্যক”-এর কাহিনীতে উপন্যাসের দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় জটিলতা নেই, নায়কের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহিঃশক্তির সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে কোনো সংকটের ক্রম-উন্মোচনে নাটকীয় উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায়নি, এমনকি কাহিনীর বা চরিত্রের উত্থানপতন ও ক্রমবিকাশও আমরা দেখি না। প্রকৃতপক্ষে ‘আরণ্যক’ লেখকের স্মৃতিচিত্র, বিভিন্ন ঋতুতে অরণ্যপ্রকৃতির বিচিত্র রূপ, জ্যোৎস্নাময় নিশীথে তার অপার্থিব সৌন্দর্য, তৃণপ্রান্তর অথবা যেমন প্রকৃতির রূপ হয়ে ওঠে শান্ত ও স্নিগ্ধ, তেমনি তার ভয়াল রূপও দুর্লভ নয়। রাজু পাঁড়ে, ধাতুরিয়া, মহাজন ধাওতাল সাহু, মটুকনাথ, যুগলপ্রসাদ, বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ, কুস্তা, মঞ্চী, রাজা দোবরু পান্না এবং ভানুমতী প্রভৃতি চরিত্রগুলি প্রকৃতি ও মানুষের দৃশ্যমালিকায় গঠিত হয়েছে ‘আরণ্যক’-এর অবয়ব। কথক সত্যচরণের স্মৃতিচারণার দৃশ্যগুলি অসংলগ্ন না হয়ে অষ্টার ভাবদৃষ্টির সমগ্রতায় পরিপূর্ণ। এই কারণেই ‘আরণ্যক’ উপন্যাসের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য উত্তীর্ণ হতে পেরেছে।

ইতিহাসকে উপন্যাস রূপে লেখক কল্পনা করেছেন।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে নভেম্বর ‘স্মৃতির রেখায়’ বিভূতিভূষণ লিখেছেন—“এই যুগ যুগ ব্যাপী বিশাল মানবজাতি—শুধু তাও নয়—এই বিশাল জীবজগৎ—কোন মহাউপন্যাসিকের কলমের আগায় বেরুনো উপন্যাস। অধ্যায়ে অধ্যায়ে ভাগ করা আছে। মহাসমুদ্রগর্ভে বিলীন কোন্ বিস্মৃত যুগের আটলান্টিক জাতির বিস্মৃত কাহিনীও যেমন এর কোন অধ্যায়ের বিষয়ীভূত ঘটনা তেমনি আজ মাঠের ধারে বন্যশৃঙ্গালের নখদন্তে নিহত নিরীহ ছাগ-শিশুর মৃত্যুতে যে বিয়োগান্ত ঘটনার পরিসমাপ্তি হোল তাও এর এক অধ্যায়ের কথা। ঐ যে কচুঝাড় বাঁশবনের আওতায় শীর্ণ হয়ে হলদে হয়ে আসছে ওর কথাও।” এই ঐতিহাসিক দৃষ্টির প্রেক্ষিতেই বলা যায় “আরণ্যক” কাব্যিক-উপন্যাস। অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন—“আরণ্যক শাস্ত্র বলতে আমরা বুঝি উপনিষদকে, এবং উপনিষদ শব্দের অর্থ রহস্যময়। বিভূতিভূষণ আমাদের জন্য এক নতুন উপনিষদ রচনা করে গেছেন। যে অধ্যাত্ম বা ভাবদৃষ্টি ‘আরণ্যকের’ সমস্ত বর্ণনা, দৃশ্য ও চরিত্র-চিত্রণকে সমগ্রতার ঐক্যসূত্রে বেঁধে রচনাটিকে উপন্যাসের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দান করেছে, সত্যচরণের এই উক্তি উদ্ঘাটিত হয়েছে : “আমার মনে যে দেবতার স্বপ্ন তিনি যে শুধু প্রধান বিচারক, ন্যায় ও দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, বিজ্ঞ ও বহুদর্শী কিংবা অব্যয়, অক্ষয় প্রভৃতি

দুরূহ দার্শনিকতার আবরণে আবৃত ব্যাপার তাহা নয়—নাচা বইহারের কি আজমাবাদের মুক্ত প্রান্তরে কত গোখুলিবেলায় রক্তমেয় স্তপের, কত দিগন্তহারা জনহীন জ্যোৎস্নালোকিত প্রান্তরের দিকে চাহিয়া মনে হইত, তিনিই প্রেম ও রোমান্স, কবিতা ও সৌন্দর্য, শিল্প ও ভাবুকতা—তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসেন, সুকুমার কলাবৃত্তি দিয়া সৃষ্টি করেন, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিয়া থাকেন নিঃশেষে প্রিয়জনের প্রীতির জন্য—আবার বিরাট বৈজ্ঞানিকের শক্তি ও দৃষ্টি দিয়া গ্রহ নক্ষত্র নীহারিকাও সৃষ্টি করেন।”

বিভূতিভূষণের অধ্যাত্মদৃষ্টির আলোকেই অরণ্যপ্রকৃতির সঙ্গে দরিদ্র, নিরক্ষর মানুষেরা বিশ্বপ্রাণের ছন্দোময় সৌন্দর্যের ঐক্যসূত্র একীভূত হয়। প্রকৃতির বিশাল-গভীরতা যেমন দৃষ্ট হয়, তেমনি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ রূপ, তাদের মতোই এই দরিদ্র, ক্ষুদ্র মানুষগুলিও দেবতার সীমাহীন প্রেম ও আশীর্বাদের ঐশ্বর্যময় প্রকাশ হিসাবে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়—“কতবার এই ক্ষান্তবর্ষণ মেঘ-থমকানো সন্ধ্যায় এই মুক্ত প্রান্তরের সীমাহীনতার মধ্যে কোন্ দেবতার স্বপ্ন যেন দেখিয়াছি—এই মেঘ, এই সন্ধ্যা, এই বন্য কোলাহলরত শিয়ালের দল, সরস্বতী হ্রদের জলজ পুষ্প, মধুগী, রাজু পাঁড়ে, ভানুমতী, মহালিখারূপের পাহাড়, দরিদ্র-গৌড়-পরিবার, আকাশ, ব্যোম সবই তাঁর সুমহতী কল্পনায় একদিন ছিল বীজরূপে নিহিত—তাঁরই আশীর্বাদ আজিকার এই নবনীল-নীরদমালার মতই সমুদয় বিশ্বকে অস্তিত্বের অমৃতধারায় সিক্ত করিতেছে—এই বর্ষা-সন্ধ্যা তাঁরই প্রকাশ, মুক্ত জীবনানন্দ তাঁরই বাণী, অন্তরে অন্তরে যে বাণী মানুষকে সচেতন করিয়া তোলে। সে দেবতাকে ভয় করিবার কিছুই নাই—এই সুবিশাল ফুলকিয়া বইহারের চেয়েও, ঐ বিশাল মেঘভরা আকাশের চেয়েও সীমাহীন অনন্ত তাঁর প্রেম ও আশীর্বাদ। যে যত হীন, যে যত ছোট, সেই বিরাট দেবতার অদৃশ্য প্রসাদ ও অনুকম্পা তার উপর তত বেশী।” ‘আরণ্যক’—এর সমগ্র বর্ণনায়, নায়ক চরিত্র সত্যচরণের চিন্তা ও কল্পনার প্রকাশে গীতিকবিতার সুর, ছন্দ ও সুষমাকে উদ্ভাসিত হতে দেখা যায়। এই দৃষ্টি ও প্রকাশভঙ্গীই ‘আরণ্যক’-কে উপন্যাসের বিশিষ্ট রূপের সমগ্রতা দান করেছে। এই বিশিষ্ট রূপের উপন্যাসকে আমরা কাব্যিক-উপন্যাস রূপে চিহ্নিত করি, ‘আরণ্যক’ সেই গোত্রেরই কাব্যিক উপন্যাস।

অতএব ‘আরণ্যক’ দিনলিপি বা ভ্রমণবৃত্তান্ত নয়। দিনলিপি বা ভ্রমণকাহিনীর বিশেষ কোন উদ্দেশ্য থাকে না। যে উদ্দেশ্য উপন্যাসের মধ্যে অধিক পরিমাণেই থাকে। বিভূতিভূষণ দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে পারেন, কিন্তু এই দেশভ্রমণের ফলে কেবল একটি দেশের সঙ্গে পরিচিত হওয়া ছাড়া তাঁর মনের ও চরিত্রের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না। দিনলিপি সেই গোত্রেরই। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা পরিবেশন করা ছাড়া এর আর কোন তাৎপর্য নেই। অপরদিকে উপন্যাসে চরিত্রগুলি বিভিন্ন ঘটনার দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্য দিয়ে আবর্তিত হয়। উপন্যাসের শুরুতে চরিত্রগুলি যে অবস্থায় থাকে, পরিণতিতে তাঁদের বিপরীতধর্মিতা দেখা যায়। আলোচ্য উপন্যাসে এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হোল সত্যচরণ চরিত্র। শহর কলকাতা থেকে সত্যচরণ যে যাত্রা শুরু করেছিল ভাগলপুরে—কলকাতায় প্রত্যাগমনের সময় কিন্তু তার জীবনদৃষ্টি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে। ‘আরণ্যক’-রে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এর উল্লেখ আছে—“কিছুতেই কিন্তু এখানকার এই জীবনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারিতেছি না। বাংলাদেশ হইতে সদ্য আসিয়াছি, চিরকাল কলিকাতায় কাটাইয়াছি, এই অরণ্যভূমির নির্জনতা যেন পাথরের মত বুকে চাপিয়া আছে বলিয়া মনে হয়।” আবার অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে দেখি—“এখানেই যদি থাকিতে পারিতাম। ভানুমতীকে বিবাহ করিতাম। এই মাটির ঘরের জ্যোৎস্না ওঠা দাওয়ায় সরলা বন্যাবালা রাঁধিতে রাঁধিতে এমনি করিয়া ছেলেমানুষী গল্প করিত—আমি বসিয়া বসিয়া শুনিতাম...ভাবিতেও বেশ লাগে। কি সুন্দর স্বপ্ন! কি হইবে

উন্নতি করিয়া? বলভদ্র সেঙ্গাং গিয়া উন্নতি করুক। রাসবিহারী সিং উন্নতি করুক।” অধ্যাপিকা চৈতালী বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—“এইভাবে সত্যচরণের মন ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়েছে, লেখকের বর্ণনাগুণে পরিবর্তনের পর্যায়গুলি স্পষ্ট। এজন্যই ‘আরণ্যক’ উপন্যাস। উপন্যাসের একটি মহৎ গুণ হোল, এটি অন্য নানা শ্রেণির রচনাকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করতে পারে। যে গুণটি কাব্য, প্রবন্ধ বা নাটকে ততটা পাওয়া যায় না। সেজন্য দিনলিপি বা ভ্রমণকাহিনীর আকৃতি গ্রহণ করলেও ‘আরণ্যক’ দিনলিপি বা ভ্রমণকাহিনী থেকে পৃথক এবং উপন্যাস শ্রেণির। সত্যচরণ ভ্রমণকারী না হয়ে উপন্যাসের কেন্দ্রীয়চরিত্র ও সত্যদ্রষ্টা হয়ে উঠেছে।”

‘আরণ্যক’ প্রসঙ্গে ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের অভিমত হোল—“একখানি সার্থক উপন্যাসের কাহিনীর তিনটি বিশেষ গুণ—ব্যাপকতা, গভীরতা ও অখণ্ডতা। যে কাহিনীর মধ্যে জীবনের বিচিত্র ব্যাপার স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই, সে কাহিনী উপন্যাসের বস্তু হইতে পারে না। যেখানে বিষয়ের অল্পতা সেখানে উপন্যাসের বিস্তার নাই। দ্বিতীয়ত, যে কাহিনী জীবনের অন্তরালে প্রবেশ করে নাই সে কাহিনীকে সার্থক উপন্যাস বলে না। তৃতীয়ত, সার্থক উপন্যাসের কাহিনী এক অখণ্ড বস্তু, ইহাতে মানুষের ভাব, চিন্তা ও কর্মের বিচিত্রমুখিতা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সুসম জগৎ পাঠকের সামনে উপস্থিত করে। ইহার ছোট বড় ঘটনা ও চরিত্র, ইহার বিভিন্ন পরিবেশ, ক্রমশ মনুষ্যজীবনের একটি মহান সত্যকে উদঘাটিত করে। যে কাহিনীতে এই অখণ্ডতা নাই, সেই কাহিনীতে পরিণতিও নাই, অর্থাৎ সে কাহিনী অপরিণত। বস্তুত, কাহিনীর অখণ্ডতা মূলত উপন্যাসিকের দৃষ্টির অখণ্ডতা। কাহিনীর গতি ও পরিণতি উভয়ই এক অখণ্ড দৃষ্টি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

কিন্তু ‘আরণ্যক’-এর কাহিনী কোথায়? ইহার নায়ক কে? ইহা কাহার ভাগ্যের কথা? ‘আরণ্যক’ বিশেষ একজনের কথা নয়—অনেকের কথা। সেই অনেক মানুষ লইয়াই এই উপন্যাসের ‘অদ্ভুত জীবনযাত্রার স্রোত।’ সেই স্রোতই এই উপন্যাসের কথাবস্তু। এই বিশিষ্ট কথাবস্তুর ব্যাপকতা, গভীরতা ও অখণ্ডতা War and Peace উপন্যাসের ঐ লক্ষণের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে গেলে গোল বাধিবে। অরণ্য ও অরণ্যের পরিবেশে লালিত জীবনের কথা War and Peace-এর সে-কাহিনী আশ্রয়ে বলা যাইবে না। War and Peace -এর জীবনধারা এক প্রবল ঘটনাস্রোতের মধ্য দিয়া বহিয়া চলিয়াছে, সেই স্রোত আবার কখন আবর্ত বা ঘূর্ণিপাকের সৃষ্টি করিতেছে, কখনও বা তাহা স্ফীত হইয়া দুই কূল ভাসাইয়া দিতেছে, ইহার গতি কখনও মস্থর, কখনও দ্রুত-কখনও সরল, কখনও বক্র এবং ইহার মধ্যেই ব্যক্তি ও জাতির ভাগ্য নির্দিষ্ট হইতেছে। এই স্রোত ‘আরণ্যক’-এর স্রোত নয়। কিন্তু ‘আরণ্যকে’ কোন জীবনস্রোত বহিয়া যাইতেছে না কে বলিবে। এই স্রোতের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভূতিভূষণ বলিয়াছেন, যে ইহা ‘আপন মনে উপল বিকীর্ণ অজানা নদীখাত দিয়ে ঝিরঝির করিয়া বহিয়া চলে।’ ‘আরণ্যক’ প্রমাণ করিল যে এই উপন্যাসও উপন্যাসের কথাবস্তু হইতে পারে। ... উপন্যাসে প্রকৃতি ও মানুষ মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতির কথার যেমন আদি মধ্য অন্ত নাই, মানুষের কথারও তেমন এখানে আদি মধ্য অন্ত নাই। অরণ্যের একটি গাছের যেমন কোন আলাদা ও পূর্ণ ইতিহাস নাই, কিন্তু প্রকৃতি ও মানুষ লইয়া যে জগৎ, তাহার একটা পরিপূর্ণতা ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিষয়ের এই পরিপূর্ণতা উপন্যাসের এক বিশেষ লক্ষণ। ‘আরণ্যক’-এ এই বিষয়ের পরিপূর্ণতা লিরিক-সুলভ ভাবের পরিপূর্ণতার বড় কাছাকাছি আসিয়া গিয়াছে। ইহাতে ‘আরণ্যক’-এর উপন্যাসত্ব ক্ষুণ্ণ হয় নাই, ইহাকে এক লিরিক-ধর্মী উপন্যাসে পরিণত করিয়াছে।”

৮.৩.১১.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

- ১। ডায়েরী কাকে বলে?
- ২। ভ্রমণ কাহিনী কাকে বলে?
- ৩। ‘ইহা ভ্রমণবৃত্তান্ত বা ডায়েরী নহে—উপন্যাস’—বিভূতিভূষণের এই মন্তব্য ‘আরণ্যক’ উপন্যাস সম্পর্কে কতখানি সত্য তা আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট করো।

কথক সত্যচরণের ভূমিকা

বিন্যাসক্রম

৮.৩.১২.১ : কথক সত্যচরণের ভূমিকা

৮.৩.১২.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৮.৩.১২.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৮.৩.১২.১ : কথক সত্যচরণের ভূমিকা

‘আরণ্যক’-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র সত্যচরণ নিজেই এই উপন্যাসের কথক। তার স্বগতোক্তিতে ও ভাবদৃষ্টির আলোকে অরণ্যের রূপ প্রকৃতি এবং তার সঙ্গে পরিচিত কিছু নরনারীর খণ্ডকাহিনী দৃশ্যায়িত। প্রধানত সত্যচরণ এই কাহিনীর সূত্রধার তথা ভাষ্যকাররূপে অঙ্কিত এক বিশিষ্ট কাহ্ননিক চরিত্র। সত্যচরণকে বহু সমালোচক বিভূতিভূষণেরই প্রতিচ্ছায়া বলে মনে করেন। লক্ষ্য করা যাবে—প্রকৃতি চেতনা, প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বকল্পনা এবং একান্ত নির্জনপ্রিয়তা ছিল বিভূতিভূষণের চরিত্রলক্ষণ। অনুরূপ ভাব ও বিশিষ্টতা সত্যচরণের মধ্যেও উপস্থিত।

‘আরণ্যক’ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সত্যচরণ এই উপন্যাসের কথক। তার মধ্য দিয়ে অরণ্যের প্রকৃতি এবং পরিচিত কিছু নরনারীর খণ্ড কাহিনী দৃশ্যায়িত। সত্যচরণের গভীর প্রকৃতি প্রেম, কবি সুলভ রোমান্টিক সৌন্দর্যচেতনা এবং বিশ্বতাত্ত্বিক চেতনাকে উদ্ভাসিত হতে দেখি। প্রকৃতপক্ষে চরিত্রটি বিভূতিভূষণের আত্মরূপ। প্রকৃতিকে ধ্বংস করতে এসে প্রকৃতি ও মানুষ উভয়কেই সত্যচরণ ভালবেসে ফেলেছে। উপন্যাসে কেবলমাত্র ভাষ্যকার রূপে চিত্রিত হলেও কাহিনীর ভাববস্তু, তার বিষয় রচনামূল্য ও বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে সত্যচরণের চরিত্র-পরিকল্পনার নিজস্ব সার্থকতা অবশ্য স্বীকার্য।

চারিত্রিক লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যে বিভূতিভূষণের সঙ্গে কাহিনীর নায়ক সত্যচরণের হুবহু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ভাগলপুরে থাকার সময়ে দেশের জন্য বিভূতিভূষণের মন উৎকণ্ঠায় বিচলিত হোত। ‘স্মৃতির রেখা’য় আছে—“কেবলই মনে পড়ে আমার দেশের ভিটায় এমনি জ্যোৎস্না আজ উঠেছে—চাঁপা পুকুরের পুকুরঘাটে, বেলেঘাটা ব্রিজের মাঠে, ইছামতীর ধারে, চাটগাঁয়ের মণিদের বাড়ী পুরনো স্মৃতির সব জায়গাগুলোতে। কুঠির মাঠের কথা হঠাৎ মনে পড়ে-দেশের জন্য মন কেমন করে”। এই উপলব্ধি সত্যচরণের মধ্যেও কাজ করেছে। ‘আরণ্যক’-এর সপ্তম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে এই ভাবে—“সেইদিন হইতে ঐ কাঁটার ফুল দেখিলে আমার মন হু হু করিয়া উঠিত বাংলাদেশের জন্য।”

জমিদারি সংক্রান্ত কাজের ভার নিয়ে সত্যচরণ আসে বিহারের পূর্ণিয়া জেলায়। সে এই আরণ্যক পরিবেশের ভয়ংকর নির্জনতায় চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং এহেন চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় ফিরে যাবার সংকল্প করে। কিন্তু কিছুদিন পরে সত্যচরণ এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। সে মনে করে যে এখানকার যা প্রকৃতির রূপ, এমনটি সে কোথাও দেখেনি। এরপর থেকেই আমরা এক একটি প্রাকৃতিক রূপের দৃশ্যে সত্যচরণের গভীর প্রকৃতি

প্রেম, কবিসুলভ রোমান্টিক সৌন্দর্য চেতনা এবং বিশ্বতাত্ত্বিক চেতনাকে উদ্ভাসিত হতে দেখি। নিসর্গচেতনা ও কবিদৃষ্টি সত্যচরণের সত্তার গভীরে নিহিত ছিল বলেই অরণ্যের সান্নিধ্যে হঠাৎই তার মধ্যে স্ফুরিত হতে পারত না। নাগরিক জীবনের পরিবেশে লালিত সত্যচরণের মধ্যে প্রকৃতিচেতনা কীভাবে সুপ্ত অবস্থায় ছিল, বিভূতিভূষণ সে সম্বন্ধে পাঠককে অবহিত করান নি। উপন্যাসের চরিত্র বিশ্লেষণের নিয়ম পদ্ধতি এবং সেই সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা প্রকৃতির পটভূমিতে সত্যচরণের চরিত্রকে ঠিক বিচার করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে চরিত্রটি বিভূতিভূষণেরই আত্মরূপ, তাঁর প্রকৃতি প্রেম, প্রকৃতির রূপধ্যান, রোমান্টিক কবির অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তার রূপের আরতি ইত্যাদির প্রতিরূপ। ভ্রমণ-কাহিনী বা ডায়েরীর মত আত্মস্মৃতিচারণামূলক রচনা হলেও বিভূতিভূষণ একে উপন্যাস হিসেবেই পরিকল্পনা করেছেন—“ইহা ভ্রমণবৃত্তান্ত বা ডায়েরী নহে—উপন্যাস”। এই কারণেই তিনি এই কাল্পনিক চরিত্রটিকে (সত্যচরণ) দিয়ে কাহিনীর কথক রূপে উপস্থাপিত করেছেন, অথচ প্রথাগত উপন্যাসের নায়ক চরিত্র রূপাঙ্কনে তাঁর অভিপ্রায় ছিল না বললেই চলে।

কতকাংশে সাদৃশ্য থাকলেও সত্যচরণ আদৌ বিভূতিভূষণ নন। বিভূতিভূষণ প্রকৃতিকে আত্মদান করেন গ্রামে যেমন, শহরেও বটে। শহরের সভা সমাবেশের বাস্তবতার মধ্যেও তাঁর গ্রামের কথা মনে হয় ‘উৎকর্ণ’ এর এই অংশটিতে—“আবার মন উদ্ভিগ্ন হয়েছে আর একবার ইছামতীতে স্নান করবার জন্য।” কিন্তু কলকাতার মানুষ সত্যচরণ প্রথমে নির্জনতার মধ্যে এসে হাঁপিয়ে উঠেছে। ‘আরণ্যক’—এর প্রথম পরিচ্ছেদেই তার উল্লেখ আছে—“মন হু হু করিয়া উঠিল—কোথায় আছি! কোথাকার জনহীন অরণ্য-প্রান্তরে খড়ের চালায় বাস করিতেছি চাকুরীর খাতিরে। মানুষ এখানে থাকে?”

সত্যচরণ চরিত্রের প্রধান গুণ যে, সে আলোচ্য উপন্যাসে বর্ণিত প্রকৃতি এবং মানবজীবনকে এক সূত্রে গ্রথিত করেছে। “লবটুলিয়া—বইহারের বনভূমির সৌন্দর্যকে সে যেমন উপলব্ধি করেছে, তেমনি মানুষের সারল্যও তার চোখ এড়িয়ে যায়নি। বিভূতিভূষণ গ্রামজীবনের প্রকৃতিকে যেমন তন্ময় চিত্তে দেখেছেন, বনাঞ্চলের বিশালতায় তিনি যেন আরও আনন্দ খুঁজে পেয়েছেন। ‘আরণ্যক’ উপন্যাসে শুধু বনের সৌন্দর্যমুগ্ধতা নিয়ে লেখা কিছু পরিচ্ছেদ আছে। যেখানে প্রকৃতি ও সত্যচরণের উপলব্ধিই শুধু স্থান পেয়েছে—অন্যান্য চরিত্র সেখানে অনুপস্থিত। এ পরিচ্ছেদগুলি আরোপিত মনে হওয়ার সম্ভাবনা ছিল—কিন্তু লেখক আশ্চর্য আন্তরিকতার সঙ্গে এই চিত্রগুলি ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রকৃতিকে লেখক পরিবেশ হিসেবে দেখেন না, প্রকৃতি তার মনের মত সঙ্গী। সত্যচরণ যখন একা প্রকৃতির কাছে এসে উপস্থিত হচ্ছে—তখন পাখীর গান, ফুলের গন্ধ, বনের সতেজ শ্যামলিমা নিয়ে প্রকৃতির শরীরী উপস্থিতিকে আমরাও অনুভব করতে পারছি। এর পরেই সত্যচরণ আবার উপস্থিত হয়েছে তার বাস্তব সঙ্গীদের কাছে। প্রকৃতির মতই সরল উদার এইসকল মানুষ। তাদের সুখ, আনন্দ, উৎসব, দারিদ্র্য-সবকিছু নিয়েই তারা সত্যচরণের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। এদের দুঃখ আনন্দের ভাগও নিতে হয়েছে তাকে। কলেরা রোগগ্রস্ত বালিকার মৃত্যু, মঞ্চীর নিরুদ্দেশ, কুস্তার ভাগ্যপরিবর্তন প্রভৃতির জন্য সত্যচরণ দুঃখিত হয়েছে, তেমনি আবার ছটপেরব বা পুণ্যাহ উৎসব উপলক্ষে অথবা সাঁওতালদের বুলন-পরবেও সে ম্যানেজারবাবুর খোলস পরে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে নি। সত্যচরণের কাজ লবটুলিয়া জঙ্গলে মানুষের বসতি স্থাপন করা। একদিকে সে জঙ্গলকে ভালবাসছে—যুগলপ্রসাদের সঙ্গে পরামর্শ করে নানা ধরনের গাছ এনে সরস্বতী কুণ্ডী ও তার পার্শ্বস্থ বনভূমিকে আরও সৌন্দর্যে ভরিয়ে তুলছে—আর একদিকে তাকেই জঙ্গলের এক একটা অংশ গৃহসম্বানী মানুষদের কাছে বিলি করতে হচ্ছে। ঘাসে ছাওয়া নীচু খুপড়ি ও লাল ধ্বজায় লবটুলিয়া বইহারের বনভূমি পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতিকে ধ্বংস করতে এসে প্রকৃতি ও মানুষ উভয়কেই সত্যচরণ ভালবেসে ফেলেছে। মানুষের মৃত্যুতেও সে দুঃখী, আবার

প্রকৃতির মৃত্যু ও সে সহ্য করতে পারে না।” ‘আরণ্যক’—এর অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে সত্যচরণের স্বগতোক্তি—“ঘন ঘন বন কাটিয়া আমিই এই হাস্যদীপ্ত শস্যপূর্ণ জনপদ বসাইয়াছি ছয় সাত বৎসরের মধ্যে।” নাচা লবটুলিয়া কি ছিল আর তার হাতে কি হল—একথা ভেবে অনুতপ্ত—“হে অরণ্যানির দেবতারা, ক্ষমা করিও আমায়”—লবটুলিয়া ত্যাগ করে শহরে ফেরার প্রাক্কালে এ কথা সত্যচরণ উপলব্ধি করেছে।

মোটের উপর সত্যচরণ উপন্যাসোচিত—পূর্ণাঙ্গ চরিত্রের রূপে অঙ্কিত না হলেও নিসর্গচেতনা, প্রকৃতি প্রীতি, কল্পনা ইত্যাদি পাঠকমনে বাস্তব, সজীব ও হৃদয়গ্রাহী বলেই অনুভূত হয়। বিভূতিভূষণ সত্যচরণের মাধ্যমে অরণ্যপ্রকৃতি সংলগ্ন অত্যন্ত সাধারণ শ্রেণির কয়েকজন নরনারীর জীবনের রেখাঙ্কনে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সংবেদনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। এক শীতের রাতে ভাত খাওয়ার লোভে বহু দূরবর্তী স্থান থেকে লবটুলিয়ার কাছারি বাড়িতে এসে উপস্থিত হয় দরিদ্র সাধারণ মানুষ, এদের দারিদ্র্য, সারল্য জীবনযাত্রা সত্যচরণকে মুগ্ধ করেছে। কুসীদজীবী মহাজন হওয়া সত্ত্বেও ধাওতাল সাহুর বিত্তে নিষ্পৃহতা ও বৃহৎ ক্ষতিকে তাচ্ছিল্য করার ক্ষমতা সত্যচরণ লক্ষ্য করেছে। দেবী সিং রাজপুত্রের বিধবা স্ত্রী কুস্তাবাঈজীর কন্যা হওয়ায় সমাজচ্যুত এবং সকলের ঘৃণা ও লাঞ্ছনার পাত্রী হয়েছে—দারিদ্রে তার এবং ছেলেমেয়েদের অনশনক্লিষ্ট করে তুলেছিল। মহাজন রাসবিহারী সিং-এর প্রলোভন ও ভীতিপ্রদর্শন অগ্রাহ্য করে তার রক্ষিতা হয়ে স্বধর্ম বিসর্জন দেয়নি—কুস্তা সম্পর্কে সত্যচরণের এই চিন্তা মানবিক দৃষ্টির ঐশ্বর্যে সমুজ্জ্বল। তার প্রতি ঐকান্তিক সমবেদনার জন্যই সত্যচরণ তাকে বিনা সেলামীতে দশ বিঘা জমির বন্দোবস্ত করে দেয়। এই মানবিকতার জন্যই সত্যচরণ দরিদ্র গাঙ্গোতা গিরিধারীলাল সম্পর্কে মমতার কারুণ্যে বলে—অনেক ধরনের মানুষ সে দেখেছে কিন্তু গিরিধারীলালের মত সাচ্চা মানুষ কখনও দেখেনি। অনাথ বালক ধাতুরিয়ার নৃত্যশিল্পে ঐকান্তিক নিষ্ঠা সত্যচরণের অন্তরকে মর্মস্পর্শী করেছিল, কিন্তু তার মৃত্যু সংবাদ শোনার পর সত্যচরণের স্বীকারোক্তিতে জানা যায় যে, সেই বন্য-অঞ্চলে সে যতগুলি নরনারীর সংস্পর্শে এসেছিল তাদের মধ্যে ধাতুরিয়া ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। সাঁওতালরাজ দোবরু পান্নার নাতির মেয়ে ভানুমতির সরল ও উষ্ণ ব্যবহার অথবা গাঙ্গোতা বৃদ্ধ নকছেদীর দ্বিতীয় স্ত্রী তরুণী মঞ্চীর প্রাণোচ্ছলতা সত্যচরণের কাছে দুর্লভ অভিজ্ঞতা-সঞ্চয় বলে মনে হয়।

উপন্যাসে কেবলমাত্র ভাষ্যকার রূপে চিত্রিত হলেও কাহিনীর ভাববস্তু, তার বিশেষ রচনামূল্য ও বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে সত্যচরণের চরিত্র—পরিকল্পনার নিজস্ব সার্থকতা অবশ্যস্বীকার্য।

৮.৩.১২.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

- ১। কথক সত্যচরণের ভূমিকা কি?
- ২। ভানুমতী কে?
- ৩। ‘আরণ্যক’ উপন্যাসে সত্যচরণ চরিত্রসৃষ্টির সার্থকতা বিচার করো।
- ৪। ‘আরণ্যক’ উপন্যাস ভানুমতী ও দোবরু পান্না চরিত্রসৃষ্টিতে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্বের পরিচয় দাও।
- ৫। ‘আরণ্যক’ উপন্যাসে অপ্রধান চরিত্রসৃজনে লেখকের নৈপুণ্যের পরিচয় দাও।

৮.৩.১২.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

পর্যায় গ্রন্থ-৩ এর প্রতিটি এককে (১-৪) নিম্নোক্ত বইগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

- ১। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা
- ২। ডঃ গোপিকানাতথ রায়চৌধুরী—দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য
- ৩। চিত্তরঞ্জন ঘোষ—বিভূতিভূষণ
- ৪। সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়—বিভূতিভূষণ : জীবন ও সাহিত্য
- ৫। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা উপন্যাসের কালান্তর
- ৬। ডঃ চৈতালী বন্দ্যোপাধ্যায়—উপন্যাসে আঙ্গিক : বিভূতিভূষণ ও তারাক্ষর

পর্যায় গ্রন্থ - ৪

লালসালু

একক ১৩

লালসালুর কাহিনি সংক্ষেপ

বিন্যাসক্রম

৮.৪.১৩.০ : ভূমিকা

৮.৪.১৩.১ : লালসালুর কাহিনি : মজিদ-রহিমা-জমিলা সম্পর্ক

৮.৪.১৩.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৮.৪.১৩.০ : ভূমিকা

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘লালসালু’ লেখা শুরু করেন কলকাতায় ১৯৪৭ এর অব্যবহিত আগে এবং শেষ করেন ঢাকায়। ‘লালসালু’ বাংলাদেশের প্রথম শিল্পসফল উপন্যাস। ‘লালসালু’ প্রথম প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে (শ্রাবণ, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ)।

‘লালসালু’ পাঠক-পরিমণ্ডলে তার সাধারণ আবেদন ছাড়াও সুনির্দিষ্টভাবে একটি ব্যতিক্রমী বোধের সঞ্চারণ করতে সক্ষম। এখানে লেখকের কৃতিত্ব তাঁর দৃষ্টির স্বচ্ছতায়, দ্বিধাহীন বক্তব্যে এবং জীবনদৃষ্টির ভিন্নতর অতিব্যক্তিতে বিধৃত। এ-উপন্যাসে লেখকের জীবনদৃষ্টি শুধু আধুনিক নয়, বলা যায় আধুনিকতম। কারণ তিনি ইউরোপীয় উপন্যাস-শিল্পের একটি সাম্প্রতিকতম ধারাকে আবহমানকালের গ্রামীণ প্রতিবেশে উপস্থাপন করেছেন। অস্তিত্ববাদী দর্শনকে ভিত্তি করে উপন্যাস রচনার পূর্ব-প্রস্তুতি হিসেবে ইউরোপীয় উপন্যাসের ক্ষেত্রে যে-ধরনের ভূমি কর্ষণের আয়োজন করা হয়েছে, বাংলাদেশের উপন্যাসের ক্ষেত্রে তা হয়নি। এদেশের গতানুগতিক কাহিনিধর্মী বর্ণনামূলক উপন্যাসের বিচরণভূমিতে ওয়ালীউল্লাহর নতুন আঙ্গিক ও মননের সংযোগ তাই একান্তই আকস্মিক, অভাবিত। ইউরোপের নতুন দিগ্বলয়ভিমুখী ক্রম পরিবর্তনশীল সাহিত্যাদর্শের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগহীন সাধারণ পাঠকের পক্ষে ওয়ালীউল্লাহর প্রতীক-ব্যঞ্জনাময় রচনার রসোপলব্ধি কষ্টকর। বস্তুত ওয়ালীউল্লাহর রচনার রসাস্বাদনের জন্য পাঠকের নিজেরই পূর্বপ্রস্তুতি প্রয়োজন। সে কারণে একমাত্র বিদগ্ধ পাঠক ছাড়া তাঁর উপন্যাসগুলো সাধারণ পাঠক

‘লালসালু’ বাংলাদেশের প্রথম শিল্পসফল উপন্যাস। সৈয়দওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-৭১) উপন্যাসটি লেখা শুরু করেন কলকাতায় ১৯৪৭ এর অব্যবহিত আগে এবং শেষ করেন ঢাকায়। উপন্যাসে লেখকের জীবনদৃষ্টি শুধু আধুনিক নয়, বলা যায় আধুনিকতম এবং নতুন আঙ্গিক ও মননের সংযোগে তাই একান্ত আকস্মিক, অভাবিত। প্রকৃতি ও গ্রাম্য মানুষের সঙ্গে ছিল লেখকের প্রগাঢ় সংযোগ এবং উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রই এসেছে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনভিজ্ঞজাত প্রাকৃত জনসমাজ থেকে।

সমাজে কখনো সমাদর পাবে কিনা সন্দেহ। আর তাই রচনার উৎকর্ষ ও ক্ষমতার পরিচয় থাকা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো সর্বজনপ্রিয় উপন্যাসিকের মর্যাদা তিনি পাবেন না, এমন আশঙ্কা সত্য। কারণ সাধারণ পাঠক চায় একটা জমট গল্প, গল্পের লভ্য চরিত্রের উত্থান-পতন, চায় নাটকীয় ঘটনাবলী। কিন্তু গল্পাতিরিক্ত গভীর তাৎপর্যবহ মূল্যবান রসাস্বাদনের জন্য স্বল্পাশ্রমেও তাদের ঘোরতর আপত্তি।

অধিকাংশ সমালোচক উপন্যাস রচনায় যে গতানুগতিক শিল্পরীতি ব্যবহৃত হয় সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ‘লালসালু’কে বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু মনে হয় ওয়ালী উল্লাহ তাঁর পরবর্তী উপন্যাসদ্বয়ে সুনির্দিষ্টভাবে যে শিল্পরীতি ব্যবহার করেছেন ‘লালসালু’কেও সেই দর্শনের নিরিখে একটি সন্তোষজনক ব্যাখ্যার আওতায় আনা সম্ভব। পরিষ্কারভাবে না হলেও এ উপন্যাসের মৌল-চিন্তায় অস্তিত্ববাদী উপাদান ব্যবহৃত। অপরিচিত দর্শনের সুকঠিন প্রেক্ষাপট পশ্চাতে থাকলেও এ উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র এসেছে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনভিজ্ঞাত প্রাকৃত জনসমাজ থেকে। এদের সবাই তাঁর চেনা-জানা, অতি পরিচিত। অথচ এই চেনা জানা চরিত্রগুলোর সঙ্গে এখানে যুক্ত হয়েছে নতুন মাত্রিকতা, নবতর সম্ভাবনা। ওয়ালী উল্লাহর শৈশব-কৈশোর অতিক্রান্ত হয়েছিল বাবার সঙ্গে মফঃস্বলে ঘুরে ঘুরে। মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, ফেণী, হুগলীর মত অঞ্চলের সঙ্গে তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ পরিচয়। ফলে সৌখিন সাহিত্যকর্মীর মতো গ্রাম্য পরিবেশে ও জীবন চেতনা সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা শেকড়বিহীন উপরাঞ্চলীয় নয়। একটা বয়সে গ্রামের প্রকৃতি ও গ্রাম্য মানুষের সঙ্গে তাঁর ছিল প্রগাঢ় সংযোগ। এ তিনি কখনোই ভুলে যাননি। এর পরিচয় আছে ‘লালসালু’ উপন্যাসে।

৮.৪.১৩.১ : লালসালুর কাহিনী : মজিদ-রহিমা-জমিলা সম্পর্ক

বাংলাদেশের উপন্যাসিকদের মধ্যে প্রথম আধুনিক শিল্পী হলেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-৭১)। তাই সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর ‘লালসালু’ বাংলাদেশের প্রথম শিল্পসফল উপন্যাস। এর পাঠকপ্রিয়তা যেমন বিপুল তেমনি ও উপন্যাসই লেখককে এনে দিয়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকস্তরে ব্যাপক খ্যাতি। তৎকালীন বাংলাদেশের ধর্ম ব্যবসায়ীর নীরন্ধ অন্ধকারের জগৎ সম্পর্কে উপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্পষ্ট। আর তারই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপ বিশ্লেষণ করেছেন ‘লালসালু’তে ধর্মব্যবসায়ী মজিদের মধ্যদিয়ে।

লালসালু উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ধর্মব্যবসায়ী মজিদ। তাই প্রবঞ্চক, স্বার্থান্বেষী, নারীলোলুপ চরিত্র বাংলাদেশে দ্বিতীয় রহিত। তাই মজিদ একদা জীবিকার তাগিদে দেশ ছেড়েছিল। জায়গা করে নিয়েছিল গারো পাহাড়ের এক বাঁশের মসজিদে। সেখানে জীবন ছিল ‘নিঃসঙ্গ হাড় বের করা’। একদিন সাহেবি পোশাকধারী নব্যশিক্ষিত এক মুসলমান শিকারির দেখা পেয়ে তার নতুন ভেক ধরে সম্পদ শিকারের নতুন এক দুর্বুদ্ধি খেলে যায়।

‘লালসালু’ উপন্যাসটির পাঠক প্রিয়তা যেমন বিপুল তেমনি উপন্যাসটি লেখককে এনে দিয়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকস্তরে ব্যাপক খ্যাতি। উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র ধর্মব্যবসায়ী মজিদ। লেখক তৎকালীন বাংলাদেশের ধর্মব্যবসায়ীর নীরন্ধ অন্ধকারের জগৎ কে উপন্যাসে স্থান করে দিয়েছেন। মহব্বত গ্রামের ধূর্ত মজিদ অধ্যাত্মজীবী হলেও রক্তমাংসের মানুষ। তার চরিত্রের মানবিক সীমাবদ্ধতা তাকে করে তুলেছে জীবন্ত। ‘সেইসঙ্গে তার সতর্ক পদক্ষেপ, অভাবনীয় বাখীতা, নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা পরায়ণতা মজিদ চরিত্রকে দিয়েছে বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট আসন। অবদমিত ও অতৃপ্ত কামনা পরিতৃপ্তির নেশায় মজিদ প্রথম বিয়ে করে রহিমার সঙ্গে ও দ্বিতীয় বিবাহ করে জমিলার সঙ্গে।

শেষ-শ্রাবণের নিরাকপড়া এক দুপুরে শীর্ণকায় মজিদ নাটকীয়ভাবে উপস্থিত হয় স্বচ্ছল জনপদ মহব্বতে নগরে। গ্রামের বাইরের পরিত্যক্ত ভাঙ্গা কবরকে সে ‘মোদাচ্ছেদ পীরের মাজার বলে ঘোষণা করে। ‘মিথ্যা’ ভাঁওতা দিয়ে বলে স্বপ্নাদেশ পেয়ে স্বচ্ছল জীবন ছেড়ে সুন্দর গারো পাহাড় থেকে সে এসেছে কারণ মোদাচ্ছেদ পীরের কবরকে অযত্নে অবহেলায় ফেলে রাখা হয়েছে। সহজ সরল গ্রামবাসীকে সে—‘জাহেল, বেএলেম, আন পড়াহ’ বলে ভৎসনা করে এবং তাদের অনুশোচনা ও লজ্জায় জর্জরিত করে সম্পদ শিকারে লিপ্ত হয়। কিন্তু মনে মনে মজিদ ছিল দ্বিধাশ্রিত ও ভীত, কারণ সে জানত—

“দুনিয়ায় সচ্ছলভাবে দুবেলা খেয়ে বাঁচবার জন্য যে খেলা খেলতে যাচ্ছে সে-খেলা সাংঘাতিক।”

খুব অল্পকালের মধ্যেই মজিদ মহব্বত নগরের অধিবাসীদের মনে খোদা ভীতির সঞ্চার করতে সক্ষম হয়। সুচতুর মজিদ খালেক ব্যাপারীকে তার তৃতীয় হাত হিসাবে ব্যবহার করে। কিন্তু সুচতুর মজিদ নিজের অবস্থান সম্পর্কে খালেক ব্যাপারীর কাছেও সতর্ক থাকে। অল্পকালের মধ্যেই প্রাচীন কবর মোদাচ্ছেদ পীরের মাজারে পরিণত হল—

“ঝালরওয়ালা লালসালু দ্বারা আবৃত হল মাছের পিঠের মত সে কবর। আস্তে আস্তে বিভিন্ন গ্রামের তীর্থক্ষেত্র হয়ে এই মাজার। সাথে সাথে বিভ্রাট, প্রভাবশালী হয়ে উঠল মজিদ। আবার সেই হয়ে উঠল সমাজপতি।

নিজের হীন অভিসন্ধিকে সফল করার লক্ষ্যে মজিদের প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল সতর্ক ও সুবিবেচিত। তার নির্দেশকে সামান্যতম অবহেলা কিম্বা অমান্যতার প্রতিফলন হয় চরম প্রতিশোধমূলক। আধিপত্য রক্ষা ও বিস্তারের জন্য মজিদ প্রয়োজনে নির্মম নিষ্ঠুর হতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি। আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে প্রতিপক্ষ মোকাবিলায় তার পদক্ষেপ ছিল প্রতিশোধাত্মক। মজিদের প্রতি সামান্যতম অবজ্ঞা প্রদর্শন করায় মজিদ তাহেরের বাপকে কন্যার কাছে মাফ চাইতে বাধ্য করে। অপমানের জ্বালা সহ্যে না পেরে সে নিরুদ্দেশ হয়। মজিদকে উপেক্ষা করে আওয়ালপুরের পীর সাহেবের কাছ থেকে পানিপড়া আনার চেষ্টা করায় মজিদ খালেক ব্যাপারীকে দিয়ে তার স্ত্রী নিরপরাধ আমেনা বিবির তালাকের ব্যবস্থা করে। আওয়ালপুরের পীর সাহেব মজিদের ধর্মব্যবসার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে হাজির হলে তার বিরুদ্ধে যে প্রকাশ্য বিদ্রোহে সামিল হয় এবং কুট-বুদ্ধির সাহায্যে তার সঙ্গে নিজের গ্রামবাসীদের সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য করে।

মহব্বত নগর গ্রামে নিজের শক্তি প্রতিষ্ঠায় ধূর্ত মজিদ যেসব পদক্ষেপ নেয় সেগুলি যেমন অভিনব তেমনি চমকপ্রদ। তাহেরের বাপকে বিচারের কৌশলে অপদস্ত করে নিজের ক্ষমতা অবস্থানকে মজিদ নিরঙ্কুশ করেছে। গ্রামের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হিসাবে নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সে প্রকাশ্যে বাজারে আধঘণ্টার মধ্যে বাপ-বেটার খতনা সম্পন্ন করেছে। সমাজের অগ্রগতিমূলক ও প্রগতিশীল যেকোনো কাজকে সে বাধা দিয়েছে প্রাণপণে। আধুনিকতা প্রয়াসী তরুণ আককাসের স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে সে কৌশলে বানচাল করেছে। এমনকী পাল্টা মসজিদ বানানোর প্রস্তাব অনুমোদন করিয়ে নেয়। এসব পদক্ষেপে মজিদের প্রত্যাশিতমত্বের ও কুটবুদ্ধির পরিচয় স্পষ্ট। সেই সঙ্গে হয় তার প্রগতিবিরোধী ভূমিকা।

মজিদ অধ্যাত্মজীবী হলেও রক্ত মাংসের মানুষ। তার চরিত্রের মানবিক সীমাবদ্ধতা তাকে করে তুলেছে জীবন্ত।

জমি গৃহস্থালি হলে শীর্ণ মজিদ একদিন ব্যাপ্ত যৌবনা বিধবা রহিমাকে দেখে জ্বলে উঠেছিল, মজিদ তাকেই বিয়ে করে ঘরে আনে কিন্তু রহিমা মজিদকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না। তার মধ্যে নেশা জাগানো উত্তাপ ছিলনা। কারণ—

“রহিমার না আছে অভিমান না আছে চপলতা... এমন মানুষ ভালো লাগেনা তার”।

এই জৈবিক অতৃপ্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে মজিদ হাসুনীর মায়ের দৈহিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়। তার দুঃখ মোচনের অছিলায় তাকে কিনে দেয় বেগুন রং-এর কালোপেড়ে শাড়ি। পৌষের হাড়-কাঁপানো শীতের রাতে রহিমা ও হাসুনীর মা যখন ধান সিদ্ধকরে উঠানে তখন খড়ের গনগনে আগুনের উজ্জ্বল আলোয় সেই বেগুনি রঙের শাড়ি পরা হাসুনীর মার উন্মুক্ত গলা কাঁধ ও বাহুর উজ্জ্বলতা দেখে—“মজিদের চোখ অন্ধকারে চকচক করে।” মজিদের জৈব অতৃপ্তির বহিঃপ্রকাশ তার কামনা লিঙ্গ দৃষ্টিতে। তার প্রকাশ ঘটে খালেক ব্যাপারীর স্ত্রী আমেনা বিবির কালো রঙের পাড়ের তল থেকে বেরিয়ে আসা সুন্দর পা আর হলুদ রঙের বুটদার চাদরের প্রান্ত ছুঁয়ে বের হয়ে আসা অদ্ভুত কোমল সাদা হাতের দিকে তাকিয়ে এখানে একইসঙ্গে মজিদের অন্তর্ভাবনার সূক্ষ্ম দিকগুলোও লেখক আমাদের জানিয়ে দেন। মজিদ লুক্ক দৃষ্টিতে আমেনাবিবির শরীর দেখে মুগ্ধ হলেও তাকে ছাপিয়ে ওঠে তার প্রতিহিংসা পরায়ণতা। তার মনে সাপ ফনা তোলে ছোবল মারার জন্য—“সুন্দর পা দেখে স্নেহ মমতা উঠে না এসে আসে বিষ।” আবার অন্যসময়ে সে পা দ্বিতীয়বার দেখালোনা বলে হঠাৎ বুকের মধ্যে কেমন যেন আফসোসবোধ করে মজিদ। তারপর মনে মনেই হাসে। “দুনিয়াটা বড় বিচিত্র যেখানে সাপ জাগে সেখানে আবার কোমলতার ফুল ফোটে”। মজিদের মানসলোকের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তরগ্রাম অন্ধনে ওয়ালীউল্লাহর দক্ষতা অপরিসীম।

বিপুল অর্থবিত্ত এবং নিরঙ্কুশ প্রতাপ প্রতিপত্তি সত্ত্বেও তার জীবনে যে ব্যক্তিগত সঙ্কট সৃষ্টি হয় তার জন্য দায়ী সে নিজেই। অতৃপ্ত ও বুভুক্ষু জৈবিক কামনায় পীড়িত মজিদ প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়ে অনুভব করে জীবনকে সে পরিপূর্ণ উপভোগ করেনি। “জীবন উপভোগ করতে না পারলে কিসের ছাই মান বল সম্পত্তি।” অবদমিত ও অতৃপ্ত কামনা পরিতৃপ্তির নেশায় মজিদ দ্বিতীয় বিয়ে করে নববধূ কিশোরী জমিলাকে দেখে তার মনে ঠিক যেন বিড়াল ছানা। “পুলকিত মজিত ‘ঘন ঘন দাড়িতে হাত বুলায়, আর তার আশপাশ আতরের গন্ধে ভুরভুর করে’ জমিলার ‘সোনালী মিহি সুন্দর হাসির ঝংকার’ শুনে চমকিত ও মুগ্ধ হয়। কিন্তু রহস্যে ঘেরা মাজারের ভাবগভীর পরিবেশকে সে হাসি যেন অবজ্ঞা করে। তাই সে হাসি সে নির্দিধায় থামিয়ে দেয়। কিন্তু এই একরঙা মেয়েটির স্বভাব চপল প্রাণোচ্ছলতাকে প্রভুক্ত কামিতার খাঁচায় বন্দী করতে গিয়ে মজিদ হয়েছে বিব্রত, বিড়ম্বিত ও বিপর্যস্ত। তার মনকে ঘিরে ধরে বিপন্নতার বোধ। সে অনুভব করে “লতার মত মেয়েটি যেন সংসারে ফাটল ধরিয়ে দিতে এসেছে।” অসহায়ের মত সে একান্ত রহিমার শরণাপন্ন হয়ে কম্পিত কণ্ঠে বলে—“বিবি কারে বিয়া করলাম? তুমি কি বদদোয়াদিছিলানি? এই প্রথম মজিদ তার প্রভুত্বের আসন ছেড়ে রহিমার পাশে একই সমতলে দাঁড়িয়েছে। আর রহিমা তার সমগ্র বিবাহিত জীবনে এই প্রথম নতুন মজিদকে আবিষ্কার করে। এই মজিদ অকৃত্রিম আন্তরিক বন্ধুভাবাপন্ন ও পরমাত্মীয়।

প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী জমিলাকে বশে আনার জন্য মজিদের চেষ্টা যতই ব্যর্থ হয়, ততই সে নিষ্ঠুর ও প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে। শেষ চেষ্টা হিসাবে মজিদ জমিলার অন্তরে খোদা, মাজার ও মজিদের প্রতি ভীতি সঞ্চারের চেষ্টা করে। জমিলাকে সে নামাজ পড়ার আদেশ দেয়। কিন্তু মজিদের আদেশ উপেক্ষা করে যায় নামাজে ঘুমিয়ে পড়ে জমিলা। ক্ষিপ্ত মজিদ তাকে জোর করে মাজারে নেওয়ার চেষ্টা করলে মজিদের মুখে থুতু নিক্ষেপ করে ঘটনায় মজিদ যেন

বজ্রাহত। কিন্তু তার রাগ চেপে যায়। ঝড় জল ও শিলাবৃষ্টির মধ্যে সে সারারাত মাজারের অন্ধকারে বেঁধে রাখে দুর্বিনীত জমিলাকে, সারারাত সে অপেক্ষা করে জমিলার কাতর আর্তনাদ শোনার জন্য। কিন্তু মজিদের প্রতিহিংসা চরিতার্থতায় এবারেও ব্যর্থ হয়। শিলাবৃষ্টি শেষে সে মাজারে গিয়ে দেখে জমিলার মেহেদি দেওয়া এক দুঃসাহসী পা সালুতে আবৃত কবরের গায়ে লেগে আছে। জমিলাকে শাস্তিদানের জন্য মজিদের ত্রুর কুটিল উদ্যোগ, তার প্রতিহিংসা পরায়ণতা, তার উৎকর্ষ ও ব্যর্থতা ইত্যাদি ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া মজিদ চরিত্রটি বাস্তব ও জীবন্ত প্রতিহিংসা পরায়ণতা, তার উৎকর্ষ ও ব্যর্থতা ইত্যাদি ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মজিদ চরিত্রটি বাস্তব ও জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। মজিদের আধ্যাত্মজীবী চরিত্রের মানবিক সীমাবদ্ধতা ফুটিয়ে তোলার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ অত্যন্ত সফল। জমিলাকে মোকাবেলায় মজিদের সে সংকট তার সংবাদ গ্রামবাসীর কাছে অজ্ঞাত থাকলেও মজিদের অন্তর্জগতে তার প্রভাব অসহ্য যন্ত্রণা দায়ক ও অবর্ণনীয়।

উপন্যাসের শেষে আমরা দেখি দুর্বিনীত জমিলাকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টায় শেষপর্যন্ত মজিদ ব্যর্থ হয়, শুধু তাই নয় শিলা ঝড়ে পুরো গ্রামের ক্ষেতের ফসল ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলে মজিদের ঐক্য ক্ষমতাও প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। মজিদের মধ্যেও দেখা দেয় একটা দ্বন্দ্ব। সত্যের সীমানায় পৌঁছানোর একটা আর্তি অনুভব করে মজিদ। কিন্তু শেষপর্যন্ত সে সামলে নেয় নিজে। সে ফিরে দাঁড়ায়, কিছুতেই সে হারতে রাজী নয়। গ্রামবাসীর হাহাকারকে সে এক ফুৎকারে থামিয়ে দেয় আমরা বুঝতে পারি, অন্ধতা, কুসংস্কার ও শোষণের শক্তি সহজে পরাজিত হবার নয়।

খোদার উপর মজিদের বিশ্বাস অটল ও সীমাহীন এ যেমন সত্য, তেমনি এটাও সত্য যে, মজিদ ছদ্ম ধার্মিক ধর্মের প্রকৃত ধ্বজাধারী সে নয়, বরং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ভাষায় সে ধর্মের আগাছা—“যে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস যুগ যুগ ধরে ভূমিহীন সরল গ্রাম্য মানুষকে প্রতারিত করে আসছে মজিদ তারই পতাকাবাহী।”

একইসঙ্গে মজিদ রক্তমাংসের মানুষ। আর দশ জনের মতই মানুষ। স্বচ্ছলভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টায় লিপ্ত এক সংগ্রামশীল মানুষ যে আপন অসাধুতা সম্পর্কে সচেতন। সে জানে “খোদার বান্দা সে নির্বোধ ও জীবনের জন্য অন্ধ। তার ভুলভ্রান্তি তিনি মাফ করে দেবেন। তাঁর করুণা অপার সীমাহীন।”

উপন্যাসে মজিদের অন্তর্ভাবনা ও বহির্পদক্ষেপে তার অশাস্তি ও অতৃপ্তি তার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মপ্রত্যারণা সবই ওয়ালীউল্লাহ ফুটিয়ে তুলেছেন শৈল্পিক কুশলতায় এ চরিত্র যেমন সুনির্মিত তেমনি ব্যতিক্রম। ছদ্মধার্মিকতা স্বার্থোদ্ধারে চালিত অভিনব কূটকৌশল, পরিস্থিতি মোকাবিলায় সুচিন্তিত ও সতর্ক পদক্ষেপ, অভাবনীয় বাগ্মীতা, নিষ্ঠুর প্রতিহিংসাপরায়ণতা এসবই মজিদ চরিত্রকে দিয়েছে বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট আসন।

৮.৪.১৩.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

- ১। ‘লালসালু’ উপন্যাসটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
- ২। উপন্যাসটি রচনার সময় লেখক কাহিনি কোথায় শুরু করেন এবং শেষ করেন কোথায়?
- ৩। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রের নাম কী? তিনি কোন গ্রামের বাসিন্দা?
- ৪। উপন্যাসের মধ্য দিয়ে লেখক কোন সমাজের ছবি বর্ণনা করেছেন?

রহিমা ও জমিলা

বিন্যাসক্রম

৮.৪.১৪.১ : রহিমা চরিত্র

৮.৪.১৪.২ : জমিলা চরিত্র

৮.৪.১৪.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৮.৪.১৪.১ : রহিমা চরিত্র

গোঁড়া ধর্মীয় অনুশাসন ও সামন্তবাদের বেড়াডালে আবদ্ধ পুরুষশাসিত এক গ্রাম সমাজে বঞ্চিত ও নিপীড়িত নারী সমাজের প্রতীক ‘লালসালু’ উপন্যাসের রহিমা চরিত্র। মহব্বত নগরে প্রতিষ্ঠা লাভের পর মজিদ প্রশস্ত ব্যাপ্ত যৌবনা যে বিধবা মেয়ে লোকটিকে বিবি করে ঘরে আনে সে রহিমা। সে লম্বা চওড়া মানুষ। হাড় চওড়া মাংসল দেহে তার প্রচণ্ড শক্তি। মজিদের গৃহস্থালি কাজে তার দারুণ পটুতা ও অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য। তার দেহের শক্তি আর লম্বা চওড়া চেহারা বাইরের খোলস মাত্র। আসলে সে ঠাণ্ডা, নিরীহ শান্ত ও ভীতু মানুষ। মজিদের সংসারে আসার আগে তার চালচলন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু কবরের আজাবের ভয় দেখিয়ে মজিদ রহিমার সহজাত স্বাচ্ছন্দ্যকে স্তব্ধ করে দেয়। রহিমা খোদাকে ভয় পায়, মাজারকে ভয় পায়, স্বামী মজিদকে ভয় পায়। স্বামী মজিদ রহিমার কাছে প্রভু মজিদ।

মানবিক চেতনায় ঋদ্ধ এক মমতাময়ী নারী সমাজের প্রতীক ‘লালসালু’ উপন্যাসের রহিমা চরিত্র। মহিমা খোদাকে ভয় পায়, মাজারকে ভয় পায়, স্বামী মজিদকে ভয় পায়, কিন্তু সে নিরীহ শান্ত ও ভীতু মানুষ। গোঁড়া ধর্মীয় অনুশাসন ও সামন্তবাদের বেড়াডালে আবদ্ধ পুরুষ শাসিত এক গ্রাম সমাজের নিপীড়িত নারী সমাজের প্রতীক হিসেবে রহিমা গুরুত্ব পেয়েছে।

স্ত্রী হিসেবে স্বামী মজিদের শক্তির প্রভাব কিছুটা রহিমার ওপরও পড়ে। এতদিনের চেনাজানা রহিমা এখন গ্রামের মেয়েদের কাছে হয়ে ওঠে অন্যরকম। রহস্যময় মজিদের কাছে মেয়েদের নিবেদন-আবেদনের একমাত্র যোগসূত্র হয়ে ওঠে রহিমা। আমেনা বিবির প্রতি তার কোমল মনের গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতি আর তা অভিব্যক্তি লাভ করেছে খোদার প্রতি এক ধরনের অনুযোগ—“তুমি এত দয়ালু খোদা, তবু তুমি কি কঠিন।” অল্পবয়স্ক ও কন্যাপ্রতীম সতীন জমিলাকে সাদরে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে রহিমা চরিত্রের স্নেহময়ী মাতৃত্বের রূপটি দীপ্ত হয়ে ওঠে। মজিদ যেদিন অব্যাহত জমিলাকে বশে আনার চরম উপায় হিসেবে অন্ধকার নির্জন মাজার ঘরে বন্দী করে রেখে আসে এবং শেষরাতে ঝড় শিলাবৃষ্টি শুরু হলেও নিষ্ঠুর ও নির্মম উদাসীনতার পরিচয় দেয় তখন রহিমা নীরব ও স্থির থাকতে পারেনি। “যে রহিমার বিশ্বাস পর্বতের মত অটল, যার আনুগত্য ধ্রুবতারার মত অনড় সেই যেন হঠাৎ মজিদের আড়ালে চলে যায়, তার কথা বোঝে না।” জীবনে এই প্রথম রহিমা স্বামীর মুখোমুখি হয় আপন ব্যক্তিত্ব নিয়ে। দীর্ঘ দিনের আনুগত্যকে দীর্ণ করে সে দৃঢ়

কণ্ঠে বলে,—‘আপনে ওরে নিয়ে আসেন ভিতরে।’ এ রহিমা অন্য এক রহিমা—মানবিক চেতনায় ঋদ্ধ এক মমতাময়ী নারী। বিশ্বস্ত ও অনুগত চরিত্র থেকে বিদ্রোহী চরিত্রে রহিমার এই আবর্তনশীলতা চরিত্রটিকে ‘লালসালু’ উপন্যাসের সবচেয়ে পরিবর্তনশীল চরিত্রের মর্যাদা দিয়েছে।

৮.৪.১৪.২ : জমিলা চরিত্র

জীবন উপভোগের দুর্নিবার নেশার টানে ধর্ম-ব্যবসায়ী মজিদ দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে যে কিশোরী মেয়েকে ঘরে আনে সে জমিলা। মজিদের যৌন অতৃপ্তির প্রতিকাররূপে এবং সন্তান কামনার নিঃশব্দ আর্তির রক্তপথে তার সংসারে প্রবেশ ঘটে এ উপন্যাসের স্ফুটতর প্রতিবাদী চরিত্র চাঁদের মত এক ফালি জমিলার। উপন্যাসের তিন চতুর্থাংশ পার হওয়ার পর কাহিনিতে তার আবির্ভাব। অচিরেই সে হয়ে ওঠে মজিদের এক অভাবিত প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। চপলা কিশোরী এই জেদি মেয়েটির কাছে প্রবল পরাক্রান্ত মজিদের পরাজয়ের মাধ্যমে মজিদের ধর্ম ব্যবসার কর্তৃত্ব খান হয়ে যায়।

জীবন উপভোগের দুর্নিবার নেশার টানে মজিদ দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে যে কিশোরী মেয়েকে ঘরে আনে সে জমিলা। উপন্যাসে জমিলা মজিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। প্রথম থেকে মজিদের সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছিল এক বিশাল দূরত্ব। জমিলা সহজ প্রাণধর্মের প্রতীক, অন্তঃসারশূন্য ধর্মানুষ্ঠান তথা পচন ধরা পুরাতন সমাজের বিরুদ্ধে জমিলার বিদ্রোহ নীরব কিন্তু অজেয়। উপন্যাসে লেখক জমিলার চরিত্রকে নিছক মজিদের দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে আঁকেননি, তাকে পরিণত করেছেন একটি প্রতীকী চরিত্রে।

ঘরে আনার পর জমিলাকে দেখে মনে হয় মজিদের—‘ঠিক যেন বিড়াল ছানা... হাসিমুখে আদর করতে গেলেও ভয়ে কেঁপে সার হয়ে যাবে।’ এ গ্রন্থে জমিলা এক নির্বোধ নিরেট জীবনের প্রতীক। জমিলা যা, জমিলা তাই-ই। শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-অনুষ্ঠান, বোধ-বিবেচনা, বিশ্বাস কোনো কিছুই তার প্রকৃতির মত সত্য সত্তাকে আচ্ছাদিত-দমিত করতে পারে না। জীবনোপভোগের বিচিত্র আকাঙ্ক্ষায় বালিকা জমিলাকে সে ঘরে এনেছিল। কিন্তু একদিন প্রাণোচ্ছল বালিকা জমিলাই যেন মজিদের প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকা নেয়। মনে মনে মজিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে সে। এরপর একটি বারের জন্যেও মজিদের কাছে মুখ খোলেনি সে। স্বামীর বিরুদ্ধে নীরবতাকে বেছে নেয় সে প্রতিবাদের অস্ত্র হিসাবে।

জমিলা বাংলাদেশের গ্রাম সমাজে অধিকার ও মর্যাদাহীন নারী-সমাজের প্রতিনিধি। সে মজিদকে যখন প্রথম দেখে তখন ভাবতেও পারেনি যে সে তার হবু স্বামী। মজিদকে দেখে সে ভেবেছিল—তানি বুঝি দুলার বাপ। তাই কৈশোর, রূপ সব বৈশিষ্ট্য জমিলার চরিত্রের উজ্জ্বলতার পরিচায়ক। জমিলা রহিমার মত ধীর ও অনুগত নয়। সে অপরিণত জেদি ও বিদ্রোহী। স্বামী মজিদের আধিপত্য রহিমা নীরবে মেনে নিলেও জমিলা কখনোই স্বামীকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি। প্রথম থেকে মজিদের সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছিল এক বিশাল দূরত্ব। সে দূরত্ব বয়সের ও মনোধর্মের। সে দূরত্ব আরও বেড়ে যায় জমিলার ওপর প্রভুত্ব আরোপে মজিদের চেষ্টায়। জমিলা জন্ম স্বাধীন, নামাজ পড়ার জন্য মজিদের আদেশ অমান্য করে জায়া নামাজে ঘুমিয়ে পড়ে। জমিলার নির্বিকারত্বে মজিদ ফুঁসে ওঠে সাপের মতো। জমিলাকে বশে আনার চেষ্টায় মজিদ তার ওপর নির্দেশ জারি করে তরাবির নামাজ পড়ে মাফ চাইবার। মজিদ যখন তাকে ঘুম থেকে টেনে তুলে মাজারের দিকে নিয়ে যায় তখন দৈহিক বলে পরাস্ত জমিলা মজিদের মুখে থুথু নিক্ষেপের মাধ্যমে তার বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তবু মজিদ জমিলাকে মাজারে নিয়ে যায়। মাজারে ঢোকান পূর্বে এবং পরেও জমিলার চোখে ভীতির মেঘ যেন ঘন হতে থাকে। উত্তেজনা ও ভীতির চরম অবস্থায় ‘অসাড় হয়ে যাওয়া’ জমিলাকে খুঁটির সঙ্গে দড়ি বেঁধে রেখে আসে মজিদ। কিন্তু তার উদ্বেগাকুল দীর্ঘ

রাত জমিলার ভীতি বিহ্বল আত্মনাদের অভাবে ব্যর্থ হয়। সকালে আবিষ্কৃত হয় গভীর ঘুমে অচৈতন্য জমিলার মেহেদী-রাঙা পা ঢেকে আছে মাজারের গায়ে। অন্তঃসারশূন্য ধর্মানুষ্ঠান তথা পচন ধরা পুরাতন সমাজের বিরুদ্ধে জমিলার বিদ্রোহ এভাবেই বিস্তারিত হয়। তার বিদ্রোহ নীরব কিন্তু অজেয়। ‘লালসালু’ উপন্যাসে ওয়ালীউল্লাহ্ অল্প কয়েকটি রেখায় জমিলার চরিত্র ঐকেছেন তাতে তাঁর শৈল্পিক সাফল্য অসাধারণ। জমিলার চরিত্রকে তিনি নিছক মজিদের দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে আঁকেননি, তাকে পরিণত করেছেন একটি প্রতীকী চরিত্রে। জমিলা সহজ প্রাণধর্মের প্রতীক, ধর্মশাসনের বেড়াজালে বন্দী সংগ্রামী নারীর প্রতীক। প্রভুত্ব ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জমিলা অপরাজেয়।

৮.৪.১৪.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

- ১। রহিমার স্বামীর নাম কী?
- ২। ‘রহিমা’ স্বামী মজিদকে ভয় পাওয়ার কারণ কী?
- ৩। জমিলা চরিত্রের প্রতীকী কোথায়?
- ৪। ‘লালসালু’ উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।
- ৫। ‘লালসালু’ উপন্যাস মজিদ কেন্দ্রীক মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করো।

একক ১৫

অপ্রধান চরিত্র

বিন্যাসক্রম

৮.৪.১৫.১ : অপ্রধান চরিত্র

৮.৪.১৫.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৮.৪.১৫.১ : অপ্রধান চরিত্র

লালসালু উপন্যাসের অপ্রধান চরিত্রগুলির গুরুত্ব ও ভূমিকা প্রধানত মজিদ চরিত্রের পরিষ্কৃটন ও পূর্ণতা দানে। সেই সঙ্গে উপন্যাসের বহিঃবস্তুবতা নির্মাণেও এগুলির ভূমিকা রয়েছে। অপ্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে খালেক ব্যাপারী, আমেনা বিবি, তাহের-কাদেরের বাপ, হাসুনীর মা, আওয়ালপুরের পীর, আক্কাল প্রমুখরা। এসব চরিত্র সৃষ্টিতে ওয়ালীউল্লাহ ‘অত্যন্ত সংযত ও গভীর পরিমিতিবোধ সম্পন্ন। এদের মধ্যে খালেক ব্যাপারী মহব্বতনগর গ্রামের জোতদার ও উপন্যাসের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য পুরুষ চরিত্র। সামন্তপ্রভুর মতই তার সামাজিক অবস্থান। খালেক ব্যাপারীর যে শক্তি তা মজিদের শক্তির পরিপূরক। মজিদ শোষণ করে মাজারের মাধ্যমে আর খালেক ব্যাপারী জমি-জোতের মাধ্যমে।

‘লালসালু’ উপন্যাসের অপ্রধান চরিত্রগুলির গুরুত্ব ও ভূমিকা প্রধানত মজিদ চরিত্রের পরিষ্কৃটন ও পূর্ণতাদানে। উপন্যাসে অপ্রধান চরিত্রের মধ্যে খালেক ব্যাপারী, আমেনা বিবি, তাহের কাদেরের বাপ, হাসুনীর মা, আওয়ালপুরের পীর, আক্কালে প্রমুখরা। অনুজ্জল হলেও উপন্যাসের কাহিনী বিস্তারে ও পরিবেশ তাহের কাদের, মোদাবেবের মিঞা, মতলুব মিঞা উল্লেখযোগ্য।

নিভীক, বদরাগী ও জেদী তাহের কাদেরের বাপই উপন্যাসের একমাত্র চরিত্র যে মজিদের অলৌকিকত্বে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেনি। চরিত্রটির নিভীক প্রতিবাদ ও বিষণ্ণ অন্তর্ধান আমাদের মনে দাগ কাটে।

হাসুনীর মহব্বতনগর গ্রামের সাধারণ দুঃখী নারী। পরিশ্রমের ধকল সত্ত্বেও তার শারীরিক সৌন্দর্য অটুট। কাহিনীতে তার উপস্থিতি স্বল্পকালীন হলেও জীবন্ত। আমেনা বিবি খালেক ব্যাপারীর প্রথম স্ত্রী। স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসা অগাধ। তাই দ্বিতীয় স্ত্রী ঘরে আনার পরেও স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসা একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। কিন্তু মজিদের চক্রান্তে আনন্দ ও সুখের নিশানাটুকু আমেনা বিবির জীবন থেকে চিরতরে হারিয়ে যায়। চরিত্রটি স্বল্প রেখায় সুন্দরভাবে অঙ্কিত। আওয়ালপুরের পীর মজিদের স্বগোষ্ঠীয় ও প্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্র। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত গ্রামের একমাত্র ব্যক্তি তরুণ যুবক আক্কাস মজিদের কৌশলের কাছে পরাভূত আর একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। আক্কাসের প্রচেষ্টা বানচাল হয়ে যায় মজিদের কূটবুদ্ধির কাছে। আক্কাস স্বল্পস্থায়ী টাইপ চরিত্র।

লালসালু উপন্যাসে ক্ষণিকের জন্য আরও কিছু ছোটখাট চরিত্রের উদয় হয়েছে। সেগুলি হল তাহের-কাদের, মোদাবেবের মিঞা, মতলুব মিঞা প্রমুখ। অনুজ্জল হলেও উপন্যাসের কাহিনী বিস্তারে ও পরিবেশ রচনায় এসব

চরিত্র স্বাভাবিক ভূমিকা পালন করেছে। এইভাবে দেখা যায় অপ্রধান চরিত্রগুলির ভূমিকা লালসালু উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কারণ এদের মাধ্যমে লেখক মজিদের চরিত্র পরিস্ফুটন করতে যেমন সফল হয়েছেন তেমনি উপন্যাসের বহির্বিাস্তবতা নির্মাণ করতেও তিনি সফল হয়েছেন।

৮.৪.১৫.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

- ১। দুটি অপ্রধান চরিত্রের নাম বল?
- ২। উপন্যাসে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত একজন যুবকের পরিচয় পাওয়া যায় তার নাম কি?
- ৩। ‘লালসালু’ উপন্যাসের অপ্রধান চরিত্রের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

একক ১৬

উপন্যাসের ভাষা

বিন্যাসক্রম

- ৮.৪.১৬.১ : লালসালু'র ভাষা
৮.৪.১৬.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী
৮.৪.১৬.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৮.৪.১৬.১ : লালসালু'র ভাষা

সাহিত্য মাত্রেই ভাষানির্ভর। সাহিত্যিকের জীবনাভিজ্ঞতা স্বাক্ষর চিন্তাচেতনা, উপলব্ধি শিল্পমণ্ডিত হয়ে ভাষায় প্রকাশিত রূপই সাহিত্য। সুতরাং সাহিত্যে ভাষার গুরুত্ব সর্বাধিক। আর তা যদি কথাসাহিত্য বা উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিবেচ্য হয়, তবে সেক্ষেত্রে ভাষায় গুরুত্ব আরো একধাপ বেড়ে যায়।

উপন্যাসে ভাষাকে উভচরবৃত্তি পালন করতে হয়। কেননা উপন্যাসে জীবনের সমগ্রতাকে ধরার প্রয়াস থাকে—যে জীবনে নাটক আছে, কাব্য আছে, আছে গতিশীলতা, স্থবিরতা, প্রাত্যহিকতর একঘেয়েমিতা যেমন আছে, তেমনি আছে সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণতা। উপন্যাসিকের ভাষা তাই সর্বত্রগামী হওয়াই স্বাভাবিক।

সাহিত্যিকের জীবনাভিজ্ঞতা স্বাক্ষর চিন্তা চেতনা, উপলব্ধি শিল্পমণ্ডিত হয়ে ভাষায় প্রকাশিত রূপই সাহিত্য। সুতরাং সাহিত্যে ভাষার গুরুত্ব সর্বাধিক। উপন্যাসের বর্ণনা অংশ লেখকের প্রবণতার নির্ভর করে, পক্ষান্তরে সংলাপ অংশের বেশিরভাগ নির্ভর করে চরিত্রের উপর। উপন্যাসের চরিত্র ও সমাজকে জীবন্ত করে তুলেছেন উপযুক্ত ভাষা অর্থাৎ শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে এবং সংলাপের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন পূর্ববঙ্গের মানুষের মুখের ভাষা।

উপন্যাসে ভাষা ব্যবহার উপায় প্রধানত দুটি—বর্ণনা এবং সংলাপ। বর্ণনা অংশ মূলত লেখকের প্রবণতার উপর নির্ভর করে, পক্ষান্তরে সংলাপ অংশের বেশিরভাগই নির্ভর করে চরিত্রের উপর। উপন্যাসের ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলি স্মরণ রাখতে হবে। আমরা ‘লালসালু’ উপন্যাসে ওয়ালীউল্লাহের ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কৃতিত্ব আলোচনা করতে গিয়ে এই বিষয়গুলিকে স্মরণে রাখব।

ওয়ালীউল্লাহ সম্পর্কে প্রথমেই মনে আসে তাঁর সাহিত্য রচনার মূল উদ্দেশ্যের কথা। তিনি নিজেই বলেছেন—

“... I want to write মুসলমান সমাজ নিয়ে—আমার সমগ্র মনের ইচ্ছা যদিও পানো। এও একরকম passion থেকে সৃষ্টি। মুসলমান সমাজ সম্পর্কে আমরা কেউ হয়তো অজ্ঞ নই, কিন্তু অধঃপতনের এই যে চূড়ান্ত অবস্থা, সেই অবস্থা নিয়ে লিখে আমার লেখা কলঙ্কিত করতে চাই।”

—এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি ‘লালসালু’ উপন্যাস রচনায় ব্রতী হন। আর এই উদ্দেশ্যপ্রবণতার কারণেই আমরা দেখি তাঁর উপন্যাসগুলি, বিশেষজ্ঞ ‘লালসালু’ উপন্যাসটিতে সংলাপ অপেক্ষা বর্ণনার আধিক্য।

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হলেও বর্ণনা অংশে ওয়ালীউল্লাহের শিল্প মনস্কতার পরিচয় পাওয়া যায়। উপন্যাসের একেবারে সূচনায় লেখক গারো পাহাড়ের, মজিদের, মহব্বতনগরের ও সেখানকার মানুষজনের যে রূপবর্ণনা দিয়েছেন বা মজিদের মহব্বতনগরের প্রবেশ কাহিনি যেভাবে বিবৃত করেছেন তা সত্যিই অভিনব। এরপর সমগ্র উপন্যাসটিতে লেখক মজিদ, রহিম, জমিলা, খালেদ বাপারী প্রমুখ চরিত্র এবং মহব্বতনগরের মানুষজন, সমাজ ধর্মবিশ্বাস, প্রভৃতি সম্পর্কে এক নিখুঁত ভাষাচিত্র গড়ে তুলেছেন। চিত্রকার প্রাণ প্রতিষ্ঠা যেমন করেন বিভিন্ন রং-এর কারুকার্য এবং সুসমঞ্জস ব্যবহারের মাধ্যমে, তেমনি কথাশিল্পী ওয়ালীউল্লাহ তাঁর উপন্যাসের চরিত্র, সমাজকে জীবন্ত করে তুলেছেন স্বতস্ফূর্ত, উপযুক্ত ভাষা অর্থাৎ শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে। যদিও তিনি সচেতন ভাবেই সংলাপ অংশে চরিত্রগুলিকে বাস্তবমুখী, জীবন্ত করে তোলার জন্য পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষাই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু বর্ণনা অংশে তিনি সাধারণ চলতি বাংলাই ব্যবহার করেছেন। অবশ্য এক্ষেত্রেও আমরা দেখি লেখক পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালিদের মুখে প্রচলিত অজস্র শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন—‘নিরাক’, ‘বতোর’, ‘আবাজ’, ‘নছিত’, ‘রহমত’, ‘পরওয়ার-দেগার’, ‘বাল’, ‘মুরিদ’, ‘দুলা-মিঞা’, ‘খ্যাংটা’, ‘এংবার’, ‘খৎনা’, প্রভৃতি বহু শব্দ যা মুসলমান ধর্মের সঙ্গে আরবি, পার্সী থেকে বাংলায় চলে এসেছে, বা একান্তই অশিক্ষিত গ্রামীণ বাঙালির সীমিত শব্দজ্ঞান থেকে তৈরি, ওয়ালীউল্লাহ চরিত্রগুলির বাস্তবভিত্তি, সামাজিক সত্যতা এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য এগুলির সুন্দর ও সার্থক ব্যবহার করেছেন।

সংলাপের ক্ষেত্রেও ওয়ালীউল্লাহ বিশিষ্টতার পরিচয় রেখেছেন। সংলাপের ক্ষেত্রে তিনি ব্যবহার করেছেন পূর্ববঙ্গের মানুষের মুখের ভাষা, যা চরিত্রগুলিকে করে তুলেছে জীবন্ত। এ প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে,—

“অবশেষে অসহায়ের মতো তাহেরের বাপ বলে, কুমু? আমার দিলের কথা আমি জানি না। ক্যামনে কুমু দিলের কথা”?

—এভাষা ছাড়া তাহেরের বাপের ‘দিলের’ অবস্থা সত্যিই বোঝানো অসম্ভব। এ ভাষাই নিজের ভাষা। তার মুখে ভদ্র শিক্ষিত বাঙালির ভাষা মোটেই সাজেনা।

এই শব্দ ব্যবহারের পাশাপাশি ‘লালসালু’ উপন্যাসে বিভিন্ন ধরনের উপমার ব্যবহার কথাশিল্পী ওয়ালীউল্লাহের সাহিত্য আসরে স্বর্ণসিংহাসনটি নিশ্চিত করেছে। উপন্যাসের পাতায় পাতায় উপমা-বৈচিত্র্য লক্ষ্যণীয়। তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে,—

(ক) উপমার পরিচিত বস্তুর সাদৃশ্য কল্পনা,—

“বালরওয়ালা সালুদারা আবৃত হলো মাছের পিঠের মত সে কবর।”

(খ) দীর্ঘ ব্যাখ্যামূলক উপমা,—

“খুন হওয়া মানুষের তীক্ষ্ণ আত্ননাদ শুনে অন্ধের চোখের দৃষ্টির জন্য যে তীর ব্যাকুলতা জাগে তেমনি একটা ব্যাকুলতা জাগে অন্ধকারের গ্রাসে জ্যোতিহীন জমিলার চোখে”।

(গ) চিত্রল উপমা,—

“ওধারে ধোঁয়া হয়, শব্দ হয় ভাপের। যেন শত সহস্র সাপ শিষ দেয়।”

(ঘ) মানসিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশক ব্যাখ্যামূলক উপমা,—

“তার যে সাদা সুন্দর পা-টা দেখেছিল, সেই পা-ই তার মনে সাপকে জাগিয়ে তুলেছে। সাপ জেগে উঠেছে ছোবল মারার জন্য। তার জিহ্বা লিকলিক করে, উদ্যত দীর্ঘ গলা বেয়ে আসে বিষ।”

এইভাবে গোটা উপন্যাসটিতে ‘লোকজ-উপমা’, ‘দৃষ্টিগ্রাহ্য উপমা’, বা দৃষ্টি ও শ্রুতিগ্রাহ্য উপমা’র ছড়াছড়ি রয়েছে। একথা বলা অনাবশ্যক যে সব ‘উপমা’ ‘উৎপ্রেক্ষা’ লেখকের শৈল্পিক কুশলতারই নিদর্শন। এগুলি ‘লালসালু’র ভাষাকে তীক্ষ্ণ সংকেতসময় ও ব্যঞ্জনাঙ্গীকৃত করে তুলেছে।

আলোচনার শেষে এসে আমরা ‘লালসালু’র ভাষাভঙ্গির বিশিষ্টতা সম্পর্কে বলতে পারি, ওয়ালীউল্লাহ যতোই একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন না কেন, তাঁর বর্ণনাশক্তির নৈর্ব্যক্ত, অনিতরঞ্জিত বা সংযত ভঙ্গি কোথাও তাঁকে উদ্দেশ্যচালিত বা বক্তব্যপ্রধান বলে মনে হতে দেয়নি। তাঁর এক বড় শক্তি উপন্যাসিক-শোভন আসক্তি-অতীত ভাষারীতি।

সবশেষে বলা যায় ‘লালসালু’ উপন্যাসের ইঙ্গিতধর্মী ভাষা কাহিনি বর্ণনায় কোথাও চিত্রধর্মী, আবার কোথাও বা কাব্যিক। এ ভাষায় আবেদন শুধু দর্শনেন্দ্রিয়ের কাছেই নয়। অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের কাছেও সমপরিমাণে। উপমা উৎপ্রেক্ষার সমন্বয়ে ‘লালসালু’র পরিশ্রুতি কাব্যিক ভাষা উপন্যাসটিকে যেমন একাধারে করে তুলেছে অনন্য, তেমনি ওয়ালীউল্লাহ এরই জোরে হয়ে উঠেছেন বিশ্ববরণ্য।

৮.৪.১৬.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

- ১। সাহিত্যে ভাষার গুরুত্ব কতখানি?
- ২। ‘লালসালু’ উপন্যাসে লেখক কোথাকার মানুষের মুখের ভাষা ব্যবহার করেছেন?
- ৩। ‘লালসালু’ উপন্যাসের মধ্যে ওয়ালীউল্লাহের স্বতন্ত্র মানসিকতার পরিচয় ফুটে উঠেছে—ব্যাখ্যা করো।
- ৪। ‘লালসালু’ নামকরণের সার্থকতা সম্পর্কে তোমার নিজস্ব ভাবনার উল্লেখ করো।
- ৫। ‘লালসালু’ উপন্যাসে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস কিভাবে গ্রামের দ্বারা পরিস্ফুট করে মানুষের সহজ সরল জীবনযাত্রায় আঘাত এনেছে তা আলোচনা করো।
- ৬। ‘লালসালু’ উপন্যাসের ভাষাশৈলী সম্পর্কে আলোচনা করো।

৮.৪.১৬.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

পর্যায় গ্রন্থ-৪ এর প্রতিটি এককে (১-৪) নিম্নোক্ত বইগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

- ১। ‘সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ‘লালসালু’—মাহবুবুল হক

- ২। ‘সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ‘লালসালু’ ও অন্যান্য প্রবন্ধ’—সৌদা আখতার
- ৩। ‘সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জীবন ও সাহিত্য’—সৈয়দ আবুল মকসুদ
- ৪। ‘বাংলাদেশের উপন্যাসের বিষয় ও নিজরূপ’—রফিকউল্লাহ খান
- ৫। ‘বাংলাদেশের তিনজন ঔপন্যাসিক’—ড. শিরীণ আখতার
- ৬। ‘লালসালু : ভাষারীতি’—মনসুর মুসা
- ৭। ‘উপন্যাসে উপমা ব্যবহার : লালসালু’—আহমদ কবীর
- ৮। ‘লালসালু উপন্যাসে নারী চরিত্র’—আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ